২য় খণ্ড সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা ১

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৪ঠা কার্ত্তিক শনিবার ১৩২৯, ইং ২১শে অক্টোবর। [১৩শ সংখ্যা

কালীঘাটের—মায়ের মন্দির।

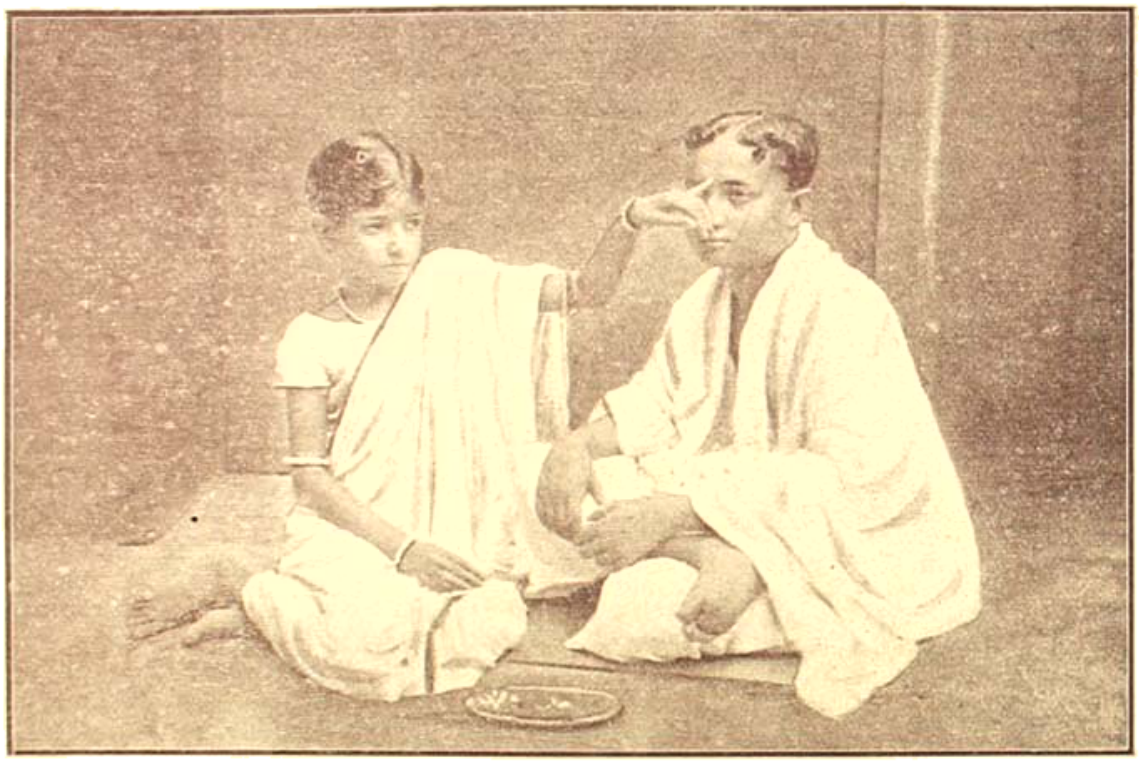

ভাইফোঁটা।

বিজয়া।

যৌবনের মঙ্গলবাদ্যের সহিত বাঙ্গালীর মনের মন্দিরে মায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সারা বর্ষের পর মা'কে অন্তর আসনে বসাইয়া বাঙ্গালার নর-নারী 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল, মা! মা বলিতে বাঙ্গালীর অন্তর বাহির ভরিয়া গিয়াছিল, বিজয়া দশমীতে মা'র বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মা'কে তিনদিন ধরিয়া গৃহে পাইয়া, পরম ভক্তিভরে মা'র পূজা করিয়াছে, মা'র রাঙ্গা চরণে কামনা-বাসনা নিবেদন করিয়াছে, বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সেই মা'কে পুণ্য সলিলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে। মা'র আগমনও বঙ্গবাসীর কাছে যেমন আনন্দদায়ক মা'র বিদায়ও তেমনি আনন্দদায়ক পবিত্র। দেবী বিসর্জ্জন—ত মায়ের বিসর্জ্জন নয় যে অবসাদে আসিবে, বিষাদে মন প্রাণ ভরিয়া যাইবে, যা-হারা সন্তানের আঁখুলি-বিঁখুলিতে আকাশ-বাতাস সিক্ত করিয়া ফেলিবে—এ যে শুধু সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তির বিসর্জ্জন! মা যে অন্তরে, মা যে সন্তানের বুকে! মা'র কি বিসর্জ্জন আছে? সন্তানের মনোমন্দিরে মা যে চিরস্থায়ী হইয়া আছেন! যুগ-যুগান্ত জন্ম-জন্মান্ত মা যে সেই সোণার সিংহাসনে বসিয়া ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন। মার বিসর্জ্জন নহে, বিসর্জ্জন সেই মাটির যে মাটী অন্তরে থাকিয়া মানুষকে মানুষের শত্রু করে; বিসর্জ্জন সেই পঙ্কের—যে পঙ্ক অন্তরে রহিয়া হিংসা দ্বেষে মানুষকে অ-মানুষ করে। বিজয়া দশমীতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে তাহাই ভাসাইয়া দিয়া আসিয়া নির্ম্মল পবিত্র অন্তরে মা'র নাম স্মরণ করিয়া মানুষকে আলিঙ্গন দিতে হয়! শত্রু নাই মিত্র নাই, আত্মীয় নাই পর নাই—মা'র সন্তান যে যেখানে আছে তাহাকেই আলিঙ্গন বদ্ধ করিতে হয়। বিজয়া দশমীতে বাঙ্গালীর মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম সুখের অনুভূতি! মা সন্তানকে, ধনিত ভার্য্যাকে, পুত্র পিতাকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে, বন্ধু বন্ধুকে স্নেহ-সম্ভাষণ জানায়; মনের ময়লা ধুইয়া আসিয়া মানুষ দেখিলেই প্রেম জ্ঞাপন করে—জাতির জীবনে এমন দিন রোজ আসে না—তাই "বিজয়া" বাঙ্গালীর এত আদরের। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া আত্মীয়ের কথা বড় বেশী মনে পড়ে; কাছে পাইলে আনন্দের সাগর উথলিয়া উঠে—যাহারা কাছে নাই তাহাদের দুঃখ বেশী করিয়া অন্তরে বাজে!

আজ যদি পারিতাম আত্মপর ভুলিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া কোল দিতে, অস্পৃশ্য নীচ ভাবিয়া মানুষকে দূরে না ঠেলিয়া যদি আজ তাহাদেরই বুকে ধরিতে পারিতাম, শত্রুতা ভুলিয়া সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারিতাম, বিজয়া দশমীর শিক্ষা তবেই আমাদের সফল হইত; দেবী আরাধনা তবেই সার্থক হইত! কিন্তু সে মন কৈ? মনের মাটি ত যায় না, আবিলতা যে তার পরতে-পরতে! মা'কে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলে আবিলতা দূর হইত, মলা ঘুচিত—কিন্তু 'মা'-ডাক ডাকিবার মত কণ্ঠ কৈ? সে শক্তি কৈ? সে ভক্তিই বা কোথায়?

বিজয়া দশমী লোকাচার নহে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ লভিবার এই একমাত্র ধর্ম্ম! যে ধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রকেই আপনার করিতে বলে, বিজয়ার সেই ধর্ম্ম! সেই ধর্ম্ম অনুসারে যতদূর সাধ্য মানুষকে চলিতে হয়, তবেই তাহার পূর্ণত্ব।

আজ বিজয়া দশমীর পর আমরা প্রথম আমাদের পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। মুকুলরা আশা লইয়া সকলকেই আমরা বিজয়ার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বিনিময়ে আমরাও সম্ভাষণের ভিখারী। আদান-প্রদানেই ইহার সার্থকতা!

বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের কথা বলিতে গিয়া মনে পড়িতেছে, বন্যাপীড়িত ভাই-বোনগুলির কথা! আজ তাহারা গৃহহারা, অন্নহীন; গৃহহীন, প্রবল বন্যা তাহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; অন্নমুষ্টি নষ্ট করিয়াছে, আজ তাহাদের গৃহপালিত পশুকুল আকুল ক্রন্দনে কীট পতঙ্গের মতই বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে—চারিদিকে হাহাকার, চারিদিকে মরণের আর্ত্তনাদ! জগজ্জননীর আগমনেও দেশের যে এ দুর্দ্দশা হয়—তাহার কারণ আমাদের ভক্তিহীনতা ছাড়া আর কি বলিতে পারি? মা কি কাহারো সর্ব্বনাশ করিতে পারেন? মা যে আমার মঙ্গলময়ী, সন্তান আপন দুঃখে দুঃখে পায়, আপন কর্ম্মফল ভোগ করে, মা কি করিবেন?

তবুও ডাক, ডাকার মত ডাক, মা'র কাণে তা পঁহুছিবে, সকল দুঃখ দূর হইবে।

শুভ শারদীয়ার পর আমরা আমাদের দেশবাসীকে সাদর অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

• • • •

জগজ্জননী মহামায়া শারদলক্ষ্মী এবার কি যান আরোহনে বাংলায় আসিয়াছিলেন জানি না—শত অভাবে দুঃখ, হাহাকার পূরিত বাংলার বিপুল প্লাবনের স্রোত বহাইয়া দিয়া—দেশের কত নর নারীর প্রাণ হরণ করিয়া—তাহাদের ঘর বাড়ী হীন আশ্রয় হারা করিয়া শারদলক্ষ্মী দূরে আবার কোন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন।

• • • •

বাংলার লোকের মুখে; বাংলা দেশের খবরের কাগজ গুলিতে আজ উত্তর বঙ্গের ভীষণ প্লাবনের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। এই ভীষণ প্লাবনের রাক্ষসী লীলা প্রায় দু'হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া নির্দ্দয় ভাবে বহিয়া গিয়াছে। এই প্লাবনে কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে—কত লোক কত সম্পত্তি হারাইয়াছে, এখনও কত লোকে কত দুঃসহ কষ্টভোগ করিতেছে আরও কত কত ইহাদের কতদিন ভোগ করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তাই নাই। বন্যাপ্লাবিত স্থান সমূহের শস্য ক্ষেত্র সমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—চাষের গরু মহিষ প্রভৃতি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে—ক্ষেত্র সমূহ ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। দেশের অধিবাসীবৃন্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যেরূপ ফসল পাইয়া তাহাদের পেটের ক্ষুধা মিটাইতে পারিত আগামী বৎসরের জন্য তাহারা তাহা পাইবে না তাহার কোন নিশ্চিয়তা নাই।

• • • •

আমাদের এ বিচিত্র দেশের সবই অনিশ্চিত—সবই রাজ্যছাড়া অদ্ভুত। এ দেশের মত জলাভাব, বন্যা,—এদেশের মত অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, এদেশের মত ব্যাধি পীড়া—মহামারীর প্রবল তাড়না ধ্বংস লীলা জগতে অপর কোন দেশেই বোধ হয় নাই। অভাবের তাড়নায়—পেটের জ্বালায় দেশবাসী দিনদিন ধ্বংসের মুখে যাইতেছে—তবু দেশবাসী আমরা যদি আমরা সভ্য হইতেছি, আমরা নূতন রাজনৈতিক অধিকার পাইতেছি কিম্বা ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাইবার যোগ্যতা লাভ করিতেছি। সবই উত্তম—সবই অতি সুসঙ্গত—কিন্তু দেশে যে ভাবে—নৈসর্গিক অনৈসর্গিক উৎপাৎ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ চলিতে গেলে আগে ইহারা আমাদিগকে বরণ করিবে, না—উন্নতি লাভ করিয়া সুখে কাল কাটাইবে তাহাই সন্দেহের বিষয়!

• • • •

দেশে এতবড় একটা ভীষণ উপদ্রব হইল—এতস্থান ব্যাপিয়া এমন ভীষণ বন্যা হইয়া গেল যাহাতে লক্ষলক্ষ দেশবাসীর ধন প্রাণ এমন ভাবে বিপন্ন হইল—এ জন্য দায়ী কে! অবশ্য ঘোরার মার দুনিয়ার মার তাহার উপর মানুষের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মানুষের দোষে—তাহারই দোষ-দুষ্ট বিচিত্র বিধানের দোষে যদি দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর এমন দুরবস্থা ঘটে—তবে এজন্য কে দায়ী হইবে? দায়ী যদি কেহ হয়—যদি কাহাকেও দায়ী করিতে পারা সম্ভব হয়—তবে সেই দোষ-দুষ্ট বিধান নিয়ন্তা বিধাতাকেই দায়ী করিতে হয়।

• • • •

আজ উত্তর বঙ্গের এই ভীষণ বন্যার সম্বন্ধীয় সরকারী যে-সরকারী যতগুলি রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতেই দেখিতেছি রেলের বাঁধ সমূহই এজন্য প্রধানতঃ দোষী এবং দায়ী। রেল কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের পথের ও গ্রবের লাঘব ঘটাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জল নিকাশের ব্যবস্থা করেন নাই। সারা শিরাজগঞ্জ রেল লাইনটি এ দোষে অতি দুষ্ট। এই রেল লাইনে উপযুক্ত পরিমাণ জল নিকাশের ব্যবস্থা নাই বলিয়া, দেশের লোকে বহুবার অভিযোগ জানাইয়াছে—বাংলা কৌন্সিলে ইহা লইয়া প্রশ্নোত্তরও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। দেশের লোকের অভাব অভিযোগে কর্ত্তৃপক্ষ কান দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কান দেওয়া না দেওয়া অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা—এমন অনেক অবহেলার যোগ্য ব্যাপারকে তাহারা চিরদিনই উপেক্ষা ও অবহেলার চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এই উপেক্ষা ও অবহেলার মধ্য দিয়া যে দেশবাসী এই লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ হানি ও অসীম কষ্ট হইল সে জন্য কে দায়ী হইবে?

• •

রেল লাইন দেশে যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াও—তোমাদের সৈন্য চলাচলের তাহাদের রসদ প্রেরণের যথেষ্ট সুব্যবস্থা কর তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার নাই—জানি সে আপত্তি অতি সঙ্গত ও অতি ন্যায্য হইলেও তাহা টিঁকিবে না—তবু দেশবাসী জিজ্ঞাসা করিতে পারে কাহার অবিবেচনার জন্য এতগুলি প্রাণী এমন দুর্ভোগ সহিতেছে!

• • • •

বন্যা হইল দেশের লোকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল—মুষ্টি ভিক্ষারীর বল তৃপ্ত হইল কিন্তু কতকাল এই মুষ্টিভিক্ষায় ভিখারী নিজের তৃপ্তি হইবে? উপদ্রবের সত্য কারণের নিরোধ না হইলে, দেশবাসীর তাহা করিবার যোগ্যতা না জন্মিলে দেশের জন্যে বরষির এমনি দুর্ভোগ আসিবে। মেঘের মত মেঘের জল নরনের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মাহুতি দিবে। আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহাদের কোন দিনই জন্মিবে না।

• • • •

বাংলাদেশের যে প্রদেশে এবার বন্যার ভীষণ প্লাবন হইয়া গেল ও প্রদেশে এমন প্লাবন ঘটিতে পারে ইহা দেশবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। স্বপ্নের অগোচর জিনিস এমন অকস্মাৎ আসিয়া কি করিয়া এমন ভীষণ বিপ্লব দেশে ঘটাইল আজ দেশবাসীকে সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া তীব্র ভাবে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে তেমন ভাবে সংযত সংহত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে লইয়া ছেলে-খেলা করিতে যাওয়াতেই এই ভীষণ বন্যা হইয়াছে। আমাদের দেশে—যে দেশে জল মতের কোন মূল্য নাই সেই দেশেই এমন ভাবে জল নিকাশের ব্যবস্থা না করিয়া রেল লাইনের অতি বিস্তৃতি চলিতে পারে—অপর কোন দেশেই ইহা সম্ভবপর হইত না—হইতে পারিত না—কোন কালে হইবেও না।

• • • •

দেশের দুরবস্থার সংবাদ সেবাকার্য্যে দেশবাসী যুবক মণ্ডলীর যে শ্রম যে ত্যাগ যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

• • • •

দুর্ভাগ্য কখনও একক কোন প্রাণী কিম্বা কোন দেশের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে আসে না। আসে সে তাহার সহোপাঙ্গ লইয়া আসে সে সঙ্গে তাহার নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া। আমাদের এই হতভাগ্য দেশের উপর এমনি দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্যের চাপ পুঞ্জীভূত হইয়া চাপিতেছে—জানিনা এ চাপ এ পেষণ হইতে দেশ কবে মুক্ত হইবে!

• • •

দেশের জন হিতকর কার্য্যে নানাদিকেই নিত্য শোনা যায় অর্থাভাব। অর্থাভাব জন্যই জাতিগঠন বিভাগের মন্ত্রীগণ ইচ্ছামত কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। দেশের লোকে অনাহারে মরে, অনাবৃষ্টিতে জলে ডুবিয়া প্রাণ দেয়, ম্যালেরিয়ার মহামারীতে নিত্য ডুবিয়া ডুবিয়া মরিতেছে, দেশে শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই—মানুষ,—দেশের অধিবাসীগণ প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এমন কোন ব্যবস্থাই দেশে নাই। জগতের অন্যান্য দেশে লোককে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিয়া পরে তাহাদের শাসন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়—আর আমাদের এ পোড়াদেশে শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কথাই শুনি সর্ব্বাগ্রে—তাহাতেই রাশি রাশি অর্থব্যয়ের কথা শুনি সর্ব্বাগ্রে—আর এই সব শাসন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য এই প্রচুর অর্থাভাবের মধ্যেও কোথা হইতে কোন গৌরী সেন এই অর্থ যোগান কেমন করিয়া নিরবধি, অনশন অর্দ্ধাশন ক্লান্ত রোগজীর্ণ দেশবাসী এই অর্থ সরবরাহ করে তাহা দেশবাসী সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। এই সব শাসন ও শৃঙ্খলার কার্য্য তাহারা—যে দেশবাসীর উপরে ইহার প্রয়োগ চলিতেছে—তাহারা বোঝে না বলিয়াই মূকের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কিম্বা মাঝে মাঝে আরও পীড়নে পিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করে এ সব ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা হয়—সাময়িক আন্দোলন হয়, আলোচনা হয়—বস্ খতম। শাসন শৃঙ্খলার ব্যয় তার তেমনি বাড়ীতে থাকে—দিনের দিন তেমনি তাহা পাষাণ চাপের মত দেশবাসীর বক্ষ শোণিত নিঃশেষে শুষিয়া লইতে থাকে। দেশে সৈন্য ব্যয়, রেল ব্যয় এসব তো দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে ইহার উপর কৌন্সিল অধিবেশনে এখনও পুলিশ ব্যয় বাড়াইবার সময় কর্ত্তাদের পরম আগ্রহ দেখা যায়। পুলিশ অন্যান্য দেশে যদিও সাধারণের বন্ধু আমাদের এ দেশের মূর্খ অধিবাসীরা কিন্তু তাহাদের একটা মহাভীতির বস্তু বলিয়াই মনে করে। আমাদের দেশী চোর ডাকাতেরা—যাহাদের পুলিশকে ভয় করিবার কথা তাহারা কিন্তু পুলিশকে তেমন ভয় করে না। ভয় করে তাহারাই যাহারা ওসব পথে যাড়ায় না। যাহারা সৎপথে চলিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও আমাদের দেশী পুলিশ ফৌজ দেখিয়া ভীতই হয়। এই যে good citizen দের পুলিশ দেখিয়া ভীতির কারণ—ইহার সঙ্গত হেতু কি তাহা এ পর্য্যন্তও নিরূপিত হয় নাই। অনেকে মনে জানিলেও প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করিবার সাহস নাই তাহাদের। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। তাহার পর দেশে চুরি ডাকাতীর সংখ্যা নিত্য বাড়িয়াই যাইতেছে। দেশের লোক রাত্রে নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পারে

না—দেশবাসীর ধন, সম্পত্তি প্রাণ মান মর্য্যাদা কিছুই নিরাপদ নহে কিন্তু দেশে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত পুলিশের ব্যয় তার কিরূপে ক্রমশঃ বন্যার উচ্ছ্বসিত জলের মত বাড়িয়া যাইতেছে তাহার নমুনা এই বাংলা দেশেই গত নয় বৎসরের ভিতর কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯১২ সাল হইতে পুলিশের ক্রম বর্দ্ধিত খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সন	মোট খরচা
১৯১২	৬৭, ৩৭, ৫৮৯৲
১৯১৩	৭৪, ২৬, ৮১২৲
১৯১৪	৮৩, ০৯, ৬২২৲
১৯১৫	৮৭, ৮৬, ৩২২৲
১৯১৬	৯৫, ৮৩, ৬৫৫৲
১৯১৭	৯৯, ২২, ৬৫২৲
১৯১৮	১০৪, ৮ , ৫৯২৲
১৯১৯	১১৪, ৬১, ০৭৪৲
১৯২০	১৩১, ৬০, ১৮০৲
১৯২১	১৫, ৬৩, ৫০০৲
১৯২২	১ , ৭৯, ৮৬২৲
১৯২৩	১৭, ০৪, ৪৭৫৲
১৯২৪	১৯, ০০, ৭৩৮৲
১৯২৫	১৯, ৬, ০৫৫৲
১৯২৬	২২, ৮৭, ১৯৩৲
১৯২৭	২০, ৮৬, ৮৮০৲
১৯২৮	২৮, ৩১৪৩০৲
১৯২১-২২ সালের বজেট—	৩৬, ৫০০০০৲

১৯০০ সনে কলিকাতা পুলিশের ব্যয় ছিল ৮, ১৭, ৬২৬৲। ১৯২১-২২ সনে সেই ব্যয় বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৬, ৫০০০০৲। কলিকাতা পুলিশের ব্যয় তার প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

* * * *

নূতন শাসন সংস্কারে দেশ শাসন ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায়ের অর্থাভাব দিন দিন যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—সংস্কার যুগে যে সমস্ত নূতন বিভাগগুলি হইয়াছে তাহার নানা কর্ত্তাদের আপিস ও ঠাট বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় বাহুল্য তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অতি সাধারণ একটা কার্য্যে খরচ বাড়াইতে গিয়াও হাজার বার ভাবিয়া দেখে—বিচার করে এই ব্যয় তার বৃদ্ধি করাতে তাহার কার্য্য কতটা সুপরিচালিত হইবে। কতটা সুবিধা সে ইহা হইতে পাইবে। ইহা লোকের মনে ওঠা সঙ্গত ও অতি স্বাভাবিক। তেমনি আজ এই যে সংস্কারের বলে নানা বিভাগ বাড়িয়া গেল—নানা বিভাগে বহু বহু লোক নিয়োগ হইল ইহার সার্থকতা কোথায় তাহা জনসাধারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে। পূর্ব্বে যে কাজ একজনে সম্পাদন করিতে পারিত—এখন সেই কার্য্যেই দশজনে নিযুক্ত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে সে বিভাগের কর্ম্মদক্ষতা সে পরিমাণে কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। অর্থের অভাব দেখায় এত বেশী দেখায় অর্থের অভাবে দেশের প্রয়োজনীয় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর হয় না দেখায় অনবরত লোকদের অপরিমিত অর্থ দিয়া পুষিবার কারণ কি—এ কথাটির সঙ্গত উত্তর দেশবাসী পাইতে চাহে।

* * * *

দেশে আজ ব্যয় সংস্কার কমিটি বসিতেছে। লর্ড ইঞ্চকেপ এই কমিটির সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া কাঁচি হাতে আসিতেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে ক্যাম্পেয়ার ব্যয় সঙ্কোচের বৈঠক বসিতেছে। ব্যয় সঙ্কোচ ঘটাইবার জন্য যে কমিটি বসিতেছে ইহাতে ব্যয় সংক্ষেপ তেমন হউক বা না হউক কমিটির আহার - বিহার—যাহিয়ানা ইত্যাদি কার্য্যে

অথচই যে ব্যয় হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেউলিয়া শাসন ব্যাপারে ব্যয় সঙ্কোচ ঘটাইতে আসিয়া শুধু এই অনাবশ্যক ব্যয়ই যদি কমিটি করিয়া যান তবে দেশের অধিবাসীবৃন্দ তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিবে কি? আরও একটি কথা—যে ব্যয়ে সংস্কার আমলে এ দেশের শাসন ব্যাপার চলিত এখনও সেই ব্যয়ে কেন শাসন ব্যাপার চলিতে পারে না কি? যদি না পারে তাহারও সঙ্গত হেতু—কেন চলিতে পারে না তাহার কারণ দেশবাসী জানিতে চাহিতে পারে।

• • • •

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি নবাব সার সামসুল হুদার মৃত্যু হইয়াছে। নবাব সাহেব হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই প্রিয় ছিলেন। এমন যোগ্য দেশবাসীর মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত।

• • • •

লুজানিয়ারের বৈঠক অনুসারে গ্রীক তুর্ক গণ্ডগোলের ও নিকট প্রাচ্য সমস্যার বুঝি বা একরূপ সমাধান হইয়া গেল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ প্রথম হইতে যেরূপ ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন তাহাতে ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি যদি তাঁহার সঙ্গে একটু যোগ দিত তবে আবার একটা ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যাইত।—জগতের সকল শক্তিবর্গই কোন না কোন পক্ষে যোগ না দিয়া পারিতেন না—জগতে আবার একটা রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইত। এই ব্যাপারে ফরাসী ও ইটালীর রাজনীতিকদিগের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। এই ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জও একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীরূপে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য বুঝি আর থাকে না। বিলাতে নানা দলের মধ্যে তাঁহার মন্ত্রীত্ব যেরূপ চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে বোধ হয় আর তাঁহাকে এ পদ উপভোগ করিতে হইবে না।

• • • •

জগতে শক্তিমানের বীর্য্যের কাছে কি করিয়া সকলেই শির নত করে এ যুগে মুস্তাফা কেমাল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। বাহুবলের মত বল আর নাই—এ যুগে মুখের কথায়—আবেদন নিবেদনে আর মানুষের অনুগ্রহ মেলেনা। বর্ত্তমান কেমাল বিজয়ে তাহাও বেশ ভালরূপে প্রমাণিত হইল।

• • • •

ডাক্তার বেন্টলী সাহেব এবার বড় একটা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বহু মাহিয়ানা ভোগী সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও বলিয়াছেন 'রেলের বাঁধগুলিই এই বন্যার কারণ। সুপ্রচুর জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকাতেই এই বন্যা হইয়াছে।' ডাক্তার বেন্টলি সত্য কথা বলিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও তিনি এমন সত্য কথা বলিয়াছেন তাই বাজার গুজব শীঘ্রই তিনি পদচ্যুত হইলেন।—সত্যের মর্য্যাদা দেখিতেছি এখন বাজারে খুব বেশী!

• • • •

সম্রাট শাজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে, সম্রাটকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের এই অমানুষিক ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে আসিয়া ঔরঙ্গজেবের তেজী বাজীতে হতভম্ব হইয়া ফিরিয়াছিলেন। বৃদ্ধটি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সুকৌশলে তাঁহার সাজাহান নাটকে বর্ণিত করিয়াছেন। তেমনি একটি দৃশ্য সম্প্রতি ঘটাইয়াছেন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ। নির্ব্বাচন আসন্ন, নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে এবং যুদ্ধান্তির সময়ে কমতাপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ যে সমস্ত ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে ইংলণ্ডের পরম মিত্র ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের আর তাঁহার সহিত সাম দিয়া তাল ঠিক রাখিতে না পারিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ গ্রীক্ তুর্ক ব্যাপারে তিনি বিদেশীয় শক্তিবর্গের ও দেশীয় মিত্রবর্গেরও একান্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন; সম্প্রতি ব্যাপার এতটাই গড়াইয়াছে যে ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনে ইহার পূর্ব্ব গৌরবে দাঁড়াইয়া থাকা একরূপ অসম্ভব। তাই জেরুজেলাম যাইবার একান্তপ্রয়াসী খৃষ্টভক্ত লয়েড জর্জ্জ পরপারের কথা স্মরণ রাখিয়া বলিতেছেন তিনি—ক্ষমতা চান নাই—নাম চান নাই, যশ চান নাই এ সমস্তই অহেতুকী ভাবে তাঁহার উপরে চাপানো হইয়াছে।—এ্যাস্কুইথ, ব্যালফুর, চেম্বারলেন প্রভৃতিকে তিনি পুনঃ পুনঃ এ সম্মান গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। তারপর প্রধান মন্ত্রী কখনও যুদ্ধ ভালবাসিয়াছেন আবার ঠেকিলেই যুদ্ধের অবমা নিন্দা গাহিয়াছেন। বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী অনেক কথাই কহিয়াছেন। ওয়েলস্ যাদুকর সভাই যাদুকরের মতই বক্তৃতা করিয়াছেন। এমন উচ্ছ্বসিত, অথচ রাজনীতিক বাঁধুনি সম্বলিত বক্তৃতা এ যুগে কোন রাজনীতিক দিয়াছেন কিনা জানি না। এ বক্তৃতা ইংলণ্ডের রাজনীতিক হল ঘরে সোণা দিয়া সোণার অক্ষরে বাঁধাইয়া রাখিবার যোগ্য।—বক্তৃতার সবই ভাল কিন্তু এ বক্তৃতায় এই উচ্ছ্বসিত ভাব-গুপ্তির বিকাশে আর জগতের লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে না। প্রাচ্য তো মোটেই নহে। পাশ্চাত্যও মোটেই নহে—পাশ্চাত্যের বন্ধুত্বের জাঁতাত লোহহয় তুর্ক গ্রীক্ ব্যাপারে ফাঁসিয়া গেল। আমেরিকা আর এ রাজনীতিক চালে নিজেকে জড়িত করিতে না চাহিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্স, ইটালীও সরিয়াছে। বলশেভিক রাশিয়া নিজ শক্তিতে দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মেনীর অবস্থাও খারাপ নহে। হতমান তুর্ক আবার কেমালকে পুরোভাগে রাখিয়া শির উন্নত করিয়া চলিয়াছে। লয়েড জর্জ্জের প্রণালীর স্বার্থী-

সভা রক্ষা ও সব বাজে কথা—ওসব কথার আর প্রাচ্য ভুলে না। তবে কথায় আছে ভেড়িকে ভেড়ি জানিয়াও লোকে তাহাতেই ভোলে চিরদিন। তাই ওয়েলস্ যাদুকরের ভেড়ি বাজী বোধহয় আবার কোটীপতিদের তাক লাগাইয়া দিবে!

সকলেই তাক লাগিতে পারে কিন্তু জগৎ জোড়া আর সকলেই এই ভেড়ি বাজীর আলোচনা করিতেছে। প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য সমভাবেই। দেখা যাউক ফল কোথা দাঁড়ায়! ফল যাহাই হউক এমন বক্তৃতা—এমন বলিবার ভঙ্গী রাজনৈতিক জগতে অনেকদিন শোনা যায় নাই।

গোপ—ও ভাই কামাল দাওনা সামাল
তোমার তরল তুর্কী সেনা!
কামাল—শ্রীজগৎ গোপ হ'ল কি?
তোমার কথা কেউ শোনে না?
তাই বলে কি বলছ আমায়?
ছাই ফেলে দাও গোপগিরীতে
যাব কবে ভাই সোহাই তোমার
কাজ নেইক আর পীরিতে।

স্বাস্থ্য বার্ত্তা

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্—"

"গুপ্ত প্রকাশ" ও তদ্রিত্র গঠনের পন্থা।—

কিশোর ও যুবকদিগের অবশ্য পাঠ্য।

(লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্ এম্ এস্)

[এই উপাদেয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি আশ্বিনের 'স্বাস্থ্য সমাচারে' বাহির হইয়াছে। আমরা উহা হইতে সংক্ষেপে কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া ছাত্র মণ্ডলীর হাতে ক্রমশঃ উপহার দিতেছি। মূল প্রবন্ধটি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই প্রবীন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চলিতে পারিলে দেশ ও সমাজ রক্ষা পাইবে—আমাদের জাতীয় জীবন-স্রোত নব বলে বলিয়ান হইয়া উঠিবে।—

বাসন্তী সম্পাদক।]

আমাদের হাত পা দেখিয়া, সাধারণতঃ আমরা কোনও কথা বলিনা; কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যন্ত হাত পাজর বাহির করা রোগা, সে লোকটি যদি দুপাতা ইংরেজী পড়িয়া থাকে তবে অতি দারুণ গ্রীষ্মেও সে জামা গায়ে দিয়া তাহার দেহের কঙ্কালের ছায়া ঢাকিয়া, তবে লোক লোচনের সম্মুখে বাহির হইবে। সে দরিদ্র বলিয়া যাইতে না পারিয়া রোগা—এ কথাটি তাহার পক্ষে সত্য না হইলেও, সে লোকের সামনে খালি গায়ে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিবে - ইংরেজী সামাজিকতার শিক্ষা এই। তাহার দেহের দৈন্যই তাহার "লজ্জার" স্থান। শ্রীলোকেরা যাহার তাহার সম্মুখে মাথার কাপড় খোলেন না; বহু বর্ষের বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এই প্রথা;—কাজেই বঙ্গ রমণীর পক্ষে মাথা ও মুখ "লজ্জার" স্থান। সাহেবদের দেশে মাথা ও মুখ "লজ্জার" স্থান নহে। কিন্তু স্থির বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় শ্রী ভগবান্ প্রদত্ত এই পবিত্র দেহে লজ্জার কোনও জিনিষ নাই।

আমরাই বুদ্ধি, বিবেচনা বা ব্যবহারের দোষে দেহের কোন অংশকে লজ্জার বিষয় করিয়া লইয়াছি। পোষাক উপর এইরূপ খোদকারী করিয়া কি ফল হইয়াছে? পাপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের স্বভাব এই—যেখানেই যত লুকোচুরি সেখানেই অনুসন্ধিৎসা তত বেশী। মেমরা ঘোমটা দেন না কাজেই রাস্তা দিয়া পরম রূপবতী মেম্ চলিয়া গেলেও কেহ তাকাইয়া দেখে না। কিন্তু ঘোমটা দিয়া একটী কুৎসিৎ হিন্দু বৃদ্ধা যাইলেও পাঁচজনের চঞ্চল চক্ষু আগে সেইদিকে পড়ে। আমাদেরও ঘটিয়াছে তাই। বহুদিন চুপি চুপি, জনন সম্বন্ধীয় কথা বলায় এখন লোকের মধ্যে ঐ সকল কথায় ইঙ্গিত করাও বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ফলে অনাচার, দুরাচার কদাচার, পাপাচার—তাহার ফলে ব্যায়াম, অকর্ম্মণ্যতা অল্পায়ুঃ। সমাজ এই সবই দেখিতেছেন। কিন্তু শব হইয়া তমো নিদ্রাবৃত আছেন।

জীবের জন্য জীব জন্ম দিবার জন্য। কোন উপায়েই এতবড় কথাটা উড়াইয়া দিতে পারেন না। সত্য সমাজে মানুষের জীবনের চরম পরীক্ষা—সমাজকে সন্তান দান করা। কাজেই এই সকল কথা যত করিয়া না শিখিলে কোথা হতে সে সব জ্ঞান আসিবে?

আজ তাই অসঙ্কোচে সকল কথা শিখাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের সূচনা। যাহার মন তেমন কলুষিত ভাবাপন্ন সে ব্যক্তি এই প্রবন্ধ পাঠের অনুপযুক্ত। শ্রী ভগবান্ নির্ম্মিত এই সুন্দর নরদেহ মানব শ্রী ভগবানের শ্রীমন্দির যে ব্যক্তি দর্শন করিতে চাহে সে নিজ মনকে ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া তবে যেন অগ্রসর হয়।

যাহারা মনে করেন যথেষ্ট রোজগার না করিতে পারিলে বিবাহ করা উচিৎ নহে তাহারা ঘোর স্বার্থপর ও ভোগ-লোলুপ জীব, তাহারা পৃথিবীর উপকার করিতে আসেন নাই; তাহারা শুধু নিজেকে ভোগায়তন করিয়া আসিতেছেন।

এই পৃথিবীতে ধনীদিগের প্রায় সন্তান জন্মেনা, কিন্তু যেখানে যত দারিদ্র্য সেখানেই তত সন্তান সম্ভাবনা বেশী। ইহাই প্রাকৃতিক নির্দ্দেশ তোমার আমার ক্ষুদ্র বিচারের ফল নয়। দরিদ্রের ঘরে বহু সন্তান জন্মিলেও কতকগুলি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; বোধ হয়, এই জন্যই দরিদ্রের সংসারে সন্তান বাহুল্য।

প্রত্যেক প্রাণীরই জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল থাকে শুধু এই কালটুকুর মধ্যে সে জীবের জন্মদিতে সক্ষম হয়। মানুষের বেলায়, সেটুকু গড়ে ১৫ বৎসর বয়স হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল। এই ত্রিশ বৎসর কাল আমাদিগের মেয়াদ থাকিলেও, ইহার প্রথমার্দ্ধকাল ত্যাগ করিয়া চলাই আমাদিগের পক্ষে সুবিবেচনার কায হইবে। কেননা ২৫।৩০ বৎসর বয়স না হইলে সন্তানোৎপাদনে নিযুক্ত হইবে না।

পুরুষের বীর্য্যই জনন কার্য্যের প্রধান উপাদান। এই বীর্য্যকে ল্যাতঃ ধাতু "খাত শুক্র ম্যাটার সিমেন্ প্রভৃতি বলা হয়। এই বীর্য্যের জন্ম স্থান অণ্ডকোষের ঝিল্লিতে। মুখে যেমন লালা সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া জমা থাকেনা, চোখে যেমন জল তৈয়ারী হইয়া কোন লুকান চৌবাচ্চায় জমা থাকে না, নাকে যেমন সর্দ্দি সদা সর্ব্বদাই জমা থাকে না, কিন্তু, প্রত্যেকবার খাইবার সময়ে যেমন আবশ্যক লালা মুখের ভিতর নিঃসৃত হয়, চোখে বালি পড়িলে যেমন অনবরত জল গড়াইতে থাকে এবং নাকে লঙ্কার ঝাঁজ লাগিলে যেমন প্রচুর সর্দ্দি পড়ে, তেমনি আবশ্যক হইলেই কামোত্তেজনার সময় অণ্ডকোষের মধ্যে বীর্য্য তেমনি তৈয়ার হইয়া যায়। কুচিন্তা, কু-দৃশ্য দর্শন কু-কথা শ্রবণ ইতর প্রাণীদিগের বেলা কুস্থানের আঘ্রাণ গ্রহণ, হস্তাদি দ্বারা জননেন্দ্রিয় উত্তেজন করা প্রভৃতি নানা উপায়েই কামোদ্রেক ঘটাইয়া বীর্য্য সৃষ্টি করা যাইতে

পারে। সাধারণত যে যে পথ দিয়া কামের উদ্রেক করান যায় বা সম্ভব হয় তাহা এই :—

(১) চিন্তা বা মনন দ্বারা। যে মন ইচ্ছা করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কেই বশ বা নিগ্রহ করিতে পারে আবার সেই মনই আমাদিগকে লইয়া যায় নানা নাচারে—দুঃকর্ম্মে রত করে। মনকে বশে আনার মত শক্ত কাজ আর নাই। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরে আধিপত্য করে। মন কখনো মরে না। পুনর্জ্জন্ম হইলেও পূর্ব্বজন্মের মন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য মন অত্যন্ত দুর্জ্জয় বলিয়া, মনকে সর্ব্বদাই সুচিন্তা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই কথা স্মরণ করিয়া (অর্থাৎ সৎ অসৎ বিচার করিয়া) যে-সে ধারণাকে মনে স্থান দিবে না।

(২) চক্ষু দ্বারা— কুৎসিৎ কাজ বা চিত্র দর্শন দ্বারা।

(৩) কর্ণ দ্বারা—কুৎসিৎ কথা শ্রবণ দ্বারা।

(৪) নাসিকা—ইহা ইতর প্রাণীদের বেলায় প্রযোজ্য। অনেকে জানেন না যে, মৃগনাভিটী কি? যে মৃগের নাভিতে এই মহা জন্মে সেইটি সেই জাতীয় পুং মৃগ। যৌন সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইলেই উহার নাভিতে এই উগ্রগন্ধী দ্রব্যের সঞ্চার হয়, এই গন্ধের দ্বারাই মৃগীরা ঐ মৃগের নিকটে আকৃষ্ট হয়। মানুষের বেলা, নানা সুগন্ধি লেবনে কামোদ্রেক হইয়া থাকে। এইজন্য ব্রহ্মচারী ও বিধবাদের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(৫) গাল, ঠোঁট, নিতম্বদেশ, উরুস্তন প্রভৃতির স্পর্শ কাহারো কাহারো পক্ষে কামোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও কণ্ডুয়নেও কামেচ্ছা প্রবল হয়। ব্রহ্মচারী ও বিধবারা এই কারণে উক্ত কার্য্যে রত হন না। নিতম্বদেশ উত্তেজিত হইলে কামোদ্রেক ঘটিতে পারে। এই কারণে শিশুদিগের নিতম্বদেশে চপেটাঘাত বা বেত্রাঘাত করা অন্যায়। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

(৬) পরিপাক যন্ত্র।—অতি ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য আহার, মাছ মাংস প্রভৃতি উগ্রদ্রব্য ভোজনে কামেচ্ছা প্রবল হয়। যাহাতে "পেট্ গরম" হয় এমন জিনিষ খাইলে কামোদ্রেক ঘটে। মাছ, মাংস, ডিম, কাঁকড়া, গরম মসলা, পেঁয়াজ রসুন বেশী পান সুপারী খাইলেও কামোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে বিধবাকে নিরামিষাশী ও পান সুপারি ত্যাগিনী হইতে হয়। ভোজনের পর চিৎ হইয়া শুইলে হজমের ব্যাঘাত হয়—এজন্য চিৎ হইয়া নিদ্রিত হইলে, কামোদ্রেক ঘটিবার সম্ভাবনা। দিবানিদ্রারও ঐ কুফল। এইজন্য "না দিবা সাপী"

(৭) মলদ্বার। ছোট ছোট কৃমি থাকিলে মল দ্বার শুড় শুড় করে। মলদ্বারে এই ভাবে উত্তেজনা থাকিলে কামেচ্ছা বলবতী হইবার সম্ভাবনা। নিরন্তর কোষ্ঠ কাঠিন্যেও কামোদ্রেক করায়।

(৮) জননেন্দ্রিয়ের অপরিচ্ছন্নতা। ইন্দ্রিয় মাত্রেই অগ্রে অতি ধীর ও সহজে অপরিষ্কার হইয়া পড়ে। অপরিষ্কার থাকিলে আপনিই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিয়া থাকে। এ কারণে পরিষ্কার জলে উহাদিগকে, ধুইয়া রাখা উচিত। পরিষ্কার রাখিবার উদ্দেশ্যে সাবান ব্যবহার করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। বরঞ্চ নিত্য সাবান লাগাইলে চর্ম্ম উগ্র হইয়া যায়। খোস পাঁচড়া চুলকানি দাদ প্রভৃতি যাহাতে না হইতে পারে সেজন্য আশে পাশে বেশী চুল জন্মাইতে দিতে নাই এবং যথাসাধ্য নিত্য পরিষ্কার রাখিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ

৺যতীন্দ্রনাথ পাল

বাঙ্গালা ভাষার উপন্যাস পাঠক পাঠিকাদের চিরপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ পাল সম্প্রতি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। আর সে লেখনী নূতন নূতন উপন্যাস প্রসব করিবে না, চিরতরে নীরব হইয়া গেল। ফুল না ফুটিতে বিধাতার কঠোর নিয়মে ঝরিয়া গেল। মৃত্যুকালে যতীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল। সাত আট বছর যতীন্দ্রনাথ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এই অল্প সময়ের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ উপন্যাস, জীবনী নাটিকা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রভৃতিতে একশত খানি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। জন্তু, গান, গল্প কবিতা—যতীন্দ্রনাথ সমস্তই রচনা করিতে পারিতেন। যতীন্দ্রনাথের মত বন্ধুবৎসল, অমায়িক, রহস্য-রসিক লোক অতি বিরলই দেখা যাইত।

যতীন্দ্রনাথ বঙ্গবিশ্রুত সাহিত্যিক ৺বীরেন্দ্রনাথ পালের কনিষ্ঠ পুত্র। যাহারা বিগত যুগের সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে বীরেন্দ্রনাথ কি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের রচিত উপন্যাস সমূহ আজও বঙ্গসাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পিতার প্রতিভা পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল।

সাহিত্যের দিক দিয়া যতীন্দ্রনাথকে হারাইয়া আমাদের মনস্তাপের অবধি নাই; তাহার উপর এমন বন্ধু হারাইলে যে কি দুঃখ—তাহা কি প্রকাশ করিবার! আজ মনে পড়িতেছে যতীন্দ্রনাথের বিশোষী পত্নীর কথা আর দু'টি অপগণ্ড শিশুর কথা—ভাবিতেও বুক ভাঙ্গিয়া যায়, চক্ষের দৃষ্টি লুপ্ত হয়। ভগবানের ইচ্ছা—মঙ্গলময়—এ শোকে এই সান্ত্বনা। তিনি যে কি মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথকে এত শীঘ্র সাধনোচিত ধামে লইয়া গেলেন, একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন।

ইন্দিরা দেবী

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা ইন্দিরা দেবীও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিদুষী মহিলা লেখিকাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী অন্যতমা ছিলেন। তাঁহার বিয়োগ বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতিজনক।

শিশুর স্মৃতি।

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

১

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিলাম,—যাক্ আজকের ফাঁড়া উৎরোইল! ডাক্তারের ছুরি কাটারীর হাত হইতে আজ বাঁচিয়াছি বলিয়া বোধ হয়!

সামনের খোলা জানেলা দিয়া মৃদু বাতাস আসিতেছিল। রোগশয্যায় পড়িয়া, কষ্টে-সৃষ্টে অতি-সাবধানে এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম। ডানহাত খানাকে ছুঁইতে ও ভয় হইতেছিল।—ক্ষত যন্ত্রণার্ত্ত হাতখানা একটু সামান্য স্পর্শ—সামান্য নড়া চড়ার ভারও সহ্য করিতে পারিতেছে না। ডান হাতের একটা আঙুল-হারা হইয়াছে, কিন্তু হায়! সমস্ত ডান-অঙ্গটাই তার টাঙ্গনে অবশ হইয়া রহিয়াছে! অসাবধানে টুক্ করিয়া কোথাও একটু লাগিলে, অমনি সর্ব্বাঙ্গের রক্তে রক্তে ঝঞ্ঝনা আসিয়া উঠে! তীব্র যন্ত্রণায় আপাদ মস্তকে কাঁপ-ঘাম ছুটে! উঃ! দেহের সামান্য একটা অংশ, সেও সমস্ত দেহটাকে এতদূর কাবু করিবার শক্তি রাখে? কোথায় আঙুলের ডগে একটা সামান্য বিস্ফোটক আগিল,—গ্রাহ্য করিলাম না। অথচ সেই অগ্রাহ্যের বস্তুটা শেষে এমন দুষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিল যে সমস্ত দেহটাকে নিষ্ঠুর-শাসন-কর্ত্তৃত্বে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল! অহোরাত্র যন্ত্রণা ভুগিয়া ভুগিয়া মনে হইতেছে এ হাতটা যে কস্মিন্ কালেও সুস্থ-কর্ম্মঠ ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা, আমার পক্ষে আজ সম্ভব নয়! হায় রে দুষ্ট ব্রণ!

বাইরে খড়্ খড়্ করিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কি যারেওা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"মা, ডাক্তার-মা এসেছেন।"

কপাল ঘামিয়া উঠিল! হায়! সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও বন্ধুটি আজ নিষ্কৃতি দিলেন না! সেই আ-ধোয়া, সেই পচা মাংস-টানা। উঃ! ডাক্তারদের প্রোক্ত চিম্‌টা ছুরি কাঁচি গুলা অধঃপাতে যায় না গা! ও গুলা যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁর পায়ে প্রণাম করিতে আমার মোটেই ইচ্ছা হয় না, বরং হাতের কাছে সেই পা দুখানা পাইলে মনের সুখে দু চারটা কিল বসাইয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতে ইচ্ছা হয় যে! ও গুলা বাহির করিবার কি দরকার ছিল বাপু? কেবল বক্তার উপর খাড়ার ঘা বসাইবার দুরভিসন্ধি বই ত নয়!

হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া মিস্ মিত্র বলিলেন—"আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে মিসেস্ অমন্তি। কেমন আছেন বলুন?"

প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলাম—"আর কেমন আছি! বলি, আপনার সেই বাজীকরের কুলিটা আজ আনেন নি ত?"

"অস্ত্রের ব্যাগ? হুর্গা বলুন! ও জিনিস কি ভুল্‌তে পারি? বেলী হোল কেন জানেন? এক মহিলা বন্ধু নতুন ফটোগ্রাফী শিখে এসেছেন। আজ বিনা-খবরে হঠাৎ আমার বক্ষে দিয়ে এমন ডর করেছিলেন—বলবার নয়। বিকেলের আলো নিভ্‌তে তবে ছুটি দিলেন! দেখুন-না, আপনাদের দেশের হিন্দুস্থানী—মেরে সাজিয়ে আমার ছবি তুললেন্! আজ আমি ঠিক হিন্দুস্থানী হয়ে গেছি, না?" তিনি হাসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

সবিস্ময়ে তাঁহার সাজ সজ্জার দিকে চাহিলাম। তাইত বটে! নিজের দুঃখের তাড়ায় বন্ধুটির বেশ বিন্যাসের দিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই,—এ যে সত্যই পশ্চিমা বেশ! সুন্দর সুগঠিত তরুণ-মূর্ত্তিতে সে বেশ সত্যই সুন্দর নূতনত্ব ব্যঞ্জক! মৃদু কণ্ঠে বলিলাম "বাঃ! চমৎকার যে!"

হা হা করিয়া প্রাণ খোলা উচ্চ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন "আপনার চোখেও চমৎকার! তা হোক্, আমি কিন্তু নিজের বেশ দেখে, খুসী হয়ে নিজের জন্যে একটা টাইটেল্ বেছে নিয়েছি,—সেটার মায়া ছাড়তে পারি না। এ চেহারায় যখন হিন্দুস্থানী বেশ, তখন সেই টাইটেলই ঠিক মানান-সই হবে।"

"কি টাইটেল্?"

"কিছিন্ধ্যা কেশরী! ঠিক নয়?"

হাসিলাম! ভৎর্সনার স্বরে বলিলাম—আপনার রঙ্গ জ্ঞান কিছু মাত্তর্ নেই! কোত্থেকেই বা থাকবে? অত

করে ছুরি কাটারী নিয়ে খুন করে' বেড়ালে মানুষের ভেতর পদার্থ বলে কিছু থাকে? আপনি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বল্‌বে,—আপনাকে ঠিক সরস্বতী ঠাকুরুণটির মত দেখাচ্ছে! কিকিন্ধ্যায় সরস্বতী মেলে?"

"ও জিনিস সেখানে অপ্রতুল থাকতে পারে কিন্তু যে জিনিস সেখানে পাওয়া গেছে, তা যে পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়! ঠাট্টা নয়, সত্যিই বন্ধু, মহাবীর হনুমানের চরিত্রাদর্শে আমাদের জীবন-সাধনাটা আমরা যদি সার্থক কর্‌তে পারি!" সহসা বন্ধু গম্ভীর হইয়া একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

"হনুমান!" সবিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম। কথাটা সহজ ভাবে বলিলে পরিহাসই মনে করিতাম, কিন্তু এ তো, পরিহাস নয়! এ যে গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রদ্ধার বাণী! আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সংশয়ের স্বরে বলিলাম "হনুমানের চরিত্রাদর্শ মানুষকে গ্রহণ কর্‌তে হবে? কারণ?"

গভীর আবেগের সহিত উত্তর হইল—কারণ, মানুষ তাহলে জীবনে 'সত্যিকার' মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে। বিবেকানন্দের কাছে কথাটা শুনলুম যখন,—প্রথম, সেদিন মনে বড় ধাক্কা লাগ্‌ল। কিন্তু কথাটা যতই ভাব্‌তে লাগলুম, ততই মনের সমস্ত সংস্কার ওলট্ পালট্ হতে লাগ্‌ল। সত্যিই বন্ধু সত্যিই,—এমন মহা-জিতেন্দ্রিয় মহা বুদ্ধিমান, মহা শক্তিশালী কর্ম্মবীরের চরিত্রাদর্শ,—এর জোড়া খুঁজে মেলা দায়! প্রভুর কাযের জন্য নিজের জীবন মরণের তোয়াক্কা রাখে না, এমন কায সে করেছে! তাই, যে সাগর পার হবার জন্যে প্রভুকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে কাঠ পাথর যোগাড় করে সেতু বাঁধ্‌তে হোল, সেই সাগর হনুমান পার হয়ে গেলেন একটি লাফে! মায়াবী দানবের হাতে পড়ে প্রভুর প্রাণ আর স্বাধিনতা এমন বিপন্ন হোল যে, নিজেকে উদ্ধার করবার এতটুকু শক্তিও প্রভুর রইল না,—কিন্তু শক্তিশালী সেবক এমন কর্ম্মবীর যে,—যে-ওজন পাতাল ফুঁড়ে দিয়ে এক চোটে দানবের মুণ্ডু উড়িয়ে, প্রভুকে উদ্ধার করে আন্‌লে! অহিরাবণের গর্ভধারিণীকেও সে রেয়াৎ করে বলেনি.. প্রভুর কাযের জন্যে, তার নিজের চক্ষুলজ্জা বল্‌তে এতটুকু জিনিস ত নেই! সে ষ্টীম্ কায করে চলেছে তো চল্‌ছে-ই!—তার ল্যাজেই আগুন ধরাও, আর মুখটাই পুড়িয়ে দাও, ভ্রূক্ষেপ নেই! প্রভুর কায সে করে চল্‌বেই ঠিক! বন্ধু, এ আদর্শকে প্রাণ দিয়ে পূজো করবে,—এমন মহা নির্ভীক, আত্মশক্তি-হীন, মহাশক্তিশালী মানুষ কই?"

অবাক্ হইয়া শুনিলাম। কোন যুগে রামায়ণ পড়িয়াছি, মনেও পড়ে না। তবে খুব অল্প বয়সেই সেটা পড়িয়াছিলাম। সে সময় হনুমানকে বিদূষক-চরিত্র হিসাবেই বিচার করিয়াছি, বুদ্ধিমান হিসাবে নয়। সে হাসাইতে পারে, সেইজন্যই লম্বা পোড়াইয়া লোক হাসাইয়াছে, দুর্দ্দান্ত রাক্ষস রাজের অন্যায় আদেশ পালনে উদ্যত সূর্য্যকে বগল-দাবায় পুরিয়া জব্দ করিয়া ছাড়িয়াছে, অনেক রকম হাস্যোদ্দীপক কীর্ত্তি করিয়াছে,—এই শুনাই মনে আছে। হনুমানের বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে নাই, বরং নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচয় পাইয়াছি,—সেই সীতাদেবীর দুর্লভ স্নেহের দান, পুরস্কারের মুক্তার মালাটির দুর্গতি-সংবাদ! লক্ষ্মণ ঠাকুরের কথায় সায় দিয়া আমিও সেজন্য মনে মনে হনুমানকে ঢের তিরস্কার করিয়াছি। বাঁদর না হইলে এমন মহামূল্য বস্তু দাঁতে চিবায় কে? হনুমানটার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ-বোধ করিয়াছি। কিন্তু তার সাধারণ বুদ্ধি, শক্তি, বা পূজাই জিতেন্দ্রিয়তার কথা কোন দিন ভাবি নাই ত!

(২)

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম "সত্যি, অন্ততঃ হনুমান চরিত্রের জিতেন্দ্রিয়তার দিকটা ভাব্‌বার আর দেখবার বিষয়!"

হঠাৎ তিনি বৃদ্ধ—বৃদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "বিশেষ করে,—এই ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার-গোলাম দেশটায়! আমি বাজী রেখে বল্‌ছি, পরতাল্লিশ বছরে এ দেশের চেহারা ফিরে যায়, যদি ঐ মহাপাপকে ঝাঁটা মেরে দেশ থেকে দূর কর্‌তে পারেন! বন্ধু,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সব জোয়ানই হাজির ছিলেন,—কিন্তু রক্ত তৈরী কর্‌বার সময় কারুর হাড় কাজে লাগ্‌ল না কেন? কেন—দরকার পড়ল সেই অনাহার-শীর্ণ জিতেন্দ্রিয় ঋষিটি তপস্বীর হাড়? কাঁকির যো টি কোথাও নেই! ইন্দ্রের ঢের অস্ত্র শস্ত্র ছিল, কিন্তু বিদ্যুতেই ফুলিয়ে উঠ্‌তে পারলেন না। বৃত্রাসুরকে ধ্বংস কর্‌তে সেই তপস্বীর

বিভেদ্রিয় বীরের হাড়খানিই ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে দাঁড়াল! আর কিছুতেই কিছু হোল না। এর অর্থ কি?"

আমি অবাক্!—থামিয়া বলিলাম "কিছু জানি না।"

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন "আপনারা হিন্দুস্থানীর বড়াই তো করেন খুব,—আপনাদের বড়াইয়ের চোটে,—বাপ! আমি হাড়ে-নাড়ে জ্বালাতন হয়ে উঠেছি! কিন্তু আপনাদের সত্যিকার শাস্ত্র যা, সত্যিকার ধর্ম্ম যা,—তার মানে যে আপনারা কি বোঝেন,—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর! ভাবলে সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়,—আমার কান্না পায়!"

ম্লান হাস্যে বলিলাম "নিষ্ফল-ক্রন্দনে কিছু হয় না মিস্ মিত্র। কিছু হয় যাতে,—সেটার নাম 'কাজ'! ভগবান আপনাকে উচ্চ কর্ম্মে অধিকার দিয়েছেন, আপনার হাত তৈরী হয়ে আছে,—দেশের জঞ্জাল, মানুষের মনুষ্যত্ব নাশী পাপ, ঝেঁটিয়ে সাফ্ করুন গিয়ে!"

হাসিয়া তিনি বলিলেন "বিস্তর জঞ্জাল! বিস্তর ঝাঁটাই চাই যে! আর অ্যাডেজার ও দশ বিশখানায় শানুবে না। দশ বিশ হাজার চাই। কি করছেন পড়ে পড়ে? উঠুন না! আপনারা ঐ যে এলিয়ে পড়ে আছেন,—আপনারা ওতেই দেশটির মাথা খেলেন!"

ঘোরতর প্রতিবাদের সুরে বলিলাম "আমরা? অন্যায় বলছেন। আমাদের সে হাত আছে কি বলুন? প্রত্যেক নিঃশ্বাসটা পরের হুকুম নিয়ে টানতে ফেলতে পারলেই আমাদের পক্ষে ভাল হয়,—ওপরওলাদের হুকুমের অভাব বলেই সেটা হয়ে ওঠে না। নইলে তাও হোত। পাড়াগাঁয়ে জমিদার বাড়ী,—অর্থাৎ অন্তঃপুর, পুরুষদের যেখানে বাইরে বেরুতে হয় না, সেখানে দেখ্-বেন হয়ত তাও হচ্ছে। সেখানে মেয়েদের জীবন-মরণ প্রভুদের মর্জ্জির ওপর নির্ভর করছে, এমন মর্জ্জি—যে খুনী হলেই বিনা বাধায় মুক্তপাত হচ্ছে দেখবেন!—"

"দেখবেন বলছেন কি? ঢের দেখেছি! ঝাঁতুর ঘর থেকে সুরু করে মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত যাদের চলবার পথ, তাদের চোখে এড়ায় না কিছুই! চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনেক সময় চেপে যেতে হয়।—কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়-শক্তির অত্যাচারে মানুষকে যখন ধ্বংসে মুখে পড়তে দেখি,—তখন নিজের অস্তিত্ব জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব মর্য্যাদা, আমার থেকে থাকে না! বিনা বিধায়—বিধার-শাণিত অসির মতই, অনাচার পাপের বুকটায় নাকিয়ে পড়ে তীব্র আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছে হয়।"—একটু থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সাধে 'কিন্ডিয়ার ফেয়ং' উপাধিটা গছন করছি? ইচ্ছে হচ্ছে হনুমানের মত বাঁদর হয়েই প্রভুর কাজ করি! মানুষের অভিমান আর রাখ্‌ব না! ওতে প্রভুর কাজে বাধা পড়ছে!"

হাতের যন্ত্রণা ভুলিলাম! সোৎসাহে উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইলাম, মুহূর্ত্তে ক্ষতমুখে আঘাত বাজিল। মাথা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, চোখে আঁধার দেখিলাম! হাতে মাথা ধরিয়া নিঃশব্দে যন্ত্রণাটুকু পরিপাক করিয়া—ক্লিষ্ট হাস্যে বলিলাম "মনে করি উঠে কাজ করি, কিন্তু উঠ্‌তেই পারি না, তা কাজ করব কি? আমিত রোগ যন্ত্রণা ভুলে যেতে চাই, কিন্তু ওরা আমায় তোলে কই? একটু নড়েছি, কি খাঁক্ করে মাথায় ঘা টি লেগেছে, বলে কথা! এ সব শরীর নিয়ে কাজের চেষ্টা দেখা চুলোয় যাক্, বাঁচতেই ইচ্ছে করে না যে!—"

গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন "সেইজন্যেই মরণটা এ দেশে এত সস্তা হয়ে উঠেছে। আমাদের শরীর মন আর বুদ্ধিতে এত ব্যামো জমা হয়েছে, যে ডাক্তার 'ক্লাসের' মত আমারও বলতে ইচ্ছে হয়—এ ব্যামোর চিকিৎসা আমাদের ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমাদের আমল থেকে সুরু হওয়া উচিত ছিল। তাহলে আজ বোধহয় আমরা বেঁচে ওঠ্‌বার পথ পেয়ে, বাঁচতুম! উঠুন, গরম জল এসেছে। ঘা-টা ধোয়া যাক।"

দেখিলাম সত্যই কি গরম জলের পাত্র লইয়া উপস্থিত! সভয়ে বলিলাম "আজও পচা মাংস ঘরে টানা-হেঁচড়া করবেন? ওগুলো আজ থাকতে দিন্ না।"

করুণ মমতাভরা কণ্ঠে উত্তর হইল "থাকতে দেবার যো নেই যে মিসিস্ অগস্তি! না হলে আমরা কি সাধ করে' কর দুর্ব্বলদের কষ্ট দিই? ওই পচা slough গুলি,—ওগুলি নির্ম্মমভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন, বিষাক্ত ক্ষতগ্রস্ত মানুষের সুস্থ হবার আশা নেই।"

"কিন্তু যন্ত্রণায় যে মরে যাই!"

"বেঁচে ওঠ্‌বার জন্যে এ 'যন্ত্রণাটুকু' সহ্য করতেই হবে। সাহস করুন। আসুন।"

৩

ধোয়া শেষ হইল। যন্ত্রণায় শক্তি লুপ্ত হইয়া

শুইয়া পড়িলাম। বাহিরে হঠাৎ সেই সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইল। ওষ্ট কাটিয়া একটা স্নিগ্ধ-শীতলতায় চারিদিক ভরিয়া গেল।

হাত মুছিতে মুছিতে মিস্ মিত্র ঘরে ঢুকিলেন। নিজের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর ভাবে বাঁ হাতের তালুতে কি একটা জিনিস চাপিয়া বসাইবার চেষ্টায় আলোর দিকে হাতখানা উঁচাইলেন। প্রত্যহই দেখি—ব্যাগ হইতে অস্ত্র শস্ত্র বাহির করিবার সময় হইতে তিনি ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন, সে গাম্ভীর্য্যটা—কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অটল কঠিনতায় স্থায়ী থাকে। ঘরে ঢুকিবার সময় এবং ঘর হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহার যে স্বাভাবিক প্রসন্ন-সুন্দর মূর্ত্তি দেখি,—কাজের সময় সে মূর্ত্তি অস্বাভাবিক-ভীষণ হইয়া উঠে। যন্ত্রণায় চোটে অধীর হইয়া যতই নড়া চড়া করি, যতই চেঁচামেচি করি—কিন্তু বন্ধুটির মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িলে ভয়ে আত্মা জড়সড় হইয়া উঠে! উঃ কি ভয়াবহ গম্ভীর সে মুখ! ভ্রুকুটি বদ্ধ ললাটে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষতের দিকে চাহিয়া তিনি যখন ক্ষত পরিষ্কার করিতে থাকেন,—মনে হয় 'থাক!' আর ঘণ্টার জন্ত দেহটা ওঁর হাতেই ছাড়িয়া দিয়া, আকাশ ভ্রমণে চম্পট দিই। ক্ষতের ক্লেদ গ্লানিগুলা পরিষ্কার হইলে, তারপর না হয়, দেহ গ্রহণ করিয়া রামরাজত্ব ভোগ করিব!'

বাহিরে বৃষ্টিটা উত্তরোত্তর জোরে চাপিয়া আসিল। ক্লান্তি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম "তাইত মিস্ মিত্র, আপনি আটকে পড়্লেন যে! আর কোথাও 'কল' আছে আজ?

তিনি হাত টিপিতে টিপিতে বলিলেন—না। তাইলে এ বেলা কি বেরুই? শুধু এখানেই কাজ ছিল।"

বলিলাম—বেশ। ভালই হয়েছে। গল্প সুরু করুন, তাহলে। ওকি করছেন? পাঁজা টিপ্ছেন না কি?"

স্নিগ্ধ হাস্তে উত্তর হইল "আপনারই প্রসাদ!—এমন কাঁকানি দিয়েছেন, হাতটি চিম্‌টে বেঁধা হয়ে গেছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "সত্যি? কই দেখিনি ত।"

কি একক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, আমার মাথায় বাতাস করিতেছিল। হঠাৎ বলিল "মা তুমি হাঁসুলি-বিসুলি কর মা, দেখবে কোত্থেকে? এমন ধমকা কাঁকানি দিলে যে ডাক্তার-মার হাতটা প্যাট করে বিঁধে গেল, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত ঝরতে লাগ্‌লে! আমি 'আহা আহা' করে উঠলুম, তুমি শুনতে পেলে না?"

"সে ওঁর হাতের জন্তে? আমি যদি আমার হাতের রক্তের জন্তে! কই উনি তো কিছু বলেন নি।"

ঈষৎ হাসিয়া মিস্ মিত্র বলিলেন—কি বল্‌ব? সে সময় কি বলা-কওয়ার কথা ছিল? যাক্ গে, ও রক্ত এখুনি বন্ধ হবে। ও রকম কত কেটে ছিঁড়ে যায়। একবার একটা কার্ব্বাঙ্কল কাটতে গিয়া বা ছুরির প্যাচ লাগিয়েছিলুম হাতে,—সেবার প্রাণটি যায় যায় হয়েছিল! এমন সেপ্‌টিক হয়ে জ্বর ধরল, দুটি মাস বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল? এ ত সামান্ত- ওষুধ ঢেলে দিয়েই পুড়িয়ে দিন দুচ্চার ঘা শুকুতে লাগবে।"

"কি বিপজ্জনক কাজ! কেন এমন বিছে শিখেছিলেন? কিঃ!—প্রাণটি সদাই হাতে করে থাকতে হয় বলুন?"

"বড় বিপদের ধাক্কা খেয়েই এই বিপজ্জনক বিদ্যে শিখ্‌তে হয়েছিল মিসিস্ অগস্তি? বিপদকে ভয় করে চল্‌তে গিয়ে জীবনে বজ্র শোকের ঘা খেয়েছি। তাই বিপদকে জয় করবার সাধনায় জীবনটি উৎসর্গ করে ছেড়েছি।"

পচা মাংস ছিঁড়িবার কথা মনে জাগিতেছিল। তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না।—অন্ত মেয়ের সহিত বলিয়া উঠিলাম "তা হোক্, এ বড় বিশ্রী কাজ। কোন ভাল লোকেরই এ সব কাজ করা উচিত নয়!"

হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তা না-হয়, আপনার বিচারে মন্দ লোকই হলুম, উপায় নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে পৃথিবী শুদ্ধ লোক হাজার রকম ব্যাধি যন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাক ছাড়্‌ছে, এদের রোগ থেকে মুক্ত করবে কে? ভাল লোকের কাজ মন্দ লোকের কাজ বলে সবাই যদি সব কাজ ছেড়ে দুঁটো-জগন্নাথ হয়ে বসি, তাহলে মানুষগুলোকে—বেশী নয়, আপনার এই আঙুলহাড়াটাই ধরুন, সারবে কিসে?"

সপরিহাসেই বলিলাম "আপনিই!—"

তিনি সহাস্তে বলিলেন "তা বল্‌বেন বৈ কি! দেশটাই যে blind fatestএর দেশ! বাড়ীর কি ভ্রূণহত্যা করে জেলে জড়িয়ে পড়ল, বাড়ীর কর্ত্তা 'তাক দিলেন। গরীব কি পয়সা দিতে পারবে না তাও জানা-

লেন। গিন্নি ঠাকরুণ মিষ্টি করে, নিজেদের মাথা মমতা প্রবণতার সাকাই গাইলেন ও চেয়ে। কিন্তু এমন জঘন্য কাণ্ডটা কেন অনুষ্ঠিত হোল তার কোনো সদুত্তর পেলুম না। শেষে রোগীর মুখে ব্যক্ত হোল কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।" কর্ত্তাটি আমার বাবার বয়সী। মিষ্টি করেই বললুম—দু কথা। জবাব শুনলুম—'কপাল!' আর ভ্রূণহত্যার ঔচিত্যের সম্বন্ধে শাস্ত্র সম্মত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনলুম, যারা এ জগতে মহাপাপ করে মরে, তাদের আত্মা ঐ রকমেই ভ্রূণ অবস্থার বারে বারে যাতায়াত করে শাস্তি পাবে না ত কি? এই উপায়েই ঐ হতভাগ্যদের উদ্ধার পথ। তিনি কিন্তু অন্যায় করেন নি।" বললুম আপনি যদি এত বড়ই ভাগ্যবিধাতা উদ্ধার কর্ত্তা, মুক্তিদাতা হয়ে উঠে থাকেন, তাহলে আইনের বিচারে আপনার দেবত্বটা একবার যাচাই হওয়া দরকার। এই গরীব হতভাগা মেয়েকে অসৎপথে নামাবার আর সেই ভগবানের জীবকে হত্যা করবার কি অধিকার আপনার ছিল, পুলিসের মারফৎ সে প্রশ্নটার জবাব নেওয়া উচিত। কেন না এ সব উচ্চ তত্ত্ববিদ্যা আমার মাথায় ঢুকছে না, এ গুলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।" কর্ত্তার এবং তার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর চক্ষু তখন চড়ক গাছ হয়ে গেল!"

সাগ্রহে বলিলাম "তারপর?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তারপর আর শুনে কাজ নেই। তবে সত্যি কথা বল্‌লে শত্রুতার উপদ্রব যে কি রকম ভোগ করতে হয়, সে যাত্রা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলুম। আমার যথেষ্ট লোকসান হোল বটে, কিন্তু সেই হতভাগা কিটার বেশ সদ্গতি করতে পেরেছিলুম সেজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ।"

"আর কর্ত্তাটির?"

"সেটা বলব না, মাপ করুন।"

পরিহাসের সুরে বলিলাম "ঘুস নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন ত?"

ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন "তাহলে আজ আপনার চিকিৎসার জন্যে আসতুম না—মিসেস্ অগস্তি, ভণ্ডামি, মিথ্যে, আর পাপকে যদি পূজা করতে জানতুম। কিন্তু এ হাল্কা ধাতে গুরুতর পুণ্যটা—একদম্ অসহ্য সত্যকে সম্মান করেছি বলে জীবনে, বিত্তের ক্ষতি, আর অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। মানুষের সত্যকার মঙ্গলকে খুঁজি বলে' মানুষের হাতে যে নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, বলবার নয়। শিক্ষিতই বলুন, আর অশিক্ষিতই বলুন, ইংরাজেরা জিনিষটির চের রকম ছদ্মবেশই এ জীবনে দেখতে হোল। আমার বড় দুঃখ হয় যে, মানুষগুলো শুধু নীচ স্বার্থকে অন্ধ-আসক্তিতে আঁকড়ে ধরেই দিন কাটালে! উচ্চ-স্বার্থকে চেয়েও দেখলে না। উচ্চ চিন্তাকে ভাল বাসতে ও শিখলে না!"

দুঃখের সহিত বলিলাম "পৃথিবীর আবহাওয়ার গুণে, মানুষের মনের উচ্চতা টিকতে পারে কই?"

দৃপ্তস্বরে উত্তর হইল—"পৃথিবীর আবহাওয়ার দোষ? দোহাই আপনাদের! পরের কাছে ধার করা বুলিগুলি অত নির্ভাবনায় কপ্‌চাবেন না।—আপনি যা বলছেন সেটা নিজের বুদ্ধি নিয়ে বিচার করে, বুঝে বলুন। ভাকামির 'কপাল' আর ভণ্ডামির 'ভগবান' শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে উঠেছে। প্রতি বৎসর উপর্য্যুপরি প্রসবে, দুর্ব্বল প্রসূতির স্বাস্থ্য চুরমার্ হয়ে গেছে। ছেলে গুলিও ছ মাস দশমাস অন্তর টপাটপ্ মরছে। প্রসূতির সামনেই তাঁর পতিদেবতাটিকে ডাহিয়ে ভস্ম ভাষায় বুঝিয়ে বললুম, "শিক্ষিত লোক আপনি। নিজের স্বার্থ বুঝে চলুন। সংসারে যদি-কামনা করেন, আর স্ত্রীটিকে দন্তে মারবার মহাপ্রাণতা যদি না থাকে, তবে বছর তিনেকের জন্যে স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করুন।" সংবাদ শুনে দেবতা-বাবাজী স্বয়ং এবং তাঁর সাতগোষ্টির সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরা সবাই 'শক্' লেগে মূর্চ্ছা গেলেন! তিন বৎসরের স্ব-তন্ত্র বাস! বাবাজী অধীর চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন "ও সব ইংরাজী মত, ইংরাজের দেশেই চলে। এ আধ্যাত্মিক দেশে চলতে পারে না। আমি ত মূর্খ নই!" বাবাজীর বাধা বাপধন,—তিনিও শিক্ষিত লোক। অর্থাৎ লোক ঠকিয়ে পয়সা কড়ি তিনি যথেষ্ট রকমই গুছিয়েছেন। তিনি চৈতন নেড়ে বললেন—এই অল্প বয়েস। এ সময় দুজনের 'সেপারেসনের' ব্যবস্থা করলে দুজনের মনই ভিন্ন পথে 'টার্ণ' নিতে পারে। সে কাজ কি করতে পারি? রামচন্দ্র!" ইচ্ছে হোল, জবাব দিই,—'বাবা

'আজ, মহেশের যদি ত্রিশূল হতাম আমি
তবে, ইতর না মেরে, মারতুম ইংরাজি!'

সাগ্রহে বলিলাম "তারপর? তারপর?"

"তারপর আর কি? সত্যি কথা সাহস করে বল্‌তে পারে, এমন লোকও এ দেশে বেশি কম—সে কথা কাণ পেতে শুন্‌তে পারে, তেমন লোক এ দেশে তার চাইতেও কম! সুতরাং যখন বল্‌তে গেলুম, "ইতর-ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার গোলামি ছাড়াও বড় কাজ, বড় উদ্দেশ্য মানুষের জীবনে আছে—সে কথাটি মনে রাখবেন বাবাজী।" বাবাজী রুখে উঠে বললেন "আমাদের 'ফ্যামিলী অকেজারে' আপনাকে 'ইন্টার ফেয়ার' করতে হবে না! কপালে থাকে, ছেলে হবে মরে যাবে! মানুষ তা রদ্ করতে পারে? সে সব কপালের কাজ! ভগবানের ইচ্ছে!"

"তারপর?"

"তারপর সে ইতর পশুর সঙ্গে কি বাদানুবাদ করব? মূর্খতা ব্যাধিটি যে শুধু ভিন্ন শানে না, সে ওষুধের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট যদি এমন জেল তৈরী করে রাখ্‌তেন, তাহলে বাবাজীর কাছে বিদায় হয়ে সটান সেই পথে রওনা হতুম। মেয়েটাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু সে পথ নেই। পরের বছর গুনতুম মেয়েটি পুনশ্চ প্রসব হতে গিয়ে মারা গেছে। এবার তারা কোন ডাক্তারের সাহায্য পর্য্যন্ত নেয় নি। বুক্‌সুয় গলদ ধরা পড়বার ভয়েই সে দুবুদ্ধি!"

আমি নীরব। মনে ভাবিতে লাগিলাম, উক্ত বাবাজীটি তারপর নব-বিবাহ-মহোৎসবে মাতিয়াছিলেন নিশ্চয়ই, এবং এতদিনে আর একটি নরহত্যা ব্রত নির্ব্বিবাদে পালন করিতেছেন বোধহয়! এমন কত বাবাজী কত হত্যাব্রত পালন করিতেছেন, কে তার সংবাদ রাখে? দৈবাৎ দু একটা সংবাদ অতর্কিতে বাহির হয় বই ত নয়! হায় রে! যাহাদের গৃহ বিবাহ-অজ্ঞানে পূর্ণ, দেহ জন্মজ রোগের বীজাণু পূর্ণ, মন—ইন্দ্রিয়ের দাস, বুদ্ধি নিষ্পন্দ-মূর্চ্ছিত, তাহারা এ জগতে 'মানুষ' হইয়া দাঁড়াইবে? মানুষের মত কাজ করিবে?...কি জানি!

(আগামীবারে সমাপ্য)

শরৎ।

(রঙ্গ-কবিতা)

[শ্রী শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ বি এ,]

বরিষার শেষে মধুময়ী বেশে
শরৎ এসেছে আজি,
কবি-প্রিয়া— সে মধুর লোভে দলে দলে তাই
ছুটিয়া আসিছে মাছি।
কবি— নন্দন হতে এসেছে শরৎ
বহিয়া সুধার বানী,
কবি-প্রিয়া— তারি সাথে আজ এনেছে বহিয়া
'ম্যালেরিয়া' রোগ খানি।
কবি — হাসিয়া নাচিয়া সোহাগে চলিয়া
যেতেছে তটিনী তলি,
কবি-প্রিয়া—আর, উভা উড়ায়ে নগরীর বুকে
ছুটিছে পথের ধূলি।
কবি— কৃষকের মুখ হরষে আকুল
ফুটেছে তাদের সুখ,
কবি-প্রিয়া—ওগো, অনাহারে জ্বর রোগ-যাতনায়
বিদরে বুঝি বা বুক।
কবি — শারদ উষায় মোহন পরশে
কাননে কুসুম হাসে,
কবি-প্রিয়া—আর, আমারি মতন অনেক বেচারী
বিছানায় পড়ে কাসে।
কবি— বিরহ-বিধুর প্রবাসী পথিক
ফিরিয়া আসিছে ঘরে,
কবি-প্রিয়া—বুঝি, গণ্ডাপাচেক ছেলে-কন্যার
কান্না শুনার তরে।
কবি— শারদ নিশার মধু-জ্যোছনার
তুলনা কি আর আছে,—
কবি-প্রিয়া—তাই, সন্ধ্যার আগে ঘরে ঢুকে যাই
ঠাণ্ডা লাগে বা পাছে।
কবি— বেলার অবোধ—ভগবান বোধ
মোটেই তোমার নাই,—
কবি-প্রিয়া—ওগো, তোমার মতন কবির ভাবের
বলি হারি দিই তাই!

বিজয়া

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর]

১। আশীর্ব্বাদ (ভ্রাতায়)

আজিকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের
এ মহামিলনের দিবসে,
আশিস করি, যেন ভারতী রমা সহ
তোমার গৃহে চির নিবসে।

২। আশীর্ব্বাদ (সন্তানে)

বিষাদ ঘন ঘোর আজিকে চারিধার
বাহারে কাছাকাছি আয় তুই,
ললাটে দেই চুমা নিবিড় বাহু পাশে
ক্ষণেকতরে তোরে বুকে থুই।

৩। আশীর্ব্বাদ (পত্নীকে)

প্রণাম তোমার লভিতে আমার
নাহি অধিকার দেবি,
মনে মনে তব সেবা লভি আর
মনে মনে তোমা সেবি।
অয়ি নমস্যা তোমার পুণ্যে
এ গৃহে যা কিছু শুভ,
আজিকে কামনা বিশ্ব পায়ে রো'ত
তোমার লক্ষ্য ধ্রুব।

৪। প্রণাম (পতির প্রতি পত্নী)

তোমার পরম সোহাগে আদরে
ভক্তি ডুবেছে প্রেমে,
তুলসী ডুবেছে হরি চন্দনে
হীরক নিহিত হেমে।
হয়েছে প্রমাদ কত অপরাধ
অই পায়ে অহরহ,
ক্ষমা করি সব প্রাণ বল্লভ
আজিকে প্রণাম লহ।

৫। প্রীতিসম্ভাষণ (বন্ধুকে)

আজি শুভদিনে জীবন বন্ধু
দাও-দাও কোলাকুলি,
পরমাস্ত্র স্কন্ধে তোমার
এ শির পড়ুক ঢুলি।
সারা বছরের ব্যথা আনন্দ
নিবিড় গভীরতম,
অশ্রু হাস্যে মিলিত হউক
শারদ গগনোপম।

—•—

শারদোষা।

(ঢাকা জগন্নাথহলের শারদোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ)

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্]

শরৎ এসেছে.—আকাশের নীলকান্তের ছটা ছড়িয়ে পড়েছে, নীলের বুকে সাদা মেঘের ছুটোছুটি লেগে গিয়েছে, ঘাসের বনে সাদার ঢেউয়ে নদীর পারে হাসের মালায় শিউলিফুলের আপনভোলা গন্ধের নেশায় শারদ-লক্ষ্মী তাঁর রূপের পশরা উজাড় করে দিয়েছেন। তরুণ রবির সোণার কিরণ সদ্যধোয়া সবুজপাতার উপর রঙের জলসা লাগিয়ে দিয়েছে, শরতের চাঁদের চাঁটুকা জ্যোছনার উপর তরুণ কুয়াসার একটা স্বচ্ছ আবরণ মাঝে মাঝে রহস্যের মত ভেসে উঠছে। সারা বিশ্ব আজ একসুরে গেয়ে উঠেছে,—শরৎ এসেছে।

এ সুর যার কাণে পৌঁছোয় নি এমন অভাগা আছে। ইটের দেয়ালে ঘেরা হ'য়ে বিজলী বাতির আলোয় অন্ধ হ'য়ে বইয়ের রাশি বুকে নিয়ে বসে তারা বড় গলায় জিজ্ঞাসা করে—"শরৎ? সে কে?" তাদের পুঁথিতে লেখে শরৎ, বৎসরের একটা ভাগ, কতটা ভাগ সেটা অঙ্কশাস্ত্র ক'সে তারা বের ক'রতে পারে, চাই কি শরৎ সম্বন্ধে কে কবে কি লিখে গেছে তার একটা পরিপূর্ণ Bibliography দিতে পারে। এমন লোকও আছে যারা সেই কইগুলি আওড় ক'রে শরৎ সম্বন্ধে দু'দশ লাইন পদ্যও লিখে দিতে পারে। অথচ শরৎকে সাক্ষাতে পেয়ে চিন্‌তে পারে না এরা—কেন না সত্যিকারের শরতের সঙ্গে তো এদের পরিচয় নেই। তুলসীদাসের কাছে তাঁর ইষ্টদেবতা যেমন এসে ছিলক দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তুলসী তাঁকে চিন্‌তে পারেন নি, তেমন শারদলক্ষ্মী এদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আপনার প্রসাদ বিলিয়ে যান, এরা টের পায় না। পুঁথির ভিতর তারা এঁকে খুঁজতে চায় তাই তারা এঁকে চেনে না।

যারা চেনে না তারা বড় গলায় বলতে আসে যে শরৎ নেই—কোনও দিন ছিল না, কালিদাসের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল কতকগুলো নিষ্কর্ম্মা প্রবীণ কথার উপর কথা গেঁথে এই সুন্দরীর রচনা করে গেছেন। এর বাস্তবতা নেই। যখাটা বাস্তব কেন না, বৃষ্টির ধারায় সে নিজেকে প্রমাণ ক'রতে পারে। শীত যে সত্য তারও বেশ যাদুর প্রমাণ আছে। গ্রীষ্ম সম্বন্ধেও মতভেদ থাকতে পারে না, কিন্তু শরৎ—হেমন্ত—বসন্ত, এ নেই। এর অস্তিত্ব, এর রূপ, এর রস, একেবারে নিছক কল্পনার ফল।

এদের সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল। ইটের সিন্ধুক থেকে বার ক'রে এদের মাঠের মাঝখানে টেনে আনলে তারা গলায় কন্ঠটার জড়াতেই এত ব্যস্ত হ'য়ে যাবে যে জ্যোছনার রূপ দেখবার তাদের অবকাশই থাকবে না। শিউলি ফুলের সারারাতের নীরব অঞ্জলির সামনে রাতের পর রাত বসে থাকলে ও এরা তার মধ্যে কেবল শিউলি ফুল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। এমন লোক আছে যারা রঙের জোরড়া একখানা পট, আর চিত্রশিল্পীর চরম চেষ্টার ভিতর কিছুই তফাৎ দেখতে পায় না। যারা হুকুমের হঠাৎ-তীৎকার আর কলাকুশলীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের ভিতর কোনও সোভার তারতম্য খুঁজে পায় না। এদের সে ইন্দ্রিয়টাই নেই যা এই সব জিনিষে সাড়া দেয়, এদের ভিতরকার সূক্ষ্ম রূপের খবর মনের কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু অন্ধ যদি খুব বড় গলায় চেঁচিয়ে বলে যে আলো নেই তার কথায় আলো কিছু মিথ্যা হ'য়ে যাবে না। যার সুরবোধ নেই তার বিচারে কালোয়াতের ঘরণ বাঁচন নির্ভর করে না। তেমনি যার দেখবার চোখ নেই, অনুভব করবার ইন্দ্রিয় নেই, তার কথায় শারদশ্রী ভুয়া কল্পনার বোঁয়ার রাজ্যে উড়ে যাবেন না।

তিনি আছেন—আমাদের ভিতরে তিনি দেখা দিয়েছেন—অরূপ তিনি অপরূপ রূপে আজ চারদিকে ফুটে উঠেছেন! তাই চারিদিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে রূপের ঢেউ ব'য়ে চলেছে—গানের ছন্দ নেচে চলেছে—রূপ রসের মাতামাতি লেগে গিয়েছে!

আমাদের এই আয়তনের বিদ্যার্থীদের ভিতর এই উন্মাদনার ঢেউটা প্রবেশ ক'রেছে, শরতের ডাকে তাদের প্রাণ সাড়া দিয়েছে, তাই তা'রা উৎসব করে শারদলক্ষ্মীর উদ্বোধনের আয়োজন ক'রেছে। ছাত্রবৃন্দ, এটা সম্পূর্ণই তোমাদের আয়োজন, আমাদের নয়—তোমরা এ

আয়োজন ক'রেছ কেন না তোমাদের অন্তরাত্মার রূপ-বোধটা সজাগ আছে! পুঁথির চাপে আর পরীক্ষার শোষণ যন্ত্রে আমরা যে তোমাদের এই পরম সম্পদ নিঃশেষ করে হরণ করে নিই নি এটা তারই পরিচয়—তাই আমার আজ বড় আনন্দ! আজকের উৎসবে আমরা পরিচয় পাচ্ছি তোমাদের ভিতরকার জীবন্ত প্রাণটির—তোমাদের মনের তলার প্রকৃতির সঙ্গে সমান সুরে বাঁধা সুন্দরের বীণাটির—তোমাদের ভিতর লুকান রসের ফোয়ারাটির—আনন্দের সম্ভোগের সৌন্দর্য্যের অনন্ত পিপাসার!

এই তো চাই! তরুণ তোমরা, যুবক তোমরা, জীবন তোমাদের দুই কূল ছাপিয়ে উঠুক, আনন্দ তোমাদের বুক ভরে' চিত্ত ভাসিয়ে দিক। আনন্দকে ভয় করো না, যেখানে তোমার তাজা প্রাণ আপন স্বচ্ছন্দতায় ছুটে বেরুতে চায় তাকে আনন্দের সঙ্গে বেরুতে দেও। তোমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব কর যে তোমরা যুবক, সমস্ত জগৎ তোমাদের বক্ষে পেয়ে পুলকিত, সমস্ত বর্ত্তমান তোমাদের সেবায় নিযুক্ত, তোমাদের জন্যই আকাশে চাঁদ হাসে, তোমাদের জন্য তটিনী কল কল করে' বয়ে' যায়, তোমাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত ক'রেই ফুলের সার্থকতা! কোকিল কি তাকে বৃন্তের প্রাণে আকুলতা জাগাতে? মলয় কি বন পলিত কেশে সহর ভুলতে? এসব উপভোগ করবার বয়স বা শক্তি বুড়োর নেই—তোমাদের আছে। যতদিন আছে ততদিন এ অমূল্য সম্পদকে অবহেলা করো না।

আনন্দ ও সম্ভোগ, জীবন ও শক্তি তোমাদের নিজস্ব এতে তোমাদের জন্মগত অধিকার—এ থেকে নিজেদের-কে বঞ্চিত ক'রলে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হ'বে, নিজের কাছে অপরাধী হ'বে।

মনে ভেব না, সত্যের সঙ্গে কর্ত্তব্যের সঙ্গে আনন্দের এতটুকু বিরোধ আছে! মনুষ্যত্ব যার ভিতর সত্য সত্য চারিদিক দিয়ে ফুটে উঠেছে দেখতে পাবে সে কর্ম্মী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—অথচ সে আনন্দময়, তার জীবনটাই যেন খেলে খেলে বয়ে যায়, তার কাছে সবই খেলার মত আনন্দদায়ক হয়। আনন্দ কর্ত্তব্যের শত্রু নয়, কেন না কর্ত্তব্যের প্রয়োজন জীবনের জন্য আর আনন্দ জীবনের পরিচয়। তোমাদের বুকে মুখে আজ যে আনন্দ ফুটে উঠেছে সে কেবল তোমাদের ভিতর জীবন এখনো তাজা আছে বলে। আনন্দের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে তোমাদের এই জীবনকে বরণ ক'রে নেও, এর কাছে তোমাদের সমস্ত আয়োজন নিবেদন ক'রে দেও, দেখতে পাবে সব কর্ত্তব্য সহজ আনন্দে ভরে উঠেছে, সমস্ত কর্ম্মজীবন সুরের নেশায় রঙিন হ'য়ে রয়েছে।

[১]মাতমে-আশ্‌নাই।

তোমারে নিয়ে তুমি থাক' আমার নিয়ে আমি যাই,
কি হবে বাক্ বিতণ্ডায়? [২]কিস্‌মতে যে লেখা তাই!
　　কোন বিহানে, কি কারণে,
　　ফুটেছিলে মোর কাননে—
　　মৃদু-গন্ধ, নিদাঘ দিনে,
　　ছুটিয়ে ছিলে বুঝি নাই!
আমার [৩]বাগে দেখা দিতে,
তোমায় ত' বলি নি নিতে—
শুধু তব যতন নিতে,
　　কসুর কি হয়েছে তাই?
দেখি নি বসুয়া গোলাপ,
নবে ত' প্রথম আলাপ—
একটু কথার খেলাপ?
　　আপশোষে কি হবে ছাই।

[৪]মতলব যে রেখেছিলে,
[৫]আশিক তা' যায় নি বুঝে,
মজিয়ে শুধু চলে গেলে—
　　ইয়া আল্লা, তোর দোহাই!
[৬]মাশুকে আস্‌তে হ'বে,
[৭]মুহব্বত মিছে কবে?
আমার সোরে ফুটো এবে—
　　খোলা কি জীব [৮]আশ্‌নাই।

[৯]মাতম-মদা।

১ প্রণয়ের বিলাপ, ২ কপালে, ৩ বাগানে, ৪ মাতো-য়ারা, ৫ প্রেমিক, ৬ প্রেমিকা, ৭ ভালবাসা, ৮ ভাল-বাসা, ৯ শোকাকুল।

রোকশোধ

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃপতির নিষেধটাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই যে অনুপমা বাহিরে যাইতে পশ্চাৎপদ হইল তাহা নহে, কিন্তু পিসীমার একটা কথা তাহার প্রাণে এমন একটা লজ্জা ও ঘৃণার আঘাত দিল যে, তাহাতে অনুপমা বহির্গমনের প্রবৃত্তিকে রোধ করিতে বাধ্য হইল। ছি ছি, সে এমনি একটা বীভৎস সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে তাহারা বয়স ও যৌবন লইয়া আলোচনা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না! অথচ সে এমনই নিশ্চেষ্টভাবে এই সকল আলোচনার ও আলোচনাকারীদের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে যে, তাহাতে দিন দিন তাহাকে সকলের নিকট নিতান্ত দুর্ব্বল—নিতান্ত অক্ষম প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। তাহাদের এই কুৎসিত নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্য অনুপমার নিকট হইতে যে একটুমাত্র প্রতিবাদের সুর উত্থিত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কাহারও নাই। ছি ছি, সে লোকের কাছে আপনাকে কি অক্ষম—কি ঘৃণ্য নিরীহ জীব প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে!

কিন্তু সক্ষম হইয়া, প্রতিবাদের সুর তুলিয়াই বা সে কি করিবে? নিতান্ত নিঃসহায় স্ত্রীলোক সে; যে সমাজের মধ্যে বাস করিতেছে, সেখানে সহায় বলিতে তাহার কেহই নাই—একজনের সঙ্গেও তাহার মতের মিল নাই; প্রতিবাদের ক্ষীণ সুর উত্থিত হইবামাত্র সকলের উপহাসের অট্টহাসির মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার স্বপক্ষে কেহই বাক্‌নিষ্পত্তিমাত্র করিবে না, শুধু অন্যায় ধর্ম্ম ও নির্লজ্জসমাজের দোহাই দিয়া অকাতরে তাহাকে পেষণ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং তাহার প্রতিবাদ অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হইবে মাত্র।

কিন্তু তাই বলিয়াই কি এমন দুঃসহ অপমান—এই অসহনীয় অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করিয়া যাইবে? এই হৃদয়হীন লোক গুলার উপহাসের ভয়ে আপনার হৃদয় পর্য্যন্ত বলি দিতে বাধ্য হইবে? বলিদানকালীন বলির জন্য উৎসৃষ্ট পশু কাতরকণ্ঠে যে অব্যক্ত অন্তর্যাতনা প্রকাশ করে, সে যাতনাটুকু প্রকাশ করিবার অধিকারও কি তাহারি নাই? কে বলে অধিকার নাই? তাহার অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে, শুধু একটা নির্লজ্জ সহিষ্ণুতাই তাহাকে সকলের নিকট এমন হীন—দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে, এই সহিষ্ণুতার জন্যই সে নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে সকলের পদদলিত হইতেছে। কিন্তু এই সহিষ্ণুতার? সে সহিষ্ণুতা তাহার আত্মমর্য্যাদার পর্য্যন্ত আঘাত দিতে পারে, সেই মহান শক্তিকে পদদলিত করিয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া সে সকলকে দেখাইবে যে, স্ত্রীলোক হইলেও সে নিতান্ত দুর্ব্বল নহে, মহেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা সে—পিতার ন্যায় সেও সমাজের শক্তিকে পরাভূত করিয়া সকলের তুচ্ছ মতামতের উপর আপনার উন্নত মস্তক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

পিতৃনাম স্মরণে অনুপমার অবসন্ন চিত্তটা যেন মুহূর্ত্তে সবল হইয়া উঠিল। সম্মুখে পিতার তৈল চিত্র প্রলম্বিত ছিল; অনুপমা স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অস্ত্রশস্ত্র সংবৃত করিয়া লইয়া তারানাথের সহিত সাক্ষাতের জন্য ক্ষিপ্রপদে বাহিরের ঘরে চলিল।

বাহিরের ঘরে কিন্তু তারানাথ ছিল না, কৃপতিনাথ সম্মুখের চেয়ারে হেলান দিয়া সিগারেট টানিতেছিল। অনুপমা ঘরদ্বারে সম্মুখে দিয়া দাঁড়াইলে সে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, "তারানাথবাবুর সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছ বুঝি? কিন্তু সে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।"

বিস্ময়ের সহিত অনুপমা বলিয়া উঠিল, "চলে গিয়েছে!"

কৃপতি বলিল, "হাঁ হাঁ, অনেকক্ষণ—প্রায় আধ ঘণ্টা. বলেছিল! আমি গোড়াতেই বলেছিলাম, এখন দেখা হবে না; শুধু এখন কেন, এমন যখন তখন দেখা করা আর চলবে না। তবু চাকরের হাত দিয়ে খবর পাঠিয়ে তীখির কাকের ন্যায় হাঁ ক'রে বসেছিল। শেষে যখন বুঝতে পারলে, আমার কথাই ঠিক, তখন আস্তে আস্তে উঠে গেল।"

বলিয়া সে একখানা হাতিয়া ফেলিল। অনুপমা তাহার দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৃত্যকে আহ্বান করিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে তারানাথবাবুকে ডাকিবার জন্য আদেশ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার উত্তেজনার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া কৃপতি যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, সে মুখ নীচু করিয়া হাতের সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিল। অনুপমা একটু ঘুরে—একটা জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নিদাঘের সায়ং সূর্য্য দগ্ধ পৃথিবীর উপর একটু স্নিগ্ধ রক্তিমচ্ছটা বিস্তার করিয়া পশ্চিম আকাশের কোণে ঢলিয়া পড়িতেছিল; কয়েকটা চিল নীল সিন্ধু বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোতের ন্যায় নীলাকাশ তলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। অনুপমা দুই হাতে জানালার গরাদে ধরিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। শেষ বেলার ঠাণ্ডা বাতাস যুঁই ফুলের মিষ্ট গন্ধ মাখিয়া তাহার ক্রোধরক্ত ললাটে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে লাগিল।

"আপনি আমায় ডেকেছেন?"

ব্যস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে অনুপমা বলিল, "আমি আপনাকে ডেকেছি, না আপনি আমায় ডেকেছিলেন?"

"আমিই আপনাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু—"

"কিন্তু আমার আসতে একটু দেরী হ'য়েছে ব'লে আপনি কেন চলে গেলেন তার কৈফিয়ৎ আমি চাই।"

অনুপমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া কৃপতিনাথের সম্মুখবর্ত্তী চেয়ারখানার উপর বসিল এবং কৃপতির দিকে একটা স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঠিক পাশের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া তারানাথকে বসিতে বলিল। কৃপতির মুখখানা তখন এমন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা জীবিতের মুখ বলিয়া কোনরূপেই প্রতীত হইতেছিল না। তারানাথ নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "চাকরের সকল ভুলচুকের কৈফিয়ৎ মনিবের কাছে দিতে হ'লে সেটা তার পক্ষে বড়ই শক্ত সমস্যা হ'য়ে ওঠে না কি?"

অনুপমা বলিল, "শক্ত সমস্যা হবে তখন, যখন আপনাকে বন্ধু জ্ঞান না ক'রে চাকর ব'লেই মনে ক'রবো।"

তাহার আর একটা স্নেহতীব্র কটাক্ষ কৃপতির মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কৃপতি বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। সে হাতের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি এখান থেকে উঠে যাওয়া দরকার?"

গম্ভীরস্বরে অনুপমা উত্তর দিল, "সেটা আপনার অভিরুচি।"

কৃপতি উঠিল, এবং একবার তারানাথের দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কৃপতি চলিয়া গেলে অনুপমা তারানাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কারো হুকুম না পেলে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে পারবো না এ কথা মনে ক'রে আপনি চলে যান নি বোধ হয়?"

অনুপমার স্বরে ও দৃষ্টিতে যেন গাঢ় লজ্জা প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া তারানাথ বলিল, "ঠিক এ রকম কথাটা আমি মনে করি না নিশ্চয়। তবে—"

তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অনুপমা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি মনে ক'রেছিলেন?"

তারানাথ বলিল, "আপনি যে এখন যে কোন সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে পারবেন না এই রকমই আমার মনে হ'য়েছিল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনুপমা বলিল, "এ রকম মনে হবার কারণটা কি?"

তারা। কারণ অপর কিছুই নয়, তবে বিবাহ যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার পক্ষে কতখানি বন্ধন এটা জানেন তো?

অনু। জানি, কিন্তু আপনি কি বলতে চান, আমি চিরকাল অবিবাহিতা থাকি?

তারা। এমন অসঙ্গত কথা বলবো এত নির্ব্বোধ অবশ্য আমি নই।

অনু। আমিও আপনাকে নির্ব্বোধ মনে করি না। কিন্তু কৃপতিবাবুর হুকুম শুনে চলে যাওয়া আপনার পক্ষে ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।

তারানাথ মৃদু হাসিল; বলিল, "আপনি স্বেচ্ছায় কৃপতিবাবুকে যে অধিকার দিচ্ছেন, তার অমর্য্যাদা করাও আমার পক্ষে উচিত হয় না।"

ভ্রূকুটী সহকারে অনুপমা বলিল, "এখন কোন

অধিকার তৃপতিবাবুকে দিয়েছি এ কথা আমি স্বীকার করি না।"

তারানাথ বলিল, "প্রত্যক্ষ ভাবে না দিলেও—"

বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে অনুপমা বলিল, "প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কিছুই আমি জানি না তারানাথ বাবু; তৃপতি বাবুর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবও আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি।"

তারানাথের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়-বিজড়িত আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অনুপমা কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মুখ নীচু করিয়া টেবিলের উপর জোরে জোরে পেন্সিলের দাগ কাটিতে লাগিল।

তারানাথ কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিল, "এই অস্বীকারের কথাটা কিন্তু আগে জানালেই ভালো হ'তো।"

ঈষৎ উচ্চস্বরে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাল হ'তো শুনি?"

তারা। অনর্থক একটা গোলযোগ বাধতো না।

অনু। গোলযোগ কিসের?

তারা। সম্পত্তির।

অনুপমা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তারানাথের দিকে চাহিল। তারানাথ বলিল, "আপনি নাবালিকা এ কথা জানেন তো?"

অনু। জানি।

তারা। নাবালিকার বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনার অধিকার নাই।

অনু। অধিকার নাই ব'লেই আপনার উপর আমমোক্তার নামা দিয়েছি।

তারা। নাবালিকার আমমোক্তার নামা দেবারও অধিকার নাই। তার পক্ষে একজন অভিভাবক থাকা দরকার।

অনু। এ কথা তো আগে আমাকে বলেন নি?

তারা। এতটা আইন জ্ঞান থাকলে তিরিশ টাকা মাইনের সিপ্‌তালার হ'তাম না।

একটু ভাবিয়া অনুপমা বলিল, "বেশ, আপনাকেই আমার অভিভাবক রূপে নিযুক্ত করি।"

তারানাথ বলিল, "সেটা শুধু আপনার মুখের কথায় হবে না, জজের কাছ থেকে হুকুম নিতে হবে।"

অনু। তাই করুন, জজের কাছে দরখাস্ত ক'রে আসুন।

তারা। এখন দরখাস্ত করা বৃথা। তারকবাবু আর তৃপতিবাবু আপনার অভিভাবক হ'বার জন্য দরখাস্ত করেছেন।

বিস্ময় ও বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে অনুপমা বলিয়া উঠিল, "দরখাস্ত করেছেন?"

তারানাথ বলিল, "হাঁ, আজ আমি আদালত থেকে নোটিস্ পেয়েছি। সম্পত্তির হিসাব নিকাশ দিবার হুকুম আমার উপর এসেছে।"

রোষবিকৃত কণ্ঠে অনুপমা বলিয়া উঠিল, "আমি এঁদের অভিভাবকত্ব স্বীকার করি না।"

তারানাথ বলিল, "জজসাহেব নাবালিকার সম্পত্তি নিয়ে অভিভাবক নিযুক্ত করেন না। তিনি শুধু দেখেন, যে অভিভাবক হবে, সে উপযুক্ত আত্মীয় কি না।"

অনুপমা দাঁতে ঠোঁটে চাপিয়া ধরিল। তারানাথ বলিল, "এই জন্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম। আমাকে এক মাসের মধ্যে হিসাব দিয়ে আপনার কাছ থেকে রোকসোধ নিতে হবে।"

অনুপমা তারার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দৃষ্টিতে যেন লজ্জা অনুভব করিয়া তারানাথ বলিল, "এ ছাড়া আর উপায় কি আছে বলুন।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুপমা বলিল, "এই দরখাস্তটাকে রদ্ ক'রবার কোন উপায়ই কি নাই?"

চিন্তিত ভাবে তারানাথ বলিল, "একটা উপায় আছে, একজন অভিভাবক খাড়া হ'য়ে আলাদা দরখাস্ত করলে চলে। কিন্তু তাতে ওঁদের সঙ্গে মোকদ্দমা করতে হবে।"

অনু। মোকদ্দমা করতে হয় তাই করুন।

তারা। করতে পারি, কিন্তু তাতে ফল কুফলটা হবে বলা যায় না, সম্ভবতঃ আমারেরি পরাজয় হবে।

অনু। কেন?

তারা। দরখাস্তকারীদের মধ্যে একজন আপনার মামাতো ভাই, আর একজন আপনার ভাবী স্বামী। তাদের প্রার্থনা না মঞ্জুর ক'রে জজসাহেব যেই একজন নিঃসম্পর্কীয় লোককে অভিভাবকত্ব দেবেন; এমন বোধ

হয় না। অবশ্য তারক বাবুর পূর্ব্ব ইতিহাস প্রমাণ কত্তে পারলে অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু বেশী গোল এই কৃপতি বাবুকে নিয়ে।

অনু। কৃপতি বাবুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই। ওঁকে নিয়ে এত গোল বাধবে কেন?

তারা। আপনি বলছেন সম্পর্ক নাই, কিন্তু তিনি আপনার ভাবী স্বামী ব'লে দরখাস্ত ক'রেছেন, তারক বাবুও তার সমর্থন ক'রে এসেছেন। এখন তিনি যে আপনার মনোনীত স্বামী ন'ন, এটা প্রমাণ কত্তে হ'লে আপনাকে হয় তো আদালতে উপস্থিত হ'তে হবে। তা ছাড়া দেশের প্রায় সকলেই শুনেছে, তারক বাবুর সঙ্গে আপনার বিবাহ নিশ্চিত। এখন সেটা অস্বীকার ক'রে তার সঙ্গে মোকদ্দমা কত্তে গেলে চারিদিকে একটা কেলেঙ্কারী রটে যাবে।"

কথাগুলা শুনিতে শুনিতে অনুপমার নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে কি এরের এই ভয়ানক অত্যাচার—"

কথাটা শেষ হইবার আগেই অনুপমার মাথাটা টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সজল বিস্ময়ে তারানাথ দেখিল, তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। তারানাথ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কিন্তু পলকাল মধ্যেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া মূর্চ্ছিতাকে জাগিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় তারকনাথ ব্যস্তভাবে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং অনুপমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "একি, অনুর কিছু হ'য়েছে যে!"

বলিয়াই সে পুনরায় ব্যস্ততার সহিত বাহির হইয়া গেল। তারানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

পথ হারা।

(শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত)

গাইব না আর গান আমি, আজকে আমায় রেহাই দাও,
তোমার দুটি পায়ে পড়ি ভাই! মোহাই, আমার মাথা খাও।
নাচতে আমি পারব না ভাই, হাসতে আমি পারব না আর,
বুকের উপর চাপছে যে ভাই বিরাট ব্যথার পাষাণ ভার।
তোমার পূজার অর্ঘ্য দেখে কাঁপছে ভয়ে আমার বুক,
নিজের পানে চাইছি যত লুটিয়ে পড়ছে মাটীতে মুখ।
অবুঝ শিশু খেলা ঘরে খালগেয়াম চিবিয়ে খায়—
হোক না ছুরী জোয়ান মিন্সে চক্ষু মিলে পারে কি হায়!

* * * *

করো না ভাই প্রেমের কথা, করো না ভাই আমায় আর,—
সজল চোখে চাইছ কেন? কর্চ্ছ কেন মুখটী ভার?
বুঝ্‌ছ না কি যারে তুমি ভাবছ ওগো রূপের রাণী
খানীর বয়েস দেখে,—শুধুই টানছে প্রেমের খানী?
বাইরে শুধু খোলস খানি দেখছ উজল চটকদার—
ভেতরে যে গলিত কুষ্ঠ খোঁজটীও কি রাখনি তার?
আমার চোখে চেয়ে দেখ ওগো আমার পেছন পানে,—
কতটা পথ তাগাড় ভেঙ্গে এসেছি হে আজ এইখানে।

* * * * *

আজকে আমায় দাওনা রেহাই, আমি যে ভাই পারিনা আর
এখনো যে দিচ্ছে সাড়া ভাঙ্গা বীণার ছেঁড়া তার।
দুখের স্মৃতি, ব্যথার আঘাত এখনো যে বিষম লাগে,
দূর অতীতের কত বেদন প্রাণে যে ভাই উঠ্‌ছে জেগে।
ছিল সেদিন কত পরাণ কেড়ে নিয়ে গেছি চলে,
তাদের তপ্ত শোণিতে পায় আলতা পরে নেচে চলে।
অশ্রু দেখে তাদের চোখে উথ্‌লে উঠতো তরল হাসি,
নয়না হেনে ছড়িয়ে গলা পরাতাম নাগপাশের ফাঁসী।

* * * *

শুনবে যদি শোন তবে,—বল না ভাই আমার কি দোষ?
ভাইনী বেটী চাবুক মেরে শেখাতো যে পর্ত্তে মুখোস।
ছলাকলা শিখিয়ে দিত কান্না হাসির দোকানদারী,—
মায়ের চোটে কত ভাগাত একটু কহর হলে ভারি।
পোকারা নর্দ্দামায় থেকে ভাবে আহা সুখে থাকি,—
আমি(ও) শেষে ভাবতুম আহা আমার সুখের আর কি বাকী!
আজকে স্বপন গেছে ভেঙ্গে, পাপের ভরা ভরাই ভারি,—
দিনের আলো যাচ্ছে নিভে আমি তো আর রইতে নারি

* * * *

তবু যদি চাও হে আমায়, বাদ যদি সত্যি ভালো,—
এলো আমার ভাঙ্গা বুকে, জ্বাল তবে আশার আলো!
মরমী মাটী ধুয়ে মুছে তোমায় আমায় একই সাথে
পায়ের পথে এগিয়ে চল ধরেনে' ভাই হাতে হাতে।

কি হবে আর হীরামতি, গয়না গাটী, জড়োয়া সাড়ী?—
কেন দূরে আছি জানা, পাশেই থুতো, আংটী বড়ি।
নাওনা পরে ভিখারীর সাজ, কিসের লজ্জা ভাবনা কি আর?
পায়ের কর্ত্তা শ্রীভগবান্ ভাবনা চিন্তা সকলি তাঁর।

সাদির গল্প

[শ্রীমতী খুরসিদজাঁহা বেগম]

অপাত্রে দয়া

একটা লোকের বাড়ীতে কতকগুলি মৌমাছি একটা মৌ-চাক করেছিল। লোকটি তার স্ত্রীকে বললে 'দেখি একটা মশাল নিয়ে এস, দি চাকটা ভেঙ্গে। স্ত্রী বললে 'না গো না—তা কোরো না—প্রাণীগুলো বাসা ছাড়া হয়ে তাহলে মহা মুস্কিলে পড়ে যাবে।' সুতরাং বোকা লোকটা মৌমাছিগুলোর বাসা ভেঙ্গে তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে তেমনি শান্তিতেই থাকতে দিলে।

একদিন লোকটার স্ত্রীকে একটা মৌমাছি দিলে হুল ফুটিয়ে, মেয়েটি রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল। স্ত্রীর কান্না শুনে স্বামী তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে অন্দরে এল। রেগে সে স্ত্রীকে বললে:—'ওগো এখন মুখ অমন কচ্ছ কেন—কি বলেছিলে আমায় তখন সে মনে নেই—'ওগো নিরীহ মৌমাছিগুলোকে মেরো না গো।'

মন্দ যে তার উপকার কে কবে করতে পারে? দুষ্টের প্রতি যতই দয়া দেখাতে যাবে ততই তার দুষ্টুমি বেড়ে চলবে।

দুষ্মনের সম্মুখে যোড়শোপচারে খানা সাজিয়ে ধরলে চলবে না। তাকে দিতে হবে পাতে যা থাকে তাই।

রাত্রের পাহারাওয়ালার উপর যদি দয়া দেখান যায়; তাহলে চোর ডাকাতের উপদ্রবে আর সবার ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে থাকতে হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দীকসকের মূল্য লাখ লাখ মিশ্রি খাঁয়ের চেয়ে ঢের বেশী।

আদর করে' বেড়াল পুষলে সে তোমার পায়রাগুলিরই ঘাড় ভাঙবে; দুধ দিয়ে কালসাপ পুষলে তোমাকেই ছোবলাবে। ভাল করে ভিত না গড়ে অট্টালিকা তুলোনা—যদি তোল তো—সাবধান।

প্রেমের একাগ্রতা

প্রেমে তোমায় অস্থির, অধৈর্য্য করে' তোলে। এমন তন্ময়তার সঙ্গে তুমি তার পদতলে তোমার মস্তক রাখ যে তুমি তখন বিশ্ব সংসার সব ভুলে যাও।

তোমার ভালবাসার জনের চোখের সম্মুখে যখন তুমি থাক তখন ধন রত্ন কোনদিকে আর তোমার লক্ষ্য থাকে না—তখন সোণা আর ধুলো তোমার কাছে সমান মনে হয়।

তুমি বল সে তোমার চোখে বিরাজ করে—যখন চোখের পাতা বন্ধ হয় সে তোমার মনের মাঝে থাকে।

যদি সে তোমার প্রাণ চায়—তবে তা তুমি তার হাতে তুলে দাও। যদি সে তোমার মাথার উপর খড়্গ তুলে ধরে তুমি মাথা আরো এগিয়ে দাও।

এই পৃথিবীর ভালবাসাই যখন এমন ভাবান্তর ঘটায়, এত বশ্যতা ও দাস্যতা চায় তখন ভগবানের উপর ভালবাসা হলে লোক যে কি হয়ে যায় সে কি আর বোঝাতে হবে?

হাতিমতাইর গল্প

হাতিমতাইর একটা ঘোড়া ছিল, প্রভাতের বায়ুর মত ছিল তার গতি। তুর্কের সুলতান এ কথা শুনে বললেন:—'হাতিমতাইর মত দাতা আর কেউ নাই—তার ঘোড়ার মত অমন দ্রুত ও তেজী ঘোড়াও আর নাই।' সাগরে যেমন জাহাজ চলে মরুভূমিতেও তেমনি হাতিমের ঘোড়া চলে যায়—উগলপাখী অবশ হয়ে তার পেছনে পড়ে থাকে।'

'হাতিমের কাছে এই ঘোড়া আমি চাইব। যদি সে দাতা হয় আর আমায় তার ঘোড়া দেয়—তবে বুঝব

তার এ খাতির, নাম দস্তা, আর যদি না দেয় তবে বুঝব এ সবই ফাঁকা কথা।'

সুলতান তখনই হাতেমের কাছে দশজন অনুচর সঙ্গে দিয়ে একজন দূত পাঠালেন। দূত হাতেমের গৃহে গিয়া উপস্থিত হোল, হাতেম তাদের আদর অভ্যর্থনা করে' তাদের আহারের জন্য একটি অশ্ব বধ করলেন।

পরদিন দূত যখন হাতেমের কাছে তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে হাতেম তখন একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠলেন। তিনি দূতকে বললেন 'এ সংবাদ আপনারা আমায় আগে দেননি কেন? কাল সেই ঘোড়াটিকেই তো হত্যা করে আপনাদের আহারের আয়োজন করে দিয়েছি। খাবার আয়োজন অন্য রাত্রে আর কিছু না থাকাতে—সেই ঘোড়াটিকেই কাটতে হয়েছিল—অতিথিরা খাবার না খেয়ে রাত্রিবাস করবেন এতো আর হতে পারে না।'

পরদিন সকালে হাতেম দূত ও অনুচরদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে বিদায় দিলেন। দূত গিয়ে সুলতানকে হাতেমের মহানুভবতার কথা বললে—সুলতান আরও সহস্র প্রজাপালনী হাতেমের উপর যখন করতে লাগলেন।

কংগ্রেসের "প্রোগ্রাম"

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সরকার]

(৫)

শ্রমিক ও কৃষকের অসহযোগিতা

ভারতবর্ষে শোষণ কার্য্যই বিদেশীর প্রথম ও প্রধান কাজ। শাসন যন্ত্র যেটা আছে, সেটা কেবল শোষণ চালাবার জন্য। দুঃখের বিষয় এই শোষণ-কার্য্যে সাহায্যকারীদের অধিকাংশই ভারতবাসী। পেটের জন্য এবং বিবেক বুদ্ধির অভাবে আজ তাহারা অন্যের মত দেশের অমঙ্গল করিয়া যাইতেছে। বিবেক বুদ্ধির অভাবেই আজ এমন দুরবস্থা হইয়াছে। তাহা না হইলে এমন সোণার দেশের সন্তানেরা অনাহারে আত্মহত্যা করে, উদরান্নের জন্য ভাইয়ের গলায় ছুরি দেয়? এই অভিশপ্ত জাতির কপালে তাই এত দুঃখ। সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই—মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, লজপৎ রায় এবং আলিভাইদের কারাগারের নরক যন্ত্রণা বরণ করিতে হইয়াছে। আজ ভারতবাসী বিদেশীর বন্দুক ঘাড়ে করিয়া মহাত্মাকে গাহারা দিতেছে। ভারতের বন্দী আত্মার মুক্তি কবে আসিবে জানি না।

যেদিন শাসন যন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লইয়া ভারতবাসী পাপানুষ্ঠানে আর সহায়তা করিবে না—সেইদিন ভারত মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু আর একটা দিকে আমরা নজর দিই নাই। এই যে বিরাট শোষণযন্ত্র ক্ষুধিত ভারতের অস্থিমজ্জা নিঙড়াইয়া বিদেশীর আরামের জন্য রস বাহির করিতেছে—তাহার চালক কে? আমাদেরই শ্রমিক এবং কৃষক। কৃষক গায়ের রক্ত জল করিয়া দেনার দায়ে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া মাটি হইতে কাঁচা মাল উৎপন্ন করিয়া দিতেছে—সেই মাল নানাপ্রকারে অর্থহীন শ্রমিক কর্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদেশীর আরামের উপকরণ আনিয়া দিতেছে। এই শোষণ প্রণালীর বিরুদ্ধে যতদিন না শ্রমিক এবং কৃষককুল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, ততদিন দেশের কল্যাণ নাই। অবশ্য তাহাদের জাগরণে সমাজে বিপ্লব আসিবে—অত্যাচারীর আসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহায়তাকারী অনেক সম্প্রদায় লোপ পাইবে—কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। জগতের চারিদিকে এই ওলট্‌পালট্ আরম্ভ হইয়াছে। এই স্রোতে ঐরাবতও বাধা দিতে আসিলে ভাসিয়া যাইবে—স্বার্থরক্ষার বালির বাঁধে তাহাকে কে আটকাইতে পারিবে? যাহারা যোগ দিবে, তাহারাই বাঁচিবে—না আসিলে ধ্বংস সুনিশ্চিত। অসহযোগের প্রকৃত সফলতা আনিতে হইলে এই অন্ধ শক্তিকে মঙ্গলময় পথে চালিত করার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কোনও সার্থকতা যদি থাকে তো এইখানে।

(৬)

অরগ্যানিজেসন

পুথিপুত্রের হঠাৎ ঐশ্বর্য্যলাভের মত যদি ভারতের অরাজলাভ হয় তো, কোনও কথা নাই। কিন্তু তাহার জন্য যদি নিয়মিত চেষ্টা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী আমাদিগকে সিদ্ধি আনিয়া দিবে না। Organisation আজকাল সমস্ত কথার মূল মন্ত্র। দেশকালের মূলমন্ত্রকে মানুষের বুদ্ধি পদে পদে পরাস্ত করিতেছে। মানবজাতি ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় জীবনে যাহার শৃঙ্খলা আছে—সেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতেছে। যাহার সে অভাব, সে দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিয়া বসিয়া থাকিবার দিন আর নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে নিজেকে মানাইয়া লইতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

অরগ্যানিজেসনের বলে দুই পয়সার জোরে একখানি চিঠি পাতাল হইতে বর্ষায় যায়। কলিকাতার রাস্তায় একজন পাহারাওয়ালার অঙ্গুলি সঙ্কেতে শত শত গাড়ী থামিয়া যায়, লাটসাহেব হইতে সকলকেই দাঁড়াইতে হয়—অঙ্গুলির ঐ ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? উহার পশ্চাতে বিরাট সাম্রাজ্যের অরগ্যানিজেসন রহিয়াছে। ঐ অঙ্গুলি সমস্ত সাম্রাজ্যের শক্তি লইয়া সঙ্কেত স্বরূপ উঠিয়াছে।

কংগ্রেসে আমাদিগকে এই ভাবের শৃঙ্খলা আনিতে হইবে। গ্রামের যে একজন কংগ্রেসের কর্ম্মী থাকিবে, তাহার পশ্চাতে সমস্ত ভারতের স্বাধীনতাকামী জনশক্তির বল থাকা চাই। জীবনের সবদিকেই পরের আধিপত্য—অশন, বসন, চিন্তা, ধ্যান সবই বিদেশীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছি। এখন একটা একটা করিয়া এই সকল বিভাগকে নিজের হাতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। Reserved Subject, Transferred Subject লইয়া এইখানেই গোলমাল। স্বরাজের তারাকিতে আমাদের সমস্ত Subject বিদেশীর হাতে Transferred—এইগুলিকে আবার আমাদিগকে reserved করিয়া নিজের হাতে আনিতে হইবে। রাজ্যের মধ্যে রাজ্য সংগঠন এই নীতির উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের যোগ্যতা যে পরিমাণে যে বিভাগে গড়িয়া উঠিবে—সেই পরিমাণে বিদেশীর হাত হইতে আমাদের হাতে ক্ষমতা আপনিই চলিয়া আসিবে। ইহা অঙ্কের অনুপাতে হইবে। উহাদের এত বড় Efficient organisation ভাঙিবার একমাত্র উপায়—নিজেদের ঠিক অত বড় efficient organisation গড়িয়া তোলা। এক একটা দিক ধরিয়া আমাদিগকে সেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। ভাবসাধনের দিক হইতে বোধহয় আমাদের মুক্তি এখনও আসে নাই—সেই আসল জায়গায় ঠিক হইলে, বসন্তের আগমনে কলমুলের প্রাচুর্য্যের মত আমাদের কর্ম্মজীবন চারিদিকে সফলতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

পাঁচ পাঁচি

(শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা বি-এ)

আমরা ঘুমাই কেন?—মানুষের শরীরের মত এমন আশ্চর্য্য যন্ত্র আর দুটি নাই। এর সমস্ত কাজের হিসাব রাখা মুস্কিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় শুইতে না শুইতেই আমাদের চোখের পাতা বুজিয়া আসে আবার জোর হইতে না হইতেই খুলিয়া যায়, ইহার সঠিক কারণ খুঁজিতে গিয়া পূর্ব্বকার বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন যে আমার মস্তিষ্কের এক অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া আমাদের ঘুম পায়। কিন্তু সেটা ভারি ভুল—কল মাত্র। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে আমরা যখন সজাগ থাকি তখন সায়ুবিন্দুর হাইড্রোজেন, কার্ব্বনডেই প্রভৃতিগুলি হইতে এক রকম বিষ উৎপন্ন হয়। এই বিষের পরিমাণ শরীরে বেশী হইলেই ঘুমাইয়া পড়ি। এই মতটা অনেকে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ দেখা গিয়াছে যে এক রকম বিষ প্রয়োগে মানুষকে যখন তখন ঘুম পাড়ান যায়। এ বিষ অত্যধিক মাত্রায় পড়িয়া গেলে মানুষ মরে না। চীনেদের এক রকম পাতির কথা জানি। আসামীকে ফাঁসি না দিয়া অন্যেকদিন ধরিয়া পরের অজ্ঞাতে ঐ বিষ তাহাকে অল্পমাত্রায় খাওয়াইয়া মারা হইত। ক্রমে একদিন শুকনো পুতার মত সে উঠিয়া পড়িয়া যাইত। সে ঘুম আর ভাঙিত না।

শব্দের গতি—শীতকালে দূরের শব্দ যতদিক আর সময়কালে পশ্চিম থেকে তাড়াতাড়ি শোনা যায়।

ইন্দুরের রাজ্য—'সাউথ জর্জ্জা' দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে একটি দ্বীপ। তিনি শিকারীরা বছর তিন পূর্ব্বে এখানে শিকার করিতে আসিবার সময় কতকগুলি ইন্দুর জাহাজ হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসে। আজকাল ইন্দুরের দল এরাজ্য ছাইয়া ফেলিয়াছে। ৫০ মাইলের মধ্যে তিনি শিকারী ও পাখী ছাড়া ইহারা কোন জীবজন্তুই আর জীবিত রাখে নাই। ইহারের যোরাত্যে সব জীবজন্তু পালাইয়াছে। ইহারের ধাক্কা তিমিমাছ শিকারীরা চর্ব্বিগুলি দিয়া বোতলি ফেলিয়াছে।

মাছের ডিম—বিলাতী মাছের ডিম পাড়িবার ক্ষমতা অদ্ভুত। এক একটী মাছের পেটে ১৯৭০০০০০ ডিম পাওয়া গিয়াছে। কডল্যাণ্ডে একটী মাছ ধরা পড়িয়াছিল তার ওজন ছিল মাত্র ১৫ সের কিন্তু তার পেটের ডিমের ওজনই ছিল ৩২ সের আর ডিমের ছিল ৯০ কোটি। একটী মেয়ে মাছের ডিমের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে ৫০ ফুটের ডিতর যত ডিম পাতে সবগুলিকে পাঁয়াইয়া রাখিতে পারিলে গোটা পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলা যায়।

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পরে)

পাকল কালীচরণকে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—নাম-টা জেনে আসতে পারলি নে? আচ্ছা বোকা ত তুই কালীচরণ!

কালীচরণ তাহার তাদা হিন্দীতে এই কথা কয়টি বলিল—যে সে বোকা নয়। নাম জানিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ট্যাবলেটে ইংরাজী অক্ষর থাকায় এবং চাকর, কম্পৌণ্ডার কাহারও দর্শন না পাওয়াতেই নাম-টা সে জানিয়া লইতে পারে নাই।

আচ্ছা, তাতে কিছু যাবে আসবে না, বলিয়া পাকল ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। নটবর একখানা বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—বন্ধুটি কে শুনতে পারি কি? ডাক্তার না-কি?

লোকটা যে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে পাকল স্পষ্টই তাহা বুঝিল; বুঝিয়াই তাহার মনটা কেমন ঘি ঘি করিয়া উঠিল, বলিল—আপনার দরকার?

নটবর ধীর প্রকৃতির লোক, হঠাৎ উত্তেজনা দেখানো তাঁহার স্বভাব নহে, বলিলেন—দরকার না থাকলে কি কোন কথা জানতে নেই?

না। অন্ততঃ আপনার নেই।

বটে!—বলিয়া নটবর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পকেট হইতে সিগারেট কেসটি বাহির করিয়া নিজে একটি চুরুটিকায় অগ্নি সংযোগ করিলেন; কেসটি পকেটে পুরিতেছিলেন, আবার বাহির করিয়া পাকলের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—খাও।

খাক্।

নটবর কেস্-টি খপ্ করিয়া বন্ধ করিয়া পকেটে ফেলিয়া বলিলেন—আমি ভাব্‌ছি কি, মধুপুরে যদি আমার বেশীদিন দেরী-ই হয়, তোমাকেও হয়ত আমার সঙ্গেই যেতে হ'বে।

পাকল নির্ব্বাক-বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত বৃদ্ধের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধের আকস্মিক এই চিন্তার মূলেও যে সন্দিগ্ধ মনটা অপেক্ষা করিতেছিল, পাকল তাহার পরিচয় পাইবামাত্র বলিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ কোন একটা কথাও তাহার ঠোঁটের আগায় জোগাইল না।

বৃদ্ধ কহিলেন—কি বল?

পাকল তথাপি নীরব।

নটবর বলিলেন—সেবারে নিয়ে যাইনি বলে তাদের যে রাগ হ'য়েছিল—চল এ'বার।

আমি যেতে পারব না।

পারবে না? কেন?

সুবিধে হ'বে না আমার!

নটবর সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—অসুবিধেটা কি হ'বে তাই শুনি? বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফূর্ত্তি চলবে না? মাহেশে মেলা দেখ্‌তে যাওয়া হ'বে না—না-কি?

পাকল আর্শীর সামনে দাঁড়াইয়া গণ্ডের একটি ব্রণমুখে হিমানী লাগাইতেছিল, বৃদ্ধের কথা কয়টা চাবুকের মতই তাহার অনাবৃত পিঠের উপর সপাৎ করিয়া বাজিয়া উঠিতেই, ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—আমার খুসী!

নটবর তেমনি ধীর, অচঞ্চল, কহিলেন—কি খুসী পাকল?

যাওয়া-না-যাওয়া আমার খুসী! মাহেশে যাই, মজায় যাই—আপনার কি!

আপনার কি! বটে!—এইবারে বৃদ্ধ সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন: সিগারেটটি অধরচ্যুত করিয়া পুনশ্চ কহিলেন—বটে!

বৃদ্ধের ঘূর্ণিত নেত্রকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া পাকল তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—বাক্ ঘরের যাগ নাই আমি, যে, মাহেশে গেলে আমার জাত যাবে, ধর্ম্ম নষ্ট হ'বে!

নটবর বিহ্বল দৃষ্টিতে সুন্দরী শিরোমণির রক্তাক্ত মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন—হুঁ।

পাকলও আর কিছু বলিল না; হিমানীর শিশিতে তর্জ্জনী পুরিয়া ডুবারসহ খানিকটা পদার্থ তুলিয়া আবার সেই ব্রণমুখে লেপিতে লাগিল।

নটবর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন—তা হ'লে যাবে না কেমন?

পাকল মুখ না ফিরাইয়াই বলিয়া উঠিল—না।—একমুহূর্ত্ত থামিয়া আর্শী হইতে সরিয়া আসিয়া বৃদ্ধের

দিকে ফিরিয়া বলিল—বলেছি না আপনি আমাকে ছুটি দিন্?

কিন্তু মধুপুর যেতেই হ'বে।

আবার! পারব না।

পারতেই হ'বে আমি অমনি টাকা দিই নে।

ওঃ—বলিয়া পারুল দ্রুতপদে শয্যার সেই অংশে উপস্থিত হইল যেখানে তখনো নটবর প্রদত্ত সেই নোট দু'খানা পড়িয়াছিল। কম্পিত হস্তে নোট দু'খানা কুড়াইয়া লইয়া নটবরের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া রোষরুক্ষ স্বরে বলিল—নিয়ে যান আপনার টাকা—

তবু—এ মাসের টাকা আগাম দেওয়া আছে—জান?

জানি—দাঁড়ান।—বলিয়া পারুল কাঁচের আলমারিটা খুলিয়া ফেলিল। একটা রঙচঙে জাপানী বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া বাছিয়া বাছিয়া দু'খানা নোট বৃদ্ধের সম্মুখে ছুড়িয়া দিয়া বলিল—যান।

নোট দু'খানা যে বৃদ্ধের পদসংলগ্ন জুতার উপরে গিয়াই পড়িল, পারুল তাহা দেখিতে পায় নাই—সে তখন বাক্স বন্ধই করিতেছিল, নটবর নোট কুড়াইয়া, 'মা-লক্ষ্মী'কে মাথায় ঠেকাইয়া আগুনের মত বলিলেন—বটে—এত তেজ?

আপনার টাকায় আমি—না, যান। বলিয়া সে তর্জনী সঙ্কেতে দ্বার দেখাইয়া দিল।

নটবর কম করিয়া ৪০।৫০ বছর এ পথে নির্ভয়ে সুখে বিচরণ করিলেও আজ কিছু ভয় পাইয়াছিলেন, দুঃখও বড় কম হয় নাই। একটা জঘন্য ঘৃণ্য বেশ্যা যে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে তাহা তাঁহার জ্ঞানেরও অগোচর ছিল।

এত তেজ ভালো নয়, বুঝ্‌লে?—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দুই পা চলিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া চোখ মিটিমিটি করিতে করিতে বলিলেন—এর ফল···

আবার কথা কচ্ছেন?—যান বলছি—বলিয়া পারুল কয়েক পদ সরিয়া আসিয়া নটবরের সম্মুখীন হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন—যাচ্ছি কিন্তু এর পরে···

কোন কথা না, আপনি যান। আপনার মত ঘেঁটো কাপ্তেন···

গালগোল! বটে!

গালাগাল কোন্‌টা? ঘোটো কাপ্তেন নও তুমি? আজ যাদে কাল যা'কে···

নটবর যারান্দার দিকে ফিরিয়া—ও পারুলের মা, পারুলের মা, যুনি গোথায় গেলে গো?

পারুল চীৎকার করিয়া বলিল—তুমি যাবে, না আমি লোক ডাকব?

কি? লোক ডেকে বার করবে? ডাক, ডাক—দেখি! কে তোমার বাবা আছে—ডাক। এই আমি বসলুম, দেখি, কার বাবার সাধ্যি আমাকে ওঠায়! আমি নটবর মল্লিক, তোর মত অমন হাজারটে মেয়েমানুষকে আমি কিন্‌তে পারি···

তাই কেনো গে, যাও? বেরোও, বেরোও বল্‌ছি আমার ঘর থেকে, নইলে, কালীচরণ! কালীচরণ। এই যে বেহারী, যে ত বেহারী এই ব্যাটা ছুঁচোর কাণ ধরে!···

নটবর উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—আচ্ছা হারাম-জাদী, থাক্ তুই! দেখ্‌ছি আমি তো'কে!

দেখ্‌ছি কেন, এখনই দেখ্ না···

বেহারী উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া নটবরকে বলিল—চলিয়ে যান্, আবি চলিয়ে! মোসয়া বখত দেখা যায়েগা! চলিয়ে!

আচ্ছা—চলিয়ে। লেকেন্ হাম দেখ্ লেঙ্গা—বলিয়া বৃদ্ধ বাহির হইয়া গেলেন।

সিঁড়িতে তাঁহার বিক্ষিপ্ত পদশব্দ ও প্রলাপ শুনা যাইতেছিল, কথাগুলি অত্যন্ত আবছায়াবোধে পারুল যারান্দাতেই বাহির হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ নটবরের গলা থামিয়া গিয়া মা'র ঘর প্রকাশ হইয়া পড়িতেই, পারুল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

নীচের তলে খানিকক্ষণ চেঁচামেচি হৈ-চৈ—তারপরই সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পারুল প্রকাণ্ড তাকিয়াটার উপরে মাথা দুইটা তুলিয়া দিয়া, দু'হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া কি ভাবিতেছিল; মা ভাবিলেন—ও মা পারুল! এমনটাই কি করতে হয়?

পারুল কথা কহিল না।

মা বলিলেন—মহাপ্রভুর বংশধর, তার ওপর অত বড় করেন, অত পয়সা...

যদু পয়সা আমি চাইনে মা!

মা আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন, বলিলেন—চাই-নে কি বাছা! অমন অলক্ষণে কথা বল্‌তে আছে? চাই-নে! আজ যদি না চাইবি ত আর কবে চাইবি পারুল?

কোন দিনই চাইব না মা!

মা বুঝিলেন, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সস্নেহে বলিলেন—তুই না চাস্...

পারুল তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—তুমি চাও কেমন? মরণ হয় না তোমার! গলায় দড়ী জোটে না! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখনও···

মা চটিলেন না; মেয়ের স্বভাব জানিতেন; চটিলে সে কাহারো নহে। ধীরকণ্ঠে কহিলেন—বুড়ো বয়সের জন্যেই ত মেয়ে মানুষ করা বাছা!

জিজ্ঞে কর গে মা। আমার দ্বারা আর হ'বে না।

মা চুপ করিলেন। ইচ্ছা চুপ করিয়াই বাহির হইয়া যান। অন্য কোন সময়ে পারুলের রাগ পড়িলে যা হয় হইবে কিন্তু নীচের ঘরে নটবরকে বসাইয়া আসিয়াছেন, উত্তর একটা চাই—কাজেই বলিলেন—চন্দরদোজ,মশাই...

আবার মশাই!—পারুল তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—মা! এক কাজ কর, তোমার মশাইকে অন্য কারু কাছে নিয়ে যাও, তোমারও কিছু হ'য়ে যাবে।

বুদ্ধি উড়াইয়া হেসে—মা এত বড় কথাটাও হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন—বোস্ বাছা বোস্! বেশী কথায় দরকার নেই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পারুল বিছানায় বসিয়া পড়িল। দারুণ উত্তেজনায় মাথার মধ্যে কেমন একটা ঘূর্ণিবায়ু ঢুকিয়া সারা দেহটাকেই কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, শুইয়া পড়িয়া কালীচরণকে ডাকিল। ভৃত্য আসিলে তাহাকে বলিল—যোড়ে গিয়ে সেই ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্ ত কালীচরণ! আমার মাথাটায় বড্ড অসুখ হ'চ্ছে!

কালীচরণ মৃদু হাসিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সাচ্চা কথা

(সুধীবর্গের সুদয়-বাণী)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ সংগৃহীত]

(১) স্ত্রীলোকে অপেক্ষা পুরুষের হৃদয় অনেক কোমল।

(২) সমালোচকের অভাব হয় না কিন্তু কর্ম্মীর সংখ্যা বিরল।

(৩) বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদিগকে বিলাসিতা, টেলিফোঁ ধরা বিষাক্ত বাষ্প ব্যবহারের শিক্ষা দিতেছে।

(৪) মূঢ় প্রতিজ্ঞের নিকট সকল কাজই সম্ভবপর।

(৫) একটু ঘসা-মাজা না করিলে বাহ্যবস্তুটা যেন ঠিকিতে চায় না।

(৬) আত্মসম্মানহীন লোকের সঙ্গে মেশা বিপজ্জনক। যে নিজের মর্য্যাদা জানে না, সে পরের মর্য্যাদাও রাখিতে পারে না।

(৭) সুযোগ সকলের দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া আছে;—কেবল চোখ দিয়া দেখিতে, হাত দিয়া গ্রহণ করিতে, এবং বুদ্ধি দ্বারা ব্যবহার করিতে পারে কয়জন?

(৮) একবার ভুল করিয়া তাহার জন্য অনুশোচনা করার অর্থ, দুইবার ভ্রমকে আশ্রিত করা।

(৯) চাটুবাদে অনেকেই গলিয়া যায় কিন্তু সে লোক খোসামুদে বিচলিত হয় না সে লোক অতি প্রশংসার্হ।

(১০) যে লোক হাসিমুখে দুঃখ বহন করে, দুঃখ তাহাকে দেখিয়া দূর হইতেই নমস্কার দেয়।

(১১) দারিদ্র্য, উন্নতির সহায়ক।

(১২) যাহার ব্যক্তিত্ব (personality) আছে তাহার কাজে বাধা দিতে অনেকেই সাহস পায় না।

(১৩) যে পরের ভাল করিতে সচেষ্ট, সে নিজের ভালই করিয়া আসিতেছে। মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদ তাহাকে বিপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

(১৪) স্মৃতি, কল্পনা, পরিশ্রমশ্রিয়তার একত্র সমন্বয় হইলে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপস্থিত হইতে পারে।

(১৫) অকৃতকার্য্যতাই বুদ্ধিমানকে সফলতার পথ দেখাইয়া দেয়।

বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চগুলিতে অভিনয় দেখিতে গিয়া অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন বাংলার রঙ্গমঞ্চে কি বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়া লাগিবে না? চিরকালই কি বাংলার রঙ্গালয় উনবিংশ শতাব্দীর ভাবে মজিয়া থাকিবে?

• • • •

কথাটা অনেক দিক হইতেই ভাবিবার বিষয়। অনেকে বোধ হয় ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু কি ভাবে কি উপায়ে উনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়া কাটাইয়া বিংশ শতাব্দীর উন্নত পর্য্যায়ে ইহাকে দাঁড় করানো যাইতে পারে সে বিষয়ে সম্যক আলোচনা আমাদের দেশে হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল বজায় রাখিয়া না চলিতে পারিলে সে জিনিষ কোন দিনই উন্নতিলাভ করিতে পারে না এবং তাহা টিঁকিয়াও থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ জিনিষই এই সময়ের সঙ্গে তাল ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না বলিয়াই জিনিষের মত জিনিষরূপে দাঁড়াইতে পারে না। রঙ্গালয় সম্বন্ধেও এ কথাটি আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে খাটে।

• • • •

রঙ্গালয় আমোদের স্থান, শিক্ষার স্থান, ব্যবসায়ের স্থান। কিন্তু আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলি কোন দিক হইতেই ইহার সার্থকতা পূর্ণভাবে দিতে পারিতেছে না। অন্য দেশীয়েরা আসিয়া এই রঙ্গালয়ের মঞ্চে বসিয়াই তাঁহাদের এই আনন্দ-ব্যবসায় সুযোগমতে চালাইয়া যথেষ্ট অর্থ অর্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে অথচ বাংলাদেশে বাঙ্গালার পরিচালিত রঙ্গমঞ্চগুলি দিন দিন হীন, শ্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। আমোদেও আমাদের এই অবনতি দেখিয়া মনে হয় জাতীয় জীবন হইতে প্রাণ নামক বিচিত্র চির-উজ্জ্বল রঙ্গিন পদার্থটি দিন দিন কি ভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে।

• • • •

আমাদের পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে ম্যাডাম মেল্‌বা'র আগমন সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই বাসন্তীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি শিয়ালদা নাটমন্দিরে মেল্‌বা তাঁহার সুধাকণ্ঠের সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করিয়াছেন। মেলবা বড়লাট লর্ড রেডিং বাহাদুরের অতিথি রূপে বাস করিতেছেন। লেডি রেডিং মেলবার কণ্ঠ সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমালা বিভূষিত করিয়াছেন; স্বয়ং বড় লাট বাহাদুরও মেলবাকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। স্বজাতীয় গুণীর সম্মান করিতে, গুণের আদর জানাইতে ইংরাজ জাতি কোন দিনই কুণ্ঠা বোধ করেন না। অভিনেত্রী মেলবা ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ ও তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক ভারতেই মহাসম্মানে সম্মানিত হইলেন, ভারতবাসীর কি ইহা দেখিয়াও চক্ষু খুলিবে না? এ আদর্শেও কি তাহাদের চিরন্তন সঙ্কীর্ণতা ঘুচিবে না? তা যদি না ঘোচে, ত ধিক্—শত ধিক্ আমাদের!

"বরের বাজার"

শনিবার ২৭শে আশ্বিন সন্ধ্যাকালে আমরা কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে "বরের বাজার" দেখিয়া আসিলাম। "বরের বাজারের" নায়ক-নায়িকাগণ সকলেই আমাদের সুপরিচিত। রসার্ণব চিত্তরঞ্জন, হাস্যার্ণব অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, নৃত্যকলার্ণব নৃপেন্দ্র-চন্দ্র—সবাইকেই দেখিলাম। ছায়াচিত্রটিতে নিম্নলিখিত অংশে অভিনেতাগণ বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রায় বাহাদুর ও ওস্তাদজীর ভূমিকায়—স্বয়ং চিত্তরঞ্জন—টীকা নিষ্প্রয়োজন; ভূদেব ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, এবং কাঙ্গালীচরণের অংশে অক্ষয়কুমার... ও গৃহ-চিকিৎসকের অংশে জ্যোতিশ্চন্দ্র সর্ব্বকারের চিত্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিতে ছবিতে হাসি আছে, কথায় হাসির ফোয়ারা আছে, রঙ্গে চঙে—সর্ব্বত্রই হাসি আছে। "বরের বাজারের" অবস্থা "(Marriage market") বাঙ্গালীর অজানিত নাই, সকলেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন, চিত্তরঞ্জন তাহারই একটা ফোটোগ্রাফ বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়াছেন। বাঙ্গালী চিত্র দেখিয়া হাসে বটে কিন্তু হাসির নীচে তাহার অশ্রু সাগর উথলিয়া উঠে।

যখন থিয়েটারের নৈপুণ্যে চিত্রগ্রহণও অতি সুন্দর হইয়াছে।

ফুলশর

মহাভারতে পড়িয়াছি কামাতুরা উর্ব্বশী অর্জ্জুনের প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিল, পর-রমণী জ্ঞানে অর্জ্জুন তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া উর্ব্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাটিকে নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত ফুলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি ত্রিঙ্কিনাটক রচনা করিয়াছেন, তার নাম "ফুলশর।" মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে আমরা সেখানির অভিনয় দেখিয়াছি। নাটকের নাম "ফুলশর" কিরূপে হইল তাহা হয়ত অনেকেই বুঝিবেন না। কেবল তিনিই বুঝিবেন, জীবনে যৌবনে কোনদিন যাহাকে এই ফুলশরের আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছে, কেবল তিনিই বুঝিবেন, সে কোমল আঘাতেও অতি বড় বীরকে আহত করিতে পারে, একমাত্র সেই শর, যাহার দেহে পুষ্প-গঠিত, যাহার অগ্র পুষ্পময়। স্বর্গের দেবরাজ সভার প্রধানা নর্ত্তকী উর্ব্বশী এই ফুলশর বিদ্ধ হইয়াছিল, নহে কামনা বাসনা তাহার ছিল না, সে চাহিয়াছিল মর্ত্ত্যের মানুষ অর্জ্জুনকে তাহার প্রেম দিতে; স্বর্গের বিধি বিধানে অনন্ত যৌবন; অসীম রূপ-রাশি মর্ত্ত্যের মানুষকে উপহার দিবে! রতিপতি মদনের ফুলশরের এমনই প্রভাব যে, অর্জ্জুন মর্ত্ত্যের কালা মানব, দেবতার ও মানবের যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভেদ—এ-সব জ্ঞান ছিল না, সে শরবিদ্ধ হরিণীর মত ছুটিয়া গিয়াছিল অর্জ্জুনকে লভিতে! আর মাটির গড়া মানুষ—অর্জ্জুন, ত্রিলোকজয়ী বীর পার্থ উর্ব্বশীর প্রেম-লালসা মাতৃত্বের অমৃতরস সিঞ্চনে ফিরাইয়া দিয়া তাহার মানবত্ব রক্ষা করিয়াছিল। বিফলকাম উর্ব্বশী তাহাকে অভিশাপ দেয়।—এই হইল নাটিকাটির মূল আখ্যান।

ঘটনার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনও সুন্দর। গন্ধর্ব্বরাজ উর্ব্বশীর প্রেম যাচ্ঞা করিতেন, উর্ব্বশী তাহার ফিরিয়া চাহিত না, হতাশ প্রেমিক গন্ধর্ব্বরাজের চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—গন্ধর্ব্বরাজ সখা 'রঙ্গন' গন্ধর্ব্বরাজের কাছে গান-বাজনা শিখিতে আসিয়াছিল, গন্ধর্ব্বরাজের শিক্ষা দিবার মত অবসর ছিল, নর্ত্তকীর প্রেমে যখন অবশেষে হতাশ হইয়া রঙ্গন তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। স্বর্গরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী দেব বিলাসিনী হইলেও যে উর্ব্বশী মনুষ্য প্রেম ভিক্ষুক হইয়াছিল, ইহাতে দেবতামণ্ডলীর কেহই সুখী ছিলেন না, এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রসেনও নয়—কেবলমাত্র দেবরাজেই ছিলেন অবিচলিত। আর একজন লোক ছিলেন যিনি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না—তিনি যক্ষরাজ। তাঁহার মুখেই শুনিতে পাই। টক্‌টকে কর্সা,—তা'র ওপোর আপনার বাপের প্রবল প্রতাপ,—আপনাদের বিষনাশী নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র হাতের ভেতর,—ইচ্ছে ক'রেই নির্ব্বিঘ্নে সে সব গড়াগড়ি ক'রে ছুঁড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছারখার ক'রে দিতে পারেন! আবার তা'র ওপোর আপনারা সভ্য—ভব্য—পরিষ্কার ঝরিষ্কার,—অমরাবতীর খাসা চাল্-চোলে একেবারে দোরোস্তো! আর ঐ মাটীর মানুষ অর্জ্জুনের হ'ল—কাল্‌টে রং,—থাকে অসভ্য মানুষের দেশে! ওদের দেবতাদের মত অস্ত্রশস্ত্রও নেই,—আর ওরা ইচ্ছে ক'রেই হুদ্‌দম্ সুধাপাত্রেও চুমুক দিতে পারেনা! ওদের সঙ্গে কি দেবতাদের তুলনা হয়? দেবতারা সভ্য—দেবরাজের জাত,—সুতরাং দেবতাদের কোন দোষ দোষই নয়! ওঁদের বেলা সব লীলা! আর কাল্‌টে তামাটে রংএর মানুষ যদি একটু এঁকে বেঁকেও চ'লে—অমনি মারো তাদের মাথায় বাজ—দাও তাদের সকা নিকেশ ক'রে!

মিনার্ভা থিয়েটার নাটকখানির অভিনয়ে বহুল অর্থব্যয় করিয়া যে সাজসজ্জা, দৃশ্যপট দেখাইয়াছেন, বাস্তবিকই তাহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। স্বর্গে মন্দাকিনীতীরে, দেবরাজ সভায় যে বিচিত্র আলোকচ্ছটা বিলাসিত দেখা গেল, তাহাও অতুলনীয়। আর পলকে পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপটের চাকচিক্যে মর্ম্মক বিমোহিত হইবেন-ই।

এইবার বলিব, অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে, নয়নমনবিমোহন করিতে যে সকল নিপুণ শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি তাঁহাদের কথা। ফুলশর-বিদ্ধ, হতজ্ঞান অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশীর কথা! রঙ্গমঞ্চের উর্ব্বশী চারুশীলা এই অংশের অভিনয়ে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি না দেখিবেন তাঁহাকে বোঝান শক্ত। নৃত্যে গীতে হাবে ভাবে ছলা-কলায় সে তাহার প্রিয়তম অর্জ্জুনকে তাহার প্রেম নিবেদন করিতে, প্রেমিকার সেই আপনহারা ভাব, সেই অব্যক্ত অস্ফুট ভাষা, ছলা-ছলোচ্ছলের সেই বিলোল প্রেক্ষন দেখিয়াছি, কেবলমাত্র চারুশীলাতেই সম্ভব।

তারপর রঙ্গনের ভূমিকায় কার্ত্তিকচন্দ্রের অভিনয়। এমন প্রাণ ভরিয়া হাসাইতে, নিছক হাসি রাশিতে এমন করিয়া ভুলাইতে আর ত আর কাহাকেও দেখি না। দুঃখ দৈন্য অভাব ক্লান্তি ভুলিয়া আনন্দাগারে গিয়া যদি এমন হাসিতে পারা যায়, তবেই বলি সার্থক—রস! সার্থক হাসি! আজ কার্ত্তিকচন্দ্রকে যন্ত্রযন্ত্রকে সেই রস

যারা ছড়াইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। হে রসসাগর কার্ত্তিকচন্দ্র! নিরানন্দ জাতির প্রাণে এমন আনন্দ বিতরণ কর, ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ! গন্ধর্ব্বরাজ চরিত্রে, কালীচরণবাবু, যক্ষরাজের অংশে চিন্তামনির অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্জ্জুন ভূমিকায় কুঞ্জবাবু ও সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

নাটকখানির আগা-গোড়া সুললিত সঙ্গীতে, নয়নরঞ্জক নৃত্যে সুন্দর শোভন হইয়াছে।

আমোদ-কর ও থিয়েটার।

সম্পাদক মহাশয়,—দৈনিক হিন্দুস্থানে "ঘরের ভাকাত" আপনি পড়িয়াছেন কি? বাঙ্গালী থিয়েটার আমোদ-ব্যবসায়ীরা সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছেন, কোন্ অপরাধে আপনি অবগত আছেন কি? বাঙ্গালী হইয়া তাঁহারা বাঁচিতে চাহিয়াছেন, বাঁচিবার একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এই তাঁহাদের অপরাধ। বাঙ্গালী আমোদ ব্যবসায়ীর বাঁচার স্পর্দ্ধা, সংবাদ ব্যবসায়ীর চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হিন্দুস্থান সম্পাদক মহাশয়ের মতে থিয়েটারগুলি আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, একথা আমি মানি এবং আরও মানি এই প্রতিষ্ঠান পরিচালকগণের অন্নাভাবে জীবনহানি ঘটিলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিও বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালী থিয়েটারে গ্যালারী ও পিটের মূল্য "অথথাক্রপে" বর্দ্ধিত হইয়াছে, থিয়েটারওয়ালারা খোদার উপর খোদকারী করিয়া জিনিষ বনাইয়াছেন, হিন্দুস্থান-সম্পাদকের ইহাই অভিযোগ। গবর্ণমেণ্ট গ্যালারীতে কোন কর বসান নাই, এবং পিটে যাহা বসাইয়াছেন, তাহার উপরেও স্বেচ্ছাকৃত জিনিষ বসাইয়া থিয়েটারওয়ালারা লুণ্ঠনবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তৎসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমি স্বয়ং এবিষয় কিছু কিছু জানি, আপনার মারফতে দেশবাসীর তাহা গোচর করিতেছি। গ্যালারী ৫০ স্থানে ৬০ হইয়াছে এবং ১৵০ না হইয়া পিটের মূল্য ১।০ হইয়াছে —থিয়েটারওয়ালারা রাহাজানি করিতেছেন। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীগণ বলেন, তাঁহারা আনন্দ-ভবনের খরচ চালাইতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন; নূতন টেক্সের নিয়মেও তাঁহাদের কতকগুলি অপূর্ব্ব-কৃত খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে, পুরাতন দ্বারে তাহার সন্ধান হইত না বলিয়াই তাঁহারা এ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি বলেন, এতদিন করেন নাই কেন? যেমন গবর্ণমেণ্টের টেক্স বসিল সেই সঙ্গেই অমনি তাঁহারা?...সম্পাদক মহাশয়, এ কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এতদিন এ কর বসান নাই কেন? পয়সার দরকার না হইলে, অভাবে স্বভাব নষ্টের ভয় না থাকিলে কে আর স্বেচ্ছায় লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে চাহে? সম্পাদক মহাশয়, বাজারে চালের দর অসম্ভব বর্দ্ধিত হইলে আলু পটলের দর কমে কি? সমানই যা থাকে কি? জীবিকানির্ব্বাহের উপকরণ মহার্ঘ হইলে আফিসের বাবুদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কি দোষের? এবং সে বর্দ্ধিত হার বেতন যোগাইতে যদি কোন আফিসওয়ালাকে তাহার কারবারের জিনিষপত্রের দাম বাড়াইতে হয়—সে কি পাপ? কাগজের, কালীর মূল্য বৃদ্ধিতে, সম্পাদকের সহ সম্পাদক কম্পোজিটার প্রেসম্যানের বেতন বৃদ্ধিতে এক পয়সার কাগজ দুই পয়সায় বিক্রয় করিতে হইলে—মহাপাপ হয় কি? সম্ভবতঃ আপনার বিচারে ইহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না! তবে থিয়েটারওয়ালারা সাজ সরঞ্জামে যার শিল্পী অভিনেতার পারিশ্রমিক অতি উচ্চহারে যোগাইতে হইলে যদি একটু আধটু সনাতন আইনের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করেন, সেইটাই বা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে কিরূপে? তবে যদি এ হয়,—'যে যারে দেখ্‌তে নারি, তার বুকে চিঁড়ে কুটে খাই—তবে কথাই নাই; বাঙ্গালী থিয়েটারওয়ালা বলিয়াই বাঙ্গালী সম্পাদকের কাছে যদি অপরাধী—তবে অধিক নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদক মহাশয় আপনি খবর জানেন কি, এই টেক্সের সঙ্গেই বাঙ্গালী থিয়েটারওয়ালাকে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিতে একটি Chartered Acctt পুষিতে হইতেছে। এতদিন এবালাই ছিল না, আনন্দ ব্যবসায়ীগণ যাহা পাইতেন তাহাতে কষ্টে-সৃষ্টে সর্ব্বব্যয় সঙ্কুলানই করিয়া আসিতেছিলেন, নূতন আইনের বলে যে সমস্ত বিস্ফোটক কুটিল তাহার খরচ জোগাইবার জন্য এই যে বৎসামান্য পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে, তজ্জন্য অমন করিয়া গায়ের জ্বালা জানাইয়া দেশ সেবাপ্রীতি জানানো সঙ্গত কি? দেশের অন্নাভাবগ্রস্থ কেরাণী শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া ট্রাম কোম্পানী, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী তাহাদের ভাড়ার হার বাড়াইয়াছে, কাগজ লিখিবার সময় চোর ডাকাত বলাটা কি শোভন মনুষ্যধর্ম্ম-সঙ্গত?

থিয়েটারওয়ালা সাধ্যমত ক্ষতি সহ্য করিয়াও সেই সনাতন কালের প্রবেশমূল্যের কোন পরিবর্ত্তনই এতদিন করেন নাই, একান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাদের এমন একটু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, তাহাও হইত কি-না সন্দেহ যদি না গবর্ণমেণ্টের টেক্সের চাপে তাঁহাদের নিজেদের আবশ্যকীয় ব্যয় ছাঁড়া আরও কিছু না বাড়িত। তুচ্ছ দেশলাই কাটিটি হইতে ভাত কাপড় সব জিনিষই দশবিশগুণ মূল্য বাড়িয়াছে, সেই মূল্য দিয়াও আনন্দব্যবসায়ীগণ এ পর্য্যন্ত দেশবাসীকে আনন্দ বিতরণ

করিতেছিলেন, বিদ্যুৎ বাতী পাখার খরচ বাড়িয়াছে, কাপড়ের মূল্য বাড়িয়াছে, শ্রমিকের 'রোজ' বাড়িয়াছে, সহিস কোচম্যানের মাহিনা বাড়িয়াছে, ঘোড়ার খাই খরচ বাড়িয়াছে, কোন্‌টা বাদে নাই—বলুন।

হিন্দুস্থান সম্পাদকের মতে অ-বাঙ্গালী আনন্দ-ব্যবসায়ীগণ এরূপে রাহাজানি করেন নাই! ধন্যবাদ সম্পাদক মহাশয় আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি জীবন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল দুঃখ সেই কথাটা বলেন নাই যে অ-বাঙ্গালী থিয়েটার ওয়ালারা কতদিন গ্যালারীর দর্শককে অর্দ্ধমূল্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছিল?

আর একজনকে দেখিলাম, বায়স্কোপে। ।৹ আ আনার কিছুমাত্র প্রভেদ ঘটে নাই! থিয়েটার ও বায়স্কোপের পার্থক্যটা মনে করাইয়া দিয়া আপনার আত্মসম্মানে ঘা দিবার ইচ্ছা আমার নাই, কাজেই নিরস্ত হইলাম।

আরো একটা কথা, সম্পাদক মহাশয়, আপনার যদি বাঙ্গালী আনন্দ প্রতিষ্ঠানে পদার্পণের ইচ্ছা বা সুবিধা থাকে, আপনি দেখিয়া আসিতে পারেন, থিয়েটারওলাদের স্বেচ্ছা স্থাপিত "জিজিয়া" সত্ত্বেও বাঙ্গালী দর্শকের অভাব গ্যালারী ও পিটে হয় নাই। উপরের আসনগুলিতে কিছু কিছু হইয়াছে বটে! দেশসেবাব্রতচারী সম্পাদক মহাশয়ের ভ্রূকুটি গর্জ্জন সত্ত্বেও "জাতীয় প্রতিষ্ঠান" গুলির মুক্তি যে দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! নিরানন্দ জীবনে কয়েক ঘণ্টার আনন্দ ক্রয় করিতে, আনন্দ দাতৃগণের জীবিকানির্ব্বাহার্থ দুই চারি আনা পয়সা অধিক দিতে কোন দর্শকই পশ্চাদপদ নহেন। এই যেমন, দক্ষন না, সংবাদ পত্র, সাপ্তাহিক পত্র ও অনেকই আছে, তবুও আপনার কাগজের এত প্রচলন কেন? সাধারণে বাসন্তীর এত আদর কেন? তদুত্তর আপনিও জানেন, আপনার পাঠক-পাঠিকারাও জানেন আর আমার মত নিরেট লোকেও জানে। ইতি শ্রী—

দেশ-বিদেশ

জগতের শ্রেষ্ঠ মানব ভারতের হৃদয়-দেবতা মহাত্মা গান্ধী ভারতেরই কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। আজ তাঁহার কারাদণ্ডের ২১৭ দিন মাত্র অতিবাহিত হইতেছে। হয় দীর্ঘ ছয় বৎসর—আরও কত দিন—কত দিন!

* * * *

গত বুধবার সপ্তম গান্ধী পূজাই গিয়াছে।

* * * *

বাসন্তীর পাঠকপাঠিকা অবগত আছেন সালেমের ডাক্তার ভাক্তারাজু নাইডু সরকারের প্রাচ্য আইনের ২য় ইনকমট্যাক্স দিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সরকার পক্ষ হইতে কর আদায়ের জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। নোটিশের উত্তরে নাইডু মহাশয় জানাইয়াছেন মহাত্মা গান্ধীর মত লোককে অপর কোন সরকার কত সম্মান করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে যে সরকার কারাগারে রাখিতে পারেন তাহাকে ট্যাক্স তিনি দিতে পারিবেন না, ইহাতে তাঁহার উপর যে কোনরূপ ব্যবস্থা হউক তিনি বরণ করিতে প্রস্তুত।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তুর্ক গ্রীক্ ব্যাপারে গ্রীকদিগের প্রতি পক্ষপাত করিতেছেন এই অজুহাতে কাউন্সিল অব ষ্টেটের সভ্য মিঃ ফুলশ্রী পদত্যাগ করিয়াছেন।

* * * *

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সিংহলে গিয়াছেন। তিনি অহিংসনীতি জগৎ, সত্যাগ্রহ, ইত্যাদি বিষয়ে তথায় বক্তৃতা করিবেন।

* * *

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট হইয়াছে।

জুবাটে ট্রাম্ব বন্ধের আলোচনা চলিতেছে। মিউনিসিপ্যাল ট্রাম্ব বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। ট্রাম্ব অনেকেই দেয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটি এখনও মাল ক্রোকের আদেশ দেয় নাই।

আনোয়ার পাশা মৃত কি জীবিত তাহা লইয়া এখনো নানা গুজব রটিতেছে। বীরদের মরণ বাঁচন তাহাও গুজবের সামিল হইল।

গয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস মণ্ডপের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। ভিত্তি স্থাপনার পূর্ব্বে হাজি মুহম্মদ হলেমও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বক্তৃতা করেন।

বিলাতে পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনে এ পর্য্যন্ত ২৮ জন মহিলা দাঁড়াইয়াছে পরে আরও দাঁড়াইবেন আশা আছে।

উত্তর বঙ্গের বন্যার জন্য আরও অর্থচাই, আরও বস্ত্র আরও খাদ্য চাই।

গুজরাট বিদ্যা পীঠের প্রিন্সিপাল গিরওয়ানীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মহাত্মার সহকর্ম্মী মিঃ কজলজী তাঁহার সম্পত্তির কতকাংশ অনাথাশ্রম, জাতীয় বিদ্যালয়, ও পাঠাগারের জন্য দান করিয়াছেন। মহাত্মাজীর নামে পাঠাগার স্থাপন হইয়াছে। এই পাঠাগারের গৃহ প্রস্তুত করিতে খরচ হইয়াছে লক্ষের পর পাঁচ

ভূপালের নবাববাহাদুর ওয়াইদুল্লা খাঁ প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য ৪ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

গত বুধবার কলিকাতায় প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চ মিনার্ভা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। নূতন নাট্য শকুন্তলার রিহার্সেল চলিতেছিল এই সময়ে আগুন লাগে। তখন বেলা প্রায় ১১টা। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। শুনিতেছি রঙ্গমঞ্চ ইন্সিওর করাও ছিল না।

বিসর্জন অন্তে—ফিরতি মুখে

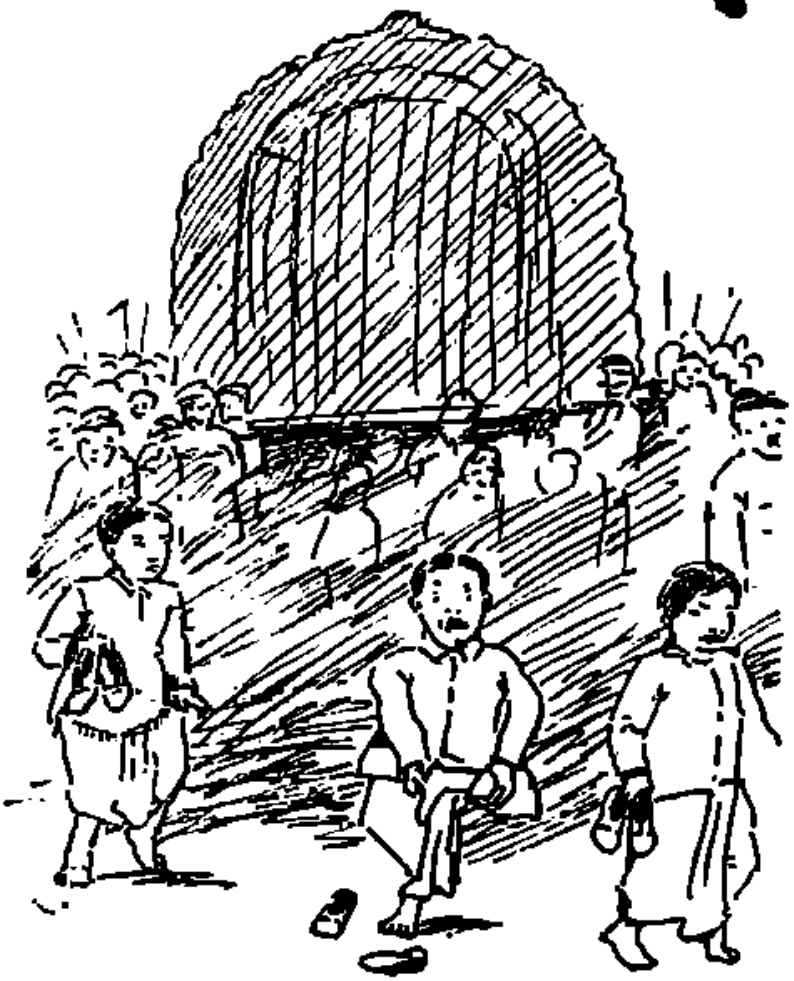

দেওয়ালীর বাজী খেলা চলতি

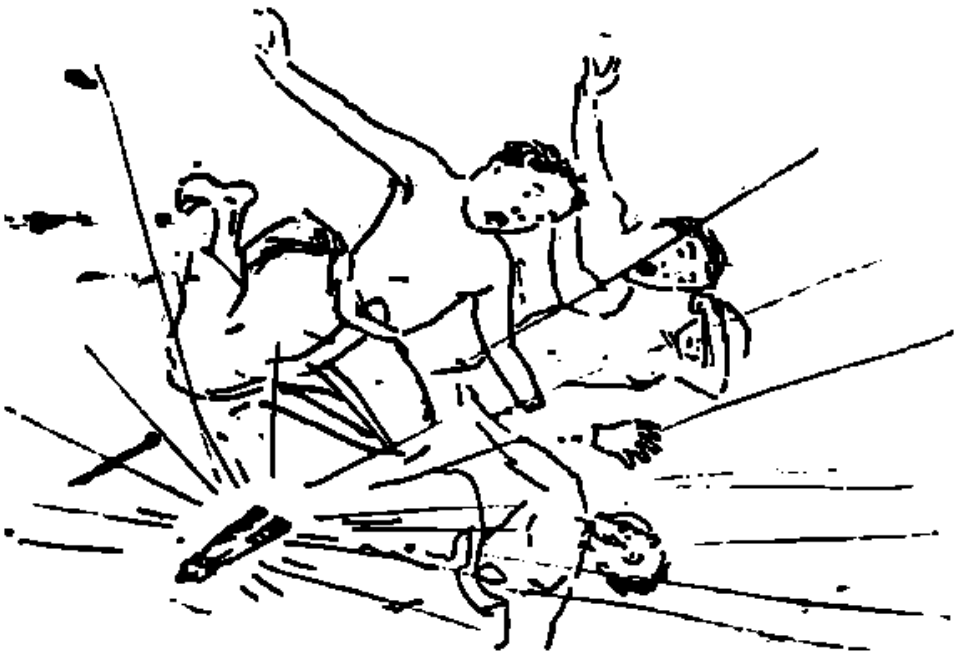

মদন-বিলাস।

Lakshmibilas Press.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ১১ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩২৯, ইং ২৮শে অক্টোবর [১৪শ সংখ্যা

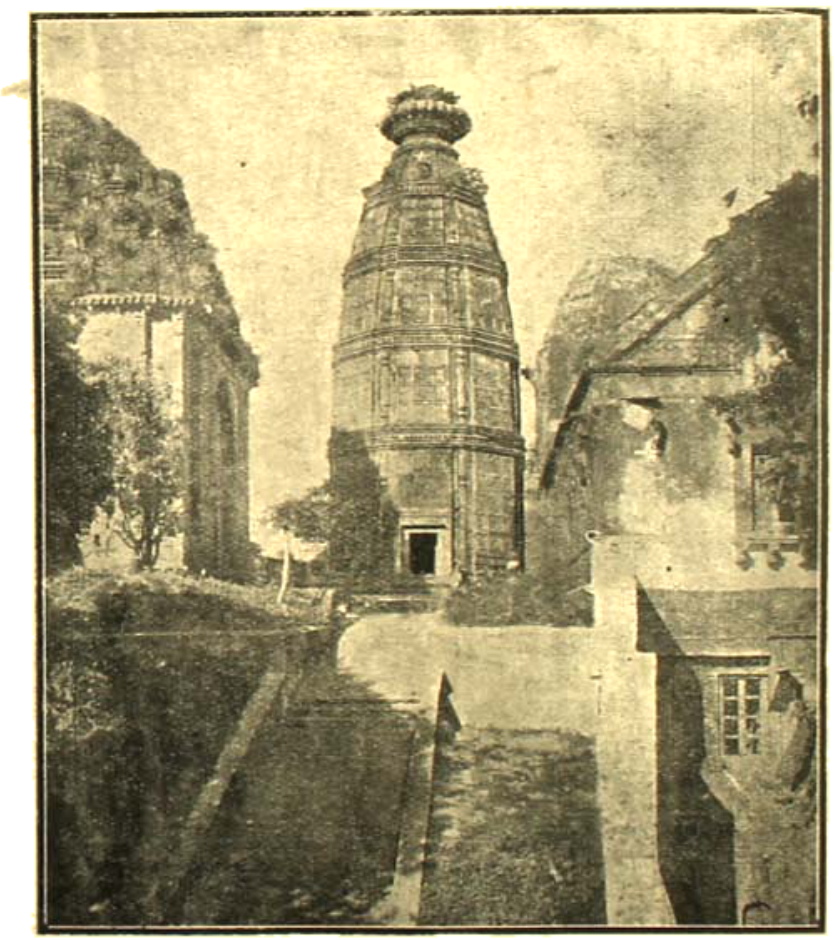

মদনমোহন-মন্দির
শ্রীধাম বৃন্দাবন।

তুর্ক যোদ্ধৃবর্গ।

১। নৌবল বে—এ্যাড্রোনা চাক্তের প্রধান মন্ত্রী।

২। ইসমাইল পাশা—কেমালের বাম সেনাপতি।

৩। ফেভী পাশা—তুর্ক সেনাপতি।

৪। প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা কেমাল পাশা—যোদ্ধা ও রাজনীতিক

৫। ইস্মেত পাশা বিদেশ-মন্ত্রী।

৬। ফেভে বে—এ্যাড্রোনা চাক্তের অর্থসচিব ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী।

৭। মুস্তাফা কেমাল ও রাফেৎ পাশা—গ্রীসের সাইভ্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া গ্রীক্ সৈন্যের গতিবিধি পরীক্ষা করিতেছেন।

৮। এ্যাড্রোনার যুদ্ধ-ভবনে যুদ্ধযাত্রা-প্রবণে কেমালের নেতৃবৃন্দ।

৯। মুস্তাফা কেমাল পাশার এ্যাড্রোনা হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা।

অভাগা দেশের দুঃখ দুর্ভাগ্যের অন্ত নাই। দেশের যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই দুর্ভাগ্যের করালদার নগ্ন বীভৎস মূর্ত্তি। স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, উত্তেজনা দেশ হইতে যেন চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মৃত পরিত্যক্ত এক মহা শ্মশানের মধ্যে—এ যেন প্রেতের তাণ্ডব নর্ত্তন চলিয়াছে। বিরাট প্রাচীন দেশ এই ভারত, জ্ঞান বিজ্ঞানের লীলাভূমি এই ভারত—অতীতের সহস্র কীর্ত্তি চিহ্ন বিমণ্ডিত এই ভারত—অনেক সুখ নিলয়, নদ নদী গিরিবন প্রান্তর শোভিত এই বিশ্বের সুখ রাজ্য ভারত—রাক্ষসীও তাহার প্রচণ্ড ক্ষুধা মিটাইবার জন্য একেবারে ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে না। রস ইহার বড় বেশী, বড় মাদু বড় রসাল এ, তাই ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া আদ্য গ্রহণ করিতে করিতে রাক্ষসী ইহাকে কবলিত করিতেছে। সোণার ভারত আজ যেন অভিশাপগ্রস্থ এক অভিশপ্ত রাজ্য—এ রাজ্য হইতে সুখ শান্তি সব অন্তর্হিত। আছে শুধু ভারত ব্যাপিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, ব্যাধি পীড়া, নৈসর্গিক অনৈসর্গিক, অত্যাচার উপদ্রব ব্যথিত একটা মৌন হাহাকার। কত দিন—কতকাল—কতযুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া ভারতলক্ষ্মীর এই বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ও ব্যথিত ক্লিষ্ট হৃদয়ের মৌন বেদনা ভরা হাহাকার আর চলিতে থাকিবে কে বলিতে পারে?

* * * *

ভারত আধ্যাত্মিকতার দেশ। এ দেশের অধিবাসীরা কর্ম্ম ফল যত মানে, ইহকালই তাহাদের সর্ব্বস্ব নয়। ইহলোকের অন্তেও যে পর-লোক বলিয়া একটা রাজ্য আছে সেই রাজ্যের চিন্তায়ই ইহার অধিবাসীরা অস্থির—তাহারা ইহলোকের সহস্র জীবনের ভোগ সহিয়াও পরলোকের জন্য রসদ সঞ্চয় করিয়া লয়। ইহলোকে যে ভোগ সুখের আস্বাদন আজ পাইল না পরলোকে সে কি তৃপ্তি ও আনন্দ যে সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইবে তাহা বোঝা দুষ্কর। আধ্যাত্ম বাদের নামে আজ অবসাদ ও জড়ত্ব জাতির জীবনের পরতে পরতে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর কর্ম্ম হইতেছে আজ নিষ্ক্রিয়—কর্ম্ম হইতেছে তাহার অনুশোচনা ও গ্লানি বেদনা ভোগ, অভিশপ্ত আত্মার যেমন কোন স্থানেই কোন রাজ্যেই শান্তি মিলে না ভারতের আত্মাও যেন আজ তেমনি অস্থির অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। জীবন থাকিতে জীবনের গতির আনন্দ তাহার নাই,—মুক্তির শক্তি তাহার নাই—দুর্ভাগা সন্তানদের হাহাকার অস্থিরতা ও অশান্তির ভার বক্ষে লইয়া ভারতমাতা আজ ভুলুণ্ঠিতা মরিতেছে।

* * * *

জগতে কর্ম্মের ফল আছে নিশ্চয়ই। ফল লাভের আকাঙ্খা করিয়াই কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া যায়। কর্ম্মের ফল রূপে লোক সাধারণতঃ চাহে সুখ শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য তৃপ্তি। কর্ম্মের ফল কেহ অশান্তি ও অনশন চাহে না। মানুষ তাহা চাহিতে পারে না তা সে যতই নিস্পৃহ নির্ব্বিকার হউক না কেন! ভারতের অধিবাসীদিগের যদি কোন কর্ম্ম থাকে তবে তাহার ফল স্বরূপে তাহারা আজ অশান্তি, অনশন ও সহস্র প্রকার দুর্ভোগই সহিতেছে। তাই দেশকে জাগাইতে হইলে দেশবাসীর মনে আজ অশান্তি ও সুখের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে আজ দেশের কর্ম্মপন্থা ও কর্ম্মধারার একটা পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। বিপথচালিত বিফল জীবন ও কর্ম্মে দেশবাসী আর তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছে না—তাহারা এখন জীবনের নূতন ধারা—ও নূতন পন্থা চাহে। আজ নিখিল ভারত ব্যগ্র হইয়া জীবনের, কর্ম্মের এই নূতন ধারা ও পন্থারই অনুসন্ধান করিতেছে।

* * * *

মানুষ চিরকাল অভ্যাসের দাস। কু-অভ্যাসে একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে—তাহাতে সহস্র জ্বালা যন্ত্রণা সহিলেও মানুষ বুঝিয়াও সহিয়াও সহজে সে অভ্যাসের মোহ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ভারতের এত দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা আজ হইয়াছে তাহার অভ্যস্ত অভ্যাসের মোহেই। দেশবাসী ভুগিবে, সহিবে, মরিবে তবুও তাহারা তাহা-

দের আচরিত অভ্যাস হইতে তিল মাত্র বিচ্যুত হইতে চাহিবে না। যে ত্যাগে, যে ধর্ম্মে, যে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় মানুষ মানুষ নামের যোগ্য হয়, যাহাতে মানুষ বরেণ্য হয় ভারতবাসী তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। মানুষের জীবনের চরম ও পরম পরিণতি যে মৃত্যু তিলে তিলে ভারতবাসী তাহাতে আত্ম সমর্পন করিতেছে বটে—কিন্তু গৌরবের মরণ যে মরণকে বরণ করিয়া মানুষ গৌরবান্বিত হয় তেমন মরণ ভারতবাসী মোটেই বরণ করিতে পারিতেছে না। মরণ বরণের ধারার মধ্যেই জাতির ও দেশের গৌরব মূর্ত্ত হইয়া উঠে, প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তি তাহার সুপ্রতিষ্ঠ হয়। ভারত মরণের সে গৌরব বিস্মৃত হইয়া পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গাদি হীন শ্রেণীর জীবের মত নিত্যই ভুগিতেছে, সহিতেছে, মরিতেছে—তবু সে মানুষের মত উন্মুক্ত বক্ষে মরণকে আলিঙ্গন দিতে পারিতেছে না বলিয়াই তাহার এই দুর্দ্দশা।

আমাদের সোনার ভারতের অধিবাসীদিগকে সব সময় বিব্রত অতিষ্ঠ করিয়া রাখিবার কারণের অন্ত নাই। উপদ্রব লাগিয়াই আছে—সহস্র অনিচ্ছায় ও দেশবাসীকে সেই উপদ্রবের হাড়িকাঠে গলা আগাইয়া দিতেই হইবে। উপদ্রব অসংখ্য; অধিকাংশই এগুলির আমাদের গা-সওয়া নিত্য সঙ্গী হইয়া গিয়াছে। তবে যে গুলি অত্যন্ত অদ্ভুত, আকস্মিক তাহাই চোখে বাজে এবং মনে লাগে। এই শ্রেণীর উপদ্রব লইয়াই মাঝে মাঝে দেশে সাড়া পড়িয়া যায়। তেমনি ধরণের একটি মহা উপদ্রব লইয়াই বর্ত্তমানে দেশে বিশেষ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উত্তর বঙ্গের ভীষণ বন্যাই এই উপদ্রব। লক্ষ লক্ষ গৃহ-হীন, সম্পত্তিহীন, অশন বসন হীন, দেশবাসীর জন্য আজ দেশবাসীর চিত্ত ব্যাকুল বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে। জনে জনে, দলে দলে লোক বন্যা পীড়িতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে তাহাদের সেবা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। সুদূর প্রান্তের বন্যা ক্লিষ্ট অধিবাসীদিগের জন্য নিখিল ভারত আজ ব্যথিত। দেশের ভাই বোনেদের জন্য দেশবাসীর চিত্তে এত করুণা এমন সহানুভূতি জাগিয়াছে, তাহাদের চিত্ত এমন কাঁদিয়া উঠিয়াছে সহস্র দুঃখের মধ্যেও জাতীয়তার এ উন্মেষ চিত্তকে আশা দেয় সবল করে। মনে হয়—জাতির ও দেশের এখনও যেন প্রাণ আছে।

* * * *

মহানগরীর রাজপথে, দূর পল্লীতে যেখানেই যাইবে সেইখানেই দেখা যায় স্বেচ্ছাসেবকের দল দিন রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, হৃদয়ভেদী দুঃখের ছবি সঙ্গীতে ধরিয়া দেশবাসীর করুণার উদ্রেক করিয়া বন্যা পীড়িতদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। সেবাকার্য্যে ভাইবোনেদের দুঃখ অপনোদনে এমন বিচিত্র আগ্রহ ও চেষ্টা পূর্ব্বে দেশে আর বোধ হয় বড় বেশী দেখা যায় নাই। সেবাকার্য্যে যে শুধু পুরুষেরাই যোগ দিয়াছে তাহা নহে, নারীরা—মায়েরা বোনেরাও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। দেশের পতিতা নারী যে অভাগিনীদের দুর্ভাগ্যে আমরা ব্যথিত সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দেবতা জাগিলে যাহাদের রাতি, দেবতা ঘুমালে যাহাদের দিন তাহারা আজ প্রকাশ্য দিবালোকে গল-বস্ত্র হইয়া রাজপথে, লোকের দ্বারে দ্বারে দেশের ভাইবোনেদের জন্য সাহায্য যাচ্ঞা করিয়া ফিরিতেছে। বিলাসে যাহারা চির-অভ্যস্ত, সম্রান্ত বংশীয় কোন-ঢেলা অবস্থায় পড়িয়া যাহারা সমাজের সহিত সম্পর্ক বিচ্যুত তাহাদিগকে সমাজের কার্য্যে প্রায় এভাবে আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়া,—সমাজ সেবায় তাহাদের এ আগ্রহ দেখিয়া আশা হয়—এ জাতির জাগরণ আসিয়াছে।

* * * *

পাপকে ঘৃণা করিও—পাপীকে নহে। কথাটি জগতের অনেক খ্যাতনামা মহাজন বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও জানি ইহাই সত্য এবং সার কথা। কিন্তু আমাদের দেশের তথা কথিত একদল ধর্ম্মপ্রাণ খ্যাতি সম্পন্ন বা গোঁড়ামী পূরিত লোকের ধারণা পাপীকে ঘৃণা করিলেই তাহাদের দেখিয়া নাক সিঁটকাইলেই যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দেওয়া হয়। জানিনা ইহা শুধু গোঁড়ামীর মূল লোক দেখান আস্ফালন না সত্যি মনের কথা—কিন্তু এই বাহ্য আস্ফালন অনেক সময় চোখে ও মনে বড় বাজে। বর্ত্তমান জনবিধ্বংসী ভীষণ বন্যায় প্রপীড়িত জনসঙ্ঘের সাহায্যের জন্য দেশের নানা সম্প্রদায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। পতিতা নারীরা এই বন্যা সম্পর্কে যে কার্য্য করিতেছে তাহা বাস্তবিকই দেশের পক্ষে নূতন—

অপূর্ব। তাহাদের শ্রম, ত্যাগ, নারীর সহজাত মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা পূর্ণ আবেদন ও করুণ সঙ্গীত শুনিলে পাষণ্ডেরও হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। ইহারা এ পর্য্যন্ত বহু অর্থ উঠাইয়াছে এবং তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। আমরা শুনিলাম ইহাদিগের এই চেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতার কোন প্রাচ্য বৃদ্ধ পত্রিকা সম্পাদক ও অধ্যাপক পুলিশ কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ডাক্তার রায়ের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, সহরে পাপের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতে দেওয়া হইবে না। ডাক্তার রায় কার্য্যের গুরুত্ব ও মহত্ব বিবেচনায় তাহাদিগকে ওরূপ হাস্যকর অভিযান হইতে বিরত হইতে বলেন। হায়রে নীতি দুর্নীতি জ্ঞান - হায়রে পাপ তত্ত্ব! এই গেল এক শ্রেণীর লোকের নমুনা।

• • • •

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান মন্দিরে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে,—লোকের মুখে শুধু বন্যার কথা—শুধু অর্থ, শুধু সাহায্য। আচার্য্য রায় বাংলার কোন খ্যাতনামা সম্পাদকের সহিত আলাপ করিতেছেন। এমন সময় করুণ নারী কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রুত হইল। রায় মহাশয় একটু উন্মনা হইয়া বলিলেন 'না এদের সময় অসময় জ্ঞান নাই—বাবু আপনি একটু দাঁড়িয়া যান, এখনি উহারা আসিয়া পড়িল।' প্রবীন সম্পাদক মহাশয় বলিলেন তা আসিলই বা উহারা তো ভাল কাজই করিতেছে—পতিতা নারীরা দলে দলে একে একে আসিয়া আচার্য্য দেবকে গলবস্ত্রে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। দেবী আচার্য্য দেবের সম্মুখে সংগৃহীত অর্থ রাখিল। আচার্য্যের চক্ষু অশ্রুসিক্ত—ভাবে ভরপুর। কেহ ইহাতে দুর্নীতি দেখিতেছে কেহ দেখিতেছে ইহাতে জাতীয় গতি ও মুক্তি! যার মন যেমন!

• • • •

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সেবাকার্য্যে অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থ না হইলে সেবাকার্য্য চলিতে পারে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টায় এই দরিদ্র দেশ হইতেও দেশের দুর্দ্দিনে যে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। জনে জনের সামান্য দান হইতেই—প্রাণের আগ্রহ হইতেই এ সব সেবাকার্য্য সফলতা লাভ করে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজে অর্থ

সংগ্রহের ভার লইয়া, কার্য্য স্থলের সব ব্যবস্থা করিতে বিখ্যাত অসহযোগী কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষবাবু ঘটনাস্থলের সমস্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিয়া কুশিলবের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। এই বিরাট কার্য্যভার স্কন্ধে লইয়া কর্ম্মী সুভাষচন্দ্র যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

• • • •

শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু জানাইয়াছেন যেরূপ ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ধ্বংসলীলা যেরূপ বিরাট তাহাতে সপ্তাহে অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা হইলে তবে সেবাকার্য্য চলিতে পারে। দেশের ভাইবোনেদের জীবনও অনেকটা নিরাপদ করা যাইতে পারে। কর্ম্মী সুভাষচন্দ্রের বিবরণ হইতেই কতকটা অনুমান করা যাইতে পারিবে দেশের উপর দিয়া কত বড় দুর্ভাগ্য বন্যার আকারে চলিয়া গিয়াছে।

• • • •

দুর্ভাগ্য যত বড় এবং ভীষণ, দেশবাসী তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে ইহা নিবারণের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছে দেশের সরকার পক্ষ হইতে তেমন চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। তার প্রাণ ধন দূর হইতে ঘটনাস্থল ও ধ্বংসলীলা দেখিয়াই পুনরায় শৈল শিখরে মন্ত্রিত্ব ঠাণ্ডা করিতেছেন। ঘটনাস্থলে যথা বিহিত সরকারী ডাক্তার মড়ক নিবারণের জন্য গিয়াছেন,—কৃষি মন্ত্রী বীজ ধানের ব্যবস্থা করিতেছেন, সমবায় ঋণ দান সমিতি হইতে বন্যা-পীড়িতদিগের অর্থ ঋণ দিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। সবই নিয়ম মাফিক হইতেছে কিন্তু রোগ যেমন সাংঘাতিক এবং রোগীর যেমন এখন তখন অবস্থা চিকিৎসার তেমন ত্বরিৎ অবস্থা দেখা যায় না এই যা দুঃখ। যাহা হউক এ বিপদকালে কাহারও দোষগুণ দেখাইবার সময় নহে—সমবেত চেষ্টায় এ বিপদের অবসান হইলেই মঙ্গল। যাহা হইয়াছে তাহার উপায় নাই, কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক ফলগুলির প্রকোপ যেমন বেশী যাহাতে না হয় তাহাই এখন করিতে হইবে।

• • • •

বিলাতের মন্ত্রী সভার সাময়িক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক সময় ছিল যখন ভারতের লোকে বিলাতের রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের উপর নিজেদের দেশের ভাগ্য অনেকটা স্থির করিয়া লইত। কিন্তু এ পরীক্ষায় ফলে দেখা গিয়াছে, এ আশা মিছে আশা। যে দলই যাউক আর যে দলই আসুক—ভারতের ভাগ্য যথা পূর্ব্বে তথা পরেও রহিবে। র‍্যামজেমেন প্রধান মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে ভারতকে যে আশা দিয়াছিলেন মন্ত্রীত্ব পাইবার পর সেরূপ কার্য্য করেন নাই। বলি মহোদয় ও সু-মানুষই ছিলেন কিন্তু তিনিও ভারতের জন্য কিছুই' করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যাহা হয় নাই এখন সেরূপ কোন অদ্ভুত কার্য্যে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ আশা করা বৃথা। ইহা অন্ধের আশা, মিথ্যা আশা। জাতিকে দেশকে আপন ক্ষমতায় নিজেদের স্বর্গ কৃতিত্ব দেখাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। নতুবা মন্ত্রী সমাজের পরিবর্ত্তনে বা বড় লাট ছোট লাটের পরিবর্ত্তনে ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবে না—তাহা হইবার আশাও নাই।

• • • •

শুনিতেছি বড় লাট লর্ড রেডিং বাহাদুর ও শীঘ্রই ভারত হইতে বিদায় লইবেন। লর্ড রেডিং যাইবেন অপর বড় লাট আসিবেন। তিনি যিনিই কেন হউন না—তবে তাঁহার বা ও তাঁহারের মত লোক আসিলে ভারতবাসী দু'দিন একটু চাঞ্চল্য দেখাইবে, আবার যে সেই। মহাত্মার বিশ্বাস ছিল জালিনওয়ালা বাগের ব্যাপারে খিলাফতের ব্যাপারে ভারতবাসীকে অন্ততঃ মানুষ হইবার শিক্ষাটুকু দিয়াছে কিন্তু ভারতের তাহা হয় নাই। কোন দিন হইবে কি না কে জানে। তাই মনে হয় 'এক রাজা যাবে অন্য রাজা হবে—ভারতের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।' ইহাদিগের দোষ গুণ, শাসক দিগের দোষ গুণ আলোচনা শাসিতদিগের পক্ষে যেন শুধু একটা অনধিকার চর্চ্চা।

• • • •

কিসকাল কমিশন বসিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী ইহাতে নিজেদের স্বদেশী দ্রব্যের প্রসারোপযোগী নীতি অনেকটা অনুসৃত হইতে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। কিন্তু তেমন হওয়া কি সম্ভব। যে বণিক জাতি নিজেদের দেশের কাপড় ভারতের বাজারে চালাইবার জন্য ভারতের তাঁতীদের, বস্ত্র ব্যবসায়ীদের হাত কাটিয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই তাহারা কি করিয়া তাহাদের বাণিজ্য অধিকার ত্যাগ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। নিজের দেশের ন্যাকাশায়ার মাকেটার মারিয়া তাহা কি সম্ভব! মনে হয় আজ এই সমস্ত কমিশনের

বিফলতা দেখিয়া মহাত্মা গান্ধীর বাণী—যদি আমরা পর হস্ত ও পরদেশ নির্ম্মিত দ্রব্য স্পর্শ না করিতাম—যদি আমরা সে বিষয়ে অন্ততঃ অ সহযোগী হইতে পারিতাম তবে আজ এ দুর্দ্দশা লাঞ্ছনার প্রকোপ এমন তীব্রভাবে আর আমাদের উপর চলিতে পারিত না।

বাঙ্গালীর মেয়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মাদ্রাজের বক্তৃতায় বলিয়াছেন মহাত্মা একটি মেউলিয়া জাতিকেই পুনরায় জীবনের পথে লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আজ দেয়ালীর এই শুভ দিনে আপনারা দেখুন কোথায় ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, কোথায় ক্ষুধিতের হাহাকার ধ্বনি মরমভেদ করিয়া প্রাণে প্রবেশ করিতেছে। দাসত্ব

শৃঙ্খল কোথায় হস্ত পদে কঠোর ভাবে বাজিতেছে, আধ্যাত্মিক আদর্শ কোথায় মলিন হইয়া গিয়াছে, হতভাগ্য দেশবাসী কোথায় মহাত্মার সত্য পথ দেখিতে পাইতেছে না। আজ এই ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, ক্ষুধাতুর-ক্ষুধা মেটান পথ-ভ্রষ্ট দেশবাসীকে মহাত্মার সারগর্ভবাণী শুনান। দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য যে মহাপুরুষ নিজ স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া দীর্ঘ কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইয়াছেন আজ তাঁহার কথা প্রাণে প্রাণে স্মরণ করুন।'

• • •

বোম্বায়ের বক্তৃতায় পণ্ডিত মালব্যজী বলিয়াছেন 'অসহযোগ নীতিকে আমলাতন্ত্র বিদ্রোহ সূচক বলিয়া ভুল

বুঝিয়াছেন। অসহযোগ নীতির প্রভাব সমগ্র ভারতের দিকে চাহিয়া বুঝিতে হইবে। দৈব শক্তি সম্পন্ন মহাত্মার প্রভাবই এই অসহযোগ অহিংস নীতিকে সফল করিয়াছে। আজ গুরুদ্বারাগের আকালীগণ যে আত্ম সংযমের সহিত নির্ম্মম অত্যাচার সহিতেছে ইহা মহাত্মার অহিংস নীতিরই ফল।

• • •

জগৎকবি রবীন্দ্রনাথ রুশিয়ার দুঃখে তথাকার দুর্দ্দিনে ব্যথিত হইয়া তাহাতে সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন। আর আজ কবির 'সোণার বাংলার' সন্তানগণ বন্যায় সর্ব্বস্বহারা হইয়া মরিতেছে—কিন্তু কোথায় বাংলার বরেণ্য কবি! জগৎকবি এখন বিশ্বভারতীর চিন্তায় মগ্নমন!

• • •

চট্টলের বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত পুনরায় তাঁহার ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ায় যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন তিনি দুর্ব্বল বটে, তবে দেশের প্রতি বিশ্বাস হারান নহেন। যতীন্দ্র মোহনের এই সরল উক্তিতে আমরা খুসী—দুর্ব্বলতাকে যাহারা বিশ্বাসের আবরণে ঢাকিতে চান তাহাদিগের দৌর্ব্বল্য আরও বেশী প্রকাশ হইয়া পড়ে।

• • • •

মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন অক্লান্তকর্ম্মী—যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তির ধার ইনি ধারেন না। নিজের সামান্য বল বল লইয়া আপন মনে দেশের বিপন্ন জনের সাহায্যার্থে বুক মুক্ত করিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বহুভাবে বহুবার নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত হইয়াছেন ইনি রাজশক্তিদ্বারা, কিন্তু বৃদ্ধ অচল অটল হিমাদ্রির সম নিজকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এমন অক্লান্ত কার্য্য, নিরভিমান কর্ম্মী দেশে যত হয় ততই ভাল।

বিদেশে যুবরাজ। স্বদেশে

ভারত পরিচয়। পরিচয় বার্ত্তা।

আষাঢ়—"I was only able to skim the surface of all India."

ব্যবস্থার তারতম্য

গত মহাযুদ্ধের সময় দেখিতে দেখিতে যখন সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যই অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়া গেল তখন সকলেই মনে করিয়াছিল যুদ্ধটা কোন রকমে কাটিয়া গেলেই দ্রব্যাদির মূল্য পুনরায় কমিবে। যুদ্ধ কালে রেলের ভাড়া অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল, চিনি লবন, চাউল, ডাল প্রভৃতি সকল জিনিসের মূল্যই বাড়িয়া গেল। জগদ্ব্যাপী মহাপ্রলয়—কতদেশের কত অগণিত নর নারী অশেষ কষ্ট সহিয়াও স্বাধীনতা লাভের জন্য সমরানলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, আর ভারত কি অন্নবস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতাটুকুও সহিতে পারিবে না? এই মনে করিয়া ভারত সে দুঃখ তেমন দুঃখ হিসাবে লয় নাই। না খাইয়াও সে জগতের যুদ্ধে রাজাকে সাধ্যমত সৈন্য দিয়া ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছে। নিজে উদ্যোগী হইয়া নানা দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছে। আশা ছিল জগতের এই স্বাধীনতা সমরে নিজ কৃতিত্ব দেখাইয়া সেও ইহার অংশীরূপে বড় মুখে দাঁড়াইতে পারিবে।

ভারতবাসীর সে আশা পূর্ণ হয় নাই, তাই আজ ভারত ক্ষুব্ধ বাথিত। তাহার পর জগতের ভীষণ সমরের অবসান হইল, বিজয়ী সকল জাতিই নিজ নিজ লাভালাভের সন্ধানে ব্যাপৃত রহিলেন। ভারতের লাভের কথা ভাবিয়া ভারতবাসীর মুখপানে চাহিয়া তাহার পক্ষ হইয়া কেহ কিছু বলিলেন কিনা বুঝিতে পারা গেল না। নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য জগতের সকল জাতিই যখন ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত তখন ভারত তাহার অধিকারের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে গিয়া সহস্রভাবে নির্য্যাতিত হইতে লাগিল। পদে পদে অনুভব করিতে লাগিল তাহার অধিকার বোধ আছে বটে—কিন্তু অধিকার বলিয়া কোন জিনিস নাই। অধিকার লাভের চেষ্টা এবং সে জন্য আন্দোলনও তাহার পক্ষে অন্যায় দুরাশা—এবং দণ্ড যোগ্য। আর্থিক দুরবস্থায় এবং অভাবে ভারত জর্জ্জরিত। অভাবে সে আজ মরিতে বসিয়াছে বলিয়াই তাহার অধিকার-বোধ আজ এমন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের সময় মহাযুদ্ধের অছিলায় ভারতের উপর যে সমস্ত নূতন নূতন করভার চাপান হইয়াছিল যুদ্ধের পর ভারতের আকাশ হইতে তাহার একটিও তো অপনোদিত হইলই না বরং হেলি সাহেবের অনুগ্রহে তাহা বর্দ্ধিতই হইয়াছে। দেশবাসী খাইতে পায় না—একটা বিরাট জাতি পথ অভাবে মরিতে বসিয়াছে—তাহার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, অথচ সেই মরণাপন্ন জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে অসংখ্য সৈন্য পোষণ করা হইতেছে। দেশের লোক মরিয়াও দেশের অর্থব্যয়ে এই সৈনিকদলের পালন কেন করিবে তাহার হেতু তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। এই সৈন্যদল পালনের জন্য এবার ভারতের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার তহবিলে চৌত্রিশ কোটি মুদ্রা ঘাটতি পড়িয়াছে। আর সব জিনিস ঘাটতি হইলেও চলিতে পারে কিন্তু শাসন শৃঙ্খলার তহবিল ঘাটতি থাকিবার উপায় নাই—তাই এই ঘাটতি পূরণের জন্য দেশবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উপরই অসম্ভব রকম কর বসান হইয়াছে। চিনি, দেশলাই, কেরোসিনতৈল, পোষ্টকার্ড খাম সকল দ্রব্যের মূল্যই প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। রেল ষ্টীমারের ভাড়া যুদ্ধের সময় যাহা ছিল তাহার উপরেও আবার বাড়িয়াছে। অসংখ্য দেশবাসীর উপর এই করভারের পীড়ন শুধু প্রধানতঃ এক সৈন্যদলের পোষণের জন্যই হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা আমাদের দেশের মত শোচনীয় নহে। জগতের অর্থশালী জাতিদিগের মধ্যে ইংরেজ বোধ হয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। ভারতের নূতন বাজেট তৈরী করিবার সময় সার যেমন হেলী যেমন ভারতবাসীর নয়নে অশ্রু বন্যা বহাইয়া তাহাদিগের জীবন বহন আরও দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছেন, ইংলণ্ডের অর্থ সচিব সার রবার্ট হোর্ন সেই সময়েই দেশের ও জাতির কর ভার নানা-ভাবে কমাইয়া দিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এক সৈন্যদলের ব্যয় ভার কমাইয়াই তিনি দেশের প্রায় ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ড রক্ষার সক্ষম হইয়াছেন। মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন কালে সার রবার্ট হোর্ণ এই কার্য্যের জন্য আত্ম প্রসাদ ও তৃপ্তি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বাধীন প্রথম শ্রেণীর শক্তি ইংলণ্ড তাহার সৈন্য ভার এভাবে কমাইতে পারিলেন আর, পরাধীন ভারতের মর্য্যাদা বড় বেশী তাই প্রতি বৎসরই ইহার সৈন্য পোষণের ব্যয় ভার বাড়িতেছে।

ইংলণ্ডের ন্যায় অর্থশালী দেশের কর ভার যখন কমিতেছে আমাদের বিপন্ন দেশের কর-ভার তখন নিত্যই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে।

ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফের মাশুল কমিয়াছে, পোষ্টকার্ড, খামের মূল্য কমিয়াছে। ইংলণ্ডে ইনকাম ট্যাক্স কমিয়াছে চা, কফির উপর ট্যাক্স কমিয়াছে। ইংলণ্ডের অর্থসচিব সার রবার্ট হোর্ন বলিয়াছেন কর বৃদ্ধিতে জাতীয় উদ্যম হ্রাস পায়—তাই সাড়ে সাত হাজার লক্ষ পাউণ্ড আয়ের কম থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের অর্থ সচিব দেশবাসীর উপর হইতে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মুদ্রার কর-ভার হ্রাস করিয়া দিলেন। আর আমাদের দেশের অবস্থা—,আমাদের মৃত জাতির উদ্যমেরই বা মূল্য কি, তাই ধরিতে বসিয়াও তাহাকে কর জোগাইতেই হইবে।

সার এরিক গেডিসের ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির প্রস্তাবেও সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু ভারতের কর্ত্তারা তাহাতে কর্ণপাত করা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নাই। বিপুল ধনে ধনী ইংলণ্ডের অর্থসচিব করিলেন ইংলণ্ডের সাধারণের কর ভারহ্রাস, আর দরিদ্র ভারত-বাসীর ভাগ্যে হইল কর ভারের বৃদ্ধি।

দেশবাসীর কথা, দেশবাসীর ব্যথা বুঝিয়া যদি দেশের গবর্ণমেণ্ট চলিত তবে কখনই এ ব্যবস্থা হইতে পারিত না। যে দেশের গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থাতেই প্রজা সাধারণের নিকট দায়ী নহে সে দেশে এরূপ ব্যাপার আশ্চর্য্যের নহে।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী :—কিন্তু মনে রেখ পড়বে, তা দেখে নিও, হ্যাঁ!

দেশ বিদেশ

লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা শেষ। লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। ২৮জন আসামীর মধ্যে ২৫জন খালাস পাইয়াছে, অবশিষ্ট ৩জনের দুই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

• • • •

জঙ্গলে পরিত্যক্ত শিশু। বেলেঘাটার এক জঙ্গলময় রাস্তার নর্দ্দমার নিকট সদ্যজাত বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে দেখাযায়। শিশুটির বয়স সাত আট দিনের বেশী হইবে না। শিশুটিকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

• • • •

স্বামী বিশ্বানন্দের কারাদণ্ড। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে ১০৮ ধারা অনুযায়ী স্বামী বিশ্বানন্দকে এক বৎসর চারি মাসের রিগোরাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

• • • •

আকালী গ্রেপ্তার সংখ্যা। আজ পর্য্যন্ত মোটের উপর ২৫৫৮ জন আকালীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

• • • •

লর্ড সিংহ পীড়িত। বঙ্গগৌরব লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিলাতে সাংঘাতিক রূপে পীড়িত। তিনি একটি শুশ্রূষাগারে রহিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সম্প্রতি তিনি একটু সুস্থ আছেন।

• • • •

রক্ষীর মৃত্যু। **ফাঁসি।**—কয়েক জন যুবক কলিকাতা হইতে ঘি-চক্কাযানে ৭ দিনে কাশী পঁহুছিয়াছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে থামিতে থামিতে গিয়াছিল।

• • • •

লয়েড জর্জ্জের ভবিষ্যদ্বাণী।—ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—নূতন নির্ব্বাচনের পর মিষ্টার বোনার ল' দেখিতে পাইবেন, তাঁহার দলে লোক কম হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি চেম্বারলেন ও লর্ড বার্কেনহেডের দলের সাহচর্য্য ব্যতীত মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ হইবেন না। কোয়ালিশন লিবারেল সদস্যগণ বলিয়াছেন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বোনার ল'র অধিনে কাজ করিতে রাজী হইবেন না। অবশ্য মিষ্টার চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী হইলে কোনও আপত্তি নাই।

• • • •

অপঘাত মৃত্যু। বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের আক্রমণে ৩৩৬৮টি লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। শার্দ্দুলাহত-১৪৫৪, চিতাব্যাঘ্র ৬৮০, নেকড়ে ৫৪৬, ভাল্লুক ৭১, হস্তী ৭০, Hyenas ১০, ১৯,৩২৬ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে,সর্পদংশনে। ১৯২০ সালের রিপোর্টে সর্পাহতের সংখ্যা ৫০,০৪৩। গত বৎসরে ২০৯৭২ বন্য পশু বিনষ্ট করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ৫১০৯টি ব্যাঘ্র, ৬৩২৮ চিতা, ২৭৭১ ভাল্লুক এবং ২০৯ নেকড়ে। বিভিন্ন প্রদেশের শিকারী-অধিবাসীদিগের ২১০৬৫৲ মূল্য পশু-বধের জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে। সর্পদষ্টের সংখ্যা যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে, তাহার কারণ গবর্ণমেণ্টের সর্পশিকারীদেরও পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

• • • •

ধনীশ্রেষ্ঠ। আমেরিকার বিখ্যাত মটরকার নির্ম্মাতা মিঃ হেনরী ফোর্ড বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী—তাঁর দৈনিক আয় একলক্ষ পাউণ্ড বা পনর লক্ষ টাকা। এক বৎসরে তাঁহার আয় হিসাব ২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার ব্যবসায় মূলধন ৫০ কোটী পাউণ্ড হইবে।

• • • •

চন্দননগরে এক কাপালিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, নরবলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করাই উদ্দেশ্য। পুলিস তাড়া করায়, কাপালিক প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

• • • •

ই, বি, রেলওয়ে নানা ভাবে তাহার আয় বাড়াইতেছে। এখন হইতে দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিলে প্রতি বার্থে ।০ অতিরিক্ত দিতে হইবে।

• • • •

গতবৎসরে কলিকাতা সহরে ৫৭০টি অগ্নি কাণ্ড হইয়াছিল তাহাতে মোট ক্ষতি হইয়াছে ৩৩০৬৫৫৲

• • • •

গোয়ালন্দের রেল ষ্টেশন ও ষ্টীমার ষ্টেশন এখন হইতে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হইল।

• • • •

ব্যাঙ্কমিলান কোম্পানীর কলিকাতার ম্যানেজার বন্যা পীড়িতের সাহায্যার্থ ৫০০৲ দান করিয়াছেন।

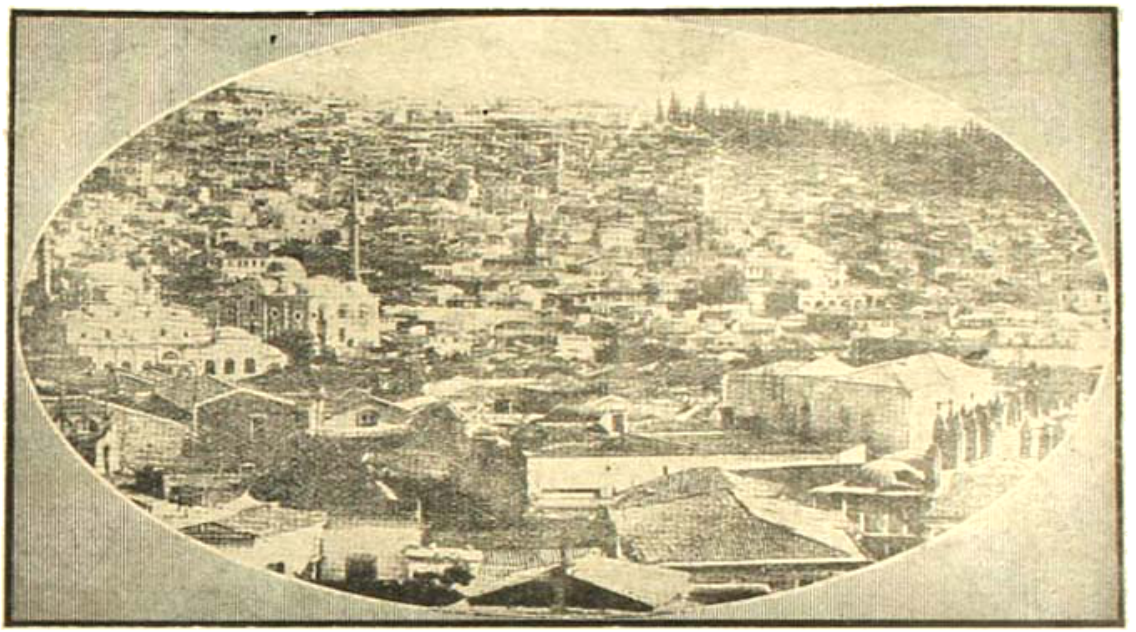

সার্পার আভ্যন্তরিক দৃশ্য।

গ্রীক সৈন্যদলের একাংশ।

বিনয়ন্তা থিয়েটার—অগ্নিমুখে।

আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে।

শিশুর স্মৃতি

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বিল মিল বলিলেন "হাঁ, কি বলছিলেন আপনি? পৃথিবীর আব্‌হাওয়ার দোষ? কিন্তু এই আব্‌হাওয়ার মধ্যেই ত বিশু, মোহম্মদ, যুক্ত সক্কর, নানক, কবীর বাস করে গেছেন। এখনও অনেকে বাস কর্‌ছেন, তাঁদের দু চারজন ত আমাদেরও বিশেষ পরিচিত। কই তাঁদের উচ্চতাকে ত পৃথিবীর আব্‌হাওয়া টলাতে পারে না।"

নীরব রহিলাম। তিনি বলিলেন "কি জানেন? সামাজিক নীচতা ব্যাধিই মানুষের মাথাটি খেয়েছে। এত ছোট, এত নীচ এই দেশটার মন,—যে খালি নীচ-চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। বাল্য বিবাহ দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে, সবাই বুঝ্‌ছেন। কিন্তু কাযে সবাই ঠিক। কন্যার সঙ্গে জরোগের বিয়ে, আয়ু দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির বিয়ে,—এ চাই-ই চাই! সাত সকালেই চাই। বর বছরের মেয়ে বিধবা হয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে থাকে, তাতে কথা নেই। কিন্তু কুমারীদের বিয়ের বয়স বাড়াও, বয়েই অমি সবাই 'ছুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান!' বিধবা ব্রহ্মচারিণী সমাজের স্বর্গের সিঁড়ি,—তা তিনি ব্রহ্মচর্য্যের মানে কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন,—যত মূর্খতা, যত অজ্ঞান, যত পাপই তাঁর কাঁধে চেপে থাক্ না। তার সংস্কারের কিছু এরকার নেই। তিনি সমাজকে সটান স্বর্গের পথে নিয়ে যাবেন-ই। আর, এই কুমারী ব্রহ্মচারিণী? ওঁরা যত শিক্ষিতাই হোন, যত সৎকার্য্যই করুন,—ওঁরা সমাজকে নরকে পাঠিয়েছেন, বলে কথা! কি উচ্চ অন্তঃকরণ, আর কি উচ্চতম বিচার বুদ্ধি! গল্প কর্‌তে ইচ্ছে হয়—এ সব মানুষের পায়ে! মিসেস্ অমতি, আপনার কি কর্‌তে ইচ্ছে হয় বলুন দেখি।"

নম্রস্বরে বলিলাম "ও বাবা! আমার ইচ্ছে? যা সব চ্যাটালো চ্যাটালো কথার বাহার! ও শুন্‌লেই আমার চোয়াল ধরে যায়, জিভ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। ইচ্ছে আমার কর্‌ব কি?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা আর একটু বয়স হলে তখন বিবাহ সুরু করুন, আর একটু কচি বয়েস থেকে যা হতে সুরু করে' দিন, তাহলেই—শুধু চোয়াল-ধরা নয়, আপাদ মস্তকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ইহ জন্মের মত ধরাশায়ী হয়ে থাক্‌বে। ঐ যে ফুলশয্যে বিছিয়ে শয়ন, ও শয়ন ছেড়ে আর মাথাটি তুল্‌তে হবে না।" তিনি উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আমি নিরুত্তর রহিলাম।

ঘরের মধ্যে বারকতক চক্র দিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। হাসিমুখে বলিলেন "রাগ কর্‌ছেন না কি মিসিস্ অমতি?"

হাসিলাম। বলিলাম "কর্‌বারই কথা? বিবাহিত-দের সম্বন্ধে এ সব সার্টিফিকেট্, মোটেই খুসী হয়ে ওঠ্‌বার মত নয়।"

"ঐ যাঃ। জলটা আবার চেপে এল। আচ্ছা, করুন আপনি রাগ। আমি বুক ঠুকে নির্ভয়ে গোটাকতক অপ্রিয় সত্য বলে যাই তাহলে। ওগো কি, মা-লক্ষী, তোমাদের আতাকুঁড় ব্যাটানো মুড়ো-ঝ্যাংরা-গাছটা এনে রাখো তো তোমার মার হাতের কাছে।"

কাতর স্বরে বলিলাম "বেশুন, মর্‌ছি একে নিজের জ্বালায়!—প্রাণটি হাতে করে পড়ে আছি—আর অত ঠাট্টা কর্‌বেন না। একেই ত slough ধরে যা নির্ঘৃণ টান দিয়েছেন……"

"বন্ধু, slough ধরে ঐ নির্ঘৃণ টান,—ওটি যেথায় জন্মেই ভগবান আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধির অভিব্যক্তির সমস্ত স্তরের slough আমি পরিষ্কার করে চল্‌বই।" অন্ধ মমতা-দৌর্ব্বল্য-বশে ভুল করে জীবনে একটিবার slough ছেড়ে দিয়েছিলুম, তাতে জোর-হাতুড়ীর ঘা যা খেয়েছি বুকে,—ইহজীবনে তোল-বার নয়! এর পর আবার ভুল? না বন্ধু, মার্জ্জনা করুন। আপনাদের জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর বলে যাকে চিন্‌ব, তাকে যেন আমি গ্রহণ কর্‌তে না ভুলি।"

তিনি চেয়ারে বসিলেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজ মনেই বলিলেন "নিয়তি বল্‌তে একটা

অদম্য শক্তি আছেই, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলে, পুরুষকারকে অস্বীকার করা,—সম্পূর্ণ ভ্রম। মিসেস্ অগস্তি, কেন ডায়েরী লিখেছি জান্‌তে চান? আমার জীবন-কাহিনীটা শুনবেন আজ?"

"বলুন-না। যত বাধিত হব তা হলে। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে, জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সময় আপনার কম বলে—"

"হাঁ, সময় আমার বড্ড কম। এত কম যে, নিজেকে স্মরণ করবার অবকাশটাও পাইনে। নিজে মরে গেছি কি বেঁচে আছি, অনেক সময় সেটাও মনে থাকে না। অন্য কেউ মনে পড়িয়ে দিলে—তবে খেয়াল হয়!"

"হাঁ, কি বল্‌ছিলুম? নিজের জীবন-কাহিনীটা? ভাগলপুরে বাবা চাকরী করতেন, সেইখেনেই বাড়ী করেছিলেন। আমার এগার বছর বয়েসের সময় বাবা মারা যান। বাড়ীখানা বেচে আর বাবার লাইফ্ ইনসিওরের টাকা হাজার কতক জমা করে মা আমায় পাত্রস্থ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু উদ্যোগ পর্ব্বের মাঝখানেই হঠাৎ মা মারা গেলেন।

"মনটা বৈরাগ্যে ভরে গেল। কি যে সে সময় মনে করতুম, ঠিক মনে পড়ে না। তবে, মৃত্যু যখন চুলের মুটো ধরে সবাই খাড়া হয়ে আছে,—তখন বিয়ে-থা, ঘর-সংসার যে কোন কাযেরই নয়, এটুকু খুব জোর করেই মনে পড়ত। তাছাড়া আমাদের স্কুলের মিসনরী মেম-সাহেব যখন বিয়ে না করেও বুড়ো হতে পেরেছেন, তখন আমারি বা বিয়ে করবার কি দরকার—তার কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। হলুম-বা আমি হিন্দুঘরের, তা হলেও,—প্রাণটা আমার 'ঘরের প্রাণ' নয়,—'মানুষের প্রাণ' ত বটে!—

"আমার ভাই বোন কেউ ছিল না। মামার বাড়ীর আর বাপের বাড়ীর কে কোথায় থাকতেন, কোন খবর জানতুম না। বাবার হিন্দু বন্ধু আর ব্রাহ্ম বন্ধুরা পরামর্শ করে, আমার আত্মীয়দের সন্ধান করতে লাগলেন। আমি মিসনরী মেমের কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার জন্যে গচ্ছিত হলুম।

"বেশ থেকে এক দূর সম্পর্কের কাকা এসে আমার এবং আমার সেই টাকা গুলোর অভিভাবক হবার জন্যে খুব হকম্ হকম্ ছুড়ে দিলেন। যে পাদ্রিটির সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তাঁর অভিভাবক ভাই খবর পেয়েই ছুটে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন,—'টাকার অভিভাবক কাউকে হতে হবে না। তিনিই কৃপা করে সে ভার স্বীকার করবেন। তাঁর আবদার রক্ষা না হলে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

বাবার হিন্দু বন্ধুরা সমর-শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্ম বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আর মিশনরী মেম আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আমি আর আমার টাকার অভিভাবকত্ব নিয়ে, এই নীচাশয়দের নীচ কলহ কোলাহল দেখে আমার বৈরাগ্য-রঞ্জিন্ মনটা বেজায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই টাকা আনা পাইয়ের লোভ-লালসা বিকৃত সংসার-ধর্ম্ম,—এটার ওপর আর কিছুমাত্র আস্থা রইল না। মিশনরী মেমের দ্বারা প্রচার করলুম "আমি বিয়ে করব না।"

"বাবার হিন্দু বন্ধুরা, কাকা, এবং বয়ের ভাই উদ্যত উত্তেজিত হয়ে মেমকে অপমান করলেন। তাঁর নামে কদর্য্য কুৎসা রটনা করে রাশি রাশি বেনামী চিঠিপত্র ছাড়লেন। আমি ঘাড় গুঁজে যে উপদ্রব এতদিন সহ্য করছিলুম সে উপদ্রবের বিরুদ্ধে এবার ঘাড় তুলে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ালুম। গো ব্রাহ্মণ হত্যা করে, ভ্রূণ হত্যা করে, ব্যভিচার করে, চুরি ডাকাতি করে মানুষ যে শাস্তি লাভ করে, তার চাইতে ঢের শক্ত অপমান আমায় লাভ করতে হোল। তাঁরা আমায় গুঁড়ো করে ফেলবার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু ইংরেজের রাজত্ব, কাযেই উদ্যোগ কার্য্যটা আরম্ভেই ইতি হয়ে গেল। তাঁরা আমায় অভিশাপ দিতে দিতে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় তাঁদের আসা-যাওয়ার খরচ-টরচ গুলোর জন্যে হাহাকার করতে ভুললেন না। আমি দিয়ে দিলুম।

"ঝড় থামলে পড়াশোনায় মন দিলুম। মেমের কাছে যে কদিন ছিলুম, বেশ একটু শান্তি আর শৃঙ্খলায় ছিলুম। তারপর কলকাতায় পড়াশোনার জন্যে গেলুম। পয়সার জোর ছিল না, অবিবেচনার সঙ্গে খরচ করলে লেখাপড়াটা যে খরচের অভাবে অকালে মারা যাবে, পিতৃ বন্ধুরা সে কথাটা আমায় বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কাযেই তাঁদের পরামর্শ মত তাঁদের পরিচিত আত্মীয় বন্ধুদের আশ্রয়ে paying guest হয়ে থেকে লেখাপড়া শিখতে লাগলুম। কিন্তু দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা, অবজ্ঞা, ধিক্কার, ক্লেশ এত চলত আমার

ওপর, এবং গোঁড়া হিন্দু গিন্নিদের এত রকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় আমায় পরিপাক করতে হোত, বলবার নয়। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতুম, চোরের মত ভীত শঙ্কিত হয়ে থাকতুম। বলছি যে,—মহাপাতকীকেও এত শাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি, লেখাপড়া শেখবার জন্যে আমায় যত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

"মনের ক্লান্তি অবসাদে সময় সময় অধীরিত হয়ে পড়তুম। কিন্তু দুঃখের আঘাতটা বেশী করে খেয়ে, ক্রমে সাহসও বাড়ল। পূজার ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষ করে, পরিচিতদের মধ্যে বাসা বদল সুরু করলুম। paying guest, সুতরাং অনেকেই আগ্রহের-সঙ্গে স্থান দিতেন,—কিন্তু তারপর যথাপূর্বং—ঘটনাবলী সুরু হোত। পরের আশ্রয়ে বাস করে, এদেশের যে মেয়েকে লেখাপড়ার চর্চ্চা করতে হয়েছে, সে জানে,—এই অবস্থাটা কি তীব্র তিক্ত, কি উৎকট বিষাদময়! জ্ঞান চর্চ্চার অপরাধে, এদেশের মেয়েকে বড় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় বন্ধু,—বড় লাঞ্ছনা! জ্ঞানের এত অপমান, তপস্যার এমন নির্য্যাতন যে বর্ব্বরতার আঘাতে অন্তরাত্মা বিদ্রোহ-উন্মাদ হয়ে উঠতে চায়।

"যাক সে কথা। এক, এ পড়বার সময় বাধ্য হয়ে এক হিন্দু গৃহে আতিথ্য নিলুম। বাড়ীর বাবুগুলি শিক্ষিত এবং গোঁড়া সাহেব, আর গিন্নিগুলি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এবং গোঁড়া পাড়াগেঁয়ে। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে কোণ ঠাসা হয়ে এক পাশে পড়ে রইলুম।

"এই বাড়ীর একটি কচি মেয়ে, বছর দেড়েক তার বয়স, সে কিন্তু অত বিচার বুঝলে না। কেন জানিনে, অচিন্ত্যনীয় অনুপ্রহ ভরে,—হঠাৎ আমায় 'পেয়ে' বসল।

"মেয়েটির মা তখন আর একটি সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এ মেয়েটার দিকে চোখ কাণ সর্ব্বদা সজাগ রাখবার অবকাশ তাঁর বড় ছিল না। মেয়েটা যখনি ফাঁক পেত,—আমার পড়ার মাঝে এসে হুটোপাটি লাগিয়ে দিত। সে কি উপদ্রব! মিলেস্ অগতি, আপনি ছুঁচো শিশুদের পছন্দ করেন কি? আমি এদের ভালবাসি, বড্ড ভালবাসি। ছুঁচোমি করবার বুদ্ধি যে শিশুর আছে,—তাকে পেলে, আমিও তার সঙ্গে শিশু হয়ে পড়ি! এই মেয়েটাকে পেয়ে আমি যেন—কি রকম হয়ে গেলুম।

"বাড়ীর লোকেরা সকলেই হয়ে উঠল! আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার সংস্পর্শে গিয়ে ঐ মেয়েটার বুঝি শুদ্ধি যে আমার মতই লক্ষ্মীছাড়া হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ রইল না। বিশেষ তার মা যখন মেয়েটার লক্ষ্মীশ্রী রক্ষার চেষ্টায় কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল না, বরঞ্চ আমার হাতে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই রইল,—তখন বাড়ী শুদ্ধ মরদীর দল আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন,—মেয়েটা গোল্লায় গেল!

চিপ্‌টেন্ শুনতে শুনতে উত্যক্ত হয়ে উঠলুম। এক দিন কলেজ থেকে বাড়ী ঢুকছি, দেখলুম পাশের বাড়ীর আর একটি মেয়ে,—ঠিক তারই বয়সী, দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে আমার সেই মেয়েটা। আমায় দেখেই সে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ছোট ছোট দাঁতগুলি বেরকরে' হেসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মুখে বন্ধুটিও অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল। দুটোকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে চুমো খেলুম, তারা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল!

"বাড়ী ঢুকতেই বড় গিন্নী রুদ্রমূর্ত্তি ধরে চীৎকার করে উঠলেন 'গেল রাস্কা গেল মান!' আমি না কি তাদের জাত ধর্ম্ম রসাতলে দিতে বসেছি!

"পাশের বাড়ীর মেয়েটি যে সোণার বেণেদের মেয়ে তা জানতুম না। জানলে তাদের লক্ষ্মীয়ে আঘাত দিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করতুম না। হুকুম হোল—বেরোও বাড়ী থেকে।

"বেরুলুম। মেয়েটার ওপর খুব প্রহার চলছিল, রাস্তা থেকে তার কান্না শুনে চোখে জল এল। হায়রে অসহায় শিশু! এ জগতে বর্ব্বরতার অত্যাচার তোরাও ভোগ করবি? তোদের জন্যেও কি রসাতল কান্না বলতে একটা জিনিস এখানে জুটবে না?

"আস্তানা খুঁজে নিলুম। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলুম না। রাত্রে ঘুমতে পারতুম না। সকল হাসের মাঝে কেবল চমকে উঠতুম, মেয়েটা এই বুঝি আসে!—সমস্ত মন দুরন্ত ব্যাকুলতায় ভরে থাকত। জীবনে কোন সময় যদি কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হয়ে থাকি, তবে,—সেই একটা সময় মাত্র! স্নেহের আকর্ষণ যে এমন যন্ত্রণাবহ পাশ, তা আগে জানতুম না,—সেই প্রথম জানলুম।

"মানসিক ক্লেশের যাত্রা সাঙ্গ করতে পারলুম না। খুব

অসুখে পড়লুম। মাসখানিক ভুগে ভাল হয়ে উঠলুম। একদিন কষ্টে সৃষ্টে হেঁটে গিয়ে তাদের দুয়ারে দাঁড়ালুম। কিন্তু তাকে সেখানে দেখতে পেলুম না। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করলুম। হঠাৎ দেখি এক ডাক্তারের মোটর এসে দাঁড়াল। মেয়েটির বাবা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ডাক্তারের অভ্যর্থনা করলেন।

"দূর থেকেই নমস্কার করলুম। তিনি চমকে উঠে বললেন 'কোথায় ছিলে এতদিন? বাড়ীতে এস। মেয়েটার বড় অসুখ।"

কোন দ্বিধা করবার সময় পেলুম না। বাড়ীতে ঢুকলুম। কিন্তু হায়!—গিয়ে আর তাকে দেখতে পেলুম না। দেখলুম শুধু তার দারুণ যন্ত্রণা। উঃ, সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! উরুস্তম্ভ থেকে প্রচণ্ড শোষ জেগে মেরুদণ্ডের হেড়টা ভেতরে ভেতরে পচিয়ে ধসিয়ে ফেলেছে! শুনলুম রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা আর শুশ্রূষার যথেষ্ট অবহেলা হয়েছিল। প্রথম চিকিৎসার ভার চিকিৎসকের হাতে দেওয়া হয়েছিল, তিনি বিজ্ঞলোক। মেয়েদের প্রাণগুলো যে অক্ষয় অমর,—তাদের রোগের চিকিৎসা যে যথাসম্ভব তাচ্ছল্য সহকারে করাই উচিত, এটুকু তিনি খুব বুঝতেন। সুতরাং তেমনি ভাবেই চিকিৎসা করেছেন।

"ডাক্তার ব্লাক্ পরিষ্কার করতে লাগলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় সে নীল হয়ে গেল। চেঁচিয়ে কাঁদবার শক্তি তার ছিল না। ঠোঁট খুলিয়ে কোঁপাতে লাগল,—মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাকুল-কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে ক্যাল ক্যাল্ করে তাকাতে লাগল। উঃ, সে কি মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টি। মিসেস্ অগস্তি, সে চাহনীর কথা মনে হলে,—আজও আমার পাঁজরটা যেন গুঁড়ো হয়ে যায়!"

মিস মিত্রের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চোখ পরিষ্কার করিয়া ধরা-গলায় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "ডাক্তার চলে গেলেন। আমি অভিভূতের মত তার বিছানার পাশে বসে যন্ত্রণা দেখতে লাগলুম। সে কিছুক্ষণ ছটফট করে, আমার হাত খানা ধরে মুখের ওপর টেনে নিলে। আমার ছোট আঙুলটা মুখে পুরে চুক্ চুক্ করে চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। তার একটা অভ্যাস ছিল,—যখন তখন আমার এই আঙুলটা ধরে মুখে পুরত। রোজ রোজ কেটে সেইজন্যে সর্ব্বদা আঙুলটি পরিষ্কার করে রাখতুম।

"আমার আকস্মিক আবির্ভাব নিয়ে মেয়ে মহলে খুব একটা হট্টগোল হল। পুরুষরা ও কেউ কেউ তাতে যোগ দিলেন। কোন কথায় কর্ণপাত করলুম না। সে ঘুমিয়ে পড়তেই উঠে এলুম। দন্ত: রোগমুক্ত দেহ তখন দৌর্ব্বল্য ভারে টল্‌ছিল। অতি কষ্টে বাসায় ফিরলুম।

"কষ্ট অগ্রাহ্য করে পরদিন আবার গেলুম। সেদিন ডাক্তার আসেন নি। একজন ড্রেসার এসে ক্ষত পরিষ্কার করছিল। কিন্তু সে বড় অসাবধানে কাজ করছিল। চিমটের খোঁচায় ঘা-টা ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছিল, কিন্তু ব্লাক্ ধরতে পারছিল না। শিশু যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠছিল। বল্লুম "সরুন—আমি দেখাই।"

"পূর্ব্বদিন ডাক্তারের ব্লাক্ ধরার কৌশল দেখেছিলুম। সেটা মনে গাঁথা ছিল। তেমনি ভাবেই কাজ করলুম। এবার শিশু শান্ত হয়ে সহ্য করলে। ড্রেসার আশ্চর্য্য হয়ে জানতে চাইলে "আমি শিখলুম কোথা?" অকপটে সত্য উত্তর দিলাম।

"পরদিন থেকে সে নিজ-হস্তেই আমার হাতে চিমটে দিতে লাগল। গায়ের জোরের কাজ নয়, বুদ্ধি আর সতর্ক মনোযোগের কাজ মাত্র,—সুতরাং অক্লেশেই সেটা করতে লাগলুম। ডাক্তারও আমার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বিশেষ,—শিশুটি আমার হাতের কাজটার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে দেখে, ডাক্তার কাজটার ভার আমার ওপরই চাপালেন। কিন্তু আমি তখন অশিক্ষিত, সেজন্যে ড্রেসারকে রোজ এসে দেখতে বলুম।

"আমি যতক্ষণ থাকতুম—মেয়েটিকে শান্ত দেখতুম। তার সমস্ত খুঁৎ খুতুনি,—সমস্ত অশান্তি আমাকে দেখলেই বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই তার সেই খুঁৎ খুঁতুনি শুনতে পেতুম। সামনে গিয়ে বসতুম, অমনি সব ঠাণ্ডা! ক্যাল্ ক্যাল্ করে এমন আকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত, দেখলে মনে হোত—সে যেন কি অপূর্ব্ব বস্তুই দেখছে। আমায় দেখে যেন তার আশা মিটছে না! উঃ। হতভাগা মেয়ে! কি ভালই সে বেসেছিল আমায়!

"একদিন ঘা পরিষ্কার করবার সময় তাকে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখলুম,—যন্ত্রণায় তার চোখ আটকে যাবার

মত হোল। ক্লেসার চোখ এড়িয়ে খানিকটা ব্লাক্ বাদ রেখেই তাড়াতাড়ি ম্যাগেজ করলুম। মনে ভাবলুম, কাল ওটা পরিষ্কার করে দেব।

কিন্তু পরদিন সেটা খুঁজে পেলুম না। ঘায়ের অবস্থা দেখলুম—হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লেসারকে দেখালুম সে কারণ বুঝতে পারলে না। কিন্তু রোগীকে সেদিন একটু প্রফুল্ল দেখলুম। রোগের যন্ত্রণার সে কথা বলতে ভুলে গেছল, হাসতে ভুলে গেছল। সেদিন দেখলুম—একটু হাসলে। আনন্দে নিজের ত্রুটির কথা ভুলে গেলুম—ভাবলুম, যাকগে ব্লাক্, মেয়েতো ভাল হয়ে আসছে।

"সেদিন তাকে অনেকটা সুস্থ সবল বোধ হোল। নেভবার আগে দীপ যে একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জানতুম না।—হায়রে অনভিজ্ঞের মূর্খতা! মন আমার আনন্দ আর আত্মপ্রসাদে ভরে উঠ্‌ছিল, আর ভয় নেই! আর ভয় নেই! ভাল হয়ে এসেছে! উঃ, কি ঠকাই ঠকলুম —সে দিন!

সেদিন অনেকক্ষণ তার কাছে বসে খেলা দিলুম। যখন উঠে আসি,—হঠাৎ সে রাগের চোটে এমনি লাফ দিলে যে বিছানা থেকে উল্টে পড়্‌ল! ওর অবস্থায় তার এত খানি জোর, আর কোন দিনই কেউ দেখেনি। মেয়েরা সবাই স্বীকার করলে তার শক্তি বেড়েছে।—সুতরাং সুস্থতা নিশ্চয়! আমিও বুঝলুম তাই। খুসী হয়ে আবার ছুটে গিয়ে বসলুম। তাকে তুলিয়ে ভালিয়ে শান্ত করে',—অনেকক্ষণ পরে চুপি চুপি পালালুম।

"পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দেখলুম, সর্ব্বনাশ! শ্বাস আরম্ভ হয়েছে! ডাক্তার জবাব দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ক্লেসার ঔষধপাতি গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে,—আজ আর যা দেখবার দরকার নেই!

"আমার মস্তক থর্ থর্ করে কাঁপছিল। টল্‌তে টল্‌তে তার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। ডাকলুম,—সে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌বার জন্যে পাশ ফিরলে। শিথিল-কম্পিত হাত দুখানা এলিয়ে পড়্‌ছিল। তবু সে দুখানা বাড়িয়ে অতি কষ্টে আমার হাতটা ধরে মুখে টেনে নেবার চেষ্টা করলে। হাত বাড়িয়ে দিলুম। আঙুলটা মুখে ধরলে, কিন্তু আইকে আস্‌ছিল,—ছেড়ে দিলে। আবার ধরলে, আবার ছাড়লে! আঃ! সে কি প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষা! হাঁ করে চেয়ে রইলুম। তখন আশা হচ্ছিল,—ডাক্তার ভুল বুঝেছেন! এতো যাবার নয়!—এ কি যেতে পারে?

"দশ মিনিট পরেই সব শেষ!

মন ঈশ্বরের উদ্দেশে উন্মাদ হয়ে উঠ্‌ল! নিজের মূর্খতা, মূঢ়তা, অনভিজ্ঞতা আমার যন্ত্রণার কশাঘাতে ক্ষিপ্ত করে তুললে! ওরে প্রিয়, ওরে স্নেহাস্পদ—আমি যে প্রাণপণে তোর মঙ্গল কামনাই করেছি! কিন্তু আমার মূঢ়তা তোর এ কি দারুণ অকল্যাণ সাধন করলে! মূর্খতা—আমায় একবার বুঝতে দিলে না! আমার ত্রুটি সংশোধন করবার এতটুকু সুযোগ আমায় দিলে না!

"ছ মাস মাথার ঠিক ছিল না। অতিকষ্টে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলুম। তারপর সেই ডাক্তারকে গিয়ে ধরলুম। তাঁর চেষ্টায় মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হলুম। অন্ধ স্নেহে নিজের মূর্খতা পাপকে, অনভিজ্ঞতা ব্যাধিকে, মূঢ়তা গ্লানিকে ধ্বংস করতে লাগ্‌লুম! ওরাই যে আমার সেই—প্রিয় স্নেহের ধনকে হত্যা করেছে! ওরাই যে আমার মহাশত্রু!

"অর্থ, যশ, মান, প্রেম, প্রণয়, সুখদুঃখ?—উৎসন্ন যাক! দেহ সুখ? শৃগাল কুকুরের শ্মশানে ভোজনে, ও সুখটা সার্থক হবে একদিন,—দুঃখ কি? আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি, এক শিশুর স্মৃতি পূজায়! সে পূজা ভগবানের পায়ে পৌঁছায় কি না, জানি না, জানবার আগ্রহও নাই। আমি ভগবানকে ভালবেসে আনন্দ পাই,—এই যথেষ্ট। ভগবান আমায় ভাল না বাস্‌লেও আপত্তি নেই। আমার পূজা, তাঁর রাজ্যের মানুষদের মনুষ্যত্বনাশী মূর্খতা পাপকে হত্যা করে চল্‌বেই। সে মূঢ়তার হাতে আমি হত্যাশোক লাভ করেছি, সে সে মূঢ়তাকে হত্যা করাই আমার জীবনের ব্রত! বন্ধু! আমার সকল কাজ, সকল চিন্তার মাঝে জাগ্‌ছে,—এক শিশুর স্মৃতি,—অদম্য কিন্তু সুন্দর! ভীষণ কিন্তু প্রাণারাম! সেই স্মৃতির মাঝখান থেকে,—আমি কর্ম্মদেবতার রুদ্র আহ্বান শুনছি!"

* * * *

বহির্দ্বার হইতে ডাক আসিল "ডাক্তার মা আছেন?"

মুহূর্ত্তে জানালার কাছে গিয়া, তিনি মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিলেন।

নীচে হইতে সংবাদ আসিল "তখনীবাবুর বাড়ীতে এখুনি যেতে হবে। তাঁর ছোটছেলের অসুখ।"

"গাড়ী আছে?"

"না।"

"ডাক্তার?"

"দরকার নেই। দেরী হবে। বৃষ্টি ধরে গেছে, হেঁটেই যাচ্ছি চলে!"

ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া তিনি অন্তমনস্কতার দোষে বিনা নমস্কারেই বাহির হইয়া গেলেন। পরণে যে তাঁহার অদ্ভুত সজ্জা রহিয়াছে, সেটা যে চিকিৎসকের যোগ্য সজ্জা নয়, সেটুকুও তাঁহার স্মরণ হইল না।

সজল-নয়নে হাসিলাম! নিঃশব্দে উদ্দেশে নমস্কার করিলাম।

রোকশোধ

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তারকনাথ যখন দেখিল, অনুপমা বড়ই শক্ত মেয়ে, বাহিরে সে যতই নম্রতা প্রকাশ করুক, ভিতরে তাহার এমন একটা দৃঢ়তা রহিয়াছে যে, সে দৃঢ়তাকে বিচলিত করা সহজসাধ্য নহে, ভূপতির সহিত বিবাহের প্রস্তাবে সে যৌনসম্মতি প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু এই বাহ্য যৌন সম্মতির অন্তরালে, যে একটা অবিচল অসম্মতি বিদ্যমান রহিয়াছে—যাহা মৌখিক প্রতিবাদ অপেক্ষা সুকঠিন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং যথা সময়ে সেই অন্তরালস্থিত অসম্মতিটা আকস্মিকভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাহাদের সকল সঙ্কল্প—সকল চেষ্টাকে এক কথায় ব্যর্থ করিয়া দিবে ইহা সুনিশ্চিত। এই সুনিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিকার আগে হইতে না করিলে পরে তারকনাথকে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে এবং সেই নিদারুণ নিষ্ফলতার জন্য তাহাকে এমন মর্ম্মান্তিক অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে, যে অনুতাপের জ্বালাকে জীবনে আর শান্ত করিবার উপায় থাকিবে না।

তা ছাড়া ভূপতিকেই বা বিশ্বাস কি? সে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিবাহের পর যদি সে এই প্রতিশ্রুতি পালন না করে? ভূপতির ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পক্ষে এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গও খুব অসম্ভব নহে, বরং খুবই স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া বিবাহের পর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লিখিয়া দিবার ক্ষমতাই বা ভূপতিনাথের কোথায়? মহেন্দ্রবাবুর উইলের মর্ম্মানুসারে একমাত্র অনুপমাই আজীবন এই সম্পত্তির অধিকারিণী, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি সম্পত্তির মালিক হইবে, ভূপতিনাথ স্ত্রীর যৌতুক সম্পত্তিতে 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিতে পাইবে মাত্র। তবে ইহার মধ্যে যদি অনুপমার মৃত্যু হয়, তবেই আমাতা তাহার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইতে পারিবে বলিয়া মহেন্দ্রবাবু নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জীবন মৃত্যুর কথা কে বলিতে পারে? সুতরাং বিবাহের পর ভূপতিনাথের নিকট হইতে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লিখাইয়া লইবার আশা যে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা তারকনাথ বেশ বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া সে চিন্তিত হইল।

বলাবাহুল্য যে, তারকনাথ বাহিরে বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেও ভিতরে বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য ছিল না, বরং বিষয়স্পৃহাই যথেষ্ট ছিল, এবং সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য সে সর্ব্বতোভাবে উদ্যোগী হইয়াছিল। তাহার ইচ্ছা, অনুপমার হাত হইতে সম্পত্তিটা ছিনাইয়া লইয়া নিজে তাহার মালিক হইয়া বসে। কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণের উপায় কিছু দেখিতে পাইতেছিল না। ম্যানেজারি বা কর্ত্তৃত্বটা হাতে আসিলেও যাহা হয় একটা উপায় করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু তারানাথ সে পথটা আগলাইয়া বসিয়াছিল। তাহাকে এ পথ হইতে সরাইয়া দেওয়াও দুষ্কর, কেন না অনুপমা যে তাহাকে সম্পূর্ণ প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে, এবং অপরের দুই পাঁচটা মিথ্যা কথা শুনিয়া, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সে যে কখনই তারানাথকে দূরীভূত করিবে না; ইহা তারকনাথ বেশ জানিত। আর তারানাথের বিরুদ্ধে তেমন কোন কথা বলিতে তারকনাথের সাহসও ছিল না, কারণ সে যে কতদূর সত্যবাদী এবং তাহার

অন্তর কতটা নির্মল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই সে অনুপমার নিকট দিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তারকনাথ বেশ বুঝিয়াছিল, এখন অনুপমা তাহার উপর যেটুকু প্রীতি বা আত্মীয়তা দেখায় তাহা যৌথিক ছাড়া আর কিছুই নহে। এই যৌথিক আত্মীয়তা ছাড়া সে যে কোনদিনই অনুপমার আন্তরিক বিশ্বাস লাভ করিতে পারিবে না এ সম্বন্ধে তারকনাথের কোনই সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তারানাথের পরিবর্ত্তে তাহার হাতে যে অনুপমা কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিবে ইহা আকাশকুসুম অপেক্ষা একটুও অল্প অসম্ভব বলিয়া তারকনাথের মনে হয় নাই।

কিন্তু যতই অসম্ভব—যতই দুঃসাধ্য হউক, সম্পত্তিটা হস্তগত করিতেই হইবে। একটা মেয়েমানুষ এত বড় বিষয়টা ভোগ করিয়া যাইবে, আর সে সেই মেয়েমানুষটার অন্নদাস হইয়া আপনার পুরুষত্বের গর্ব্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিবে ইহা হইতেই পারে না। তাহার মাতুলের বিষয়—কিন্তু তাহার একটুও বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। করিতে গেলে লোকে মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই উপহাসের হাসি হাসিতে থাকিবে। এই উপহাসের ভয়েই তো সে আপাততঃ সন্ন্যাসীর শিষ্য বলিয়া বিলাসিতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আত্মপ্রতারণা দ্বারা কতদিন সে সাংসারিক সুখসম্ভোগ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে? জীবনটা শুধু কি কঠোর নিষ্ফলতার মধ্য দিয়াই চলিয়া যাইবে, কোনদিনই তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে না? যে কোন উপায়ে এই সফলতা লাভ করিতেই হইবে, আর সে সাফল্য লাভের মূল—মাতুলের সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বপদ অধিকার করাই এখন তাহার একমাত্র মুখ্য কার্য্য।

অনেক চিন্তার পর পরিশেষে তারকনাথ ভূপতিকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "ভূপতিবাবু, বিয়েটা বোধ হয় ঘটে উঠলো না।"

ভূপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল; সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ঘটবে না?"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া তারকনাথ বলিল, "কেন, সেটা কি বুঝতে পাচ্ছো না?"

ভূপতি কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কাতরভাবে বলিল, "আমি বুঝতে পারি না, আপনি বুঝিয়ে দিন্ তারকবাবু।"

স্নেহগম্ভীর কণ্ঠে তারকনাথ বলিল, "এমন সোজা কথাটা বুঝতে পার না, অথচ এই বুদ্ধি নিয়ে এত বড় জমিদারীটা চালাবে?"

ভূপতি সে কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু বিবাহে কি এমন অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহাই জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে তারকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারকনাথ মাথাটা একবার নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "এখানে একটী বাস্ত ঘুঘু বাসা বেঁধেছে তা জান তো?"

ভূপতি বলিল, "ঘুঘু কে? তারানাথবাবু?"

ইতস্ততঃ চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তারকনাথ বলিল, "এ-ত নামে দরকার কি। কিন্তু এই ঘুঘুটী যে দিনরাত অনুপমার কাণে বিষময় ঢালবে তার উপায় কি?"

ভূপতি এবার বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "বলেন তো উকীল মধ্যস্থ দিয়ে ঘুঘুটীর বাসা ভেঙ্গে দিই।"

মৃদুগম্ভীর হাস্য সহকারে তারকনাথ বলিল, "তাতে শুধু ঘুঘুর বাসা ভাঙবেনা, নিজের বাসাও ভাঙবে।"

বিস্ময়ের সহিত তারকনাথের দিকে চাহিয়া ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

তার। মানে খুব সোজা, অনুপমা সেটা জানতে পারলে গলাধাক্কা ছাড়া আর কোন পুরস্কার মিলবে না।"

ভূপ। কেন?

তার। এত দিন খুবতো, অথচ অনুপমা যে এই ঘুঘুটীকে ভালবাসে সে খবর রাখ না?

অতিমাত্র বিস্ময়ে যেন লাফাইয়া উঠিয়া ভূপতি বলিল, "এ্যা, ভালবাসে!"

তারকনাথ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "একেবারে লাফিয়ে উঠলেন যে?"

উত্তেজিতভাবে ভূপতি বলিল, "উঠবো না? অনুপমা ওকে ভালবাসে?"

তারকনাথ বলিল, "বাসলেই বা?"

উত্তেজনার ক্রোধ মুখে লাল করিয়া ভূপতি বলিল, "বলেন কি? যে হৃদয় আমার প্রাপ্য, সেই হৃদয়ের অংশ ঐ হতভাগা—বাধা দিয়া তারানাথ বলিল, তোমার ও

নাটুকে ভালবাসা রেখে যাও। এখন হৃদয়ের অংশ ছেড়ে দিয়ে জমীদারীর অংশটাকে যাতে ঐ ঘুঘুটা গ্রাস না করে, তার কোন উপায় দেখবে কি ?"

ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, 'জমীদারীর অংশ গ্রাস করবে ?"

ঈষৎ হাস্যসহকারে তারকনাথ বলিল,"অংশ কি, আর বছরখানেক ওর হাতে থাকলে সম্পত্তির 'স'ও থাকবে না, গজভুক্ত কপিত্থের মত অন্তঃসার শূন্য হ'য়ে পড়বে।"

চিন্তিতভাবে ভূপতি বলিল, "তা হলে ত ওকে শীগ্‌গীর তাড়ানো দরকার।"

তারকনাথ বলিল, "খুব দরকার। কিন্তু তুমি আমি তাড়াতে পারব না, আইনের সাহায্যে তাড়াতে হবে।"

আইনের সাহায্যে কিরূপে তাড়াইতে হইবে তাহা ভূপতি জানিত না। তারকনাথ তাহাকে বুঝাইয়া দিল, এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, বাস্তঘুঘুটা জমিদারীর সার উদরস্থ করিবার পূর্ব্বেই জমিদারিটা আপনাকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। ইহার একমাত্র উপায় আইনের সহায়তা গ্রহণ। অনুপমা এখনও নাবালিকা, নাবালিকার বিষয় কর্ম্ম পরিচালনার অধিকার নাই; তজ্জন্য একজিকিউটার বা অভিভাবক থাকা দরকার। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু উইলে সেরূপ কোন অভিভাবক নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান নাই। এক্ষণে তারকনাথ ও ভূপতিবাবু উভয়ে যদি অভিভাবকত্বের দাবী করিয়া জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত করে, এবং তাহারা যে অভিভাবক হইবার উপযুক্ত ইহা প্রমাণিত করিতে পারে, তাহা হইলে জজসাহেব হয়তো সে দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন। দরখাস্ত একবার মঞ্জুর হইলে তখন আর পায় কে? তখন তাহারাই জমিদারীর সর্ব্বে সর্ব্বা, এমন কি, অনুপমা পর্য্যন্ত তাহাদের আজ্ঞাধীন থাকিতে বাধ্য। তখন তারানাথকে বিতাড়িত করিলে অনুপমা আর একটী কথাও বলিতে পারিবে না।

ভূপতি যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া তারকনাথকে আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ-গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "বাহবা তারকবাবু, ধন্য আপনার বুদ্ধি! আপনি যে কেন হাইকোর্টের জজ হ'লেন না তাই আশ্চর্য্য।"

তাহার কথায় তারকনাথ হাসিয়া উঠিল এবং তাহাকে শান্ত করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিল। ইহার কয়েকদিন পরে তারকনাথ উকীলের দ্বারা কাগজ-পত্র প্রস্তুত করাইয়া জজের নিকট দরখাস্ত করিয়া আসিল। খরচ যাহা হইল তাহা ক্ষেমঙ্করী দেবী গোপনে ধার দিলেন।

এখন কথা এই, তারকনাথ একা অভিভাবক না হইয়া ভূপতিকে তাহার সঙ্গে জড়াইল কেন? তারকনাথ জানিত, সে একা দরখাস্ত করিলে অনুপমা প্রতিবাদ দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু উহার ভাবী স্বামী বলিয়া ভূপতিকে ইহার সহিত জড়াইয়া রাখিলে সহজে প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইবে না, এবং লোক-লজ্জা ভয়ে হয়তো প্রতিবাদ হইতে নিরস্ত থাকিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়াই তারকনাথ ভূপতিকে নিজের সঙ্গে জড়াইয়া লইল। দরখাস্তটা এতই গোপনে সম্পন্ন হইল যে, তারানাথের নিকট নোটিস আসিবার পূর্ব্বে কেহই তাহার বিন্দুবিসর্গ অবগত হইতে পারিল না।

আবেদন মঞ্জুর হইতে বিলম্ব ছিল; কিন্তু সে বিলম্বটুকু ভূপতি যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তীব্র প্রভুত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী জানে সে ইহারই মধ্যে আধিপত্য দেখাইবার জন্য এতটা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তর্কশনে অনুপমা পর্য্যন্ত শুধু বিরক্ত নয়, অনেকটা বিস্ময়ও অনুভব করিতে-ছিল। কিন্তু ভূপতিবাবুর এই চাঞ্চল্যের কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

যেদিন বুঝিল, সেদিন প্রগাঢ় বিস্ময়ের সহিত একটা তীব্র আঘাত আসিয়া এমন নির্দ্দয় ভাবে মর্ম্ম স্থানে পতিত হইল যে, অনুপমা কিছুতেই সে তীব্র আঘাতটা বুক পাতিয়া লইতে পারিল না; ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাত্যাহতা বল্লরীর ন্যায় নিঃসঙ্গ ভাবে লুটাইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

সেদিন মিটিং-এ সুরেশ বাবুর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। সবার বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন "Now Suresh Babu will give his address" সুরেশ বাবু বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিলেন আমার address হচ্ছে ৭১নং ল্যান্স-ডাউন রোড, নবকার মহাশয়রা এখন আসি।"

কংগ্রেস "প্রোগ্রাম।"

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।]

("টু পুল্ বয়কট্")

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসহযোগ আমাদের কার্য্যতালিকার শেষ কথা। তাহার জন্য জাতি যতটা সংঘবদ্ধ ও আত্ম নির্ভরশীল হওয়া দরকার, আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। কিন্তু মহাত্মা মনে করিয়াছিলেন পাঞ্জাব অত্যাচার ও খিলাফতের প্রতিকৃতি ভঙ্গের পর ভারতের হিন্দু মুসলমানের মনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কামনা নিশ্চয়ই আসন্নিত হইয়াছে। তাঁহার নিকটে যাহারা আসিত সকলেই জয়ধ্বনি দিয়া এই বাসনার প্রমাণ দিত। কিন্তু বাকী যাহারা আসে নাই, তাহাদের সংখ্যাই যে এখনও বেশী এ-কথা বুঝিতে ভুল হইয়াছিল। সুতরাং দেশ কতখানি প্রস্তুত তাহার হিসাব সম্বন্ধে একটা নির্ভুল ধারণা করিবার অবসর আমলাতন্ত্রের ভীষণ অত্যাচারের উত্তেজনা আমাদিগকে দেয় নাই।

কলিকাতায় মহাত্মা যখন অসহযোগকে অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন যে যুদ্ধের সময় লোকে আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ এতটাই ভুলিয়া যায় যে আদালতে মোকদ্দমা করিবার এবং ছেলেপিলেকে ইস্কুলে পাঠাইবার চিন্তাই তাহাদের মনে স্থান পায় না। এবং এই দুইটিকে তিনি জাতির মনোভাব পরীক্ষার অব্যর্থ নির্দ্দেশক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন ("When a nation is at war, whether non violent or violent, *it is an indispensable condition that it stops its schools and Law courts.*" .....So long as we believe that our children's education will be neglected if we do not send them to schools and Colleges which are a factory for turning out clerks for the Government, I submit that swaraj is nearly an impossibility." মহাত্মা বলিতেছেন যতদিন গবর্ণমেণ্টের কেরাণী তৈয়ারির কারখানা এই ইস্কুল কলেজ গুলিতে না পাঠাইলে আমাদের পুত্রকন্যার শিক্ষা হইবে না এই ধারণা থাকিবে—ততদিন স্বরাজ একরূপ অসম্ভব।

গত দুই বৎসরের আন্দোলনের ফলে দেখা গেল যে দেশের লোকের সে ধারণা যায় নাই। জনকতক অসহযোগী হইয়া সে আদর্শ গ্রহণ করিলেও, সমগ্র দেশ তাহা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল তখন যুদ্ধের হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও অবস্থা (Conditions of war) বর্ত্তমান ছিল না। থাকিলে লোকে আদালত ও ইস্কুল-কলেজ বর্জ্জন করিত। জাতীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত ভাল হইয়া উঠে নাই বলিলে এযুক্তি খণ্ডিত হইবে না। কারণ সে পরের কথা—সেটা একটা সর্ত্ত নয়।

কাউন্সিল ত্যাগ করার প্রসঙ্গে মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে ওখানে গিয়া তর্ক করিয়া পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের ভঙ্গ নিবারণ করা যাইবে না। এবং দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আদালতের সংস্রব কাউন্সিলে বর্জ্জন করিলে অসহযোগের আদর্শ দ্রুত সফলতা লাভ করিবে। একথা এখনও কেহ অস্বীকার করে না। কাউন্সিলের বাহিরে থাকিয়া বেশী কাজ হইলে, কাউন্সিলে না যাওয়াই উচিত। কিন্তু বাহিরে কাজ করিয়া যখন আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না, তখন একদল যদি ভিতরে গিয়া সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে চান, তাহাতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত কি? সরকারী শিক্ষা, আবগারী বিভাগ প্রভৃতি ধ্বংস করা আমাদের কার্য্যতালিকার প্রধান অঙ্গ। এগুলি হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred subjects)—যদি অধিকাংশ সভ্যের মত হয় তাহা হইলে টাকা মঞ্জুর না করিলে গবর্ণরের ক্ষমতা নাই যে Veto করেন, তখন বাধ্য হইয়া এই দুই বিভাগ বন্ধ করিতে হইবে, কিম্বা শাসন সংস্কার বিধি (Reforms) উঠাইয়া দিতে হইবে। উভয় স্থলেই দেশের মঙ্গল এবং আমাদের জয় লাভ। সুতরাং অসহযোগের সফলতার জন্য কাউন্সিলে যাওয়া উচিত কিনা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সহযোগের উদ্দেশ্য নয়, আমরা বাহির হইতে সক্ষম হই নাই বলিয়াই, কাউন্সিলে যাওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে তাহার আবশ্যকতা হইয়াছে। বাহিরে থাকিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা সহজে সফল হইবে, না ভিতরে ঢুকিয়া হইবে, তাহাই বিবেচ্য। অবশ্য একথা মনে

করা উচিত নয় যে কাউন্সিলে গেলেই বাহিরের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। বাহিরের কাজ সমস্তই থাকিবে, তৎসঙ্গে কেবল একটা দলকে ঐ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। এখন যাঁহাদের কোন কাজ নাই, তাঁহাদের অনেককে একার্য্যের জন্য পাওয়া যাইতে পারে।

জাতির মুক্তির আন্দোলনে সমস্ত জাতির সকল প্রকার শক্তির সদ্ব্যবহারই utilisation of national energy কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য নানা দিক হইতে কাজ চালাইতে হইবে এবং সকলকে কাজের সুবিধা দিতে হইবে। শুধু জন কয়েক দেবতা হইলে তাঁহারা স্বর্গেই থাকিবেন—মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসী আমাদের দশ জনের তাঁহাদের অনুবর্ত্তীর হওয়ার কোনই উপায় থাকিবে না। একটা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা পাইতে হইলে তাহার মনের অবস্থা এমন হইয়া আসা চাই—যে সে আপনা আপনিই বিজেতার কলুষময় শাসনযন্ত্র হইতে হাত গুটাইয়া লইবে। মিশরে কৃষক হইতে মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই এরূপ করিয়াছে। আমাদের দেশে যতক্ষণ সে ব্যবস্থা না হইতেছে, ততক্ষণ স্বরাজের কথা বাতুলতা মাত্র এবং অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ মহাত্মার মতেই অনুচিত।

Imemdiately that nation realises intuitively that any gifts that may come from the conqueror come not for the benefit of the conquered, but principally for the benefit of the conqureor that nation from that very moment, will reject all voluntary assistance and refuse to give every form of voluntary assistance to the conqueror. *These are fadamental and elementary conditions of success in our struggle for national independence.*, whether within the Empire or wheher without. I want my countrymen to under stand my positon. And if you do not accept that position, probably you, will find it that it will be your duty to reject the proposition (the Non-co-perátion Resolution in the Calcutta Special Congress) I have the honour of placing before you." (Mahatma Gandhi).

(৮)

(স্বরাজের আকাঙ্খা)

গত বৎসর চারিআনা পয়সা দিয়া এক কোটি লোক কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছিল। ঐ পয়সা দেওয়া ব্যতীত তাহাদের অধিকাংশেই যে কংগ্রেসের আর কোনও কাজ করে নাই—সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেশের জনসাধারণ এই আন্দোলনে যে পরিমাণ যোগ দিয়াছিল তাহা সাধু মহাত্মার নামের আকর্ষণে এবং নিজের অর্থ গত (economic diartess) প্রতিকারের আশায়। স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন বুঝিয়া খুব কম লোকই এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল—যাহারা এইদিক হইতে হইতে আসিয়াছিল তাহারাই এখনও আছে, এবং আন্দোলনের যাহা কিছু সফলতা তাহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে সেইজন্য আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলন (mass movement) হিসাবে অন্ততঃ বাংলায় এ আন্দোলন সফলতা লাভ করে নাই। Economic unrest religious propensity এই দুইটি জিনিসকে স্বরাজের আকাঙ্খা বলিয়া ভুল করাতেই অসহযোগ প্রস্তাব ঠিক সময় মত দেশকে কাজে নামাইতে পারে নাই।

A race which is suffering from the oppression of an alien conqueror could win its freedom without any resort to force or armed violence: first, the people themselves, *must be Convinced of the necessity for freedom, and that accomplished, they must decline any longer to co-oprate* in the administration of the *foreign powr (Fauer Brockway)*

অহিংস অসহযোগ সফল করিতে গেলে স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন সম্বন্ধে জাতির সমস্ত ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই। কাপুরুষতাকে আমরা অহিংসা বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। এবং আর্থিক অভাবজাত চাঞ্চল্য ও ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কারকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। মহাত্মার কথায় অনেকেই মদ ছাড়িল না, বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিল না, কংগ্রেসে যোগ দিল না—কিন্তু সমস্ত

দেশটা একেবারে অহিংস হইয়া গেল। মনকে চোখ ঠারিয়া কিছু লাভ নাই—তাই এসকল অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ করিতে হইতেছে। অসহযোগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি সত্যাগ্রহ—তাই যাহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে—তাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। ধামা চাপা দিলে ভিতরের ঘা ক্রমশঃ পচিয়াই উঠিবে এবং পরিণামে তাহা জাতিকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিবে। এক বৎসরের প্রোগ্রাম ছিল Revolutionary কিন্তু এখন আমাদের এমন একটা Evolutionary প্রোগ্রাম লইয়া কাজ করিতে হইবে যাহা এক বৎসরের প্রস্তাবিত কাজ যতদিন না হয়, ততদিন ধরিয়া সেই আদর্শের অভিমুখে চেষ্টা করিবে—এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে।

(৯)

(স্বদেশীর সফলতা)

দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগস্থাপন সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া এবং অর্থ নৈতিক সমস্যার প্রতীকার হয় নাই বলিয়া এক বৎসর জনসাধারণ কংগ্রেসের চাদা দিতেছে না এবং বিলাতী কাপড়ের প্রচুর সদ্ব্যবহার করিতেছে। বিলাতী কাপড় সস্তা বলিয়াই যে কিনিতেছে এমন নয়। কাপড়ের দোকানে দিনের পর দিন বসিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর লোক বলা হয় সকলেই "কাইন" (fine) কাপড় চায়, এবং গোয়াপাড়, টেক্কাপাড়ের ফরমাইস্ করে। মোটা কাপড়ের ভার বহিবে কে, নিংড়াইবে কে, কাচিবে কে—এইগুলিই প্রধান আপত্তি। তাহা না হইলে তাহাদের এইটুকু বুদ্ধি বেশ আছে যে চাষাভূষার কাছে মোটা কাপড়ই ভাল এবং বেশী বিলাতীর ভরসা যায়। সুতরাং এখন একটাকা দাম বেশী দিলেও পরে তাহাতে লাভ বই লোকসান নাই। কোনও পল্লীগ্রামে কটকে গোয়ালার মেয়ে বলিয়া একটি স্ত্রীলোক মুখ ব্যাকাইয়া আমাকে বলিয়া গেল—"একবেলা খাবো সেও ভালো তো মোটা কাপড় পরতে পারবো না।" বাংলার বিলুপ্ত বিষ জর্জরিত অধঃপতিত আত্মা ঐ কটকে গোয়ালার মেয়ের মুখ দিয়া কথা কহিয়াছে ইহাই আমার ধারণা। মেয়েদের মধ্যেই এই বিষ বেশী ঢুকিয়াছে। বেশ গোয়ার হাক, কিন্তু আমার গোয়োপাড় চাই, ব্যানডোরের কলের কাপড়ের ২২২২ নম্বর আমার নিরক্ষর চাষা ভাইয়েরও মুখস্থ। এই মনোভাব বদলাইতে না পারিলে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা নাই। সেই নির্বুদ্ধিতা অস্ত্র না করিয়া দিলে আমার বস্ত্র হইবে না—এই ভাব বর্তমান থাকিলে স্বরাজ আন্দোলনের অর্থ নৈতিকদিকের মূল ভিত্তিই গঠিত হইবে না। মিল ঘুরে থাকুক, এমন কি দেশের তুলোয় দেশের লোকে বুনিয়া দিলেও চলিবে না। ঘরে ঘরে তুলার গাছ, ঘরে ঘরে চরকা ও গ্রামে গ্রামে তাঁত চাই। তবেই অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে। কংগ্রেসের এখন ইহাই প্রধান কাজ। এ কাজে সমাজের সকলেই লাগিতে পারে, সরকারী চাকর হইতে কৃষক পর্যন্ত ইহার সফলতার জন্য একযোগে চেষ্টা করিতে পারে। নিরস্ত্রের প্রতিরোধের জন্য নয়, ইংরেজকে জব্দ করিবার জন্য নয়, জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য এই গঠনকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ইহার ভিতর সহযোগ-অসহযোগের কথা লইয়া বিশেষ কিছু মারামারি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

( )

(কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য)

খদ্দর, জাতীয় শিক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের একতা এবং অস্পৃশ্যতা ত্যাগ প্রচার করাই এখন কংগ্রেসের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এসকল কাজই অসহযোগী ব্যতীত অন্য অনেকেই করিতে পারে। দুর্ভিক্ষ নিবারণ, বন্যা-পীড়িতের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি কাজও খুব ভাল—কিন্তু তাহার জন্য অসহযোগের সার্থকতা খুব বেশী আছে কি? অবশ্য আমলা তন্ত্রের সংস্রব ছাড়াই আত্মশুদ্ধির দিক দিয়া একটা মস্ত বড় জিনিষ। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে কংগ্রেসের কর্ম্মী বলিয়া যে আগুন নিবাইতে ছুটিব না, কিম্বা পাড়ার কেহ মরিলে শ্মশানে লইয়া যাইব না এমন কথা নয়—কিন্তু কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্যটা কি? এটা একটা Philanthropic organisation না Political organisation—না একাধারে সবই? কংগ্রেসের কার্য্য প্রণালী এবং উদ্দেশ্য ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সমাজে যেমন কর্ম্ম বিভাগ আছে, দেশের বিভিন্ন সভা সমিতিরও সেইরূপ কর্ম্ম বিভাগ আছে। কংগ্রেসের কাজের কি কোনও সীমানা নাই? আমরা মনে করিয়াছিলাম যে কাজটি অন্য সকলের দ্বারা এখনও সম্ভবপর হয় নাই, যা নানা কারণে সকলে পারে

না—দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য আমৃত্যু তন্ত্রের সহিত সম্ভ্রব বর্জ্জন করিয়া সেইরূপ কাজের সফলতার জন্য তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই কংগ্রেসের অসহযোগী কর্ম্মীর প্রধান কর্ত্তব্য। এইজন্য যে সমস্ত সত্য উপায় অবলম্বন করা দরকার, সেইগুলির গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের অসহযোগী কর্ম্মীদের প্রধান কাজ। এখন আমরা লক্ষ্য হারাইয়াছি। আমাদের কথা ২ দিনে ৩০ মাইল মার্চ করিয়া একটি দুর্গ জয় করিব—কিন্তু ২ দিনে ১০ মাইলের বেশী না আসিতে পারায় আমাদের নিরস্ত্রব সংগ্রামের শান্তিসেনা পরিশ্রান্ত ও হতাশ হইয়া আশপাশের গ্রাম দখল করিয়া বসিয়া আছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের সফলতাও এইরূপ হইয়াছে। আমরা খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু যতটা অগ্রসর হইবার কথা ছিল, তাহা হইতে পারি নাই এবং বাকী পথটা চলিয়া কিসে দুর্গ অধিকার করা যায়, সে চিন্তা আমাদের মনে তেমন স্পষ্ট ভাবে আর নাই, আমরা অন্য দশটা কাজে পথের মাঝে আটকাইয়া গিয়াছি। যুদ্ধ ছাড়িয়া সৈনিকগণ যদি পথের মাঝে গ্রামের পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে বসে তবে সেটা মন্দ কাজ কেহ বলিবে না, কিন্তু সৈন্যদল গঠনও সেজন্য হয় নাই এবং সৈনিক হওয়ার সফলতাও তাহাতে আনিয়া দিবে না।

(১১)

(কার্য্যে বাধা)

কংগ্রেসের কর্ম্মীরা এখনটাকা পায় না—অনাহারে দিন-পাত করিয়া তাহারা আর কতদিন কাজ করিবে? দেশের লোক যদি তাহাদিগকে চাহিত, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে আহার ও অর্থের জন্য ভাবিতে হইত না। ভারতের ৩০ কোটি লোকে শুধু ৩০ কোটি দেবতার পূজা করিয়াই কাজ নয়, এই ভারতে ৩০ লক্ষ ভিক্ষুক, অবধূতে এবং পতিতা রমণীও সমাজের দানে প্রতিপালিত হয়। আজ ৩০ হাজার কংগ্রেস কর্ম্মী সমস্ত ভারতেও নাই। কিন্তু সমাজ তাহাদের প্রতিপালনে নারাজ। যে অবস্থায় এবং যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল—তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঠেকিয়া অনেক শিখিতে হইয়াছে। এখনও সাবধান না হইলে ভবিষ্যতে আরও দুঃখ আছে। আর সমস্ত না হইলেও চলে—কিন্তু খাওয়া পরা দু'বেলা দুটি শাক অন্নের অভাব হইলে কর্ম্মীরা কি প্রকারে কাজ করিবে? পেটের চিন্তা করিতে গেলে কাজ হয় না, এবং কাজের চিন্তা করিতে গেলে পেট ভরে না—এ সমস্যা সমাধানের কোনই উপায় দেখা যাইতেছে না। ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কতদিন চলিবে? দেশের কাজ যে করিতেছে তাহার সমাজের নিকট চাহিবার অধিকার আছে—কিন্তু সমাজ যদি স্বেচ্ছায় সে দাবী স্বীকার না করে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া কর্ম্মীদিগকে আপাততঃ কাজ ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য সমাজের ভিতর সেই শুভ ইচ্ছা জাগাইবার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন—কিন্তু হাড়ে মাসে একত্র থাকিলে তো চেষ্টা সম্ভবপর? যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা একাজ করিতে পারেন, কিন্তু মা-বাপের সহিত বিরোধ করিয়া যাহারা ঘর ছাড়িয়া দেশের কাজের জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের রক্ষার জন্য দেশ দায়ী। দেশ যদি না চায়, তাহা হইলে তাহাদিগের কেন্দ্রীভূত করা ভিন্ন উপায় কি আছে?

আদালত, ইস্কুল কলেজ ও কাউন্সিল বর্জ্জনের কথা প্রচার করিলেই এখন যে কোনও সফলতা আসিবে এমন সম্ভাবনা নাই। এখনও দেশের প্রায় সকলেই এ আদর্শ গ্রহণ করে নাই—জাগা মানুষের যেমন ঘুম ভাঙানো যায় না, তেমনি আমাদের এই অতি চালাক জাতির ঘুম এখন ভাঙানো অসম্ভব। তবে সালিসী আদালত, পঞ্চায়েত, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি গঠনের দ্বারা বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে আদর্শের সফলতার জন্য উদ্যম করা যাইতে পারে। কিন্তু এই চেষ্টার পিছনে জাতির প্রাণ থাকা চাই—অর্থ সাহায্য, সহানুভূতি না পাইলে এই সকল অনুষ্ঠান শুধু জনকয়েক অসহযোগীর চেষ্টায় গড়িয়া উঠিবে না। কারণ অসহযোগ করাও দেশের জন্যই—দেশও কিন্তু শুধুই অসহযোগীদের লইয়া নয়। কাজেই যতক্ষণ না দেশের প্রাণ চেতন হইতেছে, ততদিন বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে। অসহযোগ উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য আমাদের স্বরাজ লাভ। সে উদ্দেশ্য সাধনে যদি অবস্থায় প্রয়োজনে উপায়ের পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহাও করিতে হইবে।

(১২)

(বর্ত্তমান কংগ্রেস কমিটিগুলির রক্ষার উপায়)

বর্ত্তমানে যে কংগ্রেস কমিটিগুলি আছে তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। অন্তত বাংলাদেশে প্রাদেশিক সমিতি হইতে গ্রাম্য-সমিতি পর্য্যন্ত সকলেরই আর্থিক অবস্থা একরূপ। অদূর ভবিষ্যতে যে স্বচ্ছলতা আসিবে এমন সম্ভাবনাও নাই। কংগ্রেসের সভ্য হওয়া বা তিলক-ভাণ্ডারে টাকা দেওয়াতে লোকের উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। এই সকল মৃতপ্রায় সমিতিগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া অসহযোগের কার্য্যতালিকা চালাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত। বাঁচাইবার উপায় তো দেখা যাইতেছে না—মরিয়া গেলেই বা কি উপায় আছে? প্রাদেশিক সমিতি যদি নিজের অধীনে কতকগুলি সংসদ গঠন করিয়া উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কয়েকজন নেতার হাতে স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, শ্রমজীবী সমস্যা, প্রচার প্রভৃতি বিষয়ের ভার দেন এবং অর্থসংগ্রহের জন্য প্রত্যেক সম্পন্ন কয়েকজনকে যথাযথ নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে যেটুকু এখনও আছে, বজায় থাকিবে। যেরূপ ছত্রভঙ্গ ভাবে এখন কাজ করা হইতেছে, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

কর্ম্মীগণের মধ্যে কতককে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইবে—আর কতককে কাজ করিতে হইবে। যেখানে ৩ জন কর্ম্মী আছে, ২ জনকে তাঁত চালানো বা এইরূপ কোনও কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইতে যতদিন দেরী লাগিবে, ততদিন সেবকগণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নেতাগণকে ভিক্ষা করিয়া সকলকে খাওয়াইতে হইবে। নিজের পেটের জন্য নিজে ভিক্ষা করার অপমান হইতে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্ত করা দরকার।

অসময়ে কুষ্ঠিষ্ঠ সন্তানকে বাঁচাইতে হইলে যেমন অধিক চেষ্টার প্রয়োজন, আমাদের এই আন্দোলনকে বাঁচাইতেও সেইরূপ অতিরিক্ত চেষ্টার আবশ্যক। আর যদি আমাদের চেষ্টার বা কর্ম্মক্ষমতার অভাবে কংগ্রেস কমিটি-গুলি প্রাণ হারায় তাহা হইলে নূতন করিয়া আমাদিগকে গড়িতে হইবে।

এইরূপ চালিয়া সাজিতে হইলে কার্য্যপ্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সে দুর্দিনের জন্যও আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে তখন যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে তাহার একটা মোটামুটি আভাস দিব। মনে রাখিতে হইবে আমাদের উদ্দেশ্য স্বরাজ—অসহযোগ পন্থা মাত্র।

নরম ও গরম

[শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল]

নরম*

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিলে—
মোদের স্বভাব এই গেলামী বই আসিনে।
চক্‌চকে নোট টাকার রাশি,
আমরা বড়ই ভাল বাসি,
তাই নিজেই তো হেথায় আসি—
মনের কথা মানিনে
পাঁচটি হাজার মাসে—ফেলে
যার নাইকো, তেমন ছেলে
(তাই) লাখি ষাঁটা হাজার—খেলে
চরণ তবু ছাড়িনে।

*নিমুবাবুর—"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিলে"—গানের অনুকরণে।

গরম*

চামড়া সাদা বলে দাদা, তোমরা বুঝি মনে ভাব
মনে মনে সদাই রাজা করবে খাজা সবে যাব?
চুকবে সেপাই মোদের বাড়ী
কাটবে পিলে ধরলে দাড়ই
বলতে গেলে মনের কথা গুলির চোটে খাবি খাব?
যা হবার তা হয়ে গেছে—এইখানে ইস্তফা দিল—
ভাল মন্দে থাকব না আর তোমরা সবে যতই বল,
যতই কেন দাওনা তাড়া
জেল ফাঁসী আর লাঠী মারা,
এই গোঁফ জোড়াতে দিবে চাড়া—
"ভোণ্ট কেয়ার" করে যাব।

*ডি এল রায়ের "তোমায় ভালবাসি বলে তুমি বুঝি মনে ভাব" গানের অনুকরণে।

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পরে)

মা! পারুলের মা'র ব্যথা কিছু কম ছিল না। মেয়ে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এমন শঙ্কা না থাকিলেও সে এই যে একটা বিষম অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলিল, ইহাতে তাহার মা একেবারে দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই মেয়েকে, অঙ্গের মতই, সে বুকে করিয়া বড় করিয়াছে, বড় করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার জন্য না-হক্ কত কষ্টই সহিয়াছে—সেই মেয়ে। দুঃখ-নিশা কাটিয়া এই ত সেদিন তাহার গৃহ-চুড়ে বিহগ বিরাবিত সুখ প্রভাত দেখা দিয়াছিল! ক'দিনই বা! আঙুলের দাগ ক'টিতে যে গণিয়া দেওয়া যায়। সেই সুপ্রভাতে, সেই নব-উন্মেষিত সুদিনের তরুণ বেলাতেই যদি এমন করিয়া দুঃখের কালিমা নিজেই সে পালে মাখিয়া, বরণ করিয়া আনে তবে আর তাহার জননীর দুঃখের অবসান কৈ হইল? তাহার আজীবন কষ্টের শেষ-ই বা কোথায় হইল?—পারুলের মা কথাগুলি যেন করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া ঘরের মেঝের উঁচু হইয়া বসিয়া মেয়ের কানের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতেছিল। পারুল ছোট একটা বালিশ বুকের নীচে চাপিয়া মড়ার মত পড়িয়াছিল, মা যদিও জানিত, মেয়ে নিদ্রিত নহে। কিন্তু এতগুলো কথার উত্তরে সে যখন নড়িয়া চড়িয়াও একটু সাড়া দিল না, তখন তাহার মা আর মেঝের বসিয়াই বলিয়া যাইতে পারিল না, ফরাসে উঠিয়া, মেয়ের অতি নিকটে আসিয়া, অতি আদরে ডাকিল—পারু!

পারুল পা দুটি নাড়িয়া জানাইল, সে জাগ্রত।

তাহার মা দ্বিগুণিত উৎসাহে আরম্ভ করিল, কখন্ হইতে, কি করিয়া, কত দুঃখে কি কষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়া তাহার মাতৃত্ব সফল করিয়াছে—তাহারাই ইতিহাস বর্ণিতে।

পারুল লাল দুইটা চোখ তুলিয়া, মাথাটা উঁচু করিয়া বলিল—পাঁটা পুষেছিলে, ছোলা খাইয়েছিলে, বাপ মিষ্টি হবে বলে, তার আবার গর্ব্ব কিসের!

এবার আর নীচের তলার 'মধাই' ছিলেন না এবং আর একবার এমনি একটা অদ্ভুত খোঁচা খাইয়া পারুলের মা শুম্ হইয়াছিল, একবার সে কূটনীতি অবলম্বন না করিয়া পারিল না, বলিল—বজ্জ যে চ্যাটাম চ্যাটাম কথা বল্‌ছিস্ পারু! সেই যে এতটুকু বেলা থেকে বুকে করে, কোলে করে, এত বড়টা করলুম, এখন দয়া দয়া কথা না বলে সুখ হ'বে কেন? তিন বছরের মেয়ে···

পারুল বালিশ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল; মা'র দিকে চাহিয়া ভীষণ দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—তার আগে? তিন বছরের আগে? বল, বল, তার আগে···?

পারুলের মা ক্রমাগত ঢোঁক গিলিতেছিল, যে কথা সে আজ পর্য্যন্ত কাহারো গোচর করে নাই, অসতর্ক ক্ষণে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল।

পারুল বলিল—বল্‌ছ না যে? কিনেছিলে?. ওঃ! এক মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন একটা কিছু দুরাশা করিয়া তাহারই আলোর রেখা ধরিয়া লাফ দিয়া উঠিয়াছিল, নিমেষের মধ্যেই আলেয়ার আলো বুঝিয়া তাহার সে দীপ্ত মুখ নিস্তেজ ম্লান হইয়া গেল।

পারুলের মা বলিল—সবাই বল্‌ত, পারুলের মা···

পারুল চীৎকার করিয়া উঠিল—খবর্দ্দার, আর না।

তাহার মা কিছু না বুঝিয়া হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসিল—কি 'না'?

মা-না, আর যা-হয় কিছু বল, আপত্তি নেই।

তবে রে হারামজাদি!—বলিয়া পারুলের মা ভীষণ-তেজে গর্জিয়া উঠিল। আজ তার অস্তিত্ব যায়, এতদিনের আশা-ভরসা তা'ও থাকে না, আজ তার সেই বিক্রমের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যে বিক্রমে একদিন সে সহরের বহু ধনী ও গুণ্ডাসমাজকে করায়ত্ত রাখিতে পারিয়াছিল। —মা নয়, আর কিছু? যত বড় মুখ তত বড় কথা!

পারুলও দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু চেঁচামিচি করিতে বা নারীটার সঙ্গে বচসা করিতেও তাহার ঘৃণা হইতেছিল। বার দুই একটা কথা বলিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিল, কিন্তু সেই যে মা নয়, পণ্য পশুর মত ক্রয় করিয়া হীন ব্যবসায়ে রত করিয়াছে, মনে পড়িতেই গা রি রি করিয়া উঠিল। কি কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, পারুলের আর তাহা মনে হইল না, তার সামনে দাঁড়াইতেও প্রবৃত্তি হইল না, বলিল—নিচে যাও। আমার শরীরটে ভালো নেই। তোমার সঙ্গে বক্‌তে পার্‌ব না।

তার মা নরম দেখিয়া চড়িয়া বসিল, নিচে যাব? কেন যাব—তোর কথায় যাব? তোর হুকুমে যাব?

হ্যাঁ,—নিচে যাও। শুধু এই কথাটা মনে রেখো যে এ বাড়ীটা আমার,—তোমার নয়।

তোর বাড়ী? কে করে দিয়েছিল? কার জন্যে···

সে প্রায়শ্চিত্ত পরে কর্‌ব, এখন নয়। এখনো বাড়ী

আমার। আর করে দিয়েছিলে নয়—কিনে দিয়েছিলে তুমি, তার জন্যে দালালি দিই নি, পাঁচশ'টাকা? মন খেয়ে উঠিয়েছ—মনে নেই?

যা করে ওঠাব, তোর...

তুমি যাবে কি-না?

যত বিক্রমই থাকুক এবং যত রাগই তার হোক, প্রায়শ্চিত্ত-চিন্তা শুনিয়া পারুলের মা অনেকখানি দমিয়া গিয়াছিল, কাজেই আর বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া, পুরানো পাড়ার বর্ষিয়সী দুই চারি জন পড়শীকে ডাকিয়া আনিয়া মেয়ের সুবুদ্ধি ফিরাইবার সলা-কলা করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

পারুল দ্বারটি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই আগুনে এই কথাটাই অসিদ্ধ চাউলের মত লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছিল যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত সে কি ছিল, কোথায় ছিল? কেমন ছিল? গৃহস্থের ঘরে ছিল কি? অর্থাভাবে, অন্নাভাবে অনেক গরীব গৃহস্থ এইসব পিশাচিনীদের হাতে কন্যায় বিলাইয়া দিয়া যায়—অনেকবার পারুল এ কথা অনেকের কাছে শুনিয়াছে, তাহাকেও কি তেমনি কোন হতভাগা এই পাপের অমরায় বিলাইয়া দিয়া গিয়াছিল? একটু নুন জুটে নাই? গলায় জল ছিল না? মাটিতে গর্ত্ত ছিল না? সন্তান-মায়া! বেন্যাকে দিতে মায়া জন্মে নাই? কন্যা দেহের ঘামে রক্ত জল করিয়া খাইবে ইহা জানিয়াও মায়া ছিল?.. তবু সে সত্য সত্যই শুনে নাই যে গৃহস্থের ঘরে, কোন দুর্ভাগিনী কুলবতীর দেহের মধ্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল! তাহারই বুকের রক্তে সে প্রথম নয়ন মেলিয়া পৃথিবী দেখিয়াছিল! তবুও সে সত্য সত্যই জানিতে পারে নাই যে সেই তিন বৎসর কাল এমন স্থানে ছিল সে যেখানে পাপের সংস্পর্শ ছিল না, দাম্পত্য বিবাহের বন্ধন স্বরূপ তাহাকে জন্ম দিয়া তাহার পিতামাতা তাহাকে তিন বৎসর কষ্টে-সৃষ্টে মানুষ করিয়াছিল; এত বড় ছলনা-পূর্ণ জীবনের সেই তিনটা বছর তাহার আসল জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল—এসকল কোন কথাই সে জানিতে পারে নাই—শুধুই কল্পনা আর চিন্তা। কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে এমনই হইল, ছাদে উঠিয়া সেই যে নীচের খোলা ঘরে একটি দুঃখী পরিবারের ছবি দেখিয়াছিল, মনে হইল, ঠিক যেন অমনি কোন একটা দুঃখের ঘর সে উজ্জ্বল করিয়াছিল, অমনি কোন-এক রুগ্নকায়া সুন্দরী বধূর বুকের ধন ছিল সে! অভাগিনী অবশেষে তাহাকে বুক হইতে ছিনাইয়া বেচিয়া ফেলিয়াছে! খাইতে দিতে পারে নাই, পরিতে দিবার কিছু ছিল না, ঘরে স্থান ছিল না যে ঠাঁই দেয়—অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা! কতকগুলা মরিয়াছিল, কতকগুলাকে এমনি করিয়া বিলাইয়া দিয়াছে, যেগুলা বাকী ছিল—ছেলে, তাহাদেরই আধপেটা খাওয়াইয়া ছাকড়া পরাইয়া ঘরেই থাকিতে দিয়াছিল! তা'দের ত বিবাহ দিবার ভয় ছিল না, তা'দের রূপের ত শঙ্কা ছিল না, যৌবনেরও আতঙ্ক ছিল না! আর পোড়া মেয়ে! তার রূপ, তার যৌবন সবই যে—বিভীষিকা! বিবাহ দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন! রূপ গরীবের ঘরে শোভা পায় না, যৌবনও সকল অঞ্জালের মূল—দাও বিলাইয়া! দাও যেন্তার হাতে—ব্যস্!

চোখ কাটিয়া রক্ত ঝরিল, রক্তহীন মাথাটা বালিসের উপর গুঁজিয়াছে, কালীচরণ ডাকিল—দিদি!

সমস্ত দেহটা একবার চিড় চিড় করিয়া উঠিল, তখনি আবার যেন নব-উদ্যমে বল পাইয়া পারুল শয্যা ছাড়িয়া দ্বার খুলিয়া ডাকিল—কালীচরণ!

হাঁ।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। পারুল শুইয়া পড়িল। দুই জোড়া জুতার শব্দ না?

চড়াৎ করিয়া খানিক রক্ত তাহার মাথায় চড়িয়া গেল। সে আনন্দ না দুঃখ—কিছুই না বুঝিয়া চক্ষু মুদিল।　　(ক্রমশঃ)

(স্বদেশ)

আচ্ছা বল'ত কলকাতাতে সব চেয়ে বড় লোহার বাড়ী?

"রায় বাবুর লোহার কারখানা।"

সে বাড়ীটি কয় তালা?

"তার কোন ঠিক নেই। ওখানে বহু পরিমাণে তালা প্রত্যহই তৈরী হচ্ছে।"

"বরণ"

[শ্রীভক্তিসুধা রায়]

হরি বিহীন নিশীথ আজি প্রাণে প্রাণ ভরে,
চিত্ত সখী অতীত স্মৃতির মধুর গান করে।
অতীত দিনের গোপন কথা মুছি পড়ে অন্তরে,
তাই ত আহীর লিখিত হ'য়ে বর্ষ মাঝে বর্ষরে।
আজ যে তারা ভুলেই গেছি সেদিন ছিল স্বজন যা'—
আজ যে তারা বাহিরে গেছে সেদিন ছিল জীবন যা।
সেদিন ছিল হর্ষের ধারা উল্লসিত মন মাঝে,
উদ্বেলিত সুখ তারা আজ যে হৃদে বীণ্ বাজে।
আজও হিয়ে আমার যারা সবল তারা কোন পাপে,
হাসির আড়ে নয়ন ধারা ঝরণ আজি কার শাপে।
সরমা মোর রহিম্ ছিল মণি-মুক্তার হারখোনা,
কোন্ সে আজি পড়্ল ঝরে' বর্ষ সে সব দিন গোণা।
যা ছিল মোর অতীত মেহের লয় হ'ল তব সে,—
সাজ্ল দৃষ্টি নবীনেরই অলঙ্কারেই নব সে।
দুঃখ জল বহু হ'য়ে অন্ধকারের মুছলে,
স্মরণ করে' তাদেরই যারি প্রীতির মালা-বন্ধনে।

মরা মানুষ বাঁচান সম্ভব কি ?

হৃৎক্রিয়া বন্ধ করা এবং ইচ্ছামত পুনর্জীবিত করা একালে অসম্ভব ছিল। আধুনিক অস্ত্র-পারদর্শীতার ফলে মরা মানুষকেও বাঁচান সম্ভব হইয়াছে। অপঘাত মৃত্যুর পর এইরূপ অস্ত্র-চিকিৎসা করিলে অনেক সময় মৃত ব্যক্তি নব-জীবন লাভ করে। এ কাজটা এখন বেশী শক্ত বলিয়াও বিবেচিত হয় না। মানুষের শরীরে রক্ত চলাচল করাই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। যাহার হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে সেই লোকের বুকটি লইয়া তাহার পেটিকে ফুঁকাইয়া ও ফুলাইয়া আবার জীবন্ত মানুষের মতই রক্তসঞ্চালনের উপযোগী করিতে পারেন, মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়। বিগত যুদ্ধের সময় যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিয়া তাহাদের বাঁচাইয়াছিলেন, এমন অনেক লোককে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাহাদের পাকা বার্দ্ধক্যে ধমনী সকল শক্ত হইয়া যাওয়ায় রক্ত [illegible] এই উপায়ে বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা [illegible] নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাসযন্ত্র ছিন্ন আবার [illegible] পারে। মৃত্যু নিশ্চিতভাবে [illegible] যায় যে [illegible] নাড়ি, যাতায়াতযন্ত্র তাহা নয়। [illegible] সকলেই তাহার [illegible] ও মন আছে।

প্রাতঃস্নান

নিমতা বিয়েটার যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানকে "কাশীতলা" বলে। ঐ স্থানে মহারাজা নবকৃষ্ণদেবের কাশী হইয়াছিল। ঐ স্থানে কোন লোক ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া কখনও বাস করে নাই। রাস্তার উপরে সম্মুখ ভাগে দুই চারিখানি ক্ষুদ্র দোকান ছিল, তাহার পশ্চাতে ছিল "বিঠাকুণ্ড" বা বিষ্ঠা-কুণ্ড"। লোকেরা রাত্রে মলমূত্র পরিত্যাগ করিত। প্রথমে ঐ স্থানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার" নির্ম্মিত হয়। তাহা খোলার চালের ছাউনি বিশিষ্ট ছিল। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন কি, কাঁশীতলার প্রথম বিল্ডিং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অগ্নিগ্রাসে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল। সেই থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ পাইলে, নিমতা থিয়েটার প্রস্তুত হয়। তাহাও আগুনে ভস্মীভূত হইল। থিয়েটারটী যখন ইন্সিওর করা হয় নাই, তখন নির্ম্মাতার আর্থিক সম্বন্ধেও সন্দিহান হইতে হয়। —সম্পাদক

আমরা অবগত হইলাম, ঐ স্থানে স্বর্গীয় নবকৃষ্ণের বাগবাড়ীর ভিটা, তাহার কাশী হইয়াছিল কালীতলার গাছে, বিয়াই বিলের পশ্চিম পারে। রাজার আবাস স্থান বলিয়া ঐ স্থানের নাম "কাশীতলা" হইয়া থাকিবে। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' ভস্মীভূত হইয়াছিল, একথা সত্য নহে। তবে ঐ স্থানে থিয়েটার করিয়া এক শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে যাত্রাভিনয় আর কেহ করিতে পারেন নাই। তবে আমরা শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিতেন, এই রঙ্গমঞ্চে 'অদৃষ্টদেবতা' আছেন। বিদেশীয়ারে গৈরিকপতাকা ধারণ কোন কোন অভিনেতাও দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃত মোহন বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রনাথ পাঁড়েও একদিন দেখিয়াছিলেন।—সম্পাদক— "আনন্দবাজার পত্রিকা"

এই আলোচনা হইতেছে, আমাদের [illegible] বহু শুনিয়া বলিলেন—গিরিশচন্দ্র যে [illegible] বলিতেন, তিনিও তাহার অধিক [illegible] নিমতা থিয়েটার যে [illegible] ছিল, তাহার ঠিক পার্শ্বেই ছিল রাজা নবকৃষ্ণের (নবকৃষ্ণের পুত্র) [illegible] লিঙ্গ। রাজা রাজবাস, তাঁহার একাও অট্টালিকার উপর [illegible] করিতেন। একদিন অমাবস্যার অন্ধকারে [illegible] পতিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। [illegible] যে মহাপুরুষটী গিরিশবাবু দেখিয়াছিলেন [illegible] রাজা নবকৃষ্ণের প্রেতাত্মা [illegible]

—সম্পাদক—বাণী।

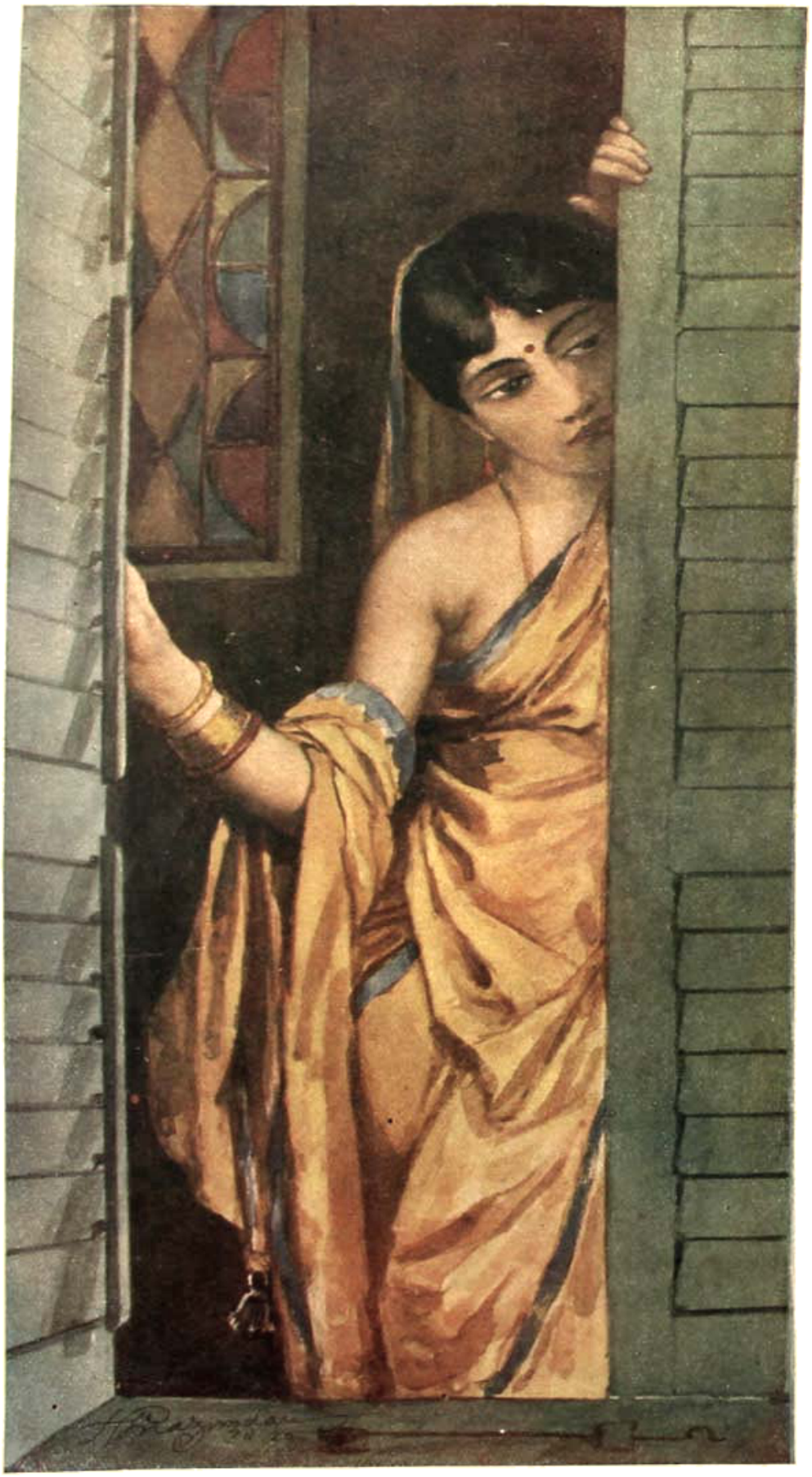

আশা-পথে
শিল্পী—
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ
মজুমদার।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩২৯, ইং ৪ঠা নবেম্বর। [১৫শ সংখ্যা

অনূঢ়া—বঙ্গবালা।

হুড্রু প্রপাতের একাংশ।

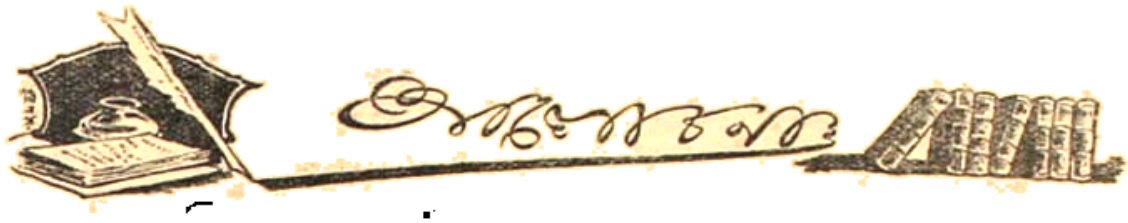

ভারতবাসী আজ দুঃখে মৈয়মাণ ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হইয়া অধীর আকুল আগ্রহে স্বরাজ চাহিতেছে। স্বরাজ যদি তাহাদের পেটের ক্ষুধার জ্বালা মিটাইতে পারে, যদি তাহাদের পরিধানের বসন দিতে পারে,—যদি তাহারা একটু সুখ স্বাচ্ছন্দে মানুষের মত মানুষের জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। জগতের সকল জাতিই চলিতেছে, বলিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে, আপন উল্লাসে আপনি প্রমত্ত হইয়া নিজ নিজ ভাগ্যও পথ নির্ণয় করিয়া লইতেছে। মানুষ চাহে মানুষের মত ক্ষমতা—মানুষ চাহে মানুষের মত স্বাধীনতা। মনুষ্য জীবনের এই যে সহজাত ইচ্ছা ও প্রবণতা ইহার গতি ও বেগ চিরদিন রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না—তাহা সম্ভব নহে।

• • • •

মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তি ও মুক্তির জন্য ভারতবাসীর পক্ষে অ-সহযোগ পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অ-সহযোগের অর্থ ইহা ছিল না যে ইহা দ্বারা প্রবল ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়াইতে হইবে, সে অ-সহযোগের অর্থ আপনার পায়ে ভর করিয়া আপনি পরের সাহায্য ব্যতিরেকেও দণ্ডায়মান হওয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানেই চলে। সমানে অসমানে চলে না। নিজ ক্ষমতায় আগে দাঁড়াইলে পরে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাট ক্ষমতাশালী জাতির সহিত চলিতে পারে—পূর্ব্বে নহে। তাই নিজ যোগ্যতাই আগে অর্জ্জন করিতে হইবে। পরমুখাপেক্ষীর মত দয়ার পাত্র ও ঘৃণার পাত্র জগতে আর নাই। বিরাট ভারতের অগণিত জনসংঘকে যদি চিরকাল এমনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া কাটাইতে হয় তবে ভারতের পক্ষে ইহা অপেক্ষা চরম দৈন্য ও দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত বিবেচনাই মহাত্মা অ-সহযোগ মন্ত্রের প্রচারে আপনাদের মধ্যে কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন ও দেশবাসীকে কর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়ার মন্ত্র দান করিয়াছিলেন।

আজ দেশের জনগণ মনোমন্দিরের দেবতা মহাত্মা দেশবাসীর মধ্যে কর্ম্ম ও ত্যাগের মন্ত্র দিতে আসিয়া কারায় অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। মহাত্মার দণ্ডের কাল বড় দীর্ঘ—অর্দ্ধ যুগ, দিন ধীরে অতি ধীরে অতিবাহিত হইতেছে। দেশের কাল রাত্রির যেন আর অবসান হইতেছে না। মহাত্মা জাতীয় জাগরণের কয়েকটি অতি সরল সহজ পন্থা দেখাইয়াছিলেন। জাতি ও দেশ স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করে—হেলায় সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, অর্থ মান সম্মান, সুখ প্রতিপত্তি বিলাস বসন সম্ভোগের মায়া এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ছুটিয়া যায়। জগতের জাতিদিগকে স্বাধীন থাকিবার জন্য নিজ মান সম্মান বজায় রাখিবার জন্য এমন ভাবে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হয়। আর ভারত স্বরাজ চাহিতেছে অথচ সে নিজ পরিধেয় বসন নিজে করিতে পারিবে না—নিজের মুখের গ্রাস নিজে হাতে তুলিয়া খাইতে কষ্ট বোধ করিবে। জাতির স্বরাজের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা যদি শুধু আকাশ কুসুমই হয় তবে স্বতন্ত্র কথা আর যদি সত্যই তাহা দেশবাসীর প্রাণের কামনা হয় তবে দেশবাসীকে নিজ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে, পরের পানে চাহিয়া অনুগ্রহার্থী হইয়া থাকিবার মোহ সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে।

• • • •

'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, দেশীবস্ত্র, হিন্দু মুসলমান মিলন' এই তিনটি মহাত্মার চরম কথা। এ কথাগুলির সারবত্তা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিভিন্ন দেশীয়েরা যে ভাবে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে ইহার মধ্যে সেরূপ কোন রক্তপাতের প্রয়োজন নাই,—ইহা একান্ত ভাবে দেশবাসীর নিজস্ব কথা। দেশবাসীর হাতেই ইহার সার্থকতা ও ফল নিহিত রহিয়াছে অথচ দেশ ইহাতেও তেমন উৎসাহ ও কর্ম্মক্ষমতা দেখাইতে পারিতেছে না। আজ মহাত্মাকে দেশবাসী কি গৌরবে

কি ক্ষমতায় মুক্ত করিতে চাহিবে, আজ মহাত্মা যদি মুক্ত হইয়া আসিয়া দেশবাসীর সম্মুখে দাঁড়ান তবে কি দেশবাসীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে না ?

• • • •

নিখিল ভারতের কংগ্রেস কমিটির গয়ার অধিবেশনে অ-সহযোগীরা কৌন্সিলে পুনঃ প্রবেশ করিবেন কি না ইহা লইয়াই তুমুল আন্দোলন হইবে। মহাত্মার আন্দোলনে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁহারা এই অ-সহযোগের সহায়করূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাদের কর্ম্মে এ বিধান ছিল না যে তাঁহারা পুনরায় সহযোগীরূপে কৌন্সিলের সভ্য পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন, তবে কৌন্সিল প্রবেশার্থীদিগের একটা যুক্তি হইতে পারে তাহারা কৌন্সিলে গিয়া দেশের কাজ ভাল করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব হইবে ? তবে আর খ্যাতনামা কৌন্সিল সভ্যগণ পদ ত্যাগ করেন কেন ? তবে আর কৌন্সিল হইতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক জননেতাগণের কারাগণ সমধিত ও সংঘটিত হইল কেমন করিয়া ? এ একটা আলেয়ার আলো—ইহা জানিতে বন্ধুপরিকর অ-সহযোগীরা কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দেশবাসীদিগের পক্ষে আর কৌন্সিল প্রবেশ এখন আলেয়ার আলো নাই;—সুতরাং কংগ্রেস ইহাতে অথথা সময়ক্ষেপ না করিয়া দেশের সত্য গঠন মূলক কার্য্যধারারই নির্ণয় ও ব্যবস্থা করিবেন সেই আশাই দেশবাসী কংগ্রেসের নিকট হইতে করিতেছে।

• • • •

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুতা সরোজিনী নাইডু বলিয়াছেন মায়ার উপাসনা করিও না—একার্য্য যদি দেশবাসী করে তবে তাহারা কংগ্রেসকে সমাধিস্থ করিয়া দিবে, যদি তাই হয় তবে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ দেশবাসীর অদৃষ্টে নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও লাহোরের বক্তৃতায় এই কথাই কহিয়াছেন—দেশবাসী ব্যাকুল চিত্তে এবারকার গয়া কংগ্রেসের কর্ম্ম পদ্ধতির পানে চাহিয়া আছে।

• • • •

পঞ্জাবে আকালী নিগ্রহ এখনও সমভাবে চলিতেছে। প্রত্যহ একশত ছুচ্ছিশন আকালী জেলে যাইতেছে। নিরস্ত্র আকালীদের উপর অত্যাচার যাহা হইতেছে সংবাদ পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহা সত্যই হৃদয় ভেদী। কোন সত্যের সন্ধান পাইয়া বীর শিখ জাতি এই নির্য্যাতন সহিতেছে কে জানে ?

• • • •

বাংলার ভীষণ বন্যার প্রকোপে অন্নহীন, গৃহহীন বস্ত্রহীন, দেশবাসীর দুরবস্থা অবর্ণনীয়। চারিদিক হইতে অর্থ উঠিতেছে, স্বেচ্ছাসেবী কর্ম্মীরাও দুর্দ্দিনের দুর্দ্দশা নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বন্যাপীড়িত দুস্থ দেশবাসীদিগের দুর্দ্দশা কবে প্রশমিত হইবে কবে ইহারা দেশবাসীর সাহায্যের হাত মুক্ত হইয়া আবার পূর্ব্বের মত স্বাধীনভাবে নিজগৃহে দাঁড়াইতে পারিবে, নিজ ক্ষেত্রের ফসলে নিজের উদর পূর্ত্তি করিতে পারিবে কে জানে ?

• • • •

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে অসুস্থ অবস্থায় কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল না। তখন হইতে কথা উঠিয়াছে এমন কাণ্ডটি করিয়াছিলেন কে—রাজ্যের ভূস্বামী কাশ্মীর মহারাজ না রাজ্যের বিধান নিয়ন্তাদিগের মধ্যে মহারাজের মত ক্ষমতাশালী বা তাঁর চেয়েও অধিক ক্ষমতাশালী কেহ ? দেশবন্ধু বলিয়াছেন কাশ্মীর মহারাজ তেমন আদেশ দিতে পারেন না—এরূপ স্থলে বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ধারণা করিয়া লইতে হয়—নিশ্চয়ই কাশ্মীর রাজ্যের সর্ব্বক্ষমতাময় অপর কাহারও দ্বারাই এই চিত্তরঞ্জন বহিষ্কার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্যাপারটির আলোচনা হইতেছে—আলোচনার যোগ্য ও বটে এবং অন্যায়ও বটে কিন্তু ইহা প্রতিরোধের উপায় কি !

• • • •

রাজধানী কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথের উপর যদি কোন পুলিশ কনেষ্টেবল বা একদল পুলিশ কোন নিরীহ লোকের উপর অথথা অত্যাচার করে, যদি সেই নির্দ্দোষ লোকের চক্ষু ও পেটের উপর সবুট চরণে উঠিয়া নৃত্য করিয়া তাহার নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে তবে সেটা কি অন্যায়—সে ব্যাপার কি দোষের ! এমনি একটা মজার ব্যাপার ও তাহার বিচার সম্প্রতি রাজধানী কলিকাতাতেই হইয়াছে। বিচারক বলিয়াছেন ব্যাপার নৃশংস, অন্যায় ও অথথা—কিন্তু অপরাধী কনেষ্টেবলদের শাস্তি হইয়াছে মাত্র ৩০৲ ক্ষমতার

অপব্যবহারের শাস্তি যদি এই হয়, আইন ও পৃষ্ঠপোষক তার যাহাদের হাতে ন্যস্ত তাহারা যদি এই ভাবেই তাহা রক্ষা করে ও বরাবর বাধাহীন ভাবে রক্ষা করিয়া যাইতে থাকে তবে তবে আর দেশবাসীর ভাবনা কি !

• • • •

বঙ্গগৌরব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লর্ডসিংহ—রায়পুর) বহুদিন অসুস্থাবস্থায় লণ্ডনের নার্সিংহোমে বিরাজ করিতেছেন। সিংহ মহাশয় কর্মীপুরুষ—চির জীবন সিংহের মত অক্লান্ত শ্রম করিয়াছেন। কিন্তু বিরামের লাট প্রাসনদে বসিবার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। সহযোগী অমৃতবাজার সিংহ মহাশয়কে একটু সুস্থ হইয়াই আত্ম জীবন স্মৃতি লিখিবার অনুরোধ করিয়াছেন। মৃতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ, মিঃ চ্যাম্বারলেনের স্মৃতি প্রভৃতি এত অধিক মূল্যে বিকাইল, লর্ড সিংহের জীবন স্মৃতি তত অধিক মূল্যে না বিকাইলেও তাহা অতি মনোরম জিনিস হইবে সন্দেহ নাই। ভারত-নীতি, বৃটিশ রাজনীতি, জাগতিক রাজনীতি, সমাজ নীতি, প্রভৃতি বহু কথাই এই গ্রন্থে লোকে জ্ঞাত হইতে পারিবে, রাজনীতি ও সমাজ নীতির বহু গুপ্ত রহস্য ও তথ্য ও ইহাতে উদ্ঘাটিত হইবে। এমন একখানি বহি কি সিংহ মহাশয়ের দেশবাসী তাহার নিকট পাইবার আশা করিতে পারে না ?

সেই মনুষ্য কি আসিয়াছে ?

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত নরনারীগণের সেবায় সাহায্য-কল্পে, কলিকাতার বারবণিতারা দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। শান্ত ও বিনীত ভাবে দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া, গলবস্ত্রে ভিক্ষা চাহিতেছে—এ দৃশ্য, অপূর্ব্ব, অভিনব। কেন এমন হইল ? কাহার আহ্বানে, কিসের প্রেরণায় ইহারা আজ রাজপথে ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া ভ্রমণ করিতেছে ?

যে শক্তির স্ফুরণ হইলে, পতিতা বারনারী পর্য্যন্ত মহা মানব পরিবারের সহিত আপন একত্ব অনুভব করিয়া, কর্ত্তব্য বোধে সেবায় অগ্রসর হয়, পুনরায় কি সেই শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে ? সেই মনুষ্য কি আসিয়াছে ?

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এই ভারতবর্ষে একজন মানুষ আসিয়াছিলেন, যিনি প্রকাশ্য রাজসভায়, ভারত সম্রাটকে বিনীত সারল্যের সহিত বলিয়াছিলেন, মহারাজ ! অদ্য আমি বেশ্যা অম্বাপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি কাজেই আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না। সেদিন বেশ্যা, পতিতা—গণিকা বা গণশক্তির সেবিকা হইয়াছিল। প্রতিভাশালিনী, কলাবিদ্যাভিজ্ঞা, বৈদগ্ধিনীরা সে যুগে ভগবান বুদ্ধদেবের চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া ভারতের ইতিহাসে কি কার্য্য করিয়াছিল, জাতীয় জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এখন কি রাষ্ট্র পরিচালনেও তাহাদের হস্ত কতখানি ছিল, আজ পর্য্যন্তও কেহ তাহা সম্যক আলোচনা করিবার অবসর পান নাই, অথবা করেন নাই। কিন্তু সেদিন ভগবান বুদ্ধদেবের অতুলনীয় সাম্যবাদের মহিমায় সমুজ্জ্বল ভারতবাসী পতিতাকে ত্যাগ করে নাই। সমাজ-জীবনে তাহাকে যথাযোগ্য স্থান দিয়া তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সেদিন বেশ্যা শুধু লম্পটের লালসার ইন্ধন ছিল না—তাহার কর্ত্তব্য ছিল, অধিকার ছিল—চারুশিল্প ও কলাবিদ্যা তাহাদেরই আয়ত্ত ছিল। সেদিন তাহারা গণিকা ছিল।

গ্রীক্‌গণ যখন সজীব ছিলেন, তখন গ্রীক্-বারাঙ্গনারাও সমাজ-জীবনের অনেক বিভাগে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস নিজেকে বৈরিণীর শিষ্য করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই; বৈরিণী নায়ীর সেদিন গ্রীক্-সমাজে দর্শন শাস্ত্র পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার অধিকার ছিল। প্রাচীন রোমের গৌরব যখন সমগ্র বিশ্বে সভ্যতা লোক বিস্তার করিয়াছিল, তখন রোমক্-প্রধানগণ সুশিক্ষিতা বৈরিণীদের শ্রদ্ধা করিতেন ; পতিতা বলিয়া উপহাস করিতেন না। ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয়।

আর সেই নারায়ণীর বিত্ত—তিনিও বারাঙ্গনাকে আশীর্ব্বাদে ও করুণা করিতে বিধা করেন নাই। তিনি তাহাদিগকেও স্বর্গরাজ্যের নিরীহ সেবাপরক হইবার অন্ত

আহ্বান করিয়াছিলেন। খৃষ্ট শিষ্যা বেশ্যা সামরীয়ার কাহিনী পবিত্র বাইবেল গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে।

দার্শনিক চূড়ামণি রামানুজ, ভক্ত কবীর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সকলেই বেশ্যাকে নারীর মর্য্যাদা দিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেশ্যাগণকে ঘৃণা করেন নাই, ধর্ম্ম সাধনার অধিকার দিয়াছিলেন।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর পতনের যুগে সংস্কারচ্ছলে কত সাম্যনীতি প্রচার হইয়াছে, কাহারো আহ্বানে বেশ্যার নারীত্ব জাগে নাই; কেননা, কোন কণ্ঠ হইতেই সে আহ্বান ধ্বনিত হয় নাই।

তারপর শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, তাম্রকূট ধূমপাননিরতা বারবনিতাকে আদ্যা-শক্তির বিকাশ বলিয়া প্রণাম করিলেন, 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা কর্ম্মবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দেও এই কৃপা, এই অনুকম্পা লক্ষ্য করিয়াছি। সে সব কাহিনী বলিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না। কেবল একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বামিজী তখন ইউরোপে,—কলিকাতার ভদ্রমহোদয়গণ আপত্তি তুলিলেন, রামকৃষ্ণ অন্নোৎসবে বেশ্যাগণ এত অধিক সংখ্যায় আসিতেছে যে ভদ্রলোকগণ তথায় যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। এমন কি উৎসবক্ষেত্রে যাহাতে বেশ্যার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় তজ্জন্য সন্ন্যাসীবর্গকে সাধারণের তরফ হইতে অনুরোধ করা হইল। স্বামিজী এ সংবাদ অবগত হইয়া লিখিলেন, "ঠাকুরের নিকট সকলেরই অবারিতদ্বার—আসুক চোর, আসুক বাতাল, আসুক লম্পট আসুক বেশ্যা! তাহারাই তো ঠাকুরের অধিক কৃপার পাত্র—তথাকথিত ভদ্রমহোদয়গণ না আসিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।" আজ পর্য্যন্তও দলে দলে বেশ্যা বেলুড়মঠে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম গ্রহণ করিতেছে, সন্ন্যাসীরা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিয়া থাকেন।

তাহার পরই সত্যাগ্রহী বীর বৈষ্ণব মহাত্মা গান্ধির অভ্যুদয়। ভারতবক্ষে অসহযোগ আন্দোলনকে জাগ্রত করিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে বেশ্যাগণকে পর্য্যন্ত আহ্বান করিতে তথাকথিত নীতিবিকারগ্রস্ত ভদ্রমহোদয়গণের ন্যায় সঙ্কুচিত হন নাই। সে আহ্বান আন্তরিক ছিল, তাই স্বরাজ ভাণ্ডারে পতিতানারী তাহার অলঙ্কার দান করিয়াছে। বেশ্যার মধ্যে নারীত্ব জাগ্রত হইয়া চরকা কাটিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এ সংবাদও আমরা রাখি। স্বদেশ সেবাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার অধিকার যিনি বেশ্যাকে পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া সেদিনই মনে হইয়াছিল, সে মনুষ্য কি সত্যই আসিয়াছে?

আসিয়াছে—সেই মানুষ আসিয়াছে। কারাপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকিয়াও তিনি তাঁহার কল্যাণবাণীর জগতে বিকীর্ণ করিতেছেন,—সেই মানবতার মূর্ত্ত বিগ্রহের অমোঘ নিগূঢ় শক্তিই আজ বারাঙ্গনার এই প্রশংসনীয় কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়াছে। জানি ইহা বিশ্বাস করিতে অনেকের কষ্ট হইবে, অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখিবে, ইতিহাস বিচার করিবে,—ইহা সত্য।

বেশ্যাসম্প্রদায় সমাজে ততদিন—যতদিন পৃথিবীতে মানুষের বাস। ততদিন থাকিবে, যতদিন মানুষ থাকিবে। বারাঙ্গনা আজ কর্ত্তব্য ও অধিকার বঞ্চিতা, পতিতা। সমাজের সকল স্তরই পরাধীনতা ও অধঃপতনের ফলে আজ কর্ত্তব্য ও অধিকার বঞ্চিত। আজ বারাঙ্গনা বাহিরে আসিয়াছে, কর্ত্তব্যপালন করিতে, কাল ইহাদের মধ্যে নারীত্বও জাগিবে, এ বিশ্বাস আবেগন তাহারই পূর্ব্বাভাস। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগে, অনেকের ঘৃণা, বিরক্তি, ব্যঙ্গ, ইহাও অনুদার উপেক্ষা করিয়া সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও অধিকার বুঝিয়া লইবে; কেননা, আবার সেই মনুষ্য আসিয়াছে।

কাণে কাণে

[শ্রীলীলা দেবী]

কি গান যে গাইলে তুমি
আমার কাণে কাণে
সুরটী যে তার বাজ্‌লো আমার
গভীর প্রাণে প্রাণে।

ফুলের আকুল গন্ধ বেয়ে
বাতাস চলে জগৎ ছেয়ে
চাঁদের হাসি পড়্‌ল লুটে
গানের তানে তানে।

গ্রন্থ সমালোচনা

শতদল। শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরী রচিত। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি কবিতার বহি। বয়স্ক বন্ধুর অবসর কাল রচিত কয়েকটি হৃদয়-কথা। আডম্বর শূন্য সরল, সহজ, হৃদয় স্পর্শী কবিতাকটি পড়িয়া আমরা সুখানুভব করিয়াছি। নিরক্ষরা পল্লী বধূর শান্ত শ্রী বিমণ্ডিত মুখ দেখিলে কাহার না চক্ষু শীতল হয়? মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে? এই গ্রন্থের কবিতা ক'টি যেন গোধূলির শীতল ছায়াপথ বিহারিণী পল্লী-রাণী, গমনে সঙ্কোচ নাই, অথচ তাদের ভাব ব্রীড়া নম্র ধীর, অঙ্গ অলঙ্কার বিহীন তবুও রূপসী তার কূলে কূলে ঢেউ তুলিয়া তাহাকে শোভন করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গবাণী সম্পাদক হেমেন্দ্রবাবু গ্রন্থটির ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন, 'তুলনায় সমালোচনা করিলে বা কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনার আদর্শ দেখিলে এগুলির প্রতি এবং লেখিকার প্রতি অবিচার করা হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া···বৈশিষ্টতা বর্জ্জিত নহে'—কবিতাগুলির মধ্যে কবির হৃদয়ের স্পন্দন আছে, ভাব আছে, সব চেয়ে বেশী আছে—হিন্দু মেয়ের পবিত্রতা ও শুচিতা। আমাদের-মা-বোনেরা তাঁদের একটি বোনের লেখা কবিতার বহিটি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সঙ্গীত সোপান

গীত সূত্রসার, সেতার শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা সঙ্গীতাচার্য্য ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র আমার মৌরীপুরাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাতচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত। পুস্তকখানি প্রথম সঙ্গীত শিক্ষার্থীর বড়ই প্রয়োজনীয়। যাহারা শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই পুস্তক খুব সহজে অনায়াসে উহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন, কারণ স্বরলিপি দৃষ্টে সঙ্গীত অভ্যাসের প্রধান কাঠিন্য মাত্রা শিক্ষা করা, তালরূপ মাত্রা অভ্যাস না হইলে স্বরলিপি হইতে সঙ্গীত শিক্ষা কঠিন ব্যাপার, বলিতে গেলে একেবারেই অসম্ভব, এই পুস্তকে মাত্রার বিষয় খুব বিশদ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এবং যে স্বরলিপিতে মাত্রা এবং সুর একসঙ্গে এবং খুব সহজে প্রকাশ করা যায়—বৈদিক স্বরলিপি (Staff Notation)—তাহাই এ পুস্তকে অবলম্বিত হইয়াছে। এই পুস্তক দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে সঙ্গীতের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এই পুস্তকে কেবল মাত্র প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে যতটুকু জানা আবশ্যক-তাহাই লিখিত হইয়াছে, যাহারা হিন্দু সঙ্গীতের বিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন উক্ত সঙ্গীতাচার্য্য প্রণীত "গীতসূত্রসার" দেখেন। আমরা প্রথম সঙ্গীত শিক্ষার্থীর জন্য যতগুলি পুস্তক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এখানি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতি কঠিন বিষয়গুলিও অতি সহজে ও নূতন শিক্ষার্থীদের জন্য সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের অতি পুরাকাল হইতে রাজা-রাজড়ারা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করিতেন না। গৌরিপুরাধিপতি রাজা প্রতাতচন্দ্র বহু শ্রম স্বীকার করিয়া অতি যত্নের সহিত এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। করিয়া একটা মস্ত অভাব দূর করিয়াছেন। রাজা প্রতাতচন্দ্রের এই সাধু উদ্যমের জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন। সঙ্গীত সোপানের ছাপা ও কাগজ উত্তম হইয়াছে। মূল্য ১৲। গুরুদাস লাইব্রেরি, ফ্লোয়ারকিন স্কোং এবং শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "৮।১ এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা, ইহাদের নিকট প্রাপ্তব্য।

পুষ্পকলম—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, সিদ্ধির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত এক টাকা সংস্করণের উপন্যাস। নারী-মোহে পড়িয়া একবার ক্ষণিকের জন্য ভুল করিলেই যে তাহাকে আজীবন সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে গ্রন্থকার এ নীতি সমর্থন করেন নাই। ভুল মানুষ মাত্রেই করিয়া থাকে কিন্তু যে তাহা সংশোধন করিয়া আবার মানুষ হইতে চাহে তাহাকে সে অধিকার দেওয়া হইবে না কেন? গ্রন্থের নায়ক নায়িকার ছবি ফুটিয়াছে ভাল। ছাপা কাগজও সুন্দর।

ফুটফুটে ছাঃ-ছানা। "খোকা ভাই" এর লেখা খোকা-ভাইদের জন্যে এই যে বহিটি বেরিয়েছে, তার দাম দু' আনা। গল্পটি ভারি জমাটি। এত জমাটি যে যখন বহিটি শেষ হ'বে তখন ভারি দুঃখ হ'বে যে এত শীঘ্র শেষ হ'য়ে গেল—যাঃ! এই বহিটির ছবিগুলি সবই খোকা-ভাইয়ের নিজের আঁকা—ভারি নূতন রকমের ছবি। দেখ্‌বে আর হাস্‌বে—ছেলেরা এই ফুটফুটে চা-দানি পেলে যে সন্তুষ্টই হ'বে তা আমরা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

পল্লিশ্রী। সচিত্র মাসিকপত্র। ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল ও সুরেশচন্দ্র গুহ সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ টাকা। মফঃস্বল হইতে যতগুলি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে "পল্লিশ্রী" একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "কাঁটার ফুল" উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। পল্লিশ্রীতে প্রকাশিত গল্প প্রবন্ধ, কবিতা সমস্তই সাহিত্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের আর ইহার পল্লীকথা, পল্লীসমাচার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অল্পদিনের মধ্যেই পল্লীশ্রী যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহাতে আশা হয় অতি শীঘ্রই পল্লিশ্রী প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র মধ্যে পরিগণিত হইবে।

দ্রব্য-সমালোচনা

ভিনিগার। গুলিস্তান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী প্রস্তুত "ক্লাব" ও "সিভিল এণ্ড মিলেটারী" ব্রাণ্ড দুই-বোতল ভিনিগার ব্যবহারার্থ পাইয়াছিলাম। ভিনিগার আজকাল অনেকেই খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সালাড, ভর্জ্জিত মৎস, চপ্, কাটলেট, অম্লবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অনেকেই ভিনিগার পছন্দ করেন। ভিনিগার এবং ঐ ধরণের দ্রব্যসমূহ যদিও বিলিতি আবহাওয়ায় এদেশে আসিয়া পঁড়িয়াছে কিন্তু সেগুলি এমনই ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের উপেক্ষা করিয়া চলা একরূপ অসম্ভব। কাজেই সেই সব অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি যদি এদেশেই প্রস্তুত হয়, তবে আর দেশের পয়সা বিদেশে পাঠাইয়া সেগুলিকে আনাইতে হয় না। আমরা "ক্লাব" ও "সিভিল এণ্ড মিলিটারী" ভিনিগার ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং অকুণ্ঠোচ্চরে বলিতে পারি যে ইহা বেশী দামের বিলাতী ভিনিগার অপেক্ষা কোন অংশেই গুণে বা গন্ধে ন্যূন বা হীন হয় নাই। দামও বিলাতী অপেক্ষা বহুল পরিমাণে সুলভ। যাঁহাদের আহার্য্যের সহিত "ভিনিগার" খাওয়ার অভ্যাস আছে তাঁহারা অন্ততঃ একটিবার এই ভিনিগার দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখুন—ভিনিগার যে আমাদের কথায় সারবত্তা স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

দেশ-বিদেশ

কলিকাতা করপোরেশনের কোন প্রবীণ সভ্য সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের উপর ট্রাম ভাড়া আদায়ের ভার দিতে বলেন, 'কোন কোন সম্পাদক পয়সাও ভারবহ, কেহ কেহ খুব মোটা মাহিনাও পান, সুতরাং তাঁহাদের উপর ট্রাম বসান উচিত।' উত্তরে চেয়ারম্যান বলেন, যে সম্পাদকদের উপর কর বসান উচিত নয় তাঁরা সাধারণের উপকারার্থে যথেষ্ট কার্য্য করেন।' যিনি সম্পাদকদের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ না পাওয়াতে আমরা প্রস্তাব টেঁকে যাই।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু চেয়ারম্যানের বক্তৃতার টুপল্ কতকটা সম্বন্ধে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি লেজিস্লেটিভ কৌন্সিলে রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশের যে প্রস্তাব উঠিয়াছে সে প্রস্তাব তিনি দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ বন্যার সাহায্য সমিতিতে এ পর্য্যন্ত দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা উঠিয়াছে। আরও অর্থ, লেখক ও সাহায্য চাই।

ঐ একদিনে সাড়ে আট বৎসরের দুটি বালক সন্তান উইলি ও হ্যারি এ্যাসেন একই ভাবে কথা বলে, কথায় একই উত্তর দেয়, পরীক্ষায় একই নম্বর পায়। আশ্চর্য্য।

বরোদার মহারাণী তাঁহার রাজ্যের নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

ঘরিয়ালের জনসেবা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত পুনরায় সাময়িক পীড়িত। মুমূর্ষাবস্থায় সময় পাট হইতে পড়িয়া গিয়াই তাঁহার এ অবস্থা হইয়াছে।

কোন জার্মেন শতাধিক একজন জার্মেন মহিলাকে সাদি করেন। বিবাহে সভাস্থলের ৫০০ মার্ক খরচের কথা হইলে সাদিকিউর বলেন বন্ধুর দ্বারাকে সাদি করার জন্য মোটে পাঁচ হাজার বিবাহক সভাস্থলের জন হাজার মার্ক খরচবিবাদ করেন।

কলিকাতা সহরে এই যে বড় ইউরিয়া এজিবেশনের বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখিতেছি অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ ব্যাপারটা কি?

জার্মেন আইজার বিপত্নীক অবস্থায় আবার বিবাহ করিতেছেন। তাঁহার পত্নী রাজকুমারী মহারাজীন মলিনাছেন আইজার কৃতজ্ঞতাম, উভয়ের লোক তাঁই তাঁহাকে আমি জানাবোনি। তাঁহার আর্থিক অবস্থা এখন ভাল নয় সেজন্য আমি জানিত নহি। সৈশব হইতেই আমাদিগের স্নেহের পুতলী ছিল।

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী মল্ল ভীম ভবানী বাঙ্গ ৪ দিনের জন্য সেরেস্তায় করিয়াছেন। ভবানীর বলে মাত্র ৩১ বৎসর হইয়াছিল। অল্পবয়ে ভবানীর মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত—বাঙ্গালী তাহার গৌরবের একটি জিনিষ হারাইল।

আগামী ১৩ই মার্চের দুইমাসব্যাপী অধিবেশনে ব্যবস্থা পরিষদে সম্পূর্ণ নূতন সভ্য বসিবে। ভোটদাতা সকল শ্রেণীই এই সভ্যদের বেশ দিবেন।

ডলারাট্ট সাধক লেনিন বলিয়াছেন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দুর্ক জাতীয় দলের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া প্রণালীতে সকল জাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ মুক্ত রাখিতে হইবে। যুদ্ধ বা শান্তি কোন কালেই উহার মধ্য দিয়া সশস্ত্র সমরায়োজন যাইতে দেওয়া হইবে না।

যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব সভ্য প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে জৌনী জেলার মামলায় এ পর্য্যন্ত ৩০ হাজার ৭ টাকা খরচ হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী উকিল ২৫২০৭৭ পাইয়াছেন।

মোপলা হাঙ্গামায় আবার ৩ জনের ফাঁসী ও ৩ জনের যাবজ্জীবন হইয়াছে।

পাঞ্জাবের পক্ষ বড়লাট লর্ড রেডিংএর পদত্যাগ গুজবের প্রতিবাদ করিতেছেন।

লণ্ডন সহরেও ডোরাই আবিষ্কারের ব্যবসায় বেশ চলিতেছে! চীনারাই এ ব্যবসায় চালাইয়া থাকে।

ওয়ালেশীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের ক্ষমতার প্রাবল্যের প্রকোপ দেখিয়া যত প্রকাশ করিয়াছেন যাহাদের দেখিয়াই ছেলেদের কচি শিক্ষায় জন্মাইতেছে।

মেক্সিকোপুরে সম্প্রতি ১০০০৭ লুট ব্যাপারে একটি মেয়ে ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়াছে। এ নাকি বিখ্যাত মেয়ে ডাকাত।

বন্যার সোণাপাড়ি, নাগরিবিক্তি, অপার চিৎপুর রোড বাণী সমিতি এ পর্য্যন্ত যত অর্থ, চাউল, বস্ত্র প্রভৃতি দান করিয়াছেন।

লর্ড রেডিং বেরীর কার্যকাল অবসানে অধি কিশনিং সেন্ট এ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর নির্বাচিত হইলেন।

আলির ডেমন মাইয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার উনবিংশ বর্ষীয়া পত্নীও স্বামীশোকে কাতর কেরোসিনে দিক করিয়া তাহাতে আগুন দেন। তাহাতেই বালিকার মৃত্যু হইয়াছে।

যেমনী পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সোদিত অবস্থায় সম্পাদকীয় আসন দৃঢ়তর হইয়াছে। ইহার উপর একটু ঘরওয়া লিখিয়া সার্টেফিকেট প্রদান করেন। সম্পাদকীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সার্টেফিকেট পত্রকে ও সাবোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বলেন; ভাল সাবোধটি বাকি উপাদেয়। উত্তরে সার্টেফিকেট আসায়, যেমন যেমনীয় প্রতিভা; উহাতে সার্টেফিকেটের কথা প্রকাশের যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এই ব্যাপারে সম্পাদকীয় সম্পাদক সার্টেফিকেট পত্রের বাবে উকিলের চিঠি দিয়াছেন। দেখা যাক্ কি হয়।

২৭শে অক্টোবর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দিল্লী প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতায় অসহযোগ প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী কৌন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে বলেন—তোমাই, কলটিও করিও না—মাথার উপাসনা করিও না।

কলিকাতা লি মোরিয়াসের অধ্যক্ষের পত্নী মিসেস লি মহাবিদায় গ্রহণ হইতে লিখিয়াছেন "সময় সময় মানুষ আমাদের অসন্তুষ্ট পতির হইতেছে কেন প্রাণে ধরে ফিরিয়া আর আমরা সুখে স্বাচ্ছন্দে কাল কাটাইব। আর আমাদের আয়ের সমান ও বিলাস ব্যসনে অধিক অর্থ ব্যয় উচিত নহে। ইওরোপীয় মহিলার এই উক্তি দেশবাসী গ্রহণ করিবেন আশা করি।

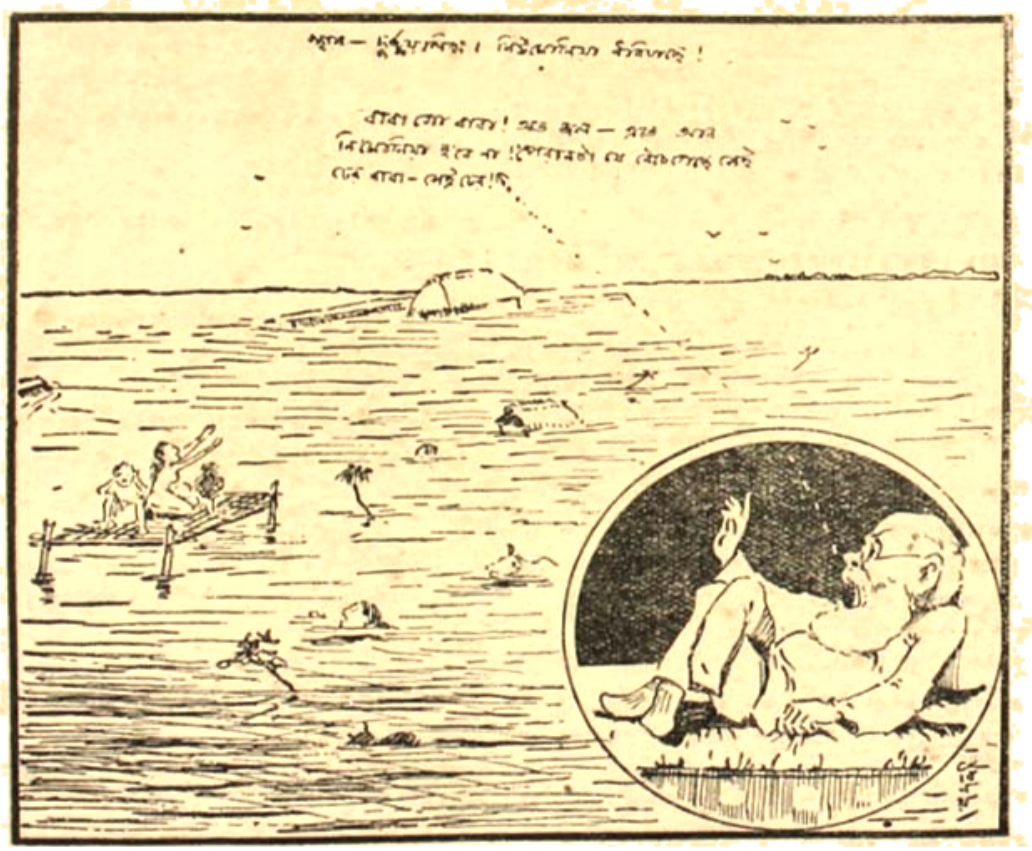

রোকশোধ

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"অনু, এখন কেমন আছ মা ?"

অনুপমা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল ; সেইভাবে থাকিয়াই যেন নিতান্ত উপেক্ষার সহিত পিসীমার প্রশ্নের উত্তর দিল, "ভাল আছি।"

মুখে খানিকটা আহ্লাদের হাসি হাসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "আহা, ভাল থাক বাছা, শুনেও বাঁচলাম। মা গো মা, যে কাণ্ড হ'য়েছিল,—আমি তো কেঁদেই বাঁচি না। বলি ও হরি, এ কি করলে ঠাকুর ? এই তো মহেন্দ্রের সেদিন বুকে বাজ হেনে চলে গেল, সে বাজের ঘা যেন এখনো শুকোয় নি। তার ওপর আবার এ কি বাজ হান্‌লে। আমি গোড়াকপালী পড়ে রইলুম, আর আমার লোণার পিত্তিমে—মা গো মা, মনে ক'রলেও বুক ফেটে যায়। তা বুড়ীর কান্না যে বাবা শুনেছেন, সেই ঢের। এম্‌নি স্তুতি মিনতি করি, সরকারের কাছ থেকে পয়সা দু'টা ঢেয়ে আনুক, স'পাঁচ পয়সার হরিলুট দিই।"

দেবতার উদ্দেশে পিসীমার এই মুক্ত হস্ততা দর্শনে অনুপমার হাসি আসিল। পিছনে থাকায় পিসীমা তাহার সেই উপহাসের হাসিটুকু দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "শুধু কি আমি, বাড়ী শুদ্ধ সকলেই হায় হায় কত্তে লেগেছে। দুপি তো কাল থেকে খায় নি বল্‌লেই হয়। এখনো চার হাত এক হয় নি, এরি মধ্যে কি টান ! এই দু'দিনে যেন আধখানা হ'য়ে গিয়েছে। বল্‌তে নাই, তবু লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বলি বাছা সোয়ামীর সুখ তুমি চায় গো পাবে। তখন বল্‌বে, হাঁ, সেই যে পিসীমা ব'লেছিল, তার একটি বর্ণও মিছে নয়।"

অনুপমার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। সে হাত বাড়াইয়া গায়ের চাদরটা মুখের কাছ পর্য্যন্ত টানিয়া দিল।

এত সহানুভূতি প্রকাশের পরও অনুপমার নিকট সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইয়া পিসীমা যেন একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। ক্ষণপরেই যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যে প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া অনুপমার পক্ষে শুধু লজ্জাজনক নহে, প্রগল্‌ভতার কার্য্য তখন তিনি পুনরায় উৎসাহ সহকারে বলিতে লাগিলেন, "তা দেখ বাছা, একটা কথা বলি, এখন ক'রে সব্‌বার সাম্‌নে আর বেরিয়ো না ; কার মনে কি আছে কে বল্‌তে পারে। কত রকমের কত লোক আছে, তন্তর্ মন্তর্ তুক্‌তাক্‌কে কি না হয় ? এই ধর না, তারক যদি ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়তো, তাহ'লে কি হ'তো বল দেখি ?"

পিসীমা সন্ত্রাসিত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। অনুপমা একটু চঞ্চলভাবে মুখের চাদরখানা সরাইয়া দিল। পিসীমা বলিলেন, দুপি বলছিল—শুধু দুপি কেন তারকও বলে, অনু একটু সেরে উঠুক, তারপর এর একটা বিহিত কত্তেই হবে।"

রুদ্ধকণ্ঠে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বিহিত ক'রবেন ওঁরা ?"

তাহার কথায় পিসীমা যেন কতকটা বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিলেন, "কিসের বিহিত কি গো ? তারানাথ এই যে এত বড় কাণ্ডটা করলে,—"

তাঁহার বক্তব্য শেষ না হইতেই অনুপমা পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া তীব্রস্বরে অনুপমা বলিল, তারানাথ বাবু কি কাণ্ডটা করেছে শুনি।"

পিসীমা বলিলেন, "কম কাণ্ডটাই কি গো, তোমাকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান ক'রে তোমার হাত দিয়ে একখানা কাগজে কি লিখিয়ে নিতে যাচ্ছিল। তারক এসে পড়ায় পেরে উঠলো না।"

এত ক্রোধ বিরক্তির মধ্যেও এমন নিতান্ত অস্বাভাবিক মিথ্যা কথাটা শুনিয়া অনুপমা একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিমুখেই সে বলিল, এখন খাঁটি সত্য কথাটা যে বলেছে পিসীমা, তাকে বুঝিয়ে দিন, অজ্ঞান অবস্থায় মানুষের কাছ থেকে টাকাকড়ি জিনিস

পত্র যন্ত্রবলেই কেড়ে লওয়া যায় বটে, কিন্তু হাতের লেখা একটুও আদায় করা যায় না।"

"কে বলেছে অনু, লেখা আদায় করা যায় না?"

সহাস্যমুখে তারকনাথ মৃদুমন্দ প্রবিষ্ট হইয়া অনুপমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেই অনুপমা দরজার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হিপ্‌নটিজম্ জান?"

অনুপমা চুপ করিয়া রহিল। তারকনাথ বলিল, "হিপ্‌নটিজম্ দ্বারা যে কোন লোককে অভিভূত ক'রে সেই লোককে দিয়ে চুরী জোচ্চুরি খুন পর্য্যন্ত করান যায়, আর দু'কলম লিখিয়ে লওয়া যায় না?"

অনুপমা উত্তর করিল, কিন্তু তারানাথ বাবুর হিপ্‌নটিজম্ বিদ্যা জানা আছে এটা আমি জানতাম না।"

মৃদু হাস্যসহকারে তারকনাথ বলিল, "আমিও তা জানি না, আর তিনি ঐ বিদ্যার প্রভাবে মুগ্ধ ক'রে কিছু লিখে নেবার চেষ্টা করিছেন কি না সে কথাও অবশ্য বলতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস, তিনি এমন কোন কথা ব'লে তোমাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়েছিলেন, যাতে তুমি খুব ভয় পেয়েই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলে।"

গম্ভীরকণ্ঠে অনুপমা বলিল, তোমার অনুমান সত্য দাদাবাবু, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলি, তাঁর ভয় দেখান কথাগুলা যদি বাস্তবিক মিথ্যা হ'তো, তা হ'লে আমি বড়ই সুখী হ'তাম।"

তারকনাথ যেন একটু চমকিয়া উঠিল। পিসীমা আশ্চর্য্যস্বরে বলিলেন, "ওমা ভয় দেখিয়ে অজ্ঞান ক'রে ছিল। এমন কি ভয় গো? ভূতের ভয় নাকি?"

"কতকটা ভূতের ভয়ই বটে পিসীমা।" বলিয়া অনুপমা মাথাটা একটু বাঁকাইয়া তারকনাথের মুখের উপর রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেই তারকনাথ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে মাথাটা একটু নীচু করিল। পিসীমা ব্যস্ততার সহিত ভূতভয়হারী রামনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারকনাথ মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বেশ কথা অনু, আমি যাচ্ছি, তারানাথ বাবু নির্দ্দোষ। তিনি যে সব কথা ব'লেছেন, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। কিন্তু আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, নির্দ্দোষ ব্যক্তি সত্য কথা বাক্ত ক'রে তাড়াতাড়ি সে স্থান হ'তে পালিয়ে যেতে চায় কি?"

বাক্ উঁচু করিয়া যেন উর্দ্ধশ্বাসে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কে পালিয়ে যেতে চাইছে?"

গম্ভীরভাবে তারকনাথ বলিল, "তারানাথ বাবু শুনছি, এক পক্ষের কালের মধ্যে কাশীর পত্র বুঝিয়ে দিয়ে কাজ থেকে অবসর নেবেন। তা হ'লে আমি এখন দোষগুণের বিচার তার তোমারি উপর অর্পণ করছি। আমি জানি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে অনুপমা বলিল, "কিছু জানা-জানির দরকার নাই, আমি শুধু জানতে চাই, তুমি আমার স্নেহময় দাদাবাবু।"।

আবেগস্ফীত কণ্ঠে তারানাথ বলিল, "আমার স্নেহের উপর তোমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস এসেছে কি অনু?"

অনুপমার তাহার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। তারকনাথ বলিল, "যদি তোমার উপর স্নেহই না থাকবে, তবে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার সম্পত্তি রাখার জন্য এত চেষ্টা করে যাবে কেন অনু? শুধু তোমার মঙ্গলের জন্যই গুরুদেবের আদেশ—আমার জীবনের মুখ্যব্রত সন্ন্যাসধর্ম্মের অন্যথা আজ ত্যাগ ক'রে—"

অনুপমা বলিয়া উঠিল, "আমি এত কথা শুনতে চাই না দাদাবাবু, আমি শুধু জেনে রাখবো, তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দাদাবাবু, আর আমি তোমার স্নেহভাগিনী ছোট বোনটী।"

বলিয়া অনুপমা সোজা হইয়া শুইয়া চাদরে মুখ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। তারকনাথ কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বেশ, আজ আর তোমাকে বেশী কথা বলতে চাইনা। তুমি সেরে উঠলে একদিন সব কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলবো।"

তারকনাথ ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। পিসীমাও আর দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্ফল বোধে ঘরের বাহিরে আসিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রতিজ্ঞা পালন।

(শ্রীযামিনীপতি রায় বি-এল)

যখনি নরেশচন্দ্র যে দিন আমাদের মেসে আসিয়া সিট্ লইল সে দিন সকল মেম্বরগণের দৃষ্টিই তাহার উপর পতিত হইল। ফুটফুটে চেহারা তাহার উপর কেশ মেসের পারিপাট্যে, বাস্তবিকই নরেশকে একটু বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। নরেশ সকালে আইন ক্লাসে পড়িতে যায় এবং খাওয়া দাওয়া করিয়া দাপাদপি কার্য্যে দিবস অতিবাহিত করে। ক্রমে ক্রমে মেসের সকলের সহিত নরেশের আলাপ পরিচয় হইল। তাহারই মুখে প্রকাশ পাইল দুই বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে এবং বালিগঞ্জে তাহার শ্বশুরালয়। নব্য বিবাহিতের দল তাহাকে তাহাদেরই একজন মনে করিয়া অন্তরঙ্গ করিয়া লইল। জীবননাট্যে ঐ অধ্যায়টিতে ঐ প্রকারই হয়। আমি নরেশের পাশের ঘরে থাকিতাম। বিবাহ ও বিবাহিত জীবনের কথাবার্ত্তা লইয়া নরেশের ঘরে তুমুল আন্দোলন হইত—নরেশ তর্ক করিয়া বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিত যে বিবাহ অতি পবিত্র বন্ধন, তারপর প্রায়ই মহাকবি ভবভূতির শ্লোক আওড়াইয়া বলিত সুখে দুঃখে সমভাবে বিরাজ করে, যত দিন যায় প্রেম ততই ঘনীভূত হইতে থাকে।

নরেশ প্রত্যেক শনিবার সকাল সকাল কার্য্য শেষ করিয়া শ্বশুরবাড়ী বালিগঞ্জে যায় এবং সোমবার সকালে আবার মেসে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম আমি কখনও হইতে দেখি নাই। মেম্বরগণ একসঙ্গে খাইতে বসিয়া প্রায়ই ঠাট্টাচ্ছলে নরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিত • • •

আশায় ভরা শনিবার
নেইক পড়ার চিন্তাভার
রবিবারের কথাই নাই
শ্বশুর বাড়ী কি মধুর ঠাঁই।

নরেশ শুনিত এবং বুঝিতে পারিত। কিন্তু কিছুই বলিত না, চুপ করিয়া অতি গম্ভীর ভাবেই সে শুনিয়া যাইত।

অনেক সময় নরেশের গম্ভীর ভাব দেখিয়া মনে হইত সে যেন নিবিষ্টচিত্তে কি ভাবিতেছে। আমি একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'নরেশ বাবু আপনি এক-এক সময় নিবিষ্টমনে কি ভাবেন, বলুন ত?' তিনি উদাসভাবে বলিয়াছিলেন 'এই বিশ্ব রচনার সূচনা এবং পরিণতি কি তাই ভাবি—আমি তাহার ভাবনার ঢেউ দেখিয়া আর তাহার গুরু গম্ভীর ভাবনায় অন্তরায় হইতে সাহস করিতাম না। তবে সকলে সমান নহে। কৌতুক-প্রিয় মেম্বরগণ কিন্তু মধ্যে মধ্যে বলিতে ছাড়িত না 'নরেশ বাবু শনিবারের ভাবনায় বিভোর'।

যদি কেহ সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার স্ত্রীকে ঠাট্টার প্রসঙ্গের ভিতর আনিয়া ফেলিত তাহা হইলে নরেশ বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হইতে এবং বেশ মিষ্টমিষ্ট দু'কথা ঠাট্টাকারীদের শুনাইয়া বুঝাইয়া দিত যে পবিত্রতার আধার স্ত্রীকে ঠাট্টা প্রসঙ্গে আনা ধর্ম, সমাজ এবং ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

এমনি করিয়া প্রায় তিনমাস কাটিয়া গেল। নরেশ ক্রমে ক্রমে সকলের এবং আমার ভক্তিভাজন হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনা স্রোতের বৈচিত্র্যে হঠাৎ এক অঘটন ঘটিয়া পড়িল। আমি ক্যামবেলে ডাক্তারি পড়ি। একবার একটি রোগীকে অপারেশন করা হইয়াছিল আমাকে তাহার বাড়ী যাইয়া তাহার ঘা ধুইয়া ড্যাংেস করিতে হইত, অবশ্য এজন্য আমি পরিশ্রমিক পাইতাম। যেখানে রোগীটি থাকিত সেটি একটি প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু সহরের ঐ অংশের খ্যাতি মোটেই ভাল ছিল না। সুতরাং আমার রোগীটিও তার আশপাশের অস্বাস্থ্যকর প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে তাহার চরিত্রের বিষয় ও জানিতে পারিলাম। তখন মনে হইতে লাগিল পূর্ব্বে ইহা জানিলে সামান্য পারিশ্রমিকের লোভে কখনই এখানে আসিতাম না। যাহা হউক একদিন শনিবার সন্ধ্যায় ড্যাংেস করিয়া রোগীর ঘরের বাহিরে আসিতেছি এমন সেই বাড়ীরই এক ঝি ছিল। একটা "বোরিক বটন" কিনিয়া দিতে হইবে—বলিয়া তাহাকে সঙ্গে

লইয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার নজর পড়িল একটি বাবুর উপর। পার্শ্বের এক ঘরে তিনি তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িলেন। বাবুটীকে সুস্পষ্ট না দেখিতে পাইলেও চিনিতে পারিলাম। ইনিই আমাদের ভক্তিভাজন "নরেশচন্দ্র।"

পথে ঝির নিকট সকলেই জানিতে পারিলাম। ইহাই কি নরেশবাবুর শ্বশুর বাটী? এই পতিব্রতা-পত্নীর অযত্ন প্রেমের পরিচয় দিয়াই কি এতদিন আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন? যাহা হউক নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে মেসে ফিরিলাম। মেসে দু'একজন বন্ধুবান্ধবকে ব্যাপারখানা সবিশেষ বলিলাম। তার পর সকলে মিলিয়া এক কমিটি বসাইলাম। একটা ঘটনায় আমাদের সুবিধা হইয়া পড়িল। ২।৩ দিনের মধ্যে নরেশের ঘরে এক ভদ্রলোক আসিলেন। নরেশ এমন সতর্কভাবে তাহার কাছে থাকে যে—মেসের কোন মেম্বর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু একদিন সুযোগ ঘটিল। সেদিন তিনি হাত-মুখ ধুইতে নীচের তলায় গিয়াছিলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার পথে আমি তাড়াতাড়ি দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি নরেশের শ্যালক। নরেশকে পূজার সময় তাহাদের বাটী যাইতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। তাদের বাটী খুলনায়। সেই রাত্রেই নরেশের শ্যালক চলিয়া গেলেন।

আমরা নরেশের শ্বশুরের নিকট আদ্যোপান্ত লিখিয়া এক পত্র দিলাম। দুই দিন পরে উত্তর আসিল। তার শ্বশুর আমাদের কথা একেবারে বিশ্বাস করিলেন না। বরং লিখিলেন—আমি বাটীর ভিতর, খোঁজ লইয়া জানিলাম আমার কন্যার উপর তার স্নেহ, মমতা, ভালবাসা অতিশয় প্রবল। তাহার পত্রাদি দেখিয়া তাহার উপর কোন সন্দেহ করা আদি উচিৎ বিবেচনা করি না'। আমরা একটু হতাশ হইলাম। কিন্তু নাছোড়বন্দা আমরা কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিলাম না। এবার নরেশচন্দ্রের শ্বশুর শ্রদ্ধিরীর নাম ধাম এবং সবিশেষ বিবরণ সহ পুনরায় এক পত্র দিলাম, এবং তাহাকে, শনিবার-রাত্রে আসিতে অনুরোধ করিলাম। নরেশের শ্বশুর মহাশয় এক পোষ্টকার্ডে জানাইলেন—তিনি শনিবারে অবশ্য আসিবেন।

সে সময়ে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। যখন সন্ধ্যার পরও নরেশচন্দ্র মেসের বাহির হইল না, তখন সকলেই অনুমান করিলাম যে সে পত্র পাইয়াছে এবং সাবধান হইয়াছে। যাহা হউক শনিবার রাত ৮টা বাজিল, ৯টা বাজিল তথাপি তাহার শ্বশুর আসিলেন না।

রাত্রি ১০টার পর খাইয়া শুইতেছি এমন সময়ে নরেশের ঘরের দরজার কে অতি ধীরে ধীরে কড়া নাড়িল। সচকিত চিত্তে ভাবিলাম—বুঝি বা নরেশের শ্বশুর আসিয়াছেন। কিন্তু তা ত নয়! আমাদের মেসের এক চাকরের সঙ্গে এক ঝি নরেশের ইয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া আছে লুকাইয়া তাহা দেখিলাম। চাকর চলিয়া গেলে ঝি নরেশের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'বাবু, তুমি আজ যাওনি, উনি বড় ভাবছেন। আমাকে পাঠালেন।' ঝিকে অন্ধকারে দেখিয়া চিনিতে পারি নাই, কিন্তু গলার স্বরে চিনিতে বাকী রহিল না। এই-ঝিই সেই ঝি, ইহারই মুখে নরেশের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়াছিলাম এবং ইহারই হাতে রোগীর কটন কিনিয়া দিয়াছিলাম। নরেশ অতি সঙ্কুচিত ভাবে ঝিকে চুপি চুপি বলিল 'তুমি এখানে এলে কেন? আঃ কি অপমান, কি কেলেঙ্কারি! যাও, যাও আমি আজ যেতে পারব না; শরীর খারাপ। আর এসো না,—যাও, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো বাবুদের বাড়ী আগে কাজ করতাম, খবর পেয়ে একবার দেখা করতে এসেছি; বুঝলে যাও।' ঝি, সে যে সে ঝি নয়, বলিল, 'আমাকে সে সব শেখাতে হবে না। কিন্তু একবার না গেলে চলবে না। এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। সে রাত্ত কাটিল। পরদিন রবিবার মেসের অনেকে বাটী গিয়াছে, সকাল কাটিল, দুপুর ও বিকাল কাটিল। তথাপি নরেশের শ্বশুরের খোঁজ নাই। আমি বিরক্ত হইলাম। তিনি কি আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিলেন। সন্ধ্যার সময় আমাদের মেসের সামনে দরজা জানালা বন্ধ একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রমাদ গণিলাম নরেশের শ্বশুর বুঝি আসিলেন। উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইলাম গাড়ী হইতে আমাদের পরিচিতা ঝি নামিয়া আসিল। গাড়ীর দরজা খোলা হইলে দেখিতে

পাইলাম ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী অলঙ্কার বিমণ্ডিতা এক রমণী গাড়ীতে রহিলেন। গাড়ীর দরজা বন্ধ করা হইল। কি উপরে নরেশের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

নরেশের দরজায় চাবি বন্ধ দেখিয়া কি এক বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, এ বাবু কোথায় গিয়েছেন গো?' এই কলস্বরে স্নেহে একটু বসো দেখা হবে এখন।' সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে আমরা নীচের গাড়ীর দিকে উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছি।

এমন সময় দরজা জানালা বন্ধ আর একখানি গাড়ী আমাদের মেসের সাম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। এ গাড়ী-খানির দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ গোছের এক ভদ্রলোক নামিলেন। এবং দেখিলাম একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক উহাতে বসিয়া আছেন। ভদ্রলোককে দেখিয়া মনে হইল ইনিই নরেশের শ্বশুর। দ্রুতগতিতে নীচে যাইয়া তার পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলাম আমাদের অনুমান মিথ্যা নহে। নরেশের ঘর বন্ধ ছিল কাজেই আমার ঘরে আনিয়া তাহাকে বসাইলাম এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন 'কাল ভাল দিন না থাকায় মেয়ে নিয়ে আস্তে পারি নাই, এজন্য কাল না আসিয়া—আজ আসিয়াছি। আপনাদের কথা আমার অবিশ্বাস হয় নাই, তাই কন্যাকেও সঙ্গে আনিয়াছি, নিজে অপারগ হইলে কন্যার সাহায্যে নরেশকে নিজের কাছে লইয়া যাইব।'

এই কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে নরেশ নিজের ঘরে আসিয়াছে এবং স্থির নেহাত পীড়াপীড়িতে নীচে তার প্রণয়িনীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের কি খেলা! যার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল তার বন্ধ গাড়ী একটু দূরে আগাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নরেশ বন্ধ গাড়ীর দরজা খুলিয়া মধ্যে প্রবেশ করিতেই আমি তাহার শ্বশুরকে লইয়া সত্বরপদে সেই গাড়ীর পার্শ্বে অলক্ষ্যে দাঁড়াইলাম। নরেশ তাড়াতাড়ি লজ্জিত ভাবে তার নিজ পরিণীতা স্ত্রীকেই বলিয়া বসিল, 'আমার বিশেষ দরকারে আর শরীরও ভাল ছিল না বলিয়া কাল যেতে পারিনি। তা রাগ ক'রো না আজ যাও কাল আমি নিশ্চয়ই যাব। অবগুণ্ঠনবতী কথা কহিতেছে না দেখিয়া নরেশ একেবারে রমণীর পা ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'এবার মাপ কর ভাই, আর কখনও তোমার অবাধ্য হবো না।' অবগুণ্ঠনবতী ক্ষিপ্রতা সহকারে নিজের পা ছাড়াইয়া লইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন, হায়! হায়! তুমি কি হয়েছ! তবে মনে থাকে যেন আজ আমার গা ছুঁয়ে সোণা ছুঁয়ে যে দিব্যি করলে' বলিতে বলিতে তিনি গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া হাসিলেন। সে হাসিতে নরেশচন্দ্রের অন্তর মন পুলকিত হইয়া উঠিল—লজ্জায় নত মস্তকে অপরাধীর মত সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কয়েক দিন পরে নরেশের শ্যালক আসিয়া তার জিনিষপত্রগুলি মেস হইতে লইয়া গেল। এর পর আর সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই। শুনিতে পাইলাম নিতান্ত বাধ্য ছেলেটির মত শ্বশুরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে।

'পতি পরমগুরু'

(শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল)

আয়রে বাবা লঙ্কা পায়রা ঘুরবো ফিরবো যেথায় খুসী—
রইবি তোরা খাঁচায় পোরা রবনা পাখীর মত,
ঘোমটা খুলে কাজল পানে চাহিলে হবি দোষী—
বলে গেছেন বাঙ্গলা দেশের সমাজ পতি যত।
বুঝ্ খেয়েছি যেচে করেছি তুই কেন তা বলবি?
তাই দিয়েছি মেয়েমানুষীর উচিত যত সাজা;
চাস ভালতো এখন থেকে সোজা পথে চল্‌বি—
জেনে রাখিস তোরা বাঁদী—আমরা তোদের রাজা।

হায়রে সমাজ! চোখ মেলনা, পর্দ্দা বিষম গুরু,
তোমার বিধান—এই মাতালও পতি পরমগুরু

বয়্ স্কাউট্ (Boy Soout)

[শ্রীরমেশ বসু এম্-এ]

Sir Robert Baden Powell বালকদের সকল রকমের উন্নতির জন্য একটি সংঘ সৃষ্টি করেন। এর উদ্দেশ্য এক কথায় বলিতে গেলে এই যে বালকেরা যাহাতে বড় হইয়া ভবিষ্যতে সমাজ-বদ্ধ মানুষের কর্ত্তব্য-গুলি অতি সহজে সাধন করিতে পারে সেই জন্য পূর্ণ হইতেই আনন্দ ও কর্ত্তব্যের পথে তাহাদিগকে দীক্ষা দেওয়া। পরমেশ্বর স্বদেশ ও রাজার সেবার জন্য বালকেরা স্বলবদ্ধভাবে শিক্ষা পায়। সাধারণ ইস্কুলের শিক্ষা অপেক্ষা এই কার্য্যে তাহারা বেশী আনন্দ পায়, কারণ এইরূপে তাহার কচি কচি প্রাণ আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করিবার পথ পায়। সমাজের সেবা করিতে হইলে যে পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে হয় তাহাতে যথেষ্ট মনের সবলতার দরকার হয়, এবং এইরূপ বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব অপেক্ষা কম নহে। ছেলেবেলা হইতে এই কার্য্য করিলে মনে সাহসের সঞ্চার হয় ও যাহাতে শক্তি অনুভব করা যায়। ছেলেদের মনে যে একটা adventure এর ভাব আছে তাহাকে নিছক্ ছেলেমি মনে না করিয়া এইরূপে কাজে লাগাইলে তাহাদেরও মনুষ্যত্বের পথ খুলিয়া যায়, আর সমাজেরও খুব উপকার হয়, কারণ দেহে ও মনে সবল ব্যক্তিরাই সমাজের মেরুদণ্ড।

বয় স্কাউট্ আন্দোলন ছেলেদের একটা উপকার করিয়াছে এত শীঘ্র টের পাওয়া যায় যে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই দেখিতে দেখিতে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে এক প্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। এই সব বইয়ের কিরূপ কাটতি হয় তাহা দেখিলেই এই আন্দোলনের সফলতা বুঝিতে পারা যায়। আমেরিকাতে Boy scout of America নামে একখানা বই বাহির হয়, ১৯১০ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বইয়ের ২৩ সংস্করণ হয়, এবং সব শুদ্ধ ২,৬১,৪০০ পুস্তক বিক্রয় হয়। বিলাতে Scouting for Boys নামে একখানা বইয়ের ১৯০৮ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ সংস্করণের বেশী ছাপা হয়, এবং ৩,৩১,০০০ পুস্তক বাহির হয়। শুধু পাশ্চাত্য দেশেই ইহার এরূপ আদর নহে, প্রাচ্য দেশের চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও এই আন্দোলনই ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। বয় স্কাউট্রা শুধু বই পড়ে না, তাহারা বইয়ের উপদেশ অনুসারে চলিয়া হাতে কলমে কাজ করে। নানারকমের বিদ্যাই তাহারা আয়ত্ত করিবার সুযোগ পায়। দৈহিক পরিশ্রমকে হীন মনে করে না বলিয়াই তাহাদের দেহের, স্বাস্থ্যের অভাব হয় না। সুতরাং এই প্রকারের সাহিত্যের প্রচার দেখিয়া এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয় যে ছেলেরা এখানেও ইস্কুল পাঠশালার মতই পড়া মুখস্ত করে।

এই আন্দোলন আমাদের দেশেও প্রবেশ করিয়াছে। যদিও লোকে এখনও ইহার উপকারীতা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তবু আশা হয় দেশেও আন্দোলন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত আবজান-পুরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ী মহাশয় ইং ১৯১৪ সালে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। অন্যান্য স্থানেও ইনি "সেবাসমিতি Boy scouts Asociation" নাম দিয়া অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইনি ১৯২১ সালে নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাতে যান, এবং নানাস্থানের বয় স্কাউট্ ও গার্ল গাইড্দের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করেন এবং বক্তৃতা দেন। ইহার সমিতি ছাড়া আরও একটি সমিতি আছে, উহা Indian boy scout নামে পরিচিত। এই দুইটি সমিতি খুব ভাল কাজ করিতেছে।

বাংলাদেশে এই আন্দোলন অল্প বিস্তর সফলতা লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু বয় স্কাউটদের জন্য ভালরূপ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না। আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে শ্রীযুক্ত শ্রীরাম বাজপেয়ী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর লাল বৈশ্য, বাবা সীতারাম প্রভৃতি অনেকেই এ বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন। আগরা হইতে প্রকাশিত কর্ত্তব্য নামে একখানি হিন্দী মাসিক এই আন্দোলনের একটি মুখপত্র আমাদের বাংলা ভাষায় বর্ত্তমানকালে বালকদের জন্য অনেক লেখা বাহির হইতেছে, কিন্তু বয় স্কাউট্ সমিতি বা সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা খুব কমই আমাদের

চোখে পড়ে। অথচ আমরা জানি যে আমাদের অনেক কবি ও লেখকদের গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ে উপযোগী অনেক লেখা সংগৃহীত হইতে পারে। শক্তিশালী লেখকেরা নূতন লেখা দ্বারাও ছেলেদের মনে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।

এই প্রতিষ্ঠান ছেলেদের পক্ষে সর্ব্বরকমের কাল্‌চারের বীজ স্বরূপ দেহচর্য্যা ও সঙ্গীতচর্চ্চা এই আন্দোলনের আকর্ষণ। কাওয়াজ করা এবং সাঁতার দেওয়া প্রকৃতি শ্রমজনক অভ্যাসে আজকালকার দিনে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। ছেলেরা শুধু খেলা ও তামাসায় যে আনন্দ না পায়, তাহা এই স্কাউটের কাজে পাইতে পারে, কারণ কোন কাজের দায়িত্ব পাইতে অভ্যস্ত হইলে এবং হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির যোগ থাকিলেও ছেলেদের মন সহজেই সাড়া দেয়। স্কাউটের কাজে ছেলেদের মনে যে স্বভাবদত্ত সৃজনী শক্তি আছে তাহা বিশেষভাবে ফুটিবার অবসর পায়। ইস্কুল পাঠশালার রুদ্ধ ঘরের ভিতর বন্ধ ঘটা ধরিয়া আটকাইয়া রাখিলে তাহাদের মনের ও দেহের বিকাশ হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তাহারা উপযুক্তভাবে চালিত হইয়া তাহাদের সুপ্তনকল মনের ভাব গুলিকে বাহিরের কাজে সাকার করিয়া তুলিতে পারে সেখানে তাহাদের মন সজাগ হইয়া ওঠে। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে যে কোন লোকহিতকর কার্য্যে বল বাঁধিয়া কাজ করিতে ছেলেদের কি উৎসাহ দেখা যায় তাহাদের মুখে কি অপার্থিব জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে! এই স্বেচ্ছাসেবকের কাজে নিতান্ত ছোট বালকেরাও উৎসাহে বড় বালকদের অপেক্ষা কম নহে। ছেলেদের মনের এই স্বাভাবিক ঝোঁক কাজে লাগাইতে পারিলেই বয়্ স্কাউট্ আন্দোলন সফল হইল মনে করা যাইতে পারে।

১১ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কাউট্ হইতে হয়। এই বয়সই মানুষের ভাব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় (Impressionable age)। এই সময় হইতে ছেলেরা উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হইলে সমাজের একটি বিশেষ উপকার হয়। আমরা জানি যে চুল কদাইয়া বদাইয়া রাখিলেও ছেলেদের মন চুপ করিয়া থাকে না, তাহাতে নানারকমের খেয়াল উঠে। ছেলেদের মনের এই খেয়ালকে সুপথে পরিচালনা করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

ধ্বংসোন্মুখ ফরাসী জাতি।

[শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।]

যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সে বহু লোক হতাহত হইয়া পুরুষের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে ও স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। ফ্রান্সে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ৪০ লক্ষ বেশী। ২০।২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বাইশ লক্ষ ফরাসী যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে এবং তিন লক্ষ যুবক এরূপ ভাবে আহত হইয়াছে যে তাহারা বিবাহের ও সন্তান উৎপাদনের অনুপযুক্ত। এদিকে দেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলেই নয়। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায় তবে অচিরেই ফরাসী জাতির চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই এখন ফরাসীরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে কি করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

যুদ্ধের সময় বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে নানা পুরুষোচিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়া ছিল,—অনেকে স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ায় বা যুদ্ধে হত হওয়ায় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অনেকে স্বেচ্ছায় এইসব কাজে যোগ দিয়াছিল। এইসব কাজ করিতে করিতে নারীদের মনের অবস্থা ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নারীরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে পুরুষদিগকে অবলম্বন না করিয়াও তাহারা পুরুষদের উপর টেক্কা দিয়াই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে খাটিয়া খাইতে পারে। বিবাহ করিয়া পুরুষদের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার আর কোনও প্রয়োজন তাহারা বোধ করিতেছে না।

মেয়েদের মধ্যে এই যে নূতন ভাব ইহা সন্তানোৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। নারীরা যে আর নারী হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না, তাহার উপায় কি? দেখা যাইতেছে অবৈধ প্রণয় সঞ্জাত সন্তানদের অর্দ্ধেকও জীবিত থাকিতেছে না, কারণ মাতার "মা" হইয়া থাকিবার ইচ্ছার অভাব।

দেশের জীবিকানির্ব্বাহের খরচও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরুষ কিম্বা নারীর একার উপার্জ্জনে একার স্বচ্ছন্দে বাস করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আবার বিবাহ করিয়া ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবের মাত্রা বাড়াইয়া লাভ কি?

বিবাহিত জীবনের উপরে পুরুষ ও নারীর একটা বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভ আসিয়াছে।

তাছাড়া ফরাসী আইনে বিবাহে কন্যার মাতাপিতার মত আবশ্যক। এমন কি মাতাপিতার বিবাহচ্ছেদ হইয়া থাকিলেও তা দরকার। শুধু প্রণয় হইলেই বিবাহ হইতে পারে না। বহু চেষ্টার পর আইনটীকে কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কন্যার যিনি অভিভাবক তাঁহার মত হইলেই এখন চলিবে।

তাছাড়া এখন হইতে বিবাহের বিরুদ্ধে যিনি বই কিম্বা সংবাদপত্রে লিখিবেন বা বিজ্ঞাপন দিবেন গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে শুরুতর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন স্ত্রীপুরুষদের বুঝাইয়া দিতে এই অবিবাহিত জীবনের বিষময় ফল। ফরাসী জাতির এই ভীষণ দুর্দ্দিনের চিত্র দেখিয়া ও স্বদেশপ্রেমের বলে ফরাসীজাতি যদি ফেরে তবেই রক্ষা। কর্ত্তৃপক্ষের আশা ফরাসীদের স্বদেশপ্রেমই ফরাসী জাতিকে রক্ষা করিবে।

কাগজ কাটা

(শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ)

আমাদের দেশে কাগজ কাটার প্রচলন আছে। কাগজ কাটা একটা আর্ট—কিন্তু তার বিশেষ আলোচনা আমাদের দেশে দেখিতে পাই না। চিত্র শিল্প এবং তাহার উন্নতি দেখিতে পাইতেছি কিন্তু কাগজ কাটা শিল্পীর নিভৃত কোণে ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আমাদের দেশের মেয়েরা ফুল, লতা, পাতা মাছ এবং হাত পাকিলে রাধা কৃষ্ণের ছবি পর্য্যন্ত নরুণের সাহায্যে কাটিয়া থাকেন—যে যেমন পারেন তিনি তেমনই কাটিয়া থাকেন কোন সুনিপুণ শিল্পীর নিকট তাঁহারা এ কাজ শিক্ষা করেন না কাজেই তাঁহারা যা তৈরী করেন তাহা চলনসই রকমের হয়।

য়ুরোপ এবং আমেরিকায় কাগজ কাটার প্রচলন আছে কিন্তু আমাদের দেশের কাগজ কাটার ভঙ্গির চাইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। তাঁহাদের ছবি-ভঙ্গিকে সাধারণতঃ ছায়াছবি (Shadow picture) বলা চলে—সাদা দেয়ালের উপর ছায়া পড়িলে তার যে চেহারা হয় ইহাদের কাটা ছবি হুবহু ঠিক সেই ধরণের তাঁহারা কালো কাগজে ছবি কাটেন—তারপর সেগুলি সাদা বোর্ডে আঁটিয়া দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের মেয়েরা করেন তার উল্টা—সাদা কাগজের উপর তাঁহারা ছবি কাটেন এবং শেষে কালো কাগজের বোর্ডে তা আঁটিয়া দেন। ছায়া ছবিতে চোখ মুখ দেখা যায় না কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা যে সব ছবি কাটেন তাহাতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যটুকুও বাদ যায় না।

বিদেশী ধাই।

আমাদের দেশে পূজা পার্ব্বণে উৎসব আনন্দে আদর সাজাইতে কাগজ কাটার ব্যবহার দেখিতে পাই—সে সব কাগজ কাটার ব্যবহার দেখিতে পাই—সে সব কাগজ কাটার ভঙ্গি বিলাতী ছায়া ছবির অনুরূপ।

এই ছায়া ছবিকে ইংরেজীতে সিলুয়েট (Silhouette) বলে। ফরাসী-মন্ত্রী এটিয়েন দি সিলুয়েট্ (Etienne de

Silhouette) মিতব্যয়িতার জন্য প্রসিদ্ধ। এই ছায়া-ছবি তাঁর অতি প্রিয় জিনিষ ছিল—অবসর সময়ে তিনি ছায়া ছবি তৈয়ার করিতেন—তাই তাঁর নামানুসারে এখন সিলুয়েট বলিতে ছায়াছবি বুঝায়।

এই প্রসঙ্গে জেনমার্ক দেশীয় একটী "সিলুয়েট" শিল্পির বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি। এই বালিকার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর কিন্তু এই অল্প বয়সেই ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহার নাম মিস্ ওল্-গান্ বাট্।

এই বালিকার বিশেষত্ব এই যে ইনি পাশ্চাত্য ছায়া-ছবির সঙ্গে প্রাচ্যের কারুকার্য্য মিশাইয়া সিলুয়েট শিল্পকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন।—এই কাগজ কাটা সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—তৈল চিত্র, ধোদাই শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে তুলনায় ইহা নিতান্তই সস্তা বলিতে হইবে—একখানা কাঁচি আর এক তা কাগজ ছাড়া আর কোন জিনিষই শিল্পির আবশ্যক হয় না। প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান লম্বাদাম খরচ করিয়া একটী জিনিষকে সুন্দর করিয়া তোলা সহজ কিন্তু সামান্য উপকরণ হইতে জিনিষকে সুন্দর করিয়া তোলার মধ্যে যে আনন্দ আছে অন্য কিছুতে তা নাই।

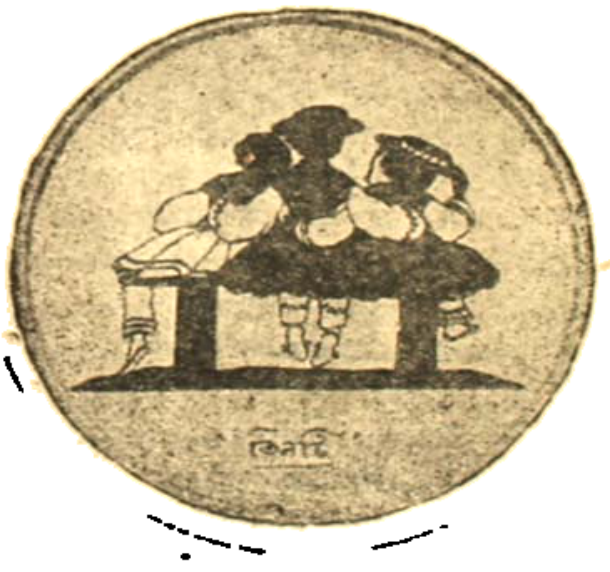

"আমি ইচ্ছা করিলে একজন চিত্রকর হইতে পারিতাম কারণ আমার বাবা একজন চিত্রকর। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই আমার ঝোঁক ছিল এই সিলুয়েট শিল্পের দিকে। আমার বয়স যখন চার বৎসর তখনই আমি খবরের

"নব-বসন্ত।"

কাগজ কাটিয়া গরু ঘোড়া ছাগল প্রভৃতি তৈয়ার করিতাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার ভিতর যে শিল্পানুরাগ নিহিত হইয়াছিল তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য পিতা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

"আমার বয়স যখন ১০ তখন কোপেনহাগেন সহরে এক শিল্প প্রদর্শনী হয় তথায় সিলুয়েট শিল্পির অনেক চিত্র আমাকে নূতনভাবে উৎসাহ দান করিল এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি স্থির করিলাম যে সিলুয়েট শিল্পের সাধনাই হইবে আমার জীবনের অবলম্বন।

"ক্রমে আমার হাত পরিষ্কার হইতে লাগিল। আমার বয়স যখন ১৬ তখন কোপেনহাগেন সহরে আর একটি শিল্প প্রদর্শনী হয় তাহাতে আমার ৭০ খানা চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত আমি মামুলি ধরণে সিলুয়েট চিত্র কাটিয়া যাইতেছিলাম। প্রদীপের আলোতে দেয়ালে যে কালো ছায়া পড়ে সিলুয়েট চিত্র এতদিন তারই অনুরূপ ছিল।

"একদিন আমি একটি জাপানী মেয়ের ছবি তৈয়ারী করিতে যাইয়া ভাবিতে লাগিলাম কেমন করিয়া তার পোষাকের বিচিত্র কারুকার্য্য ছুটীতে ফুটাইয়া তুলিতে পারি—তারপর অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় যাহা তৈয়ার হইল তাহা বিচিত্র ও নূতন "নব বসন্ত" ছবিখানা আমার

প্রথম নূতন ধরণের ছবি—উহা দেখিয়া আমার মনেও যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার হইল।

"একটি মহিলা বলিয়াছিলেন—'সেলেটির একটি ছবি তৈয়ী করিতে নিশ্চয়ই ৫।৭ দিন সময় লাগিয়াছে।' সকলেরই বোধহয় ঐরূপ ধারণা। কিন্তু তা ত নয়। ছবি কাটা আমার কাছে এত সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে সাধারণ ছবি তৈয়ার করিতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না কিন্তু কারুকার্য্যময় কঠিন ছবি তৈয়ার করিতে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগে।

"ইহা শুধু অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অনেকের ধারণা আমি আগে কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া লই, কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল—কাগজ পাইলেই আমি কাটিতে আরম্ভ করি—যা তৈয়ার করি তার ছবি মনের ভিতর আঁকিয়া লই।"

মিস্ মাষ্টার কাটা কয়েকখানি ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইল। পাঠকপাঠিকাগণ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন—ইহার আলোচনায় যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন।

আমাদের দেশের পুরুষমহিলাদের নিকট এই ধরণের ছবি তৈয়ী করা সম্পূর্ণ নূতন। আশা করি তাঁহারা এই সিলুয়েট শিল্পের নূতন ধারাটি গ্রহণ করিতে পারিবেন। দেশীয় কাগজ কাটার নমুনা, পাঠকপাঠিকাগণ যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে ভবিষ্যতে দিবার চেষ্টা করিব।

হৈমন্তী।

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।]

সবুজ শোভার মাঝখানে কে
দাঁড়িয়ে আছ সুন্দরী,
কণ্ঠে শোভে কুন্দ-মালা—
হস্তে ধানের মঞ্জরী ?
চরণ ছুঁলে তুষন্-বুকে,
আঁচল ঝুলে অম্বরে ;
চামর-করে বীজন করে
পবন্-রাণী মন্ ভরে।

আলোর সাথে মধুর ছায়া
গড়্‌ল রাধা প্রেম-জালে,—
খেল্‌ছে খেলা লীলার পরী
কুজ্ঝটিকার আঁধ্‌ আলে।
মনের পাখী ব্যাকুল হেরি'
চারদিকে ঘুর ঘুর ছেয়ে,
মনের ক্ষ্যাপা আবুল হ'ল
পরশ্ মণির খোঁজ্ পেয়ে।

কংগ্রেস "প্রোগ্রাম্।"

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।]

(১৩)

কো-অপারেটিভ্ নন্ কো-অপারেশন।

"There can be independent Co-operation, where of use, with those honest men who will not go the whole way"

Macswiney.

ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটি গুলির ভিতর জাতীয় দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এখন অনেকে এখন আছেন যাহারা জমিদারি ব্যবসাদারি বা ওকালতি লইয়া ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইহাদের অনেকেই স্থানীয় বোর্ড সমূহের মেম্বর আছেন। যদি জাতীয় মহাসমিতির পক্ষ হইতে আরও অধিক সংখ্যক লোক এই সকল বোর্ডে প্রবেশ করেন এবং প্রাদেশিক সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে কর স্থাপন ও ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে দেশের কাজে অনেককে পাওয়া যায় এবং কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়। আয়র্লণ্ডে সিন ফিন আন্দোলন প্রথমে এইরূপ ভাবেই আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের লোক স্থানীয় বোর্ড গুলিতে না যাইলে অনেক অনুপযুক্ত লোক তাহাতে প্রবেশ করিবে, প্রজাগণকেও বাধ্য হইয়া কর দিতে হইবে—অথচ সে অর্থের সদ্ব্যয়ও হইবে না। ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা তেমন কিছু না থাকিলেও প্রতি জনে বাৎসরিক ।৵০ আনা হইতে ৮৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কর আদায় করিবার ক্ষমতা আছে। চৌকিদার, দফাদারের মাহিনা দিয়া বাকী টাকা দেশের কাজে ব্যয় হইতে পারে। বর্ত্তমানে Constructive Programme বলিয়া কংগ্রেস যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন—ইউনিয়ন বোর্ডের ভিতর দিয়া সেই সকল কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। এই গঠন কার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছু করা কংগ্রেসের উচিত নয় এবং প্রোগ্রাম বদলানো উচিত নয়—ইহা অনেকেরই মত। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে এই গঠন মূলক কার্য্যে আমলা তন্ত্র প্রথমে বাধা দিতে পারিবে না—যদি তাহাতে বোর্ডগুলিকে সম্পূর্ণ, করে তাহা হইলে তখন সেই বোর্ডই যে-সরকারী ভাবে কার্য্য করিবে। দেশের লোকের সমবেত শক্তি ও সংঘ তাহার পিছনে থাকিলে তখনই অসহযোগ সম্পূর্ণ হইবে এবং রাজ্যের মধ্যে রাজ্য সংগঠিত হইয়া (A state within the state) আমাদের স্বরাজলাভ সহজপর হইবে।

গঠন মূলক কার্য্যতালিকা লইয়া স্থানীয় বোর্ড গুলির সম্পৃক্ত হওয়ার যেমন ফল আছে, কংগ্রেস কমিটিগুলি যে-আইনী বলিয়া সেই অবস্থাতে Suppressed হওয়ারও সেইরূপ সম্ভাবনা আছে। যখন সেইরূপ অবস্থা আসিবে তখন যদি দেশের লোক তৈয়ারি হইয়া থাকে, তাহা হইলেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এখন কোন পথে শীঘ্র সফলতা আসিবে তাহাই বিবেচ্য। স্থানীয় বোর্ড গুলির ভিতর দিয়া কাজ করিলে অর্থের জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না—সকলকেই টাকা দিতে হইবে—দেশের সমস্ত লোককেই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনে স্থান দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত সর্ব্বত্যাগী সেবক আছেন তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া এই সকল কার্য্য, নির্ব্বাচন প্রভৃতি যাহাতে আমাদের মনের মত করিয়া সম্পন্ন হয় তাহার জন্য প্রাদেশিক সমিতিকে ভার লইতে হইবে। প্রাদেশিক সমিতির খরচ পত্র voluntary contribution হইতে চলিতে পারিবে, আশা করা যায়। এখন কাজের লোক এত অল্প যে প্রাদেশিক সংঘ ব্যতীত অন্যত্র সুচারুভাবে কাজ নিষ্পন্ন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান চালনার শক্তি ও সুবিধা আমাদের নাই।

(১৪) প্রাদেশিক সমিতির গঠন

জেলা ও গ্রাম্য কংগ্রেস সমিতিগুলি না থাকিলে প্রাদেশিক সমিতি কিরূপে গঠিত হইবে? তাহার একটি প্ল্যান আছে। নিম্নলিখিত ভাবে প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হইতে পারে :—

(১) কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হইয়া যে সকল প্রতিনিধি কাউন্সিলের বাহিরে থাকিবেন।

(২) যে সকল জেলায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি না

আমলাতন্ত্রের কাউন্সিলের গঠন

	মনোনীত				নির্বাচিত														
					বিশিষ্ট ইলেকটোরেট					সাম্প্রদায়িক ইলেকটোরেট					সাধারণ ইলেকটোরেট				
	বহু-সদস্যক, অসাম্প্রদায়িক এবং নির্বাচনিক মোট সংখ্যা	বহু সদস্যক, এক অসাম্প্রদায়িক মোট সংখ্যা	অসাম্প্রদায়িক—অসাম্প্রদায়িক এক সদস্যক নির্বাচনিক	অ-সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িক	নির্বাচনিক—মোট সংখ্যা	বিশিষ্ট ইলেকটোরেট বহু সদস্যক নির্বাচনিক মোট সংখ্যা	নির্বাচনিক এক	অনির্বাচনিক	ভদ্রলোক ও শ্রমিক (মাইনিং ও লেবার)	নির্বাচনিক ইলেকটোরেট বহু সদস্যক নির্বাচনিক মোট সংখ্যা	মুসলমান-অমুসলমান	মুসলমান-মুসলমান	ইঙ্গ-ভারতীয়	ভারত-ইউরোপীয়	ভারত-খৃষ্টীয়	শ্রমিক	সাধারণ ইলেকটোরেট বহু সদস্যক নির্বাচনিক মোট সংখ্যা	অমুসলমান-অমুসলমান	অমুসলমান—মুসলমান
বাংলার	১২৭	২৯	২৩	৬	৯৮	১৩	১	৬	৬	২০	১১	২	১	১	৪		৬৫	৫৬	৯
		২৫	২০	৫	৮৬			৩		২৯	২২						৪৬	৩৫	
বাংলার	১৪০	২৬		৬	১১৪					৪৬	৩৩	৬				৯	৪৬	৩৫	১১
পাঞ্জাব ও অন্যান্য	১২৩	২০	১৮							৩০		৪					৬০	৫২	
পাঞ্জাব	৯৩	২২	১৬																
	১০৩	২৭	২০		৭৬														
অন্যান্যদের		১৬			৫৪														
অন্যান্য	৫৩	১৪			৩৯														
বিভিন্ন জাতি	৬২০	১৮২	১৩৩	৩৬	৬০৮									৩	৫	১২	৩৪৬	২৮৪	৩২

থাকিবে সেখানে জাতীয় দলের ব্যক্তির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে জাতীয় দলের ব্যক্তি সেরূপ কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, সে স্থলে (১) এবং (২) সংখ্যক তালিকার প্রতিনিধিগণ co-opt করিয়া লইবেন।

(৪) ইউরোপীয় এবং অন্যান্য constituencyর প্রতিনিধি স্থলে কারারুদ্ধ বা কারামুক্ত স্বদেশ সেবকগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে যাঁহারা কারাবাস ভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল নির্ব্বাচন করিবেন। Nominated মেম্বরদের স্থলে নারীগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণ করিলেই হইবে।

(৫) অনুন্নত শ্রেণী এবং বিশেষ কোনও সম্প্রদায় বা সংঘ হইতে প্রতিনিধি Co-opt করিয়া লওয়া হইবে।

ভারত গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত নির্ব্বাচনে আপাততঃ হাত দিবার দরকার নাই। প্রদেশ গুলিকে প্রস্তুত করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমাদের নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রাদেশিক সমিতির সমস্ত সভ্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে। এই সকল সভ্যগণের কার্য্যকাল ৩ বৎসর হইবে এবং জাতীয় মহাসমিতির এখন যে বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হয় তাহার স্থলে এই নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে।

কংগ্রেসকে সত্য সত্যই যদি জাতীয় মহাসমিতি করিতে হয় তাহা হইলে এইভাবে কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। দেশের জনকতক একটা মহৎ আদর্শ লইয়া জাতীয় সমিতি খুলিয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে? কর্ম্মীগণের যে ত্যাগ সে তো সমস্ত দেশের জন্য! দেশের সকলে যদি পিছনে পড়িয়া থাকে তো নেতাগণকে আগিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আদর্শবাদের পক্ষিরাজ হাঁকাইয়া কয়েকজন শীঘ্র স্বর্গে পৌঁছিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের পৌঁছানোতেই দেশের স্বর্গলাভ হইবে না। দেশের সকলে যদি রাসথতে নাম লিখিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য ধমকাইলে বা দোষ দিলে কি প্রতিকার হইবে? বরঞ্চ সকলে যাহাতে অল্পে অল্পে মুখল খুলিয়া মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। স্বপ্নবিহারীর প্রয়োজন আছে—কিন্তু সকলেই স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী নয়। "Transcendal Philosophy has feet of clay like Nebuchandnezzar's golden-imagine, for the natural needs of the bad afflict saint and sinner alike,and even the Vedanta cannot flourish without a certain modicum of protien, carbohydrates and water within twenty four hours" (Hardayal) জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিলেও, বেদান্তবাদীর ছুঁচটা কিনিতেই মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয় না। তখন আর একটা মিথ্যা খাওয়ার আশায় না লইলে আর উপায় থাকে না। সেইরূপ, আদর্শ এক জিনিস আর কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ আর এক জিনিস। আমাদের ভবিষ্যতের আদর্শকে সফল করিতে হইলে, হিসাবগণ্ডা বুঝিতে হইবে এবং আয় মত ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের আবশ্যক অবিলম্বে সেগুলি স্থাপিত করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বোর্ডগুলি প্রাদেশিক সমিতির অধীনে গঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক বোর্ড autonomous হইবে এবং ফিনান্স বোর্ড হইতে সকলকে অর্থ দেওয়া হইবে। সামর্থ্য বুঝিয়া ফিনান্স বোর্ড প্রত্যেক বোর্ডের নিকট বজেট চাহিবেন। ফিনান্স বোর্ডে অন্যান্য বোর্ডের সম্পাদকগণ ex-officio মেম্বর থাকিবেন এবং বজেট পাশ করিবার ক্ষমতা একমাত্র এই বোর্ডের হাতেই থাকিবে।

(১) ন্যাশনাল সার্ভিস বোর্ড (National Service Board)
(২) শিক্ষা বোর্ড (Education Board)
(৩) স্বদেশী বোর্ড (Swadeshi Board)
(৪) শ্রমজীবী বোর্ড (Labour Board)
(৫) কৃষিজীবী বোর্ড (Agriculturist Board)
(৬) প্রচার বোর্ড (Propoganda Board)
(৭) প্রকাশ বোর্ড (Publicity Board).
(৮) বিচার বোর্ড (Arbitration court Board)
(৯) নারী প্রতিষ্ঠান বোর্ড (Womens organisation Board)
(১০) অর্থ সংগ্রহ বোর্ড (Finance Board)

এই সকল বোর্ডের খরচ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান, ফিকানস্ব অর্থ, বিদেশীয় ভারত বাসীর নিকট সংগৃহীত অর্থ, আইন ব্যবসায়ী, চামুরে ব্যবসাদার, ছাত্র প্রভৃতির স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আয় কর (Voluntary National Income Tax) এবং জাতীয় ঋণভাণ্ডার (National Loanfund) হইতে চালানোর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়া ঋণদাতাগণকে শতকরা ৩৲ টাকা সুদ দিয়া সমস্ত টাকার বাকি সুদ হইতেই অনেক কাজ হইতে পারে। আসল টাকা খরচ না করিয়া ৫ বৎসর বা এইরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় পরে ফেরত দেওয়া হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলিতে পারে।

দেশের সমক্ষে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল—এখন সুধীগণ যদি একবার আমাদের এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি প্রসূত প্রস্তাবের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগও করেন—তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। তবে এই প্রস্তাবের মূল অংশ স্বাধীনতার ইতিহাসে অন্যত্রও পরীক্ষিত হইয়াছে—মুক্তিপথের যাত্রী আমাদের একবার সে পথের কথা ভাবা উচিত নয় কি?

আমলাতন্ত্রের নির্দ্ধারিত প্রতিনিধি সংখ্যা লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। Constituency সম্বন্ধে একটু পরিবর্ত্তন দরকার—যেমন ইউরোপীয়দের স্থলে

কারাদণ্ডিত দেশ সেবকগণের নির্ব্বাচন অধিকার দেওয়া অথবা নারীগণের নির্বাচন অধিকার স্বীকার করা বর্ত্তমানে ভারতে ৪০লক্ষ লোক ভোটের অধিকার পাইয়াছে। বাংলা দেশে দশলক্ষ লোকের ভোট আছে—তন্মধ্যে গত নির্ব্বাচনে প্রায় ৩ লক্ষ লোক ভোট দিয়াছিল। Election propoganda উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে জাতীয় মহাসমিতির প্রচার কার্য্য বেশ চলিতে পারিবে এবং নির্ব্বাচিত হইয়া কাউন্সিলে না গেলেই অসহযোগের আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইবে না। প্রতিনিধিগণের representative character আমলাতন্ত্র বা বিদেশের লোকেও অস্বীকার করিতে পারিবে না। অবশ্য Oath of allegiance না নিলে তাঁহাদের স্থলে গবর্ণর অন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের আদেশ দিবেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্যের কোনও বাধা হইবে না।

(১৫) বর্ত্তমান কংগ্রেস কমিটির অনুপযুক্ততা

একবৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে সমগ্র কংগ্রেস কার্য্য-পদ্ধতির অনেক দোষগুণ আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এবৎসর অধিকাংশ জেলা কমিটিতেই দস্তুর মত নির্ব্বাচন হয় নাই—পরিচালক সমিতি হইতে প্রাদেশিক সমিতিতে নির্ব্বাচন হইয়াছে, কিম্বা প্রতিনিধি সংখ্যা এরূপ বাঁধ করানো হইয়াছে যে নির্বাচন আবশ্যক হয় নাই। Single Tradsferable System নামক অদ্ভুত নির্ব্বাচন প্রণালী মফঃস্বলে অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ত্তারা বোঝেন নাই—আমরাও বুঝিনা। উহার সার্থকতাও দেখি নাই। ২৩জন ও ৫০ জন কংগ্রেস সভ্যের উপস্থিতিতে যথাক্রমে গ্রাম্য ও সহর কংগ্রেস কমিটিগুলি এবৎসর নিয়ম মত গঠিত হয় নাই। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অনেক আইন ব্যবসায়ী কর্ত্তৃত্ব পদ পাইয়াছেন। আর এক কথা তিনশত সভ্য লইয়া প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হওয়া উচিত নয়। সমিতির কাউন্সিলের যে সমস্ত কাজ হওয়া উচিত তাহাতে সমিতি ডাকিতে হইয়াছে। কাউন্সিলে কোরামের অভাবে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় নাই। "The strength of an association depends not on its numbers but on it homogeneity" (Mazzini)—সংখ্যাধিক্যেই সমিতির বল নয় একতাবদ্ধ হওয়াই শক্তির উৎস—ম্যাট্‌সিনির এই মহা-বাক্য অবেলা স্মরণ রাখি নাই। An earliest band is more effective than a discreditable multitude"—ম্যাকস্‌হুইনিও ইহাই বলিয়াছেন।

সমিতির অধিবেশনে মফঃস্বল হইতে কর্ম্মীগণের যার যার আসা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। কর্ম্মকর্ত্তা ও কাউন্সিল নির্ব্বাচনের জন্য সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন ভিন্ন প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হওয়া উচিত নয়। অবশ্য বিশেষ কোনও উপলক্ষে অধিবেশন হইতে পারে। ঘন ঘন অধিবেশন হইলে কার্য্যের অসুবিধা অনেক ঘটে। সাধারণত এইরূপ অধিবেশনে ৫০।৬০ জনের বেশী সভ্য উপস্থিত থাকেন না। যদি কোনও একটি দল বাঁধা যায় এবং তাহাতে ৩০।৩৫ জন থাকে—তাহা হইলে তাহারা সভায় উপস্থিত হইয়া যাহা খুসী করিতে পারে। দুএকবার এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে। প্রাদেশিক সমিতিতে গুপ্তচর অসৎলোক এবং অসহযোগের বিরোধী ব্যক্তির অভাব নাই—তাহারা একত্র হইয়া সমস্ত দেশের কার্য্য প্রণালী উল্টাইয়া দিতে পারে—এরূপ সুযোগের সম্ভাবনা থাকা উচিত নয়।

(১৬) নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক সমিতি

আমাদের প্রস্তাবিত মতে প্রতিনিধি সংখ্যা কম হইলেও ক্ষতি হইবে না। বরং কাজে ভালই চলিবে। কিন্তু এই ভাবে কাজ চালাইতে হইলে কংগ্রেসে Provincial autonomy চাই। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির হাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :—

(১) কংগ্রেস ক্রীড (Congress creed)
(২) কংগ্রেস সাধারণ নীতি (Congress general policy)
(৩) আর্থিক নীতি (Economic policy)
(Swadeshi Banking)
(৪) হিন্দু মুসলমানের একতা (Hindu Moslem unity)
(৫) বিদেশে প্রচার (Foreign Propoganda)

প্রাদেশিক সমিতির হাতে থাকিবে :—

(১) শিক্ষা (Education)
(২) বিচার (Justice—Panchayet Courts)
(৩) ন্যাশনাল পার্টিস (National Service-volunteers, officer)
(৪) শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী সমস্যা (Labour Agricultural organisations)
(৫) অর্থসংগ্রহ (Finance)

(উপসংহার)

আমাদের আশাহার তরা বাগানে মহাত্মা নন্দনের পারিজাত ও কল্পতরু আনিয়াছিলেন। তাই যখন তিনি আসার প্রস্তাব করেন, সকলেই চিরঙ্কুত সেই সুন্দর শ্রেষ্ঠ পুষ্পের ও সকল কামনার পূরক কল্পতরুর দর্শনের চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া মহাত্মার চারিদিকে ভিড় করিয়াছিল। মহাত্মা স্বর্গ হইতে তাহাই আনিয়া দিলেন। তাতা ঘরে চাঁদের আলোর মত দিন কতকের জন্য স্বর্গের শোভা আমাদের দেশে দেখা গেল—পারিজাতের গন্ধ স্বাধীনতার মলয়ের সঙ্গে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া নরনারীকে পাগল করিয়া তুলিল। কয়েকদিন পরেই গাছটি আশাহার চাপে, মাটিতে উপযুক্ত রসের অভাবে শুকাইতে আরম্ভ করিল। তখন স্বর্গ হইতে জল আনিয়া কয়েকজন সাধক তাহার গোড়ায় দিতে চাহিলেন—কিন্তু গাছ শুকাইতেই লাগিল। এখন যে প্রাণের সজীবতা, পুষ্পগন্ধ—সে আশপাশের অভাব, তাহাদের নয়। সতাগুলি এখন করিয়া গাছ দুটিকে জড়াইয়া চাকিয়া ফেলিয়াছে, যে ভিতরের কল্পতরু ও পারিজাতের আর

শুকুনো ডাঁটি দেখিতেও পাওয়া যায় না—উপরে যে সমস্ত ফুল ফুটিয়াছে, তাহারা পারিজাত নয়, যে ভাবলতা চারিদিকে বিরিয়াছে সে-ও কল্পতরুর নয়।

মহাত্মা অসহযোগের কল্পতরুও স্বরাজের পারিজাত নিজের সাধনা দ্বারা স্বর্গ হইতে আনিয়া আমাদিগকে দিয়াছিলেন। কল্পতরুও মাটির তলে চারা অবস্থাতেই শুকাইতে আরম্ভ করিল, পারিজাতটি ফুলন্ত আনা হইয়াছিল, তাই দিনকতকের জন্য সে স্বর্গীয় গন্ধ ও সৌন্দর্য্যের আভাস আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু গাছের যেমন একটা organic growth আছে, তাহাকেও মাটি হইতে রস টানিয়া আস্তে আস্তে বড় হইতে হয়, প্রত্যেক আন্দোলনের বেলায়ও সেইরূপ হয়। ফুলের জন্য অধীর হইয়া মুহূর্ত্তে গাছ উপড়াইয়া আনিয়া পুঁতিলে, তাহা যেমন না বাঁচাই সম্ভব।

সেইরূপ অসময়ে একটা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেও তৎজাত অনুষ্ঠানগুলিরও সেই অবস্থা সম্ভব। আমাদের স্বরাজের পারিজাতও অসহযোগের কল্পতরু যে কয়দিন রস পাইয়াছিল তাহা স্বাভাবিক রস নয়, সে রস খালিয়ানওয়ালাবাগের বিন্দু মূলধনের রক্ত এবং তাহার সঙ্গে আমাদের শত নির্য্যাতন অপমান ও লাঞ্ছনার মিলিত অশ্রুধারা।

তাই আজ আমাদের সাজান বাগান শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। এখন যে ফল ফুলের সুষমা তাহা সে স্বর্গীয় তরুর নয়। তাই আজ কংগ্রেসের নেতারা উদ্ভ্রান্ত। আজ পথহারা পথিকের মত তাঁহারা সামনে যে পথ দেখিতেছেন, সেই দিকেই চলিতেছেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে মৃত সঞ্জীবনী আনিবেন, এই আশায় ছুটিতেছেন। যিনি স্বর্গের সন্ধান দিয়াছিলেন, সেই পথ যিনি চিনিতেন আজ তিনি গণ্ড শক্তির হস্তে নিবদ্ধ। কে এই পথহারা জাতিকে এখন প্রকৃত পথে লইয়া যাইবে? কে এই লক্ষ্যহারা ভ্রান্ত পথিকদের একটু আশার বাণী শুনাইবে? আমরা এখন সেই অমোঘবাণী শুনিবার আশায় পথের ধারে কাণ পাতিয়া বসিয়া আছি।

স্বাস্থ্য-বার্ত্তা

(২)

[ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্]

("স্বাস্থ্য-সমাচার" হইতে)

যে যে কারণে কামোদ্রেক হয়, সেই সেই অবস্থায় বীর্য্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। সুপক্ক আম ভিন্ন আম গাছের অপর কোথাও সে ঘুমিষ্ট রস পাওয়া না গেলেও, সেই রসের উপাদান আম গাছেই ওতপ্রোতভাবে থাকে। আমও যখন-তখন ফলে না, ফলিলেও সকল সময়ে ঘুমিষ্ট হয় না। সেই রকমে, আমাদের অণ্ডকোষে বীর্য্য প্রস্তুত হইলেও, আমাদের রক্তে সেই বীর্য্যের উপাদান থাকে। রক্ত হইতে বীর্য্যের উপাদান আহরণ করিয়া, যখন ইচ্ছা, তাহাকে আমরা অণ্ডকোষের মধ্যে চালানী করিয়া লই। এই সার কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। রক্তের মধ্যে বীর্য্যের উপাদান ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতবার বীর্য্যপাত করা যায় ততবারই রক্ত হইতে ঐ জিনিষটিকে তুলিয়া লওয়া হয়, রক্ত ততই ঐ জিনিষটি শূন্য হইয়া পড়ে। দেখা গিয়াছে যে, রক্তের ঐ উপাদান যে যে পরিমাণে নষ্ট হয়, রক্ত পরিমাণে ও শক্তিতে তত হীন হইয়া পড়ে,—অথচ রক্তই আমাদের জীবন।

যাহাদের বেশীবার বা বেশী পরিমাণে বীর্য্যপাত হইয়াছে, তাহারা দুর্ব্বল বোধ করে, তাহাদের চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে, মাথা ঘোরে, বেশীক্ষণ চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না, স্মরণ শক্তি কমিয়া যায় তাহারা কোনও কাযে মনোনিবেশ করিতে পারে না। কথা—মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়। চিন্তাশক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া আসে; ক্রমশঃ ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়; অনেক সময়ে, কাণের ভিতরে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ বোধ হয়, তাহাদের চক্ষের দৃষ্টিও কমিয়া আসে। শরীর অলস হয়, মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়। কাহারো কাহারো মাথা ধরিতে থাকে, বৈকালে খুব ঘুমে জ্বর হয়, কেহ কেহ বা সাময়িক পাগলও হইয়াই যায়। এ অতিমাত্র বীর্য্য-ক্ষয় হইতে ফয়কাশিও (phthisis) আসিয়া দাঁড়ায়। আরো কত কি হয়—তাহার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্য করিও—শরীরের সামান্য অংশ অণ্ডকোষ হইতে বীর্য্যপাত ঘটিলে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কোন যন্ত্র নিষ্কৃতি পায় না—অন্ন-বিস্তর সকলেই বিকল হইয়া পড়ে।

মোট কথা এই যে, আমাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু নির্ভর করে—শরীরের রক্তের উৎকর্ষতার উপরে। সেই রক্তের সারাৎসার অংশ—বীর্য্য। কাযেই, বেশী বা অযথা বীর্য্যপাতে, রক্ত দুর্ব্বল হয়। রক্ত দুর্ব্বল হইলে, মানুষটার সব দিকেই অনিষ্ট হয়। এই কথাটি মুনি-ঋষিরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা তাহার শতাংশের একাংশও বুঝেন না। কাযেই, মুনি-ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের উপরে এত জোর দিতেন। "ব্রহ্মচর্য্য" বলিলে, আর যাহা কিছু বুঝাক বা না বুঝাক, বীর্য্যপাত না করাটাকেই সব চেয়ে বেশী করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। আধু

থাকিয়া "ঊর্দ্ধরেতঃ" থাকিতেন—অর্থাৎ জীবনে কখনো এক ফোঁটাও বীর্য্যপাত করিতেন না। তাই, না খাইয়াও তাঁহাদিগের দেহের এত লাবণ্য থাকিত, তাঁহাদের ধ্যান ও ধারণা করিবার এত শক্তি জন্মাইত, তাঁহারা এক গণ্ডুষ আহার করিয়াও এত দীর্ঘায়ু হইতেন। আজ আমরা যে অত্যন্ত বেশী অল্পায়ু, এত রোগ ও অকালমৃত্যু, এত কম বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী, তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের অসংযম। এটাকে একটা কথার কথা হিসাবে বলিলাম, তাহা নহে। ইহা খাঁটি সত্য।

এ পৃথিবীতে আর একটী মহার্ঘ জিনিষ লক্ষ করিবার আছে। তুমি যতই ধরণী খাঁকিতে চেষ্টা কর—যতই এক-বস্ত্র লইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর—দেখিবে, "জ্বর" সহিত "এক" কত রকমে যোগান, কত কত বিষয়ে জড়ান। এই "এক" জিনিষ বীর্য্য-ধরিয়াই দেখাইয়াছি যে, বীর্য্যপাতে মাথা খারাপ হয়, চক্ষু খারাপ হয়, মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়, আয়ুঃ কমিয়া যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি কমিয়া যায়। আবার অসংযমের দিক দিয়া দেখ—যে এতটুকু সামান্য জিনিষের বেলায় অসংযত হইতে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ সকল জিনিষের বেলায়ও অসংযম আসিয়া জোটে। এই কারণেই, মুনি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের সাধনকার্য্যে বীর্য্যপাতের দিকে প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিলেও, সকল বিষয়েই সংযমের অভ্যাস করিতে বলিতেন। তাঁহারা এটা বেশ বুঝিতেন যে, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক অণুর সঙ্গে অপর প্রত্যেক অণুর অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অসংযমী, অহঙ্কৃত, ও "ছ-ম প্রধান" ঘরোয়ী পাশ্চাত্যগণের শিক্ষা ও দীক্ষার ফলে, আমরা প্রতি কাজেই এই সত্য সূত্র ভুলিয়া যাই।

আর একটা কথা।—বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,—প্রথমতঃ, যখন জীবের জন্ম হয় অপর জীবের জন্ম দিবার জন্য, এবং সেই জন্মদান হয় প্রধানতঃ বীর্য্যেরই প্রভাবে, "বীর্য্য নষ্ট করা" মানে দাঁড়ায়—জীবন ও জন্ম অনার্থক করা—পরমপিতার হইয়া ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করা—অপমানিত করা। দ্বিতীয়তঃ এ পৃথিবীতে তিনটি দারুণ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব—স্নেহ (গণোরিয়া), পঙ্কি (সিফিলিস) ও কর্কটরোগ (ক্যান্সার) —যাহা জীবনে কখনো পারে কি না সন্দেহ—যাহা পর-পর পাঁচ পুরুষকে ভোগায়, এবং যাহার জন্য মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে। এমন যে তিনটি ব্যাধির, তাহার মধ্যে দুইটিই অসংযমের, অসংযমের শাস্তি স্বরূপ এবং কর্কটরোগও প্রকারান্তরে তাই। অন্ততঃ এই দুইটি দিক দিয়াও বেশ বুঝা যায়—ভগবানের নির্দ্দেশ কোন পথে। জীব, তুমি কি এতই অন্ধ যে এই ভগবৎ-সঙ্কেত দেখিতে পাও না?

পৃথিবীতে যত জীব আছে, প্রত্যেকেরই জীব-জন্ম দিবার নির্দ্দিষ্ট কতু বা কাল আছে—শুধু মানুষের বেলায় তাহা নাই। ভগবান্ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়াছেন বলিয়া, ঐরূপ (সাময়িক প্রবৃত্তির উপরে) কোনও ভার-নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। কিন্তু মানুষ নিজের বুদ্ধির অপব্যবহার করিয়া, অত্যন্ত অসংযমের পরিচয় দিতেছে।

প্রথমতঃ।—আজ আমরা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমাদের জীবনের মধ্যে মস্ত কর্ত্তব্য রহিয়াছে মাত্র একটা—সেটি হ'ল—একটী সুসন্তান রেখে যাওয়া। কামাচারী হইয়া "সুখের পায়রা" পালন করা নয়। "সুসন্তান" বলিতে "রূপ, জ্ঞান ও ধর্ম্ম" সম্পন্ন সন্তান বুঝায়। সেরূপ সন্তান জন্ম দিবার জন্য যে আয়োজন, যে ব্রহ্মচর্য্য, যে মানসিক-উন্নতাবস্থার প্রয়োজন, তাহার এতটুকুও কি আমরা করি? কাজেই, যে সন্তান জন্মায় সে দীর্ঘায়ু, রূপ, জ্ঞান (জীবনের সাফল্য) যশঃ ও ভগবদ্বিভূতি)—কিছুরই কিছু লইয়া আসে না—সে আমাদের অসংযমের মূর্ত্ত বিকাশ হইয়া জন্মায়। সে নিত্য ব্যারামে ভোগে, অল্পায়ু হয়—সবগুলি আমাদের অসংযমের ফলে। সে সন্তান আমাদিগের পাপের শাস্তি দিতে আসে, আমাদের বংশের বা সমাজের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আসে না। তাহার নিত্য ব্যারাম, নিত্য অকাল-মৃত্যু দেখিয়াও আমরা অসংযত হইতে ছাড়ি না!!!

দ্বিতীয়তঃ। সন্তান জন্মিলে, অভার মনস্ত কলহ আমরাই (পিতামাতাই) বাল্যকাল হইতে তাহাকে অসংযমের ক্ষেত্রের মাঝখানে রাখিয়া, পরে পরে অসংযমের খুব খুব প্রাণা দিয়া, তাহার মধ্যে ঐ অসংযমের বিপুল জোড় বহাইয়া দিই। সন্তান জন্মিলে সে সন্তান যে ষোল আনা আমারই সৃষ্টি, এটা মনে করি—সে যে দেশের ও দশের সেবা করিতে জন্মিয়াছে, এ কথা ভুলিয়া যাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধের অধিকতার জন্য এবার "রাসলীলা" ছাপান যাইতে পারিল না, আগামী সংখ্যায় আশা করি দিতে পারিব।

বিরহ-বিধুরা
[আলোকচিত্র হইতে]

নূতন মন্ত্রীসভা

১ ভাইকাউণ্ট পীল। ২ মাক্যু ইভ্ অব সলিসবরী। ৩ সার্ এল ওয়ারিংটন-ইডাল। ৪ লর্ড হীউ সিসিল। ৫ আর্ল অব বাল্‌ফুর।

৬ সার্ জর্জ ইউয়ার। ৭ লর্ড কারজন। ৮ সার্ জন জেনার হিক্স্। ৯ সার্ এ ব্রিক্স বমণ্ট্রেন। ১০ কাপ্টেন প্রেটিম্যান।

মিঃ বোনার ল—প্রধান মন্ত্রী।

বাঙ্গালী বীর ভীষণবাহী মাত্র অল্পদিনের জন্য মর্ত্য-জগতে অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখাইয়া ঘোবনেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালেও বীরের দেহ সেই অমানুষিক শক্তি-আধারের পরিচয় দিতেছে, মুখে অপার্থিব শান্তি বিরাজিত।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৫শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩২৯, ইং ১১ই নবেম্বর । [১৬শ সংখ্যা

যমের এর বেশী নয়—১৩৯ বৎসর মাত্র। রোগ-শোক নেই, বেশ আছে, অমর অমর।

সর্বগ্রাসী-ক্ষুধা !

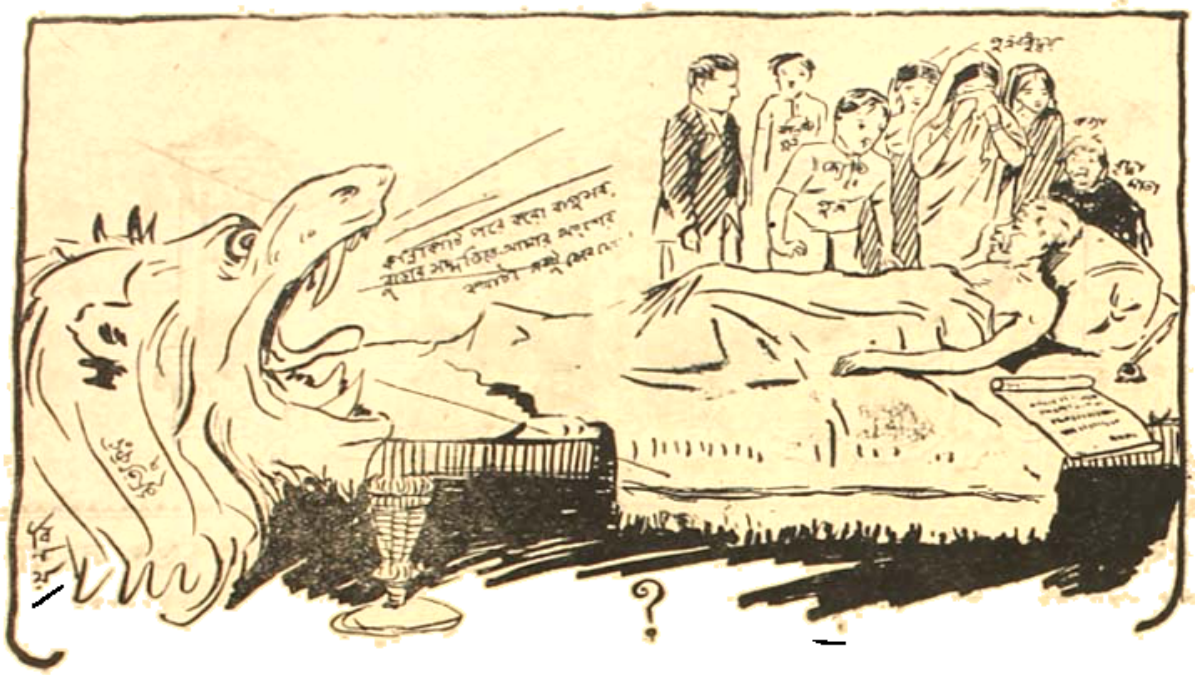

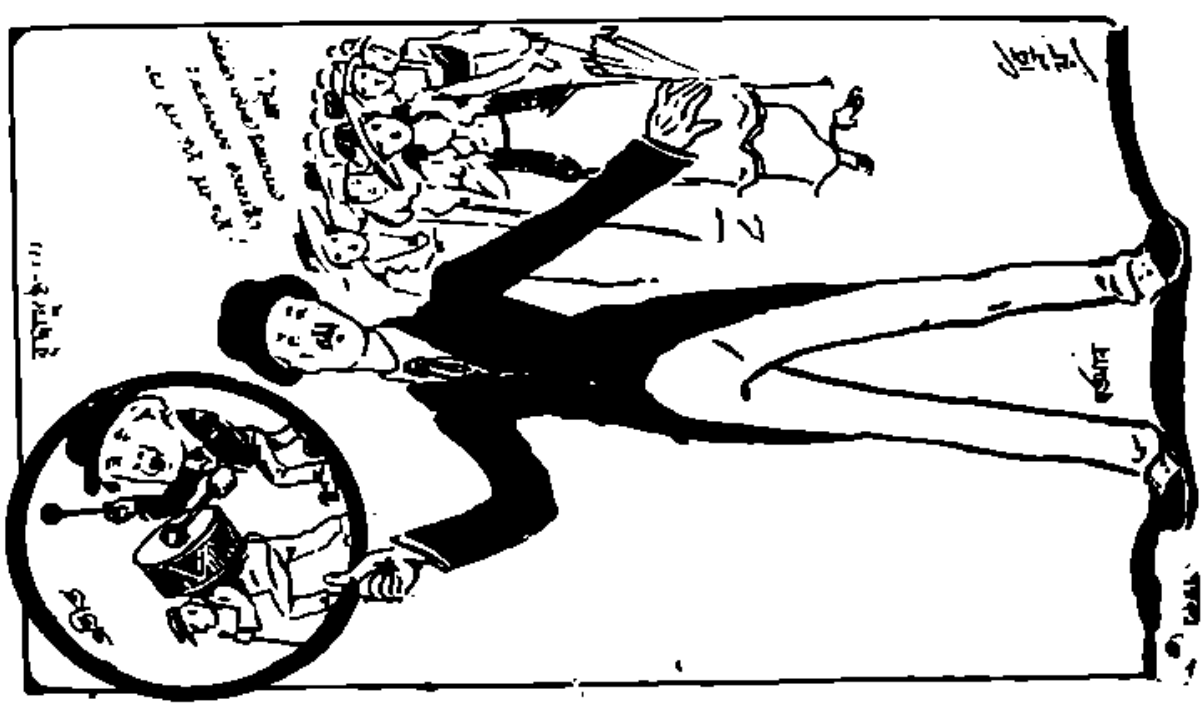

বোঝার চাপ।

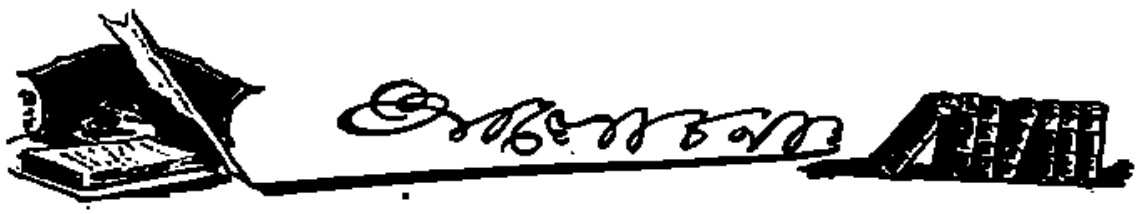

অনগত আইন অমান্য তদন্ত সমিতির রিপোর্ট এতদিন পরে বাহির হইয়াছে। গত কংগ্রেসের সময়—আমলা-তন্ত্রীদিগের অত্যাচার যখন একেবারে চরমে উঠিয়াছিল তখন দেশবাসী অত্যাচার প্রতিরোধ অবস্থায় অত্যাচার নিরাকরণার্থ বন্ধভাব ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষমাভাব অবলম্বন করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিল। দেশবাসীর এই আগ্রহ হইতেই আইন-অমান্য তদন্ত সমিতির সৃষ্টি। মহাত্মা প্রবর্তিত বারদোলীর গঠন মূলক কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে দেশ যে ক্রমে নির্য্যাতন ও আবিলতার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে দেশবাসী উত্তেজনার আধিক্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। সত্ত সত্ত ফল একটা ফল দেশবাসী চাহিয়াছিল। কিন্তু সে হাতে চাঁদ, কপালে সূর্য্যি যে কল্পনাতেই শুধু মেলে সত্য জীবনে তাহা যেমন দূরে তেমনি দূরেই থাকিয়া যায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ আইন অমান্য তদন্ত সমিতির রিপোর্ট হইতেই দেখা যাইতেছে। নিখিল ভারতের কোন প্রদেশের কোন নেতাই আইন অমান্যের স্বপক্ষে বলেন নাই। সকলেই দেশ এখনও ইহার যোগ্য হয় নাই বলিয়াই রায় দিয়াছেন। সুতরাং সম্ভবতঃ সম্প্রতিকার মত আইন অমান্য দেশে বন্ধ রহিল। তবে সমিতির সভ্যেরা একটা বিধান দিয়াছেন—যাহারা ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক হিসাবে আইন অমান্য করিতে ইচ্ছুক তাহারা তাহা নিজ দায়িত্বে করিতে পারেন।

• • • •

আইন অমান্য তদন্ত সমিতি সাক্ষ্য হইতে একটা কথা বলিয়াছেন যে বারদোলী বিজয়ীর প্রস্তাবেই কংগ্রেস কর্মীদের সকল উৎসাহ নিভাইয়া দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাবেই দেশের লোকের উপর একটা অতিরিক্ত নিরাশা ও অবসাদের ভার আনিয়া দিয়াছিল। সত্য কথা ব্যাপারটা যে সত্যই তাহা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যে উৎসাহ লইয়া কংগ্রেস কর্মীগণ খেলে যাইতেছিলেন—যে উৎসাহ, উত্তেজনাবশে তাহারা দেশমাতৃকার সেবায় অগ্রসর হইতেছিলেন সে উৎসাহ উত্তেজনা মহাত্মার বারদোলীর প্রস্তাবে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।

• • • •

হিংসার বদলে হিংসাই ভাল না অহিংসা দ্বারা হিংসার প্রবৃত্তিকে রোধ করা ভাল এবং তাহা আদৌ সম্ভবপর কিনা বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ইহা লইয়া বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। আমাদের দেশীয় ব্যাপারেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে ও দেখা যাইতেছে শক্তিদর্পিত যাহারা—অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত যাহারা তাহারাই নিরস্ত্রপ্রায় জনসঙ্ঘের উপর বরাবর জয়লাভ করিয়া যাইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার শক্তি ভিন্ন কেহই অপরের উপর জয়লাভে সমর্থ হয় নাই। সুধাপানে অমর দেবতা মণ্ডলিকেও অসুরের সহিত সংগ্রামে শক্তির সাধনা করিতে হইয়াছিল। শক্তি সাধনায় শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াই তাহারা অসুরবৃন্দকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই শক্তির মাহাত্ম্য ভারত পুরাণে নানা ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শক্তি সাধনার কথা মহাত্মা যে বোঝেন নাই বা জানিতেন না তাহা নহে। তিনি উহার সারবত্তা বিশেষ ভাবে স্বীকার করেন বলিয়াই ভারতব্যাপী জনসঙ্ঘের উদ্যত উৎসাহের উপর বারদোলীর প্রস্তাবের বরফজল সেচন করিয়াছিলেন।

• • • •

আমাদের দেশ কোন শক্তিতেই শক্তিমান নহে। এককালে—যদিও সে খুব বেশীদিনের কথা নহে ভারতের নানা প্রদেশের নানা জাতি যুদ্ধাসক্ত ও যুদ্ধে পারঙ্গম ছিল। কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসন আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতীয় জাতিদিগের যুদ্ধবিদ্যা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—যে জাতি বা যে প্রদেশের লোকেরা এখনও যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহারা ভারতে বৃটিশ রাজ্য অক্ষুণ্ণ ও অনুস্যূতে রাখিবার জন্যই বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তাহার উপর এমন নিরস্ত্রদেশ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। নিরস্ত্রদেশের এই অধিবাসীবৃন্দ যে অস্ত্র যুদ্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ

ক্ষমতার সহিত কণমাত্রও দাঁড়াইতে পারিবে না তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় দিগের পক্ষে ওরূপ কল্পনা করিতে যাওয়াও ভুল।

• • • •

বৃটিশ জাতি নানা ভাবে বারংবার ভারতীয়দিগকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা অস্ত্র দ্বারাই ভারত জয় করিয়াছেন এবং অস্ত্র বলেই ভারতে তাহাদের স্বার্থ অক্ষয় অটল রাখিবেন। জগতে ক্ষমতাশালী যাহারা তাহারা চিরদিন এমন গর্ব্বের সহিতই কথা বলিয়া থাকেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

• • • •

আজ কোটি কোটি ভারতবাসী অভাবের দারুণ পেষণে মরণ কামনা করিতেছে। জীবনের সুখ শান্তি তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। জীবন আর তাহাদের নিকট বিচিত্র উপভোগের বস্তু নাই। তাহার উপর মিথ্যা মান মর্য্যাদা, খ্যাতি সম্ভ্রম ইহাও যে কত অনিত্য তাহা ভারতীয়েরা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে আরও বেশী ভাবে মহাত্মার অ-সহযোগ আন্দোলন প্রচার হইবার পর হইতেই। রাজদ্বারে সম্মানিত, দেশের জন শক্তির নিকট পূজিত মহৎচরিত্রের ব্যক্তিরাও যখন দেশের কথা বলিতে গিয়া সহজভাবে লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত হইলেন তখন তাহাদের বাহিরের সম্মান খ্যাতি যে কত মিথ্যা ও অনিত্য তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

• • • •

এই বোঝা বুঝির পর—মহাত্মার বারদোলীর গঠন মূলক কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ গঠন মূলক কার্য্য ভিন্ন অপর কোন কার্য্যে যে কিরূপ সুফল ফলিতে পারে তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি?

• • • •

গঠন মূলক কার্য্য হইতেই পরে জনগত আইন অমান্যের ভাব আসিয়া পড়িবে। এইরূপ একটা ধারণা অনেকের মনে ছিল। কিন্তু গঠন মূলক কার্য্যের কর্ম্মী যাহারা তাহারা নাকি এই গঠন মূলক কার্য্য ধারার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল—তাই আইন অমান্য হইতে বিলম্ব হইতেছে। এটি গঠন মূলক কার্য্য ধারারই দোষ না কার্য্য করিবার কর্ম্মীদিগের দোষ—দোষ কাহার তাহা তদন্ত সমিতির সভ্যেরা তেমন ভাবে দেখান নাই। যাহাই হউক কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বেই তাহার ফলভোগ করিতে চাহিলে লোকের যে দশা হয় এ ব্যাপারেও সেই দশাই হইয়াছে।

• • •

আইন অমান্য তদন্ত সমিতি সব চেয়ে বেশী ব্যাপৃত ছিলেন বোধ হয় দেশের গঠন মূলক কার্য্য ধারা ও আইন অমান্যের যোগ্য হইয়াছে কিনা দেশ তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া—যে দেশবাসী পুনরায় কৌন্সিলে প্রবেশ করিবে কিনা! আইন অমান্য তদন্ত সমিতির দু'একজন সভ্য ভূতপূর্ব্ব কৌন্সিলর, তাহারাই আবার কৌন্সিল যাইবার পক্ষে রায় দিয়াছেন। আমরা বুঝিতে অক্ষম হইতেছি কি করিয়া ইহারা কৌন্সিলে বসিয়া এমন সুন্দর দেশের কার্য্য হয় জানিয়াও অ-সহযোগী হইয়াছিলেন।

• • • •

মহাত্মার অ-সহযোগ কর্ম্মধারার বিরাট তত্ত্ব এক একটি দেশের ব্যবস্থা বুঝিয়া আবার ফিরে ফিরে পুনঃ কৌন্সিল প্রবেশ করিবেন এই সিদ্ধান্তে এতদিন পরে উপনীত হইয়াছেন ইহা জানিয়া মহাত্মা বোধ হয় কারাকক্ষে থাকিয়াও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিবেন। মহাত্মার নির্দ্দেশ মত দেশ সবটুকুই করিয়াছে এখন বাকী ছিল এটি তাহাও দেশ প্রাণপণে করিবে।

• • • •

মারাঠা প্রদেশের অনেক নেতারা বার বার বলিতেছেন হয় আইন অমান্য কর নতুবা কৌন্সিলে যাও। দেশ কৌন্সিলে গিয়া যদি শাসন প্রথা উল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব হইত তবে দেশ এক বাক্যে তাহাতে সায় দিত, কিন্তু তাহা কি সম্ভব! আজ কৌন্সিল নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া পণ্ডিত মতিলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকতআলী, হজরত মোহানী, পণ্ডিত জহরলাল, লালা লাজপত প্রভৃতি কেহই বোধ হয় দাঁড়াইতে পারিবেন না। কারণ ইহারা সকলেই কারারুদ্ধ। তার পরে ইহারা দাঁড়াইলেই যে নির্ব্বাচিত হইয়া চলতি শাসন প্রথার মুণ্ডরাঘাত করিয়া তাহাকে ঠিক মত করিয়া লইতে পারিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি! এক এক প্রদেশের দু'একজন প্রিয় নেতা অবশ্য আছেন যাহারা দাঁড়াইলে নির্ব্বাচিত হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু অধিকাংশই নির্ব্বাচনে

দাঁড়াইয়াও ভোটের অভাবে বা অন্যভাবে বাতিল হইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই।

• • • •

দেশ যদিও আইন অমান্য তদন্ত সমিতির রিপোর্ট সম্যক চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই—তবু ইহাতে ভাবিবার বহু কথা আছে। রিপোর্টটিতে সব চেয়ে আজগুবি মান হইয়া ফুটিয়াছে দেশের অবসাদ। তদন্ত সমিতির তিনজন সভ্য হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং শ্রীযুক্ত গ্যাটেল কৌন্সিল যাইবার পক্ষে ও শ্রীযুক্ত কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার, আনসারী এবং রাজগোপাল আচারিয়ার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাক্ষ্যদিগের অধিকাংশই কৌন্সিল যাইবার বিপক্ষে—জন দুচার জন পক্ষে। আগামী গয়া কংগ্রেসে ইতি কর্ত্তব্য স্থির হইবে।

• • • •

আগামী গয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আইন অমান্য তদন্ত সমিতির রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত কৌন্সিল গমন সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছিলেন। রিপোর্ট বাহির হইবার পর মারাঠার শ্রীযুক্ত কেলকার, এ্যানি ও মুনজী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাতে অ-সহযোগ নীতির মূল বজায় রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন যাহা করিয়াছেন ও কৌন্সিলে প্রবেশের পক্ষে বিশেষভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

• • • •

দু'চার জন নেতা যে মতই প্রকাশ করুন না কেন সমগ্রদেশ এ মতে সায় দিবে কিনা সন্দেহ। বোধ হয় দেশ এ মতে আদৌ সম্মতি দিবে না। সাধারণের মতামতানুসারেই অবশ্য কংগ্রেস এ প্রস্তাবের বিচার করিবেন। কিন্তু আগাইয়া গিয়া আবার পিছু হটিবার মতলব ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস দেশের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিবার অপর কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না কি? মহাত্মার কারাদণ্ডের পর ভারতে কি এমন একজন লোকও জুটিবে না যিনি অন্ততঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উপর কলকের ছাপ না লেপন করিয়া তাহাকে সব অবস্থায় অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার তারতম্য করিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতে পারেন।

• • • •

বাংলার শাসন পরিষদের দু-উচ্চ তক্তে সমাসীন রহিয়া মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান সরকার পক্ষ হইতে ষ্টেটস্‌ম্যান প্রতিনিধির নিকট উত্তরবঙ্গের বন্যার সাহায্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'in spite of all sentimental criticism it had to be remembered that a Government was not a charitable institution, on the contrary it was a business concern, and, consequently, there was no provision for giving alms out of public revenue" অর্থাৎ :—সাধারণের ভাবপ্রবণ সমালোচনার সময় মনে রাখিতে হয় যে সরকার খয়রাতের কারখানা নহে—বরঞ্চ ইহা একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুতরাং ইহাতে সাধারণের দেয় রাজস্ব হইতে ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই। অব্যবসায়ী বাঙ্গালী জাতিকে মহারাজ বাহাদুর ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন। প্রায় সাত লক্ষ লোক বন্যা তাড়নে সহায় সম্বলহীন মরণাপন্ন। সরকার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের হাত দিয়া এ পর্য্যন্ত বন্যা পীড়িতদের জন্য বিয়াল্লিশ হাজার মুদ্রা দিয়াছেন—সাধারণ প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা এ পর্য্যন্ত দিয়াছে। সরকার তাহার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান হইতে এত মুদ্রাই বা দিলেন কেন! চক্ষু লজ্জা কি? তারপর এ টাকাটা বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের নিজস্ব সম্পত্তি নয়—সরকারেরই তহবিলের অর্থ? দেশের এ প্রকার উপদ্রবে সরকার টাকা খরচ করিতে পারুন আর নাই পারুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—ও অন্যান্য দেশ কর্ম্মী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নূতন জেল নির্ম্মাণের বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা করিতে পারিয়াছিলেন দেশবাসী তাহা অবগত আছে। বাংলার লোক ভাবপ্রবণই বটে তবে ইওরোপীয় শিক্ষা ও ইওরোপীয় স্বাস্থ্য সেবন নিবাসের জন্য তাহারা যখন মহারাজাধিরাজের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা দেখে তখন এত ভাবপ্রবণ জাতিও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। আজ এই ভাবপ্রবণ জাতির দেয় রাজস্ব হইতে কোন গুণে মহারাজ বাহাদুরের মত লোকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি থাকিতেও বাৎসরিক বাট হাজার মুদ্রা লইতেছেন, কোন গুণে মহারাজ বাহাদুর আজ দেশের শান্তিশৃঙ্খলার একজন নিয়ন্তা?

• • • •

দেশে ইকনেম কমিটি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এইবার ব্যয় সংক্ষেপ কোন দিক্ দিয়া কি ভাবে হয় তাহা

দেখা যাইবে। মিশরীয় মেত হস্তীর পতন হয় না, সংস্কৃত মুসের শাসন ব্যাপারে হাতী পোষণ করিয়া যায় তাহাও দেখা যাইবে। বিভিন্ন প্রদেশ গুলি যাহা পূর্ব্বে একত্রে এক সবর্ণরের শাসনাধীনে ছিল তাহা কি আবার এক করা যায় না? তাহা হইলেও ব্যয় বোধ হয় অনেক কমিয়া যাইতে পারে। সিনেট কমিশনে দেখাইয়াছেন আসাম ও বাংলা একত্র করিলে তাহাতে একুশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। এইরূপ আরও বহু প্রদেশ সম্বন্ধে দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু যোগ্য পথে কি ব্যয় সংক্ষেপ হইবে?

• • • •

বলশেভিক নেতা লেনিন সম্প্রতি মরিয়াও আবার বাঁচিয়া উঠিয়া রুস রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রুস ও জার্মেন ব্যবসায় কোম্পানী বলিয়া আট লক্ষ স্বর্ণ রুবল মূলধনে ইহাদের একটী ব্যবসায় সংঘও স্থাপিত হইতেছে। ফরাসী ও ইংরেজের সহিত ইনি মিত্রতা চাহেন বটে তবে অর্থনীতিক সমস্যা জাগিলে এ মিত্রতা আবার চটিয়াও যাইতে পারে। লেনিন যেন আপন গর্ব্বে অনেকটা প্রমত্ত—ভাব দেখিয়া তো মনে হয় রুসিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ভালই।

• • • •

দেশে আবার একটা নূতন কর বসিতেছে। এবার মরণ কর। যে মরিবে, মরিবার সময় যে সম্পত্তি তাহার থাকিয়া যাইবে তাহারই এক চতুর্থাংশ সরকার বাহাদুর লইবেন। আইনটি হয়তো শীঘ্রই পাশ হইয়া যাইবে। ইহাতে সরকারের বিপুল লাভেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

নীতি-সংস্কার।

[শ্রীপঞ্চানন রক্ষিত (কাব্যবারিধি।)]

সত্যযুগের কথাগুলো,
এক সময়ে সত্য ছিল।
কালের বশে মিথ্যা আবার
তা'র স্থানটি দখল কর্‌লো।
(এখন) সব সময়ে সত্য কথা,
যদি তুমি বোলে কেন,
কালের কোপে পড়্‌বে তুমি,
রক্ষা কে কোর্‌বে বল।
দেশ কাল পাত্র ভেদে
সত্যকথা বোল্‌তে হবে,
নইলে, সত্য বোল্‌লে দফা
কলির কোপে জান হারাবে।
সংসার ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব
যাদের জোরে তুলছ শির;
সত্যাসত্যের আলাপনে,
সেগুলোকে রাখ্‌বে স্থির।
খাঁটী হয়ে চল্‌বে কিসে
খাঁটি তোমার নাইকো মূলে।
• • • •
মুখের কথায় হয় না কিছু,
—বহু চেষ্টায় সকল ফলে।

খবরাখবর।

জেনিস অধ্যাপক নিলস্ বের পদার্থ বিদ্যায় অণুমাত্র ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

• • • •

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তুর্কীর সুলতান ইংরাজের মুখ তাকাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

• • •

অদ্য আর্মিষ্টিচ্ সাক্ষরের দিন—বেলা ১১টার সময় দুই মিনিটের জন্য নিশ্চল নিষ্ক্রিয় থাকা, সম্রাটের আদেশ।

• • • •

"ধূমকেতু" কাগজখানি রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশিত "আনন্দময়ীর আগমন" ও "বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ"—নিবন্ধ দুইটিই তাহার কারণ। মামলা ২০শে নভেম্বর হইবে।

• • • •

"ধূমকেতু" কেন্দ্র পুলিস-কর্ত্তৃক খানাতল্লাসী হইয়াছিল।

• • • •

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির লোকের মুখে শুনিলাম, কলিকাতার বিভিন্ন নারীসমিতিগুলি আশাতিরিক্ত সাহায্য দান করিতেছে।

সহযোগ ও অ-সহযোগ

গত চট্টল প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবী সভানেত্রীর অভিভাষণ পাঠ করিবার পর হইতেই বাঙ্গালীর রাজনীতিক জীবনে একটা কথা বিশেষ করিয়া পুনরায় উঠিয়াছে যে দেশ পূর্ণ অ-সহযোগীই থাকিবে না আংশিক সহযোগী হইবে। মারাঠা প্রদেশেও এই কথারই বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি আইন অমান্য তদন্ত সমিতির যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতেও তাঁহারা দেশ পুনরায় সহযোগী হইবে না মহাত্মার মন্ত্রণীকিত অ-সহযোগীই থাকিবে তাহাই লইয়াই বিশেষ আলোচনা ও সময় ক্ষেপ করিয়াছেন।

একটা জিনিষ পূর্ণভাবে গঠন না করিয়া তাহার ফলাফল না দেখিয়াই আমরা যদি সে কার্য্য হইতে বিরত হইতে যাই তবে আমাদের সাফল্যের পরীক্ষা হইল কোথায়?

সত্য কার্য্যক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর মত প্রকৃত সহযোগী ভারতে বোধহয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছিল। পরে ঠেকিয়া শিখিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে সহযোগ সমানে সমানেই চলে। সমানে অ-সমানে সহযোগীতা করিতে গেলে তাহার অবস্থা দ্রুপদ রাজা ও দ্রোণাচার্য্যের বন্ধুত্বের মতই হইয়া দাঁড়ায়। সহযোগ করিতে করিতে একটা বিরাট জাতি দুর্ব্বল, সর্ব্ববিষয়ে পরবশ, পঙ্গু অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। তাই অ-সহযোগ করিয়া এই জাতিকে যদি একবার নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করান যায়, একবার যদি তাহাকে তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তবে আবার যদি জাতি জাগে। এই উদ্দেশ্যেই গান্ধী মহাত্মা ভারতের জাতীয় জীবনে অ-সহযোগ মন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। অ-সহযোগী হইতে গেলে জাতিকে প্রথমটা কত দুঃখ বরণ করিয়া লইতে হইবে, কত সার্থত্যাগ করিতে হইবে, কত বড় সাধনায় সমাহিত হইতে হইবে মহাত্মা বার বার তাঁহার বাণীতে ও কার্য্যে তাহা দেখাইয়াছেন।

অ-সহযোগের প্রধান মন্ত্র কি? নিজ হাতে চরকায় কাটা সুতায় কাপড় বুনিয়া পরিধান করিব। সে কাপড় মোটা হউক সরু হউক তাহাই মায়ের দেওয়া বলিয়া মাথায় লইব। জগতে আত্ম-কর্ম্মতায় যাহা হয় তাহাই নিজস্ব—আর যাহা কিছু বাহির হইতে আসে তাহা পরের অনুগ্রহ বা ভিক্ষার দান। এ দান সত্য নহে—চিরকাল ইহা মিথ্যা। এই মিথ্যার মোহে বদ্ধ হইয়া থাকিলে জাতি ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের মুখে চলিয়া যাইবে। এই মিথ্যার মোহ হইতে রক্ষা করিয়া আত্মবোধও আত্মক্ষমতা জাগাইয়া তুলিবার জন্যই মহাত্মার অ-সহযোগ প্রচার। বাহিরের দান, মিথ্যা বসন ভূষণ, মিথ্যা মান সম্মানের মোহ হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই রক্ষা কবচ। ইহাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ছলনা নাই ইহাই শাশ্বত সত্য, ইহাই ধ্রুব।

বিরাট শক্তির পার্শ্বে সহযোগী ভাবে দাঁড়াইতে গেলে তোমাকেও অন্ততঃ এমন কি শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে যাহাতে সে তোমার উপর নির্ভর করিতে পারে, বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, সম্মান করিতে পারে। সে শক্তি অর্জ্জন করিয়া সহযোগী বা সহকর্ম্মী হইলে তাহাতে অসম্মানের কিছু নাই—বরঞ্চ তাহা সম্মানের ও শ্লাঘ্য।

মহাত্মা গান্ধী অপরকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, আগে নিজেই তাহা করিয়াছেন। তাই মহাত্মা আজ দেশ বিদেশে পূজিত। সহযোগ করিবে পরিষদের সভ্য হইবে উত্তম কিন্তু মানুষ হইয়া সেখায় পুতুল সাজিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না। যে মানুষ নিজের অভাব নিজে মিটাইতে পারে না, যে জাতি দেশের অভাব দেশ দ্বারা দূর করিতে পারে না তাহার সহযোগিত্বের মূল্য অপরের কাছে থাকিলেও কিছু থাকিতে পারে কিন্তু নিজের কাছে, দেশের কাছে তাহার কোনই মূল্য নাই—তাহার কোনই সার্থকতা নাই।

সহযোগ বা অ-সহযোগের কথায় ছল বা ইহার মধ্যেরই কোন সূত্রের জটিলতা বাহির করিয়া কথার মার প্যাঁচে জাতীয় জীবনের কর্ম্মপ্রবাহকে যেন আবার পঙ্গিল করিয়া না দেওয়া হয়। দেশগুরু মহাত্মা বলিয়াছেন দেশের সকল লোক দেশের প্রস্তুত বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলে তখন স্বরাজ আপনা হইতেই আসিবে। তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি অনুসারে যদি দেশবাসী চলে তাহা হইলে সমস্ত জগতের রাজ নৈতিক হাওয়া বদলাইয়া যাইবে।

মহাত্মার কার্য্য পদ্ধতি অনুসারে শান্তসংযত ভাবে দেশবাসী মনে প্রাণে একবার চল, আপনাদের মধ্যে পূর্ণ ভাবে সহযোগ স্থাপন কর, আলস্য ঔদাসিন্য ভরা জীবনকে একবার কর্ম প্রবাহ মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কর্মক্ষম হও, নিজের অভাব নিজে দূর করিতে শেখ, জগতে মানুষের মত অধিকার চাহিবার আগে নিজ দেশী ব্যথিত নির্য্যাতিত মানুষদের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দাও—তখন দেখিবে কি এক সুন্দর মহান রাজ্যে তোমরা উপস্থিত হইয়াছ।

সহযোগ অ-সহযোগের চেয়ে আজ দেশ সমস্যাই সকলের বড়। মূল ছাড়িয়া আমরা শাখা ও পত্র লইয়া নাড়া চাড়া করি বলিয়াই সত্য বস্তুর স্বাদ হইতে আমাদিগকে অনেক সময় বঞ্চিত হইতে হয়। মহাত্মার কারাদণ্ডের পর মহাত্মার সহধর্ম্মিণী বলিয়াছিলেন 'ভারত যদি জাগিয়া উঠে, সে যদি কংগ্রেসের গঠন মূলক কার্য্য তালিকা অনুসারে কাজ করে, তবে কেবল মাত্র মহাত্মাকে মুক্ত করা হইবে না, গত দেড় বৎসর ধরিয়া আমরা যে সমস্যাগুলি মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি তাহার সমাধান সহজেই আমাদের হাতে আসিবে। প্রতিকার আমাদের নিজেদের হাতেই আছে আমরা যদি কৃতকার্য্য না হই তবে দোষ আমাদের।

আমরা আজ জাতীয় জীবনের গঠন মূলক কার্য্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া আবার এক আলেয়ার পাছে দিগ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিতে চাহিতেছি। যে মোহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমগ্র দেশবাসী মনে প্রাণে চেষ্টা করিয়া মোহকে মোহ রূপে বুঝিতে কতকটা সক্ষম হইয়াছিল সমগ্র দেশকে আবার আমরা সেই মোহ পঙ্কে নিমজ্জিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি কেন?'

মহাত্মা খিলাফতের বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন, পঞ্জাবের অত্যাচারের নিরাকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সর্ব্বোপরি চাহিয়াছিলেন দেশের ক্রম বর্দ্ধিত দারিদ্র ও স্বরাজ্য অপসারিত করিতে। খিলাফতের অবিচার আজ এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট সহজে গ্রহণ করিয়াছেন—প্রতিবিধানও করিয়াছেন; ভারতীয় মুসলমান হিন্দুর সমবেত নিবেদন ও ক্রন্দনে সে সমস্যার প্রতিকার হয় নাই—হইতে পারিত না। আত্ম কর্তৃত্বে প্রাধান্য স্থাপন জগতের নীতি ও ধর্ম এ যুগে এঙ্গোরার মুসলমানেরা শীকৃত হইয়াছে তাই অন্যের শক্তিবর্গ তাহার প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছে।

পঞ্জাবের অত্যাচারের বীভৎস রক্তে লীলা দেশবাসীর প্রাণে যে শিহরণ আনিয়াছিল—অসহায় মেষের মত মরণ ভীতি হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এই সমবেত চেষ্টা জাগরিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল সে চেষ্টার ফলে এ পর্য্যন্ত ভারতবাসী কি লাভ করিয়াছে! ভারতবাসী বলিবে মোপলা নিগ্রহ—আকালী নিগ্রহ—ইত্যাদি।

দেশের যে সমস্ত সন্তানগণ স্বদেশকে ভাল বাসিয়া স্বদেশের জন্য এখনও কারা নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা দেশবাসী কি করিতে পারিয়াছে! জগৎপূজ্য নেতা মহাত্মা গান্ধী এখনও কারাকক্ষে বন্দী রহিয়াছেন—মৌলানা সৌকত আলি, মহম্মদ আলী, লালা-লাজপত, বৃদ্ধ ত্যাগী আইন পণ্ডিত মতিলালের প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র দেশের মুসলমান রাজপুত্র সম বিদ্যাসী পণ্ডিত জহরলাল আজও কারাগারে রহিয়াছেন। দেশবাসী কৌশলে দেশেই কি ইহারা মুক্ত হইয়া আসিবেন!

দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণকে ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া লাভ নাই—তাহাতে অসত্য ও অন্যায়ের বিনাশ সাধিত হয় না। মহাত্মা গান্ধী তাই অসত্য ত্যাগের পক্ষে এত কথা কহিয়া গিয়াছেন। আজ মহাত্মার মত চালকের অভাবে নিখিল ভারতে এমন একটি মস্তিষ্ক ও হৃদয়বান নেতা জুটিল না যে যিনি ভারতকে আত্মক্ষমতায় প্রবুদ্ধ করিয়া আবার জাগরণ দিতে পারেন ইহাই সব চেয়ে ক্ষোভের কথা। অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া যাওয়াতেই যদি কৃতিত্ব হয় তবে অ-সহযোগ হইতে সহযোগ পন্থায় যাওয়া কৃতিত্ব বটে,—কিন্তু কোন যুক্তিই পশ্চাৎভাগ যেখান যুক্ত নীতিতে বিধান দেয় না। যে যুক্তিতে অভিভূত হইয়া মহাত্মার অ-সহযোগনীতি দেশের নেতৃবৃন্দ মানিয়া লইয়াছিলেন সে যুক্তি আজও তেমনি রহিয়াছে সে সব নেতারা আজও কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মার সে অখণ্ড যুক্তি ইহারা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবে কেমন করিয়া দেশের মুখে কলঙ্কের ছাপ টানিয়া এই আংশিক সহযোগ অযাচিত ভাবে ইহারা দিতে যাইতেছেন তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সকলে চলিয়া গেলে অনুপমা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল; তারপর পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঝি!"

দুই তিন ডাকের পর উত্তর আসিল, "এই যাই দিদিমণি!"

অল্পকাল পরেই স্থূল কৃষ্ণ দেহযষ্টি আন্দোলিত করিতে করিতে ঝী ওরফে যশোদা রাণী ধীরগতির পদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং স্থূল অধরপ্রান্তে মৃদুহাস্যের লহর তুলিয়া প্রীতিভরা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডাকচো দিদিমণি?"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত অনুপমা বলিল, "না, তোকে নয়, যমকে ডাকচি।"

সন্ত্রস্তভাবে মৃদু তিরস্কারের স্বরে যশোদা বলিয়া উঠিল, "ও আবার কি কথা দিদিমণি? বালাই, বাট! যমকে তুমি ডাকতে যাবে কেনে গা?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অনুপমা বলিল, "কেন ডাকচি সে কৈফিয়ৎ তোর কাছে দিতে পারি না। তুই এখন ও ঘর থেকে কাগজ কলম দোয়াতটা নিয়ে আয় দেখি।"

"তা বরং এনে দিচ্চি" বলিয়া যশোদা ঘরের বাহির হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কাগজ কলম দোয়াত আনিয়া উপস্থিত করিল। অনুপমা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। যশোদা ঘরের দুই চারিটা জিনিষপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া, এখানকার জিনিষটা সেখানে, সেখানকার জিনিষটা এখানে রাখিয়া, এবং স্ফূর্তি স্থির প্রমবিমুখতা ও কার্য্যে অসংযোগিতার জন্য তাহাকে গালাগালি দিয়া, স্বীয় কর্ম্মপটুতার পরিচয় প্রদান করিতে থাকিল।

যশোদার দুর্ভাগ্য, যাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সে এতটা কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টি কিন্তু যশোদার সবত্নসূচিত কার্য্যের দিকে আদৌ নিপতিত হইল না; সে যেমন ঘাড় গুঁজিয়া চিঠি লিখিতেছিল, সেই ভাবেই লিখিতে লাগিল, যশোদার এত বক্তৃতা ও জিনিসপত্র নাড়া পথে একবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না। তাহার এই অন্যায় ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইয়া যশোদা মনে মনে চিঠিখানার মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

চিঠি লেখা শেষ হইলে অনুপমা মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং যশোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "চিঠিখানা বাইরে দিয়ে আস্‌তে পারবি?"

মানসিক অপ্রফুল্লতা সত্ত্বেও মুখে কতকটা প্রফুল্লতা আনিয়া যশোদা উত্তর করিল, "পারবো না কেনে দিদিমণি? জামাইবাবুকে দিতে হবে তো?"

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনুপমা বলিল, "না, যমকে দিতে হবে। পারবি?"

মেয়েমানুষ স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও চিঠি লিখিলে সে যে যম ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না, ইহা যশোদা বেশ বুঝিতে পারিল, কিন্তু সেই যমটী যে কে, এই টুকুই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনুপমা তাহার দিকে রুক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "ম্যানেজারবাবুর হাতে দিয়ে আস্‌বি, বুঝেছিস্?"

"বুঝেছি দিদিমণি" বলিয়া যশোদা হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা লইল, এবং সত্বরপদে ঘরের বাহিরে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাহিরে আসিয়া সে একবার চিঠিখানার উপর রোষ-কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তারপর আঁচলে মুখখানা মুছিয়া, হাত দিয়া মাথার সম্মুখের চুলগুলাকে কতকটা সুবিন্যস্ত করিয়া লইয়া, গজেন্দ্রগতিতে বহির্ব্বাটীর দিকে চলিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিতেই দুই একজন সুরসিক ভৃত্যের সরসোক্তি তাহার বেদনাম্লান মুখখানাকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল করিয়া তুলিলেও আজ সে কর্ত্রীর বিশ্বাসভাজিনী পত্রবাহিকা হইয়া যে সম্মানলাভ করিয়াছে, সামান্য ভৃত্যের সরস উক্তির রসাল উত্তর দিলে পাছে সেই সম্মানের লাঘব হয় এই আশঙ্কায় সে নিরুত্তরেই ধীরগতির ভাবে কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

কাছারী বাড়ীতে যাইতে হইলে বৈঠকখানার সম্মুখ

দিয়া যাইতে হয়। সেখানে উপস্থিত হইতেই পশ্চাৎ হইতে আহ্বান আসিল, "ও যশোদা, যশোদা রাণি!"

ভৃত্যের রসিকতাকে উপেক্ষা করিয়া আসিলেও এই নামের সম্বোধনকে যশোদা উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "কে গা?"

"বড় 'কেও কেটা' নয়, দয়া ক'রে ফিরে চাইলেই চিন্‌তে পারবে?"

যশোদা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল; বলিল, "কে, জামাইবাবু?"

ভূপতি বলিল, "এক দিন তা হ'লেও হ'তে পারি। এখন মাত্র কোতো বাবু।"

যশোদা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; কটাক্ষে বিদ্যুতের তেমন তেজ ছিল না, তথাপি তাহা মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুৎবিকাশের মত একটা কটাক্ষ হেলাইয়া শ্রীবাক্যসহকারে বলিল, "এত দুখু কেনে গা জামাইবাবু?"

"জামাইবাবুর সুখটাই বা কি দেখলে?"

"সুখের আর কম কি? অর্দ্ধেক রাজ্যি, এক রাজকন্যে।"

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, কিন্তু এখন আমার পক্ষে সেটা বোঝার স্বপ্ন দেখা।"

জামাইবাবুর এই আক্ষেপটা যে নিতান্ত যাচে নয়, যশোদা অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই যেন ইহার একটু আভাস পাইয়াছিল। সুতরাং জামাইবাবুর আক্ষেপোক্তির উত্তরে সে কি বলিবে তাহাই দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "এদিকে কোথায় চলেছ?"

যশোদা বলিল, "একবার কাছারী বাড়ীর দিকে যাচ্ছি।"

ভূপ। কাছারী বাড়ীতে আবার তোমার কি কাজ পড়লো?

যশো। আমাদের কত কাজ! বড় মানুষের বাড়ীতে কাজের কি বিরাম আছে।

ভূপ। খুব জরুরি কাজ নিশ্চয়?

যশো। তা নইলে যদি কি চৌকাটের বাহিরে পা দেয়?

গম্ভীরভাবে তাহার উক্তির সমর্থন করিয়া ভূপতি বলিল, "সে আমি জানি যশোদা, এক্‌দিনের তেতর তোমাকে তো বাইরে আস্‌তে, দেখি নাই। আর বাইরে আসাটাও ঠিক নয়; চাকরীই না হয় পেটের দায়ে করতে হচ্ছে, কিন্তু মেয়ে মানুষের ইজ্জত ব'লে তো একটা জিনিষ আছে।"

ভূপতিনাথের এই সমবেদনায় যশোদার প্রাণটা একটু আর্দ্র হইয়া আসিল; সে বৈঠকখানার দিকে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "সে কথা কি সকলে বোঝে জামাইবাবু? বড় লোকেরা মনে করে, চাকর আর কুকুর এক। তা নইলে কি কুকুর কত্তে পারে, যা বলি, চিঠি নিয়ে কাছারীতে দিয়ে আয়।"

সান্ত্বনার স্বরে ভূপতি বলিল, "তা বৈকি, তবে কি জান যশোদা, দরকারী চিঠি তো যার তার হাতে দেওয়া যায় না। তুমি হচ্ছো বিশ্বাসী—"

মুখ মচ্‌কাইয়া যশোদা বলিল, "ছাই দরকারী! তুমি মেয়েমানুষ, তোমার কি এত দরকার যে, ম্যানেজারবাবুকে চিঠি লিখ্‌তে হবে? তুমি ভালই বল আর মন্দই বল জামাইবাবু, দিদিমণি আমাদের চিরকালটাই পুরুষ ঘেঁষা।"

ভূপতি মৃদু হাসিল; বলিল, "তা হ'লে চিঠিখানা তুমি ম্যানেজারবাবুকে দিয়ে এস। কিন্তু সেখানে যেতে পারবে কি?"

শঙ্কিতভাবে যশোদা বলিল, "কেন বল দেখি?"

ভূপতি বলিল, "সেখানে তো ম্যানেজারবাবু একা নাই, আমলা, মুহুরী, গোমস্তা, সরকার, আরও বাইরের বিস্তর লোক রয়েছে। আমি এইমাত্র দেখে এলাম, কে একটা প্রজার ধানকাটা বাবদ নিয়ে হৈ হৈরৈ রৈ চলেছে, কাছারী বাড়ীতে লোক গিস্ গিস্ কচ্ছে।"

শঙ্কাব্যাকুলস্বরে যশোদা বলিল, "ওমা, এত লোকের মাঝখানে আমি যাব কি ক'রে?"

চিন্তাগম্ভীর স্বরে ভূপতি বলিল, "আমিও তাই ভাবছি।"

যশোদা বলিল, "তা আমি কক্ষণো পারবো না জামাই বাবু। এর একটা উপায় ক'রে দাও।"

ভূপতি বলিল, "উপায় কি করবো বল? দরকারী চিঠি—অন্য চাকর বাকরের হাতে দিয়ে বিশ্বাস নাই। তবে আমি একবার ঐ দিকেই যাব—"

উৎসুক সহকারে যশোদা বলিল, "তা হ'লে তুমিই যদি চিঠিখানা নিয়ে যাও জামাই বাবু।"

বলিয়াই সে কাপড়ের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির

করিয়া ভূপতির দিকে হাতটা বাড়াইয়া দিল। ভূপতি তাহার হাত হইতে চিঠি লইয়া বলিল, "কিন্তু তোমার দিদিমণি যদি জিজ্ঞাসা করে—"

ঘাড় নাড়িয়া যশোদা বলিল, "বল্‌বো ম্যানেজারবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি।"

"হাঁ, সেই কথাই ব'লো।" বলিয়া ভূপতি চিঠিখানার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই সেখানাকে পকেটে ফেলিল। যশোদা যেন একটা ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া, মুখে নিশ্চিন্ততার ভাব আনিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আজ তুমি বড্ড উপকারই করলে আমাইবাবু।"

সহাস্যে ভূপতি বলিল, "বেশ, তুমিও এর প্রত্যুপকার দেখিও।"

"যদি মনে থাকে।" কটাক্ষে বিদ্যুতের ক্ষীণদীপ্তি চমকিত করিয়া যশোদা বিদ্যুতের মতই বৈঠকখানা হইতে অন্তর্হিত হইল। (ক্রমশঃ)

সত্য-কথা

জমি যেমন কেন না হোক না, অসত্যের বীজ ছড়াই-লেই গাছ জন্মে।

• • • •

নিজের শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস না থাকিলে কেহই কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

• • • •

যখন করিবার কিছু থাকে তখন তাহা সম্পন্ন করিলেই সাফল্য আসে।

যদি কোন সুযোগ না পাও তাহা হইলে কাজ কর ও সুযোগ একটা গড়িয়া তোল।

• • • •

বিপদে পড়িলেই কোন বন্ধুর কি দাম তাহা টের পাওয়া যায়।

• • • •

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কার প্রথম কলহ এড়াইয়া তাহারা দ্বিতীয়বার ঝগড়া করে না।

(৩)

[ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্]

("স্বাস্থ্য-সমাচার" হইতে)

মানবের কত বয়সে, কম পক্ষে মানবকে জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়? সাধারণতঃ, মেয়েদিগের বেলায়, এ দেশে, বারো বর্ষে ও বালকদিগের বেলায়, চৌদ্দ-পনর বৎসরের পরে—গড়ে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'মেয়েদের ১২, আর ছেলেদের ১৩।১৪ বৎসর বয়সের পর ছেলে জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়" বলিলে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পৃথিবীতে ঐ নিয়ম সকলেরই বেলায় সমান খাটে। তাহার চেয়েও বেশী মন করিয়া মনে রাখা দরকার এই যে, যদিও কোনও বালিকার ১২ বৎসর বয়সে, ও বালকের ১৩।১৪ বৎসর বয়সে, ঐ ক্ষমতা জন্মায়, তবে সেই নির্দ্দেশ মত তাহারা যদি কাজ করিতে যায়, তবে উভয়েরই অল্প বয়স হইতে শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং উভয়েই অল্পায়ু হইবে। যে সকল ঘোড়া বা বলদ গাড়ী টানে, তাহাদিগকে কখন ঘোটকী বা সঙ্গম সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া হয় না—এমন কি বেশী বয়সে, একদিনেরও জন্য নয়—কারণ, ঐ একদিনের সংসর্গের ফলে, ঐ জানোয়ারেরা হীনবল হইয়া পড়ে। যদি মানুষের চেয়ে বিশগুণ বলিষ্ঠ গরু ঘোড়ার বেলায় এ কথা সত্য হয়, তবে দুর্ব্বল মানুষের বেলায় ঐ কাঁচা বয়সে (১২—১৪) বীর্য্যপাত করিলে, শুধু দেহ কেন, আয়ুও ক্ষয় হইয়া যাইবেই। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স না হইলে, আমাদিগের দেহের সমস্ত হাড় পক্ক হয় না। নিজে পক্ক না হইয়া, জীবের জন্ম দিতে গেলে,

নিজেরও সর্ব্বনাশ, ভাবী সন্তানেরও সর্ব্বনাশ—চির রুগ্ন অল্পায়ু ছেলেকে লইয়া আজীবন কষ্ট পাইতে হয়। এখানে তাহা হইলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে।—প্রথম, বালিকারা ১২ ও বালকেরা ১৪।১৫ বৎসরের পরে সন্তানোৎপাদন করিতে পারে। দ্বিতীয়,—উক্ত কথাটি লিখিত—পঠিত ভাষায় ঠিক হইলেও, বালিকাদিগের ১৮।১৯ বৎসর ও বালকদিগের ২৪।২৫ বৎসর বয়স না হইলে, কখনো পুত্রোৎপাদনে উদ্যত হইতে নাই।

আমরা কেমন করিয়া জানিলাম যে, বালিকাদিগের ১২ বৎসর বয়সের পরে ও বালকদিগের ১৪।১৫ বৎসর বয়সের পরে ঐ ক্ষমতা জন্মায়? আমরা প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে ঐটি টের পাই।

বালিকাদিগের "ঋতু" আরম্ভ হয় ১২।১৩ বৎসর বয়সে। যে আধারে সন্তানের জন্ম হয়, তাহাকে "পো—নাড়ী," জরায়ু, গর্ভাশয়, ইউটারাস্ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। আমাদিগের মুখের ভিতরে যেমন লাল রঙের চামড়া আছে, পো নাড়ীর ভিতরেও ঠিক্ সেই রকমের কোমল লাল রঙের চামড়া আছে। প্রত্যেক ২৮ দিন অন্তর (অর্থাৎ চান্দ্র মাসের শেষে) ঐ পো-নাড়ীর চামড়ার খোলসটি বদল হয়। যতকাল, রমণীর পক্ষে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা সম্ভব হয় (অর্থাৎ গড়ে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) ততদিন প্রত্যেক চান্দ্র মাসান্তে (অর্থাৎ, গড়ে ২৮ দিনের মাথায়) ঐ পো নাড়ীর রীতিমত খোলসটি বদল হয়। প্রত্যেকবার খোলস বদলের সঙ্গে, চারিদিন ধরিয়া ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই যে ২৮ দিন অন্তর ৪ দিন ধরিয়া পো-নাড়ী হইতে রক্তস্রাব হয়, ইহাকে "ঋতু" আর্ত্তব, শোণিত, মাসিক, মাসকাবারি, মাথাঘরলা, মাহিনা, লো, মেন্সেস, মেনষ্ট্রুয়েসন, কোর্স, পিরিয়ড্ প্রভৃতি নামে বলা হয়। ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব। মেয়েরা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হইলে, তাহাদিগের ঋতু হইতে থাকে, তাহাদের স্তন বড় হয়, তাহাদিগের লজ্জার ভাব খুব বাড়ে, এবং সেই সঙ্গে দেহটাও হঠাৎ বেশ ঘুরী ও পুষ্ট হইতে থাকে। যে বয়সে (১২-১৫) এই লক্ষণগুলি আরম্ভ হয়, তাহাকে Age of puberty বলে।

বালকদিগের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা আগমন কালে, কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। তাহারা হঠাৎ লম্বে বাড়ে, তাহাদের গলার স্বর মোটা হয়, গোঁফ-দাড়ির রেখা দেখা যায়, তাহাদের স্বভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয়—কেহ গম্ভীর হয়, কেহ অতিশয় চঞ্চল হয়, কেহ কোপন স্বভাব হয়, ইত্যাদি। বালকদিগের এই বয়ঃসন্ধিকে (১৫-১৬,) যৌবনের আরম্ভকাল বা Age of puberty বলে।

(ক্রমশঃ)

অভিশাপ—

[শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর]

[J. Willmot]

যাহার হৃদয় চরণে ঠেলিলে
তাহার জীবনে কি আর রাখিলে
বাকী?
নিরাশা অনলে দহিয়া দহিয়া
পলে পলে সেযে মরণ আনিবে
ডাকি'।
মেদিনীর স্নেহ ক্রোড়ের ছায়ায়
তাঁহার বেদনা ভিরলেব হবে
হবে,
সেদিন হইতে তাহারি বেদনা
তিলে তিলে তব পরাণ দহিতে
র'বে।
তাহার পরাণ যেমন করিছে
তোমারো পরাণ তেমনি করিবে
জেন,
প্রণয়িজনের পুণ্য হৃদয়
বৃথায় ভাঙ্গো, বৃথাই ভাঙ্গিবে
কেন?

দ্বাদশ গোপাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পরে]

ডাক্তার ঘরে ঢুকিতেই প্রথম দৃষ্টি পড়িল তাহার ক্ষুব্ধলপায়িত রোগিণীর দিকে। রোগিণী-আকণ্ঠ একখানি কৃষ্ণাবনী চাদরে আবৃত, কেবল মুখখানিই দেখা যাইতেছিল, অজিত দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। প্রথমেই তাহার মনে হইল, এ-কি বিকশিত সৌন্দর্য্য, সৃষ্টির একীভূত লাবণ্য ঐটুকু মুখখানিতে শোভিত রহিয়াছে। সারা মুখে কোথাও কলঙ্ক নাই, যেখানে যা আছে, যতটুকু আছে সব টুকুই তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। অজিত তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

পারুল প্রথম-টা চক্ষু খুলে নাই কিন্তু পদশব্দ থামিয়া যাইবার পরও কাহারও কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া সে চক্ষু মেলিল। অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে ভয় চকিত দৃষ্টি মেলিয়া প্রথমেই কঙ্কালসার দেহ ডাক্তারকে দেখিল; কালীচরণ ঠিক তাহার পিছনটিতে দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইতেছিল, পারুল তাহারই উদ্দেশে কহিল—কালীচরণ তুমি বুঝি জুতো পায়ে দিয়েছিলে?

কালীচরণের মুখের উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার বলিল—আপনারই অসুখ?...কথাটা সে পারুলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কিন্তু সে দিকে চাহিতে পারিল না। ডাক্তার হইয়া এই যে ডাক্তারের অনুচিত কর্ম্ম এখনই সে করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারই লজ্জাটা এক্ষণে তাহাকে ঘরিয়া বসিয়াছিল।

কালীচরণ বলিল—চলিয়ে না ডাক্তার বাবু!

অজিত শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। পারুল পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল। অজিত জিজ্ঞাসিল—কি হয়েছে আপনার?

পারুল চক্ষু খুলিল। তাহার চক্ষুতরা বিষাদরাশি দেখিয়া ডাক্তারের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে কোন উৎকট পীড়াতেই সে পীড়িত। বলিল—বলুন।

পারুল চক্ষুরেঙ্গিতে কালীচরণকে কি বলিতেই সে বাহির হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—মাথার বড় যন্ত্রণা।

কি-রকম হয়—বলুন?

পারুল ভাবিতে লাগিল, কি বলিবে? এই কিছুক্ষণ আগেও মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইয়াছিল বটে কিন্তু সে ত জানে, সে রোগ সর্ব্বচিকিৎসারই অতীত। তাহার ত অজানা নাই আকস্মিক উত্তেজনার বশে যে বেদনা সে মস্তিষ্কে ভোগ করিতেছিল তাহা সারাইতে কোন ডাক্তারই ভূ-ভারতে জন্মায় নাই! মনের মধ্যে একটা অপরিসীম লজ্জার স্তূপ জমিয়া উঠিয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু চুপ করিয়াই বা কতক্ষণ থাকা যায়? ডাক্তার যে তাহার মুখ চাহিয়া বিবরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন! মনে হইল, ছিঃ ছিঃ ডাকিয়া আনিয়া কি অন্যায় করিয়াছে। মনস্কামনা ত সিদ্ধ হইল-ই না নূতন ধার আসিয়া উপস্থিত! ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চক্ষু চাহিতেই দেখিল, ডাক্তার দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। গৃহ প্রাচীরে একখানি প্রকাণ্ড গ্রীক পুরাণের ছবি অঙ্কিত ছিল, ডাক্তারের দৃষ্টি সেখানেই নিবদ্ধ।

ডাক্তার ঠিক সেই সময়ে ফিরিয়া বলিল হ্যাঁ—কি বলেন?

দেখুন—বলিয়াই সে থামিয়া গেল। মিথ্যার আবরণে মিথ্যাচরণে ডুবিয়া থাকিয়াও কোনদিন যাহার এতটুকু বাধে নাই, আজ হঠাৎ মিথ্যা কথাটা বলিতে গিয়া ওষ্ঠে বাধিয়া গেল। মরমে মরিয়া গেল, আবার সেই মিথ্যা! আবার—আবার—সেই হীনতা নীচতা! তবে আর তাহার মা কি অপরাধ করিয়াছিল? মিথ্যা ভালোবাসার নিখুঁত অভিনয়ে যাহাকে ভুলাইয়া মজাইয়া রাখিয়াছিল সেই বৃদ্ধ নটবরকেই বা সে বিদায় করিল কোন্ অপরাধে? সে যে এই কিছুক্ষণ আগে মিথ্যা রাজত্ব কাটাইয়া সত্যের জগতে পা বাড়াইয়াছিল, যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই পা পিছলাইল? আবার সেই নরককুণ্ডে? আবার! আবার! মনে হইতেই দুশ্চিন্তার ছায়া তাহার সুন্দর মুখের অংশে অংশে রেখাকারে ফুটিয়া উঠিল। ডাক্তার তাহা দেখিয়াই ডান হাতটি কপালের পরে রাখিয়া ডাক্তারসুলভ স্নেহ-কণ্ঠে বলিল—কি হ'চ্ছে—বলুন?

ডাক্তারের স্নেহ-মুখরিত স্বরে মুদ্রিত বেদনার আপনা হইতে মুক্ত হইয়া গেল। বেশ করিয়া মনে পড়িয়া গেল—ইহারই পাশে, ইহারই গায়ে গা ঘেঁসিয়া সেই লোকটি বসিয়াছিল! নিশ্চয়-নিশ্চয়—কোন ভুল

নাই! সেই লোক, ঠিক দেখিয়াছে। কোন ভুল নাই, ভুল হইতে পারে না। সেই লোক—যাহার নাম জানে না, মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী যাহার সঙ্গে আলাপ হয় নাই, অথচ সকল ধ্যান সকল চিন্তা যাহার অধিকৃত। যে তাহার এত দিনের সুখের, বিলাসের, আরামের সংসার-পথটি এক নিমিষে বিষাদ-বিরস করিয়া গেছে। সেই লোক—যে পৃথিবীর আদিকালের চিরন্তন সত্যের ধারা উল্টাইয়া দিয়াছে, যে পারুলের মত রূপ, যশঃ ও জয়-শালিনী রমণীকে এমন বিদ্ধ করিয়া নিমেষে অক্ষত দেহে প্রস্থান করিয়াছে—তাহাকে পারুল ভুল দেখে নাই, দেখিতে পারে না। শিরায় শিরায় তার স্বর ধ্বনিত, অণুতে পরমাণুতে তার নিরস কঠোর মূর্ত্তি চিত্রিত—তাকেই ভুল দেখিবে নারী হইয়া? নারী পরাজিত, লাঞ্ছিত হইয়া বিজয়ীকে ভুল করিতে পারে না! আমরণ তাকে তার স্মরণে থাকে।

ডাক্তার বলিল-কৈ—বলেন না!

পারুল নিষ্কম্প স্বরে বলিল—মাথার মাঝে এমন যাতনা হয় যে...

কি-রকম যাতনা—বলুন? দপ্ দপ্ করে? ব্যথা...

হ্যাঁ হ্যাঁ!

বেশী মনে হয় কোন্ খানটা? তালুতে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, জিভ্ দেখি আপনার?

পারুল চক্ষু বুজিয়া জিভ্ দেখাইল।

অজিত বলিল, কতদিন এ-রকম হ'য়েছে?

পারুল মনে-মনে যেন হিসাব করিল, বলিল—বেশী দিন নয়—অল্প দিন।

কখন্ বেশী হয়? সব সময়েই এক-রকম থাকে, না বাড়ে?

বাড়ে ডাক্তার বাবু, মাঝে মাঝে খুব বাড়ে।

কখনও কোন ওষুধ-বিষুধ খেয়েছিলেন?

না।

ডাক্তার একমিনিট নীরব থাকিয়া ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করিয়া বলিল—রাত জাগা আছে ত?

পারুল মৃদু হাসিল; মুখে কোন উত্তর দিল না। সে হাসিতে ডাক্তার কি বুঝিল, সেই জানে কিন্তু আসনের এক-সীমায় উঠিয়া অন্য সীমায় যে বিদ্যুৎরেখা স্টান হইয়া গেল, তাহার দিকে চাহিয়া কে না মুগ্ধ আবিষ্ট হয়? ডাক্তার আবিষ্টও হইল, কিছু স্তম্ভিতও হইল। পুনশ্চ কহিল—সারা রাত না-কি?

আবার সেই হাসি। ডাক্তার নিজমনেই পারুলের কপালে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল। প্রশ্নের উত্তর মিলে নাই, যদি বা মিলিয়া থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থার কথা—কিছুই তাহার মনে রহিল না।

পারুল মৃদু হাসিয়া কটাক্ষে কহিল—না, বেশী নয়। বলিয়া আর একবার আর এক দৃষ্টিতে সে ডাক্তারকে দেখিয়া লইল।

ডাক্তার-অজিতের হুঁস হইল, সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ অজিত হইলে দোষ ছিল না, কিন্তু ডাক্তার হইয়া রোগী দেখিতে আসিয়া এরূপ বিহ্বলতা যে শুধুই অনুচিত তাহা নয়, বিশেষ দোষাই! পারুলের দৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই অজিত নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিল। পারিয়াই হাতটা সরাইয়া লইল।

পারুল সহাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—রাত আমি বেশী জাগিনে, ডাক্তারবাবু, তবে...

অজিত সুপ্ত-জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া কহিল—ও তবে টুকুও বাদ দিতে হবে। শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ না রাখ্‌তে পার্লে মাথার অসুখ সার্বার আশা নেই।

বেশ—তাই কর্ব। আপনি ওষুধও দেবেন ত?

দেব—একটা—নামমাত্র। আর একটা কথা, খাওয়া দাওয়ারও যত্ন-কাই করতে হ'বে।

তা'ও কর্ব, ডাক্তারবাবু, তাও কর্ব। আপনি যা বল্‌বেন, তাই কর্ব। আপনি একটু ভালো করে' ওষুধ দিন—যাতে সেরে যাই। বড় যন্ত্রণা।

অজিত বলিল—ভয় কি, সেরে যাবেন বৈ-কি। আপনি শুধু একটু সাবধানে থাক্‌বেন, অত্যাচার না হয়।

হবে না—বলিয়াই পারুল আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল।

দোয়াত কলম কৈ?

দিই-বলিয়া পারুল উঠিয়া দাঁড়াইল; কাঁচের আল্‌মারিটা খুলিয়া রাইটিং প্যাড্-ও কাউন্টেন পেন্‌টি বাহির করিয়া দিয়া বলিল—আপনার ডাক্তারখানা থেকেই আন্‌বে ত?

হ্যাঁ—তাও আস্তে পারে।

অজিত প্রেসক্রিপশন লিখিয়া, সহি করিয়া পারুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল-কি নাম লিখ্‌ব?

পারুল।

ডাক্তার কাগজখানি পারুলের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—সকালে একবার, রাত্রে শোবার আগে একবার খাবেন।—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পারুল বলিল—আপনার টাকাটা?—আবার সে আলমারি খুলিল। খুলিয়া, এদিকে ফিরিয়া বলিল—ক'টাকা দিতে হ'বে?

আমি চার-টাকা ধরে নিই।

পারুল নিঃশব্দে একটাকার চারখানা নোট ডাক্তারের হাতে দিয়া বলিল—আবার কখন্ আস্‌বেন?

অজিত বলিল—দুদিন খান ওটা, তারপর কেমন থাকেন, খবর···

না ডাক্তারবাবু, আপনি এসে দয়া করে' দেখে যাবেন। আমার আর কেউ নেই ডাক্তারবাবু, আপনি দয়া করে...

বেশ। কাল এমনি সময়ে···

ডাক্তারখানায় যাবার সময়ে?

তাই।

দ্বার-সন্নিকটে আসিতে, পারুল সিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ভুলবেন না ডাক্তারবাবু!

অজিত একটুখানি বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—না না ভুলব কেন?—আস্‌ব।

আস্‌বেন—বলিয়া দ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া গেল।

অজিতের বোধ হইল, যেন তাহার চোখ দুইটায় জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা গোপন করিতেই মেয়েটি বুঝি অমন করিয়া চলিয়া গেল। সিঁড়িটা নামিতে নামিতে সে এই কথাই ভাবিতেছিল যে, এ মেয়েটি সেই ধরণের লোকেরই একজন যাহারা অতি অল্পেই কাতর হইয়া আকুলি বিকুলী করিয়া অসুখটা বাড়াইয়া বসে। ইহাদের দেহের অসুখের চেয়ে—মনের অসুখটাই বেশী। সেই জন্যই ইহাদের ব্যাধি শীঘ্র আরাম হইতে চায় না।

কালীচরণ সদর-দ্বারের পার্শ্বে বসিয়া তাহারই সহিসের সহিত গল্প করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া অজিত বলিল—একটা দাবা সিখ্ দেখিয়া, হামারা ঐ দাবাখানামে উঠো বানাকে ল্যা-আই-ও! বুঝা?

কালীচরণ প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল।

গাড়ীতে উঠিয়া আর-একটা কলে যাইতে যাইতে অজিত ভাবিতেছিল—আহা! মেয়েটি একা, একটুতেই তার ভাবনা হইবে বৈ-কি! আপনার জন ত কেহ নাই যে একটু মুখের কথাতেও সান্ত্বনা দিবে, আত্মীয়-স্বজনও কেহ নাই যে একটু শুশ্রূষা করিবে—ভয় হয় না! কত পুরুষই ত সামান্য অসুখে একে বারে অধীর অস্থির হইয়া পড়ে, কত লোক শীঘ্র আরাম হইবার আশায় সকল জিনিষ দিয়া আবারে পায়েও ধরে—অথচ সেবা করিবার, সান্ত্বনা দিবার দেখিবার-শুনিবার কত লোকই তাহাদের আছে। আর ইহার! সংসারে—একটা খোঁড়া চাকর—আর কেহ নাই। আপনার অসুখের ভাবনাতেই দিনরাত সে-যে অসুখী হইয়া আছে। ব্যাকুলতা তার হইবে না ত কার হইবে? আহা!...এই বিজন ব্রহ্মাণ্ডে একাকিনী রমণীর যে কত দুঃখ কত কষ্ট—সমস্তই অজিতের মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মনটা তাহারই দুঃখে তাহারই বেদনায় ভরিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

তোড়া।

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ)

অমরের দেশ

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার খৃষ্টান সেলার অন্তর্গত ক্রাণমোর নামক স্থানটিই না কি আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই গ্রামের একজন লোকও মারা যায় নাই;—সমাধি উদ্যানের এক ক্ষোদাল মাটিও খুঁড়িতে হয় নাই। ক্রাণমোরের লোকেরা এই ৬০ বৎসরের মধ্যে যে একেবারেই মরে নাই তাহা নহে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যাহারা মরিয়াছে তাহারা বিদেশে মারা গিয়াছে—এ গ্রামে নয়।

বাইবেলের পরতা

মিষ্টার এইচ্, এস, ষ্ট্যাভেলি হিল, ইংলণ্ডের নূতন কাউন্টি জজ। তাঁহার জীবনে ৫২ সংখ্যাটি অনেক কাজ

করিয়াছে। ইনি ২২শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, ২২শে তারিখে এঁর খৃষ্টীয় নামকরণ হয়, ২২ তারিখে বিবাহ হয়, এবং তাঁহার সন্তানদির মধ্যে দুইজন ২২শে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ২২শে তারিখে ইনি "বারে" যোগ দেন, ২২শে তারিখে বানবেরির 'রেকর্ডার' পদে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে কোন মাসের ২২শে তারিখে ইনি অবসরবৃত্তি লাভ করেন। (সম্মিলনী)

চুম্বন পরিমাপক যন্ত্র

বিজ্ঞানের চোখে ফকিকারী চলিবে না। সে এবার প্রেমের ঘরেও উঁকি মারিয়াছে। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রেইটওয়েসার (J. V. Breitweiser) "কিসোগ্রাফ" (Kissograph) নামে একটি চুম্বন পরিমাপক যন্ত্র বাহির করিয়াছেন। স্নেহের চুম্বন, লাল-সার চুম্বন, প্রেমের চুম্বন অথবা অনিচ্ছাকৃত চুম্বনও এই যন্ত্র সহজে ধরিয়া ফেলিতে পারে। কেহ কাহাকেও চুম্বন করিলে, চুম্বনজাত শিহরণের গভীরতা এই আবিষ্কৃত যন্ত্রটির দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। (Tit Bits)

শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা

চীন দেশীয় সম্পাদক অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠা-ইবার সময় প্রবন্ধ লেখকের নিকট কিরূপভাবে পত্র লিখি-তেন তাহার নমুনা দেখুন,—

"আমরা অপরিমেয় আনন্দের সহিত আপনার রচনাটি পাঠ করিয়াছি। জীবনে এরূপ রচনা আর কখনও পড়ি নাই। যদি আমরা ইহা প্রকাশিত করি তাহা হইলে সকলে এরূপ রচনাই সর্ব্বদা প্রকাশিত করিতে বলিবেন। যে হেতু দশ সহস্র বৎসরের মধ্যে ইহার সমকক্ষ আর একটি রচনা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, সেহেতু সগভীর দুঃখের সহিত আপনার পবিত্র রচনাটি ফেরৎ দিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের অক্ষমতার জন্য এক কোটি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

(Pearson's Magazine)

* * * *

যুক্তরাজ্যে ২৬০,০০০ স্ত্রীলোক কৃষিকার্য্য করেন।

* * * *

করাসীদেশের হাল ফ্যাসান, যুবতীকে বৃদ্ধার মতন দেখানো।

*

এক ইতালীয় কেরাণী স্ত্রী-ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার প্রেয়সীর মাথায় বলের মত এক প্রকাণ্ড টাক।

* * * *

মেরীল্যাণ্ডের আইন-সভা এক আইন পাশ করিয়াছেন যে, স্বামীর পকেট অনুসন্ধান করা স্ত্রীর পক্ষে বে-আইনী। বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটা আইন পাশ করিলে চকলা-দের কি উপায় হইবে?

* * * *

লণ্ডনে সাধারণতঃ এক বৎসরে ৮,০০০,০০০, টন কয়লা ব্যবহৃত হয়।

* * * *

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কই পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্ক; অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ই (যাহা ১০৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) প্রাচীনতম বিদ্যালয়; প্যারীর জাতীয় পাঠাগারই সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ পাঠাগার, উহাতে প্রায় ৩,০০০,০০০ পুস্তক আছে; প্যারীর "অপেরা হাউসই" বৃহত্তম থিয়েটার, উহার পরিধি তিন একার; পেট্রোগ্রেডে পিটার দি গ্রেটের ব্রোঞ্জমূর্ত্তিই বৃহত্তম প্রতিমূর্ত্তি, উহা ওজনে ১,১০০ টন হইবে; পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কলেজ কেইরোতে প্রতিষ্ঠিত, উহাতে ১০,০০০এর অধিক ছাত্র এবং ৩১০ জন শিক্ষক আছে। (Tit Bits.)

রাজমন্ত্রীর ইতিহাস

আজ প্রায় ২০০ বৎসর হইল, ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী-পদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্যার রবার্ট ওয়ালপোলই ইংলণ্ডের প্রথম রাজমন্ত্রী। তিনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। আজ পর্য্যন্ত ছয়ত্রিশজন রাজমন্ত্রী ইংলণ্ডে নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম:—

(১) স্যার রবার্ট ওয়ালপোল (২) আর্ল অব্ উইলমিংটন (৩) হেনরী পেল্‌হাম (৪) ডিউক অব্ নিউকাসেল (৫) ডিউক অব্ ডিভনসায়ার (৬) আর্ল অব্ বুট (৭) লর্ড গ্রেনভিল (৮) মার্কুইস অব্ রকিংহাম (৯) আর্ল অব্ চেথাম (১০) ডিউক অব্ গ্রেফটন (১১) লর্ড নর্থ (১২) আর্ল অব্ সেলবার্ণ (১৩) ডিউক অব্ পোর্টলেণ্ড (১৪) উইলিয়াম পিট (১৫) হেনরী এডিংটন (১৬) লর্ড গ্রেনভিল (১৭) লেডার পার্সিভেল (১৮) আর্ল অব্ লিভার পুল (১৯) জর্জ ক্যানিং (২০) ভিস্কাউণ্ট

গোডেরিচ্ (২১) ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন (২২) আর্ল গ্রে (২৩) ভিস্কাউণ্ট মেল বোর্ণ (২৪) স্যার রবার্ট পিল্ (২৫) লর্ড জন্ রাসেল (২৬) আর্ল অফ্ ডার্বী ২৭) আর্ল অফ্ এবারডিন (২৮) ভিস্কাউণ্ট প্যাল্মার্সটন (২৯) বেঞ্জামীন ডিস্রেলী (৩০) উইলিয়াম গ্লেডষ্টোন্ (৩১) মার্কুইস্ অফ্ সেলিস্বারী (৩২) আর্ল অফ্ রোজবারী (৩৩) আর্থার বেলফোর (৩৪) স্যার হেনরী ক্যাম্বেল বেনারম্যান (৩৫) হেনরী এস্কুইথ্ (৩৬) ডেভিড লয়েড জর্জ্জ। ইহাদের মধ্যে চারজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের নেতৃত্ব ভার মিঃ বোনার ল, গ্রহণ করিয়াছেন।

সাচ্চা কথা।

(সুধীবর্গের হৃদয়-বাণী)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

(১) যাহা আসিতেছে তাহা লইয়াই নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিও না ; যাহা চাও তাহার খোঁজে ছুটিয়া যাও।

(২) দশজনের সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া, যে নির্ভীক-চিত্তে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হয়, বিজয়লক্ষ্মী চিরদিনই তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

(৩) পৃথিবীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, যে পরকে সুখী করিতে সচেষ্ট।

(৪) দশজনকে শান্তি দেওয়ার চেষ্টাই নিজের শান্তি বৃদ্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

(৫) জ্ঞান-ভিক্ষুকই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

(৬) যখন হইতে অর্থ পিপাসা তোমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিবে, তখন হইতেই মনুষ্যত্ব তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

(৭) আনন্দ দানই মহত্তম দান।

(৮) এই নিখিল-বিশ্বে খাঁটী বন্ধু মাত্র একজন,—সে আর কেহই নয়—নিজের বিবেক।

(৯) নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিও। এ বিশ্বাসেই তোমাকে নিত্য নূতন শক্তি দান করিবে।

(১০) বালিকা অপেক্ষা বালকের নিকট উপদেশ অধিক কার্য্যকরী হয়।

(১১) স্ত্রীর নিকট আর সবই বলিতে পার, কিন্তু আয়ের খবরটা বলিও না।

(১২) যে স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য করিতে অপমান বোধ করে, তাহাকে বিবাহ করার অর্থ—সৌভাগ্যকে পদদলিত করা।

সংগ্রহ।

মোটর চেয়ারঃ—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আরাম প্রিয়তার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। সে চায় বিনা পরিশ্রমে পাখীর মত উড়িতে, মাছের মত সাঁতার কাটিতে, ঘোড়ার বেগে ছুটিতে। তাই এরোপ্লেন, হাইড্রোপ্লেন, ট্রেণ এবং মটরের সৃষ্টি। আরাম চেয়ারে বসিয়া সহর ঘুরিয়া আসার জন্য এই অভিনব মোটরের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানি আরাম চেয়ারে চারিটী চাকা লাগাইয়া—সামনের চাকার উপর ছোট্ট মোটরখানি ফিট্ করা হইয়াছে, বসিবার গদির নীচে সেল (Cell) রহিয়াছে তথা হইতে বিদ্যুৎস্রোত বাহিরে আসে।

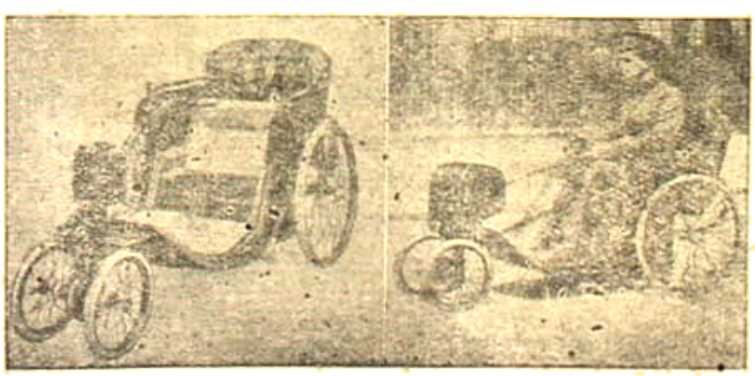

"কপি" রাখিবার অভিনব যন্ত্র ঃ— আপিসের কাজকর্ম সহজ এবং সরল করিবার উদ্দেশ্যে নিত্য নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন হইতেছে। লেখার হাঙ্গামা

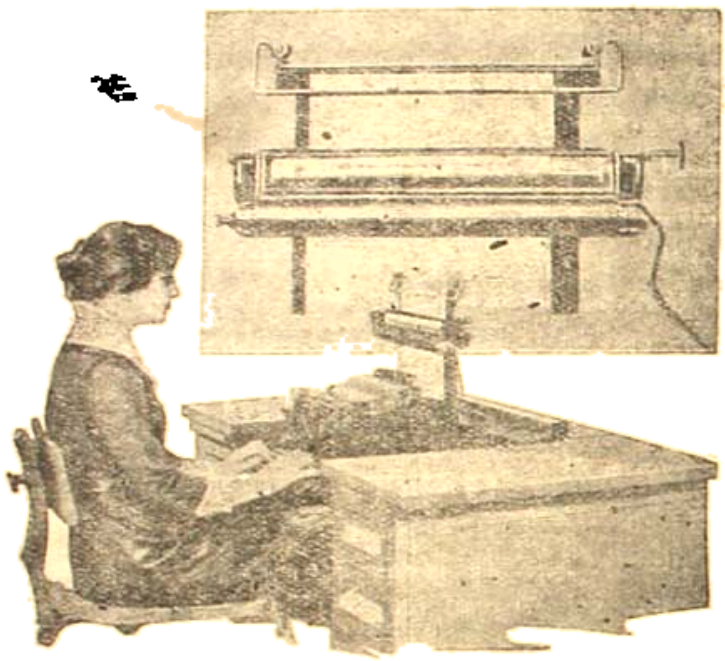

চুকাইবার জন্য টাইপরাইটার যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, কার্বন কাগজের সাহায্যে তাহার নকল সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইতেছে। যে লেখা দেখিয়া 'টাইপ' করিতে হয় তাহা চোখের সাম্‌নে থাকিলে নকলের পক্ষে সুবিধা হয়—এই নূতন যন্ত্রখানি এই উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত হইয়াছে—মূল চিঠি বা লেখাখানি একটি ফ্রেমে আঁটিয়া দেওয়া হয়, চোখের ঠিক সাম্‌নে একটি করিয়া লাইন বিদ্যুৎ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে—ঠিক এই লাইনটির উপরে একটা ম্যাগ্‌নিফাইং কাঁচ আঁটা আছে যাহার সাহায্যে অক্ষরগুলি স্পষ্ট ও দেখা যায়। অন্ধকার ঘরে বসিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে বিনা আয়াসে টাইপ করা যাইবে। বিদ্যুৎ-আলোকে যাহাতে চোখের কোন প্রকার অনিষ্ট না করে সেই কারণে ঐ আলোক কাঁচের ফিল্‌টারের ভিতর দিয়া বাহিরে আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পার্শ্বের চিত্রখানিতে এই "কপি" রাখিবার যন্ত্রটি পরিষ্কার স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অষ্টমগর্ভের সন্তান সর্ব্বোৎকৃষ্ট

সম্প্রতি বিলাতের এসাক্সের অন্তর্গত চেলমস্‌ফোর্ড নামক স্থানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদির স্বাস্থ্য পরিদর্শন করিতে যাইয়া ডাক্তার আর, এইচ, ডার্কো বলিয়াছেন যে, সাধারণত বড় বড় পরিবারের প্রথম ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল হইতে দেখা যায় না, অষ্টম গর্ভের সন্তান ও তার পরবর্ত্তী ছেলে-মেয়েগুলি সব দিক দিয়াই বেশ ভাল।

অষ্টম গর্ভের ছেলে মেয়েরা অন্যান্য ছেলে মেয়েদের চাইতে কিছুতেই ন্যূন তো নহেই বরং সাধারণ পরিবারের বড় ছেলেদের চাইতে ঢের বেশী শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি, উচ্চতা, দেহের ওজন ও অন্যান্য গুণে পার্থক্য বড় বেশী হয় না কিন্তু এ বিষয়ে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা নীচে দেওয়া গেল।

বুদ্ধিবৃত্তি উহার প্রথম সন্তান হইতে তৃতীয় সন্তান পর্য্যন্ত ক্রমাগত বাড়িয়া ষষ্ঠ সন্তানে যাইয়া শেষ হয় এবং পুনরায় অষ্টম সন্তান হইতে আবার বাড়িতে থাকে।

অতি দীর্ঘ ও দৈহিক ওজনে ভারী তারাই হয় যাহারা পরে জন্মায়। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সন্তানই সব চাইতে বেশী ওজনে কম এবং বেঁটে হইয়া থাকে।

সাধারণত দেখা যায়, প্রথম সন্তানের চোখ কম কালো আর অষ্টম সন্তানের চোখ নিবিড় কালো হইয়া থাকে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য সন্তানের চাইতে ঢের কম, তৃতীয় সন্তানের দৃষ্টিশক্তি সব চাইতে বেশী থাকে।

সাধারণত প্রথম সন্তানেরই সাধারণ দোষত্রুটি গুলি একটু কম বেশী আছে, অষ্টম সন্তানের মোটেই নাই।

উপরে যে সকল কথা বলা হইল তাহা সাধারণ হিসাব হইতে ধরা গেল, ইহার ব্যতিক্রমও সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টম গর্ভের সন্তান যে সকল সন্তানের সেরা সে কথা হিসুরা যত জানে এমন আর কেউ জানে কিনা জানা নাই। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম গর্ভের সন্তান এবং তাঁহার জীবনে ভাগ্যের তার্কোর অভিমত যে একেবারে খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে, তাহা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

(শ্রীলীলা দেবী)

১

আমি বেলফুলের চারা। বকুলবাগের বাগানে কেয়ারী করা রাস্তার ধারে, বেদী ক'রে বাঁধান কামিনী গাছের একটু তফাতে থাকি। ঘন পাতা ভরা কামিনী ফাল্গুনের এধারে বুঁইএর মালঞ্চ; তার পাশে মাধবীলতার কচি কচি ডালগুলি তারাও আমার সঙ্গে হেসে কথা কয়। আমার পাশেই ছোট গোলাপ গাছ এ পাশে একটা ঝুঁই-কলি—এরা দুটি আমার সখী, আমায় খুব ভালোবাসে। বসন্তের হাওয়ায় যখন আমাদের নতুন শরীর নতুন জীবনের শোভায় সুখে ভ'রে উঠেছে সেই সময় আমার কচিপাতায় রাঙা আভায় মুগ্ধ হ'য়ে গোলাপ ব'লে "তবে তোর ফুল ফুটবে সখী?"

আমি ব'লুম "কি জানি ভাই, কুঁড়ি তো এখনো হয় নি। আগে কুঁড়ি, তারপরে ফুল ফোটা।"

আগামী সংখ্যায় কি পাইবেন? বিজয়বাবুর লেখা নূতন চিত্র "স্মৃতিখানি" আপনাকে আনন্দ দিবেই!

দেখতে দেখতে কোকিলের কুহু, পাপিয়ার পঞ্চমতান, সূর্য্যের প্রখর আলোয় যখন ক্লান্ত সুরে গান ধ'রলে সেই গ্রীষ্মের প্রথম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখি আমার ছোট ডালগুলি ভ'রে ভ'রে থোকো থোকো কুঁড়ি ধ'রেছে। তখন আমার মনের মধ্যে এমন একটা অজানা শিহরণ দিয়ে উঠ্‌লো যেটা ঠিক্ ভাষায় বলা যায় না। ভ্রমর আর প্রজাপতিরা রোজ দল বেঁধে আমার চারধারে ঘোরাঘুরি ক'রত ফুল ফুটলো কিনা দেখতে। তাদের দেখে আমার এমন লজ্জা হ'ত, শুধু লজ্জা নয় তার সঙ্গে এমন একটা আবেশজড়িত মধিরতায় সমস্ত দেহ পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তো যে কোনো কথাই আমি কইতে পারতুম না।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। আমার যৌবন উদ্ভাসিত দেহ অপূর্ব্ব শোভায় রমণীয় হ'য়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা সমীর আমার আধফোটা কুঁড়িগুলি একেবারে ফুটিয়ে দিয়ে ব'লে গেলো "আজ তোর বর আসবে।" পাশ থেকে গোলাপ সখী ব'লে—"এই যে বেল, তোর ফুল ফুট্‌লো এবার!" ঝুঁইকলি ব'লে—"আহা! কি সুন্দরই মানিয়েছে আজ তোকে!" আমার কিন্তু সমস্ত জ্ঞান তখন এমনি উদ্ভ্রান্ত মেশায় ভরপুর যে আমি তাদের কথার উত্তর ভালো ক'রে দিতেই পারলুম না।

সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রিরে পরিণত হ'চ্ছিল। সেই নিবীড় জ্যোৎস্নাময় যামিনীর শোভা সার্থক ক'রে আমার কাণের কাছে মধুপের গুন্‌গুনানি সুরু হ'ল। ফুলের মধু খেয়ে যখন সে উড়ে গেলো তখন প্রায় ভোর, সারারাত জাগরণ ক্লান্ত দেহ নিয়ে আমি তখন এত প্রান্ত যে বাগানের মালী এসে কখন ফুল তুলে নিয়ে গেছে, তাও জানতে পারিনি।

২

তারপরে এমনি ক'রে কত ফুল ফুটলো, কত মধুপ জুটলো আনন্দের নূতন নূতন উৎস ধারায় ভেসে চ'লেছিলুম। এ আনন্দের যে শেষ আছে তা তখন ভাবিনি। একদিন অন্ধকার রাত্রিরে আমার মুকুলিত যুবনাপূর্ণ এই দেহের উপর-ভাগে অজানা স্পর্শ অনুভব হ'ল। আমি চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা ক'রলুম কিন্তু এমনি বিপুল অন্ধকার যে কিছুই দেখা গেলো না। তখন ব'লুম—"তুমি কে?"

সেই অজানা স্পর্শ ব'লে—"সেই সকালে যে সোণালী ও রূপহারা রঙের প্রজাপতি তোমার কাছে এসেছিল আমি সেই।"

আমি ব'লুম—"উঁহু তুমি সে নয়, তোমার স্পর্শে আমি বেশ বুঝছি, তুমি অন্য কোন জগতের জীব।"

অজানা স্পর্শটা এইবার একটু হেসে ব'লে—"তুমি ব'লেছ ঠিক্! আমি সুরলোকের নন্দন-কাননের সোণা ভ্রমর, পারিজাতের মধুই আমার আহার। একদিন মত্ত অবস্থায় দেবরাজের এক প্রিয় অপ্সরীর গোলাপ ফোটা গালের উপর ব'সেছিলুম তাই সেই অপ্সরী শাপ দিলে এক রাতের জন্যে তোমায় মর্ত্যে বাস ক'রতে হবে। তাই আজ আমি মর্ত্যে এসেছি।"

স্বর্গের ভ্রমরের এই গল্প শুনে আমি অবাক্ হ'য়ে ব'লুম—"এখন তুমি আমার কাছে কি চাও?"

সে ব'লে—"একটী চুম্বন।"

—"তা এত লোভ থাকতে আমি তোমায় এ জিনিষটি দেবো কেন?"

"যদি দাও তো তোমারই ভালো—আমার সেই চুম্বনের ফলে তুমি স্বর্গের পারিজাত হ'য়ে অমরাবতীর উদ্যান আলো ক'রতে পারবে, মর্ত্যের বেলফুলের গাছ হ'য়ে আর থাকতে হবে না।"

"স্বর্গের পারিজাতের চেয়ে মর্ত্যের বেলফুলের আদর কিসে হীন, যে সে লোভ দেখাচ্ছ?"

"মর্ত্যের ফুল ঝরে যায়, গাছ শুকিয়ে যায়, বছরে একবার মাত্র ফুল ফোটে, আর স্বর্গের ফুল অমর! তার ঝরাও নেই, শুকনোও নেই, চিরদিন যৌবন রসে ভরপুর সুন্দর।"

তারপর আমি আর আপত্তি তুল্লুম না। দেবলোকের অপূর্ব্ব নগর, বিচিত্র সুন্দর অমরাবতীর মোহ আমায় পেয়ে ব'সল। নন্দন-ভ্রমর তার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে চ'লে যাচ্ছিল আমি বল্লুম—"কই আমি পারিজাত হ'লুম না তো? স্বর্গে নিয়ে যাবে কে আমায় তুমি যে আমায় ফেলে যাচ্ছ?"

সে ব'লে—"আমি ফিরে এসে আবার তোমায় নিয়ে যাবো।"

৩

তারপর দিন সকালে আমার প্রিয় সখী গোলাপ ব'লে—"এ কি সখি! এ কি ব্যাপার হ'ল তোর?"

আমি নিজের গায়ের দিকে চেয়ে দেখে শিউরে উঠ্‌লুম। সাদা সাদা ধবলের মত সর্ব্বাঙ্গে কি বেরিয়েছে! এক দিকের কতকগুলি পাতা কেবল যা সবুজ আছে, তা ছাড়া আর সব বিশ্রী বিবর্ণ! গোলাপ সখী ব'লে—"আহা! অমন রূপ তোর মাটী হ'য়ে গেলো, এই কচি বয়েসে!"

সেদিন থেকে মধুকরীর দল আর আমার দিকে ঘেঁসে না, প্রজাপতিরা আড়চোখে চেয়ে উড়ে যায়। মাধবীর বুকে ভৃঙ্গ এসে খেলা করে, কামিনীর মুখের কাছে গুন্ গুন্ করে, যূথিকার সঙ্গে প্রণয় কলহে রাত কাটায় কিন্তু আমার দিকে কেউ ফিরেও চায় না। মধু যামিনীর রজত ধারায় জগৎ যেমনি হাসে, শিশির ভেজা পুষ্পদলে প্রভাত কিরণ যেমনিই ঝল্‌মল্ করে, কিন্তু আমার কাছে সব অন্ধকার!

সেদিন গোলাপ সখীর কাছে আমার দুঃখের কাহিনী ব'লুম, সে শুনে ব'লে—"ওঃ তাই তোর এই অসুখ হ'য়েছে। তুই কেন তার কথা বিশ্বাস ক'রলি ভাই? আমার চামেলি সেদিন ব'লছিল যে দেবরাজের সেই ভ্রমর যতক্ষণ না কোনো ফুলগাছ চুম্বন ক'রবে-ততক্ষণ শাপমুক্ত হবে না; যাঁরি যাকে চুম্বন ক'রবে অমরীর শাপে সেই চুম্বিত গাছের এই বিশ্রী ব্যাধি হ'য়ে যাবে।"

আমি অবাক্ হ'য়ে ব'লুম—"চামেলী গাছ কি ক'রে একথা জানলে?"

"নন্দনের এক প্রজাপতির সঙ্গে আর অন্যে চামেলীর আলাপ ছিল, সেই প্রজাপতি ছদ্মবেশে এসে চামেলীকে সাবধান ক'রে দিয়ে যায়।"

এতক্ষণ আমার সব দুঃখ যেন আনন্দে পরিণত হ'ল। আমি যে নিজে এই দারুণ ব্যাধি সর্ব্বাঙ্গে নিয়ে অপরকে শাপমুক্ত ও সুখী ক'রতে পেরেছি এইটুকু ভেবে। ক্ষুদ্র জীবন আর ক'দিনের? রূপ যৌবনও চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু এই যে নিজে বেদনা ব'য়ে অপরকে সুখী ক'রতে পারা—এ সুখের বুঝি তুলনা নেই! এর চেয়ে বুকভরা তৃপ্তি বুঝি আর ভুবনে কোথাও নেই।

তারপরে আমরা শুনতে পেলুম তার এই মনের অতি সুন্দর ভাবটুকু যথার্থই তাকে মর-জগতের নশ্বরতা ছাড়িয়ে নন্দনের পারিজাতে পরিণত করেছে, কারণ—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।"

বিচিত্র সংবাদ।

সমগ্র পৃথিবীতে যত লোহার বেচা-কেনা হয়, তার খানিকটা অংশ খরচে পড়ে লোকসান হয়। এই খরচে পড়া লোহার দরুণ অন্ততঃ পৃথিবীর লৌহ-ব্যবসায়ীদের সাড়ে সাত শ' কোটি টাকা লোকসান যায়!

* * * *

সম্প্রতি ক্রান্সের প্যারী নগরীর এক সৌখীনদিনের কর্ম্মচারী টেলীফোনের একটি নূতন যন্ত্র তৈরী করেছেন, যার সাহায্যে একসঙ্গে ছয় জনে কথা বলতে পারবে।

* * *

ইউরোপ যুদ্ধের বিরতির পর থেকে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ বিগ্রহের ১৫,০০০,০০,০০০, টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

ভিক্ষুক

(চিত্র)

(শ্রীমনোলেখা দাশী)

সেদিন আকাশটা ছিল থম্‌থমা খেয়ে, সারা আকাশের গায়ে কে যেন কালী মাখিয়ে রেখে দিয়েছে।

যখন আকাশের এই প্রকারের অবস্থা তখন বেরিয়ে পড়্‌লাম রাস্তায়। আসন্ন বৃষ্টির বেগ দেখে যে যার ঘরে আশ্রয়ের জন্য ছুটতে আরম্ভ কর্‌তে লাগল। এক একটা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে রাস্তার লোকদিগকে ব্যাকুল কোরে তুল্‌ছিল। এমন সময়ে দেখি একটি ভিক্ষুক গাছের তলায় বসে করুণস্বরে কাঁদ্‌ছে। কি করুণ তার সুর নিকটে গিয়ে বল্‌লাম, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

কেঁদে সে বল্‌লে, আমার স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছি না—কোথায় হারিয়ে গেছে।

তোমরা কোথায় থাক?

আমাদের ঘর-দোর কিছুই নেই বাবা—পথে পথে ভিক্ষে কোরে খাই।

সে এমন কোরে কথাগুলি বল্‌লে—যে প্রাণে গিয়ে তা' তীরের মতন বিধ্‌ল।

তা'হলে এখন কি কর্‌বে?

কি আর কর্‌ব বাবা—যতক্ষণ না তাকে পাই ততক্ষণ এই গাছ তলায় তার জন্যে বসে থাক্‌ব।

একে এই ভীষণ দুর্যোগ তার মধ্যে রাস্তার গাছগুলি ও বিরাট অন্ধকার কোরে তুল্‌ছিল। নীড়হারা পাখীরা অপরের বাসায় বসে কলরব কর্‌ছিল এবং মাঝে মাঝে তাদের পক্ষসঞ্চালনের শব্দ ও আস্‌ছিল। আবার কেউ থেকে থেকে বাঘিনীর মতন বুক ফাটা স্বরে শব্দ করে উঠ্‌ছিল।

মনে মনে ভাব্‌ছিলাম এমন একে একা এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া সঙ্গত হ'বে কিনা।

কিছুকাল চুপ করে থেকে শেষে বল্‌লাম, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমাদের বাসায়—তারপর না হয় দু'জনে মিলে তোমার স্বামীকে খোঁজা যাবে খন।

মিনতি-স্বরে সে বল্‌লে, না বাবু আমি যাব না—সে যে অন্ধ—চোখে দেখে না?

এই দুর্যোগের মধ্যে তোমার মত সে-ও কোথায় একটু স্থান পেয়েছে—তারজন্য ভাবনা কি?

না বাবু, এ হয় না—তার বড় কষ্ট হবে আমাকে না দেখ্‌লে। এই বলে সে তাহার অতি জরাজীর্ণ কাপড়ের প্রান্তভাগ দিয়া চক্ষু-মুছিয়া লইল।

অগত্যা সেই দুর্যোগের মধ্যে তাকে নিয়ে সারা সহরের রাস্তা ও গলি-ঘুঁজি মথন করে বেড়ালুম। কিন্তু কোথায়ও তার সন্ধান মিল্‌ল না।

যখন তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন সে হতাশ হোয়ে পড়্‌ল এবং কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল, বাবু, সে অন্ধ—তার যে দু'টী চোখই নেই বাবু। আহা বেচারা কোথায় পড়ে গিয়ে না-জানি কত কষ্ট পাচ্ছে। এই কথা ক'টি বলে সে যেন কি রকম হ'য়ে পড়্‌ল।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লাম, এখন যেন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না—দু'দিন বাদে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তুমি এখন আমাদের বাসায় চল; কাল না হয় আর একবার ভাল করে খোঁজা যাবে' খন।

না বাবু, আমি আর কোথায়ও যাব না—এই গাছ তলাতে বসে থাক্‌ব—যতদিন না আসে।

তার এই প্রকারের কথা শুনে আমার চোখ জলে ভরে গেল।

এ কয়দিন আর কোন খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ভিক্ষুকটির কথা। বাড়ীতে বলে গেলাম ফিরে আস্‌তে কিছু দেরী হবে।

সরাসর সেই গাছতলায় গিয়ে দেখি—ভিক্ষুকটি যেমন অবস্থায় রেখে এসেছিলুম ঠিক তেমনি ভাবে বসে আছে, অনিমেষ নয়নে! তখন নিজের মনের মধ্যে ভীষণ আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হোল। আমি করেছি কি—এতদিন এর কোনই খোঁজ নিইনি! কি পাষণ্ড আমি!

কোন রকমে তার সাম্‌নে গিয়ে বল্‌লাম, তার কোন সন্ধান পেলে?

হঠাৎ চম্‌কে গিয়ে সে বিষাদ ক্লিষ্ট-কণ্ঠে বল্‌লে, বাবু, এখনও ত সে আসে নি—এইবার সে আস্‌বে।

তার একাগ্রতা দেখে আমি মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লাম, চল আজ সহর ছেড়ে ঘাটের দিকে যাই—যদি সেখানে তার কোন সন্ধান পাই।

পথে যেতে যেতে যখনি দুই চারিজন লোককে এক সঙ্গে দেখি—তখনই মনের মধ্যে যেন কি রকম করে ওঠে এবং মনে হয় বুঝি এইবার তার দেখা পাব।

এই রকম করে কত স্থান খুঁজলাম—কত আশা নিরাশায় পূর্ণ হয়ে গেল; তথাপি তার কোন সন্ধান মিল্‌ল না।

যখন ক্লান্ত পা দুটী পথশ্রমে অবশ হয়ে পড়ে, সে তখন তার ব্যাথাকাতর মুখখানি তুলে বলে, বাবুজী—কি হবে?

এই যে এত কঠোর পরিশ্রম তার ঐ বিষাদভরা কথাটিতে আমার অন্তঃকরণ নিখিল হোয়ে পড়ে। তখন এই স্বামীগত প্রাণ ভিক্ষুকটির জন্ত প্রাণ কেঁদে ওঠে।

একদিন খবর পেলুম—কোন এক বিজন ঘাটের পাশে একটি অন্ধ ভিক্ষুক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই কথা শুনে প্রাণের মধ্যে বিদ্যুতের স্পন্দন অনুভব কর্‌লাম—সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগ্‌ল। আহা অভাগিনী নারী!

এখন তাকে কি বলি এবং কি দিয়েই বা তাকে সান্ত্বনা দিই! কিন্তু বলব না, শুধু তুলে বাড়ী নিয়ে আসব ভেবে সেই গাছতলায় গিয়ে দেখি—হা ভগবান! স্বামীর তার সন্ধান মিলেছে, অভাগিনী ঠিক স্থানেই তার সঙ্গে মিলেছে!

বে-ইমান্

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

ওরে তোরী বেইমান্
ধিক তোর প্রাণ্‌কে,
প্রাণে মোর আগ্‌কে
যত জোর বাজছে,
দায়ী এর অন্তে
কর্‌ব না অন্তে।

হিয়া মোর কুমারী
আশা নিয়ে তোমারি
ছুঁয়ে রই দোয়ারই,
নারী হতে চাইলো,
তোমারে সে পাইলে;
তুমি পথ দেখালে,
ভালোবাসা শেখালে।

জানি আমি পাব না
দিতে আর যোর কি?
তাতে আফশোষ্ কি—
শেষে হবে কাঁদতে
আগে যদি জান্‌তে
তবে কেন আস্‌তে
এত ভালো বাস্‌তে?

শুনিবার কেউ নাই
আমাদের কান্না।
সেটা কেউ চান্ না।
যেন এটা প্রাণ না!
নিতে এসে দিয়ে যাই
কান্নাই ফিরে পাই।

ছাড়্‌তে কি পার না
এই ছুরা ছুরি টা?
কসাই এর ছুরি টা
বসাতে কি বাজে না?
তোমাদের লাগে না
প্রাণ নিয়ে ছলনা,
তোমরাই বল না?

আমাদের জীবনের
সার শুধু বেদনাই
তাতে মোর খেদ্ নাই।
তোমাদের জেদ্‌টাই
কভি নাই রাখ্‌লে,
তুমি সুখী থাক্‌লে।

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী]

বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতাচার্য্যগণের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা বড় একটা দেখা যায় না। জীবিতাবস্থায় যাঁহারা বহুলোকের আনন্দবিধান করিয়া থাকেন, মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের কথা বিস্মৃতি গর্ভে লীন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যান তাঁহাদের কথাও অতি অল্পকাল মধ্যেই সাধারণে ভুলিয়া গিয়া থাকে। কলাবিদ্যায় আমাদের ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। যাঁহারা এই অনাদৃত বিদ্যার লোপ নিরাকরণ করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাতার নাম উমাসুন্দরী দেবী। গোবিন্দ বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বড়িশা বেহালার জমীদার পার্থ রায়চৌধুরীগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ঐ গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে কন্যাদান করিয়া জমী দিয়া বসবাস করাইবার প্রথা উক্ত জমীদারগণের বংশে ছিল। কৃষ্ণধন বাবুর পূর্ব্বপুরুষ কুলীন (রঘুরাম ঠাকুরের সন্তান) ছিলেন। এই হেতু তাঁহারও ঐ গ্রামে উক্ত জমীদারগণের জামাতাস্বরূপে বসবাস ঘটিয়াছিল।

কৃষ্ণধন বাবুর পিতার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। হিন্দুকলেজে কৃষ্ণধন বাবুর প্রথম পাঠারম্ভ হয়। পরে হিন্দুকলেজ ছাড়িয়া কৃষ্ণধনবাবু হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনবাবু এণ্ট্রান্স পরিক্ষা পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন।

কৃষ্ণধন বাবুর পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার পিতা কলিকাতা হোগলকুড়িয়ার (ভীম ঘোষের লেন, দর্জ্জিপাড়া) বাস করিতেন। ঐ পল্লীতে সুবিখ্যাত গুহ বাবুদের কুস্তির আখড়া ছিল। কৃষ্ণধন বাবু ঐ আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। এই সময় ৺তারা চরণ গুহ ঐ আখড়ায় প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতেন। তারাচরণ বাবু কেবল ব্যায়ামানুশীলনে নহে, অভিনয় কার্য্যেরও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সময়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হয়। সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির যত্নে ইংরাজী ধরণে ঐকতান বাদনও ঐ নাট্যশালায় অভিনয়ের সময় প্রবর্ত্তিত হয়। এই নাট্যশালার অভিনয় তৎকালীন সমস্ত কলিকাতা নগরীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। তারাচরণ গুহ কুস্তির আখড়ায় অনেক সময় অভিনয়ের আলাপ করিতেন কারণ বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তিনি ঐ নাট্যশালার অভিনীত নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হইতেন। তারাচরণ বাবুর মুখে অভিনয়ের আলাপ শুনিয়া কৃষ্ণধন বাবুর অভিনয় দেখিবার বাসনা অতিশয় প্রবল হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি উক্ত নাট্যশালায় অভিনয় দেখিবার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অবশেষে কৃষ্ণধন বাবু নিজ বাসনা পূরণের জন্য ঐ নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করিতে কৃতসংকল্প হন ও ভাগ্যবলে সেই চেষ্টায় সফলকাম হন। এই নাট্যশালায় প্রবেশ হইতেই কৃষ্ণধন বাবুর জীবনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। সঙ্গীতের অনুপম মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া, তাহার চর্চ্চায় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অর্থোপার্জ্জন বা অন্য প্রকার সাংসারিক উন্নতির কামনা পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন।

ক্রমশঃ

স্বদেশকথা

"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে; চৈতন্যের শক্তিতে,—বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া,—সন্ন্যাসীর বেশ লইয়ে।"

—বিবেকানন্দ

দেশ-বিদেশ

আগামী ১৯২০ সনের ৫ই মার্চ হইতে আই, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, এবং জানুয়ারীর পূর্ব্বে উহার ফি দাখিল করিতে হইবে। আই, এ, পরীক্ষা আগামী ১৯শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে, ১০ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে ফি দাখিল করিতে হইবে। অনার্স বি, এ, পরীক্ষা আগামী ১৯শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে; পাস বি, এ, পরীক্ষা ৮ই মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে। ১০ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে ফি দাখিল করিতে হইবে। ফি নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্বে পরীক্ষার এপ্লিকেশন ফর্ম্ম কলেজে মহাশয়ের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

পদোন্নতি। বর্দ্ধমান বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ ডে, এল, ভট মহাশয় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারির পদে উন্নীত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

ডাক্তার ঘোষেন্দ্রনাথ বার্ত্তি মহাশয় অবস্থিতকাল হইতে ডিমেন্সিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ঐ রোগ হওয়ায় অনেকেই চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন এবং বাঁকিপুর হইতে বাঙ্গালপুরে নিজ বাটীতে আগমন করিয়াছেন।

"সার্ভেণ্ট" পত্রের বিরুদ্ধে "সঞ্জীবনী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মানহানি ও ক্ষতিপূরণের যে অভিযোগ আনয়ন করিবেন বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে কি বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। গত রবিবারে টীমারযোগে এইরূপ স্থির হয় যে কৃষ্ণকুমার বাবু "সার্ভেণ্ট" পত্রে একখানি পত্র প্রেরণ করিবেন এবং "সার্ভেণ্ট" সম্পাদক মহাশয় বাবু সেই পত্র প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে, কৃষ্ণকুমার বাবু দুঃখ প্রকাশ করিতে আলোচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন। গত সোমবারে "সার্ভেণ্ট" পত্রে কৃষ্ণকুমার বাবুর পত্র এবং ঐ বিষয়ে সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক কমিটির অধিবেশন, লর্ড ইলকেশন বাহাদুর এদেশে আগমন করিয়া সভাস্থলে বিদায় বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য পত্র মসুদ করিয়া রাখিয়াছেন, লর্ড ইলকেশন এখনে সেই সকল দেখিবেন পরে আমরা অনুসন্ধানাদি হইবে। শুনিতেছি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যার আরো প্রভৃতির হ্রাস সম্বন্ধে বিদায় ইলকেশন কমিটির বিবেচনার্থ কতক গুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে কমিটিতে আলোচিত হইবে।

অনারেবিলোপলের স্থানের সম্বন্ধে প্রকাশ মুসলমান আরোগ্য সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্ট অবস্থার করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, আরোহার জাতীয় এসেম্বলি মুসলিম প্রজাকে নিরাশ্রয়ভূত করিতে পারে না।

ডিসেম্বর মাসটি আমাদের নিকট বড় প্রবল করিয়াছেন।

ডি ভেলেরা এক বেসরকারের আপিল করিয়া দরিয়াছিলেন, সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ বিফল। তিনি বলেন, "গণতন্ত্রীগণ যে তাহা মীমাংসার জন্য দাঁড়িয়েছেন, উহার পরিবর্ত্তন ও হইতে পারে না" তাঁহারই বিবেচনা ও সমালোচনা হয়। বর্ত্তমানে মাত্র দুইটী পন্থা বর্ত্তমান—হয় এক পক্ষ, না হয় পক্ষান্তরের ধ্বংস।

বঙ্গবাসী কলেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাধালদাস বসু, বি, এ, কন্যা বেলা বিয়োগ (১৮ই সময়) ভীষণ টাইফো-নিউমোনিয়া রোগে ১৩ দিন কাল ভুগিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ওঁহার বয়স ১৩ বৎসর হইয়াছিল। ইনি বঙ্গবাসী কলেজ স্কুলে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল শিক্ষকতার সহিত স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আকাশের আন্ত-সংবাদ পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে সেবকের এক একটী 'আর' (রয়) শুক-তা-বাদে কার্য্য আফিসে যাইয়া পড়িয়াছেন। ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৪০০০ হাজারের উপর আকাশি এরূপে গ্রেফতার হইয়াছেন।

আকালী প্রেসের ম্যানেজার সতীশের মাহাতুন সিং গ্রেপ্তার হইয়াছেন। উহার বিরুদ্ধে ৫০০৲ টাকার জামিন তলবী হইয়াছিল। তিনি উহা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই তারিখে মুক্ত আকালীদলের বিচার হইয়া গিয়াছে। বহুল বিবেচনা করিয়া ৩০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১০০ জন কয়েদ হইয়াছে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ২৩শে নভেম্বর বাঙ্গালোর আসিয়াছেন।

কলিকাতায় শুভদিনকে কলম করিবার অনেক চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া স্কুলের নূতন আইন তৈরার কথা উঠিয়াছে।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কর্ম্মকর্তা মহাশয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়মহাশয়ের বাড়ীতে কাছে ওঁর একটী আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহা হইতে বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য যেসব্যক্তি কাজের কর্ত্তব্য কম নয় এইটাই আমাদের মনকে জানাতে হবে ও অনুভব করতে হবে। এবং সে কর্ত্তব্য আমরা কত রকমে সম্পন্ন করতে পারি। আজ তাই তিনি ছাত্রদের স্কুল কলেজ ছেড়ে বন্যাপীড়ের জন্য আহ্বান করেন নি। তাঁর আহ্বান তার বিদ্যার্থীর আহ্বান নয়, তাঁর আহ্বানে যেন দিন যাঁরা আরামের অভ্যাস থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করে বন্যাপীড়িত ভাইবোনদের কাছে কর্ত্তব্য পালনের আহ্বান। আমাদের রায়মহা অন্তরিক্ষ বিদায়িক ঘোষণা করে থাকেন। আমাদের রায়মহা মেসবাসীর এই দুর্দিনে তাদের যাঁরা অভ্যাস আরাম করে তা তার সকল এই বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্যে ব্যয় করুক। তিনি আশা রাখেন আমাদের রায়মহা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিবেন।

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন ও মুসলমান সমাজ আরম্ভ করে দিল। সভ্যদের বলে দেওয়া হয়েছে যে টেলিফোনের ফোঁ আর বেশী দিন হবেনে, তোমরা কেউ টাকা দিওনা।

সেদিন একটী ট্রেণ বোঝাই করে বন্দী আকালী দিনাজপুর চালান যাইতেছিল, সেই সময় ওদের মধ্যে একটী ট্রেণের ভিতর থাকার ভিতর আলোচনা করে। কিন্তু, ট্রেণ ট্রেণটী যে থামবে তাহার কোন লাইনের উপর দাঁড়াবে, কিন্তু ওদের উপর দিয়ে ট্রেণ চালান হয়। ফলে ওদের ১২ জন মারা যায়। রেল কর্ত্তৃপক্ষ যে রোটিশ দায় করেছেন তাতে তাদের যে ট্রেণ ধাক্কা দেয়া হয়েছিল কিন্তু সত্যের অভাবে ঠিক সত্যে যাওয়া যায় নি।

শ্মশানে

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সমুদ্র হইতে কনস্তানতিপোল—যেমন দেখায়।

কনস্তানতিপোল্।

নিহার যেদেব বে—আমেরিকার ইংলণ্ডীয় প্রতিনিধি।

একালে দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার সাহা ও ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান পৃথিবী রাজ্যটাকে ভাগাভাগি করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। পরামর্শটা একরূপ পাকাপাকিও হইয়া গিয়াছিল—গোল বাধিল এই কনস্তানতিনোপল লইয়া! নেপোলিয়নের মত, যে কনস্তানতিপোলে রাজত্ব করিবে, মেদিনী রাজত্ব তাহার অধিকারেই থাকিবে। গ্রীক্ ও ফরাসী সম্রাটের পৃথিবী ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এখন অনেকে বলিয়া থাকেন নেপোলিয়নের কনস্তানতিপোল সম্বন্ধে মতটা নেহাৎ বাড়াবাড়ি গোছের। কিন্তু কনস্তানতিনোপ্‌ল যে ষোলশত বৎসর দক্ষিণ পূর্ব্ব ইওরোপের মধ্যমণিরূপে অবস্থিত ছিল তাহাতে কাহারো কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি ঝলকিত অসংখ্য মীনার ও মসজিদের লোহিতাভা দর্শকের দৃষ্টিকে এমনই বিভ্রান্ত করিয়া দেয় যে সুলতানের বাসভূমি এই নগরী অপেক্ষা সুন্দরতর যে কোনও দেশ ভূ-মণ্ডলে আছে বা থাকিতে পারে—তাহাই ভুলিয়া যাইতে হয়।

ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদিও কনস্তান্তিনোপ্‌ল জেরুজালেম বা মক্কার চেয়ে বড় তীর্থ নহে, তবু "ঈশ্বরের প্রধান বিশ্বাসভাজন" খালিফের বাসভূমি বলিয়া ইহার কদর কোন অংশেই অল্প নয়।

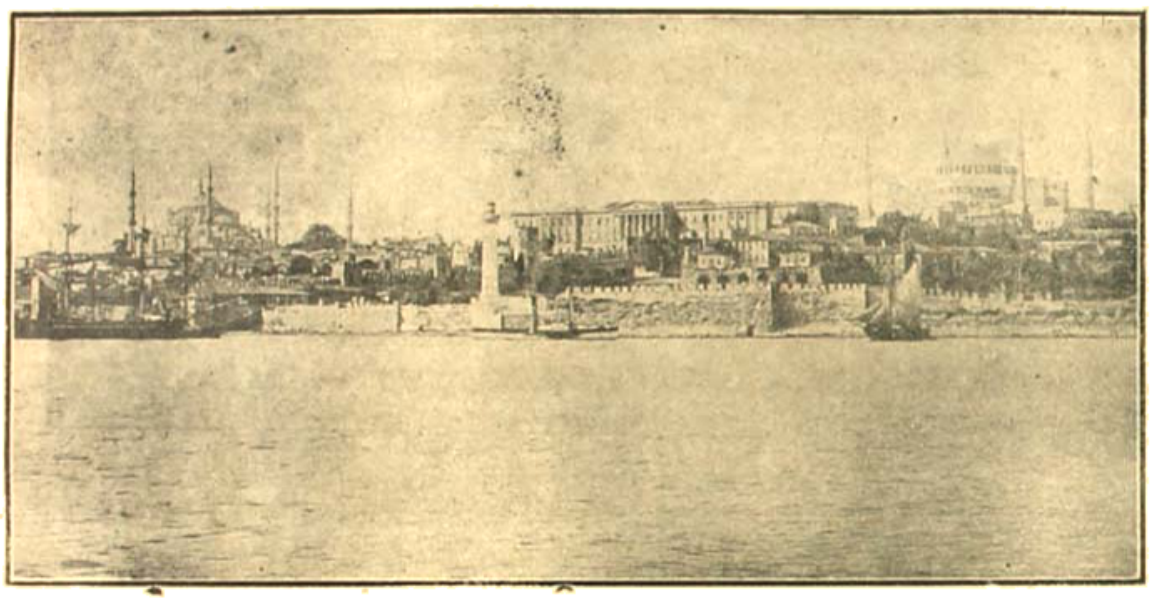

'স্বর্ণ শৃঙ্গের' উপর গালাতা সেতু।

তুর্কীয় কামান। চনক দুর্গের প্রত্যন্তর দৃশ্য। দার্দেনেলিস্ চনক হইতে যেমন দেখায়।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩২৯, ইং ১৮ই নবেম্বর। [১৭শ সংখ্যা

ব্যয়-সংক্ষেপ

আয়ের অপেক্ষা ব্যয় যখন বাড়িয়া উঠে, সংসারে টানিতে যখন বাঁধে ফুলায় না, তখনই সংসারের ব্যয়-বাহুল্য হ্রাস করিয়া গৃহস্থ তাহার সংসার-তরীটিকে ডুবাডুবির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। সংসারের চারিদিক বেষ্টন করিয়া অভাবের করাল ছায়া যখন গৃহ-প্রাচীর কৃষ্ণতর করিয়া তুলে, অতি বড় উদাসীনও তখন গৃহরক্ষা কল্পে আপন-আপন শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। সে শক্তি-সামর্থ্য আর কিছুই নয়, ব্যয় সংক্ষেপ করাই তখন একমাত্র পথ তাঁহাদের সম্মুখে মুক্ত থাকে, সেই পথে চলিলেই রক্ষার সম্ভাবনা, অন্যথা অবশ্য অনিবার্য্য।

আজ বাংলার সংসারে সেইদিন আসিয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থের, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের অধিকারীদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই বিশাল বঙ্গদেশের শাসনরক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া যাহারা অবস্থিত, তাঁহাদের টানিতে বাঁধে ফুলাইতেছে না; শাসন-সিংহাসন 'নাই-নাই' রবে কাঁপিয়া উঠিতেছে; আয় বাড়াইবার নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে; কত উর্বর ও প্রতিভাশালীর মাথার চুল পড়িয়া উঠিয়াছে, আয় না বাড়াইলে চলিবে না; সেউলিয়া হইতে হইবে—পড়া হইতেছে—কিন্তু যে উপায় করিলে 'নাই নাই'র সংসারেও শান্তির সুধা-স্রোতাল প্রবাহিত হয়, যে-পথে চলিলে স্বাভাবিক ব্যয় করাও সম্ভব হয়—সে পথের দিকে যে দৃষ্টি পড়ে নাই, পড়িতেছে না বা কখনই পড়িবে না—তাহা না বলিলেও চলে। যেখানে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশী, সেখানে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারাই যে সুযুক্তির ও সুবিবেচনার, সরকারও যে তাহা না বুঝেন, তাহা নহে, বুঝিলেও সে-পথ গ্রহণ করিবার পক্ষে যে-সকল অন্তরায় বর্ত্তমান, সেগুলিকে এড়ানো তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব নহে। সরকার কি জানেন না যে এক পুলিসের ব্যয়ে যে এককোটি পঁচানব্বই হাজার টাকা অপব্যয়িত হইবে তাহা বাঙলার এই ভীষণ দুর্দিনে, এই অভাব-অনটনের কালে কোনমতেই সম্ভব নহে? সরকার জেলা শাসনে যে সত্তর পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, দেশবাসীর দুরেক্ষের এই টাকাটা কি সত্য-সত্যই তাঁহারা সদ্ব্যয় করিতেছেন বলিয়া মনে করেন? সংস্কার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাংলার শাসন ব্যয় পড়িয়াছিল, ৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। সংস্কার-শাসন প্রচলিত হইবার পর হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যেক শতকরা ৷৷০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সংস্কার-শাসনে সুখের মধ্যে শতকরা এই বেশী পঞ্চাশ টাকা এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন মৃতপ্রায় দেশবাসীর স্কন্ধে খাঁড়ার মত পড়িয়াছে। এই শাসন-সংস্কার চালাইতে হইলে যে-পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, সরকারের তাহা নাই; যে কোনো উপায়ে হৌক সেই টাকা তুলিতেই হইবে, সংস্কার বজায় রাখিতেই হইবে, নড়চড় প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে, আত্মমর্য্যাদায় ঘা পড়িবে—টাকা চাই।

ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের অধিকারী, ক্ষুদ্র জীব—যাহারা

বাড়াইবার কল্পনা করিয়া থাকে সত্য, তাহার পূর্বে তাহাকে দেখিতে হয়, কোন্ ব্যয়টা ত্যাগ করিলেও তাহার সংসার যাত্রার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না? কোন্ ব্যয়টা বর্জিত হইয়াও তাহার সংসারে সচল থাকিবে? গৃহী যদি এইরূপে ব্যয় বাহুল্য বর্জন করিয়া তাঁহার সংসারটিকে অভাব-রাক্ষসীর করাল গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা রাক্ষসী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার সংসারটিকে গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

বাংলা সরকার অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন। সাধারণ গৃহস্থের অনুভূতির সঙ্গে ইঁহাদের অনুভূতির অনেকটা পার্থক্য আছে। গৃহস্থের অভাব-অনটন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—আপনাদেরই লইয়া,—তাঁহার দুর্দিনে তিনিই নিজের সহায়, খরচ কমাইতে, পরিজনের মুখ চাহিয়া সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরাইয়া আনিতে তিনি যতটা তৎপর,— বাংলা সংসারের-দায়িত্ব-পূর্ণ-গৃহস্থের তাহা নহে। পরিজনের অর্থের সঙ্গেই যাঁহাদের সম্পর্ক, তাহাদের সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগ, বেদনার সঙ্গে যাঁহাদের কোনই সহানুভূতি নাই—তাঁহাদের অনুভূতি যে একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু—এই যে হু হু করিয়া ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে, ইহাতে যে এই দরিদ্র দেশবাসীর ক্ষুদ্র সামর্থ্যই ক্রমাগত নিষ্পীড়িত হইয়া চলিতেছে—এমন করিয়া কতদিন চলিবে? কতদিন চলিতে পারে? বাংলা সরকারের শাসন ব্যয়, জেলা-শাসনব্যয় পুলিস রক্ষার ব্যয় এই অন্নহীন, নগ্নদেহ দেশবাসী আর কতদিন যোগাইতে পারিবে? এক-একটা জেলা শাসনে সরকার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া প্রজাদের আর্থিক অবস্থায় কতখানি আঘাত করিয়াছে, সরকার বুঝুন আর নাই বুঝুন, প্রজারা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। সারা বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি বজ্রাঘাত সহিয়া সস্ত উৎপন্ন করিয়া দেশের চাষী পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, সুবিধানে একখানা বই দ্বিতীয় বস্ত্র দিতে পারে না, বাঁচার [illegible] পথে দুর্গতির হইয়া চলিয়াছে। [illegible] দুনিয়ার [illegible] মধ্যে নিয়ম ও সাম্য সংস্থাপিত না হইলে [illegible] একদিন আসিবে যখন [illegible] শাসন অচল হইয়া আসিবেই এবং সেদিনও যে খুব বেশীদূরে—তাও নয়।

এই দুর্দিনে ব্যয়-সংকোচ কমিটি বসিতেছে। দেশের লোক এই সব কমিটি ও তথাকথিত কমিটির কাজে আদৌ আস্থা রাখে না। তাহার কারণও যে খুব স্পষ্ট তাহাও নয়। সাধারণতঃ বিদেশী ও দেশী দৌকী হইয়া যে-সকল কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটিতে যেসব যে সমস্ত ব্যক্তি স্থান প্রাপ্ত হ'ন—দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিদেশীর মত তাঁহারাও দেশের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত নহেন। দেশের মর্মে যে কি গ্লানি ঘনিয়া, দেশের প্রাণে যে কি বেদনা পুঞ্জীভূত—সহস্রযোজন দূর দেশের অধিবাসীদের মতই তাঁহাদেরও তাহা ধ্যান-ধারণার অগোচর। কাজেই এই সকল কমিটির কার্যফল—যাহা হয়, না হওয়ারই তাহা সামিল।

অন্নদেশীয় ভারত সভা ব্যয় সংকোচের অনেকগুলি পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পুলিস-ব্যয় কমাইতে বলিয়াছেন, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট তুলিয়া দিতে বলিয়াছেন, সম্ভব হইলে একজিকিউটিভ কাউন্সিলারের পদ উঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন, বিভাগীয় কমিশনার রাখার অনাবশ্যকতা নাই দেখাইয়াছেন, পুলিসের হোয়ার-হোয়ের পদ রাখার অপ্রয়োজনীয়তা, রেভিনিউ বোর্ডে কাজ নাই—বলিয়াছেন, আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। এ সমস্তই অবশ্যে হইবে কি-না জানি-না, হইলে যে সুফল হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই তবে Prestigeএর মায়া-কান্না যদি উঁচে-উঁচে সজিত থাকে ত—হা বরাত।

অসহযোগ-মহৌষধি, ভারতের জাতীয় জীবনের উদ্বোধক, সর্বজনপূজিত মহাত্মা গান্ধী আজ ভারতেরই কারাগারে আবদ্ধ। আজ ১৪৭ দিন মহাত্মা আমেদাবাদী হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইহা স্থির, বিদেশীর কারাগারে, বিদেশীর আদেশে কারারক্ষের মহাত্মা আমেদাবাদীর কল্যাণ কামনা করিতেছেন। ভারতবাসীর উচিৎ—মহাত্মার আদর্শ অনুসরণ করা, অতএব সেই মহাত্মার প্রতি ভারতবাসীর অবজ্ঞাই দেখানো হইবে।

[illegible] এই পাপ [illegible] [illegible] [illegible]

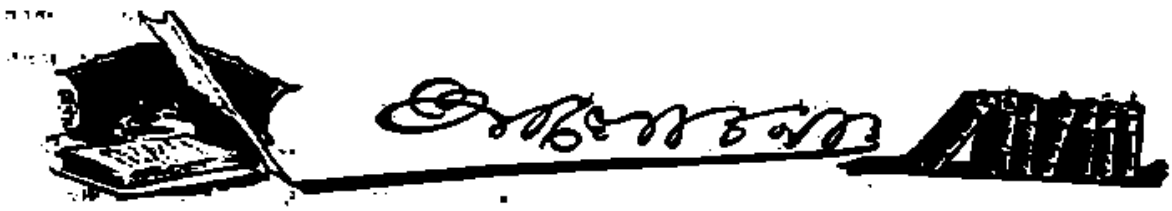

এই হীন বাদ-বিসম্বাদের জগতে, স্বার্থলুব্ধ কঠিন ধরাতলে মাঝে মাঝে এমন এক একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃর আভাস পাওয়া যায় যে স্বার্থান্ধ মানব সেদিকে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক্ হইয়া যায়। সংসার আবাসে সন্ন্যাসী, মর্ত্যের দেহে দেবতা—এমন লোকের সাক্ষাৎ ক্বচিৎ মিলে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ভারতবাসী এমনই দু'একজন মহাত্মার পরিচয় লাভের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হইয়াছে। আজ এই নির্বীর্য্য, স্বার্থপর বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে এমনই এক দেবতার দর্শন মিলিয়াছে—তিনি আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্র। আচার্য্যদেব আজীবন রসায়ন-শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া অদ্বিতীয় রসায়নশাস্ত্রবিৎ বলিয়া ভূমণ্ডলে পরিচিত। কিন্তু আচার্য্যদেবের ইহাপেক্ষাও মহান পরিচয় দেশবাসী প্রতি মুহূর্ত্তে পাইতেছে। উত্তরবঙ্গে দেশব্যাপী ভীষণ বন্যায় আচার্য্যদেবের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কৌমার্য্য-ব্রতধারী এই মহাপুরুষের যে বিরাট পরিচয় দেখা গিয়াছে—তাহা কথায় বলা চলে না—অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে হয়। উত্তরবঙ্গের বন্যা প্রপীড়িত গণের হাহাকার আচার্য্যদেবের কোমল প্রাণে যে কি দারুণ শেলাঘাত করিয়াছিল—তাহা দেশবাসী তাঁহার কর্ম্মের মধ্য দিয়াই বুঝিয়াছে। এই দেশ পূজ্য আচার্য্যদেবের আর একটা পরিচয় পাইবার অবকাশ আসিয়াছে। গত শনিবার সেনেট সভার মিটিংএ আচার্য্যদেব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্রতা দর্শনে, সায়ান্স কলেজের অধ্যক্ষের কর্ম্ম বিনাবেতনে করিবেন বলিয়াছেন। এতখানি ত্যাগ, এতখানি মহত্ব আচার্য্যদেবেই সম্ভব। বাঙ্গালী আচার্য্য-দেব প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে! একটা জাতের জাত বলিয়া পরিচয় দিবার গর্ব্ব তাহারা করিতে পারে!

• • • • •

ভারতসরকারের রেলওয়ে বোর্ড উত্তর বঙ্গের বন্যার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিতেছেন। ইষ্টার্নবেঙ্গল রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার, বর্ত্তমানে পাতিয়ালা রাজ্যের প্রধান ইঞ্জি-নীয়ার রায়বাহাদুর রসরাজ মহাশয় এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। রায়বাহাদুর রসরাজ উত্তর বঙ্গের অলি-গলি চিনেন্; প্রত্যেক রেল-লাইন, রেল বাঁধ তাঁহার পরিচিত—ইষ্টার্নবেঙ্গল রেলওয়ে উত্তরবঙ্গের বক্ষ ভেদ করিয়া সর্ব্বত্র গিয়াছে, এই রেলওয়ের ইঞ্জিনী-য়ারিং ডিপার্টমেণ্টের সম্পর্কে থাকিয়া রায়বাহাদুর সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহার অধিনায়কত্বে ভবিষ্যতের বিপদটা কমিবার কোন উপায় হইলে বঙ্গ-দেশবাসী তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিবে।

• • • • •

রায়বাহাদুর রসরাজকে বাঙ্গালী বলিয়াই, আপনার বলিয়াই আদর করিতে ইচ্ছা হয়। পঞ্চনদতীরের অধিবাসী কুল্ল বালক শস্যশ্যামলা বাঙ্গলায় আসিয়া বসবাস করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ইষ্টার্নবেঙ্গলরেলের প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের পদ প্রথম ভারতবাসী তিনিই স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার বলে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই অসীম দায়িত্ব পূর্ণ পদের সম্যক সম্মান রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। রায়বাহাদুরের পুত্র লালা যমুনা প্রসাদকে সে দিন ও ই-বি-রেলের ট্রাফিক অফিসে একটা গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছি। এই ত সে দিন দীর্ঘ পঁচিশ তিন বছরের অধিষ্ঠানের পর রায়-বাহাদুর রসরাজ বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী তাঁহাকে একান্ত আপনার ভাবে বলিয়াই রেলওয়ে বোর্ড নিয়োজিত এই কমিটির উপর কথঞ্চিত আশা তাহারা করিতে পারিতেছে। রায়বাহাদুর বন্যার প্রকৃত কারণ ও তাহার নিরাকরণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উপকার সাধন করিবেন—বলিয়াই আমাদের আশা।

• • • •

ছেলেবেলায় খেলার সাথীদের মুখে একটা কথা

প্রায়ই শুনিতাম, আপনার বেলায় আঁটিশুটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি! "ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তুরস্ককে শয়তান অপেক্ষা ভীষণরূপে চিত্রিত করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু সত্যকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও আবার "মর্ণিং পোষ্টের প্রবন্ধাদ্ভূত। "মর্ণিং পোষ্টের বিশেষ সংবাদ দাতার লেখনীতে প্রকাশ, গ্রীকরা পুনরায়নের সময়ে সকল গ্রাম ও সহর দিয়া গিয়াছিল তাহাদের যে, কিরূপ অবস্থা করিয়া গিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এই লেন্টের হইতে গ্রীকরা এই কার্য্যপ্রণালী চালাইয়াছিল। আর্মানিয়ানরাও তাহাদের এই কার্য্যে সহায়তা করে। ফরাসী ক্যাপ্টেন বেনিভিনো স্বচক্ষে সেই সকল তাণ্ডব লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফরাসী ক্যাপ্টেন বাধা দিতে অগ্রসর হইলে গ্রীকরা তাহাদের যমদণ্ড তুলিয়া, তাঁহাদের পথরোধ করিয়া আপন-মনে স্বচ্ছন্দে কার্য্য চালাইয়াছিল। এটা হইল সত্যকথা। সত্য কথাটা যে লয়েড জর্জের মত মাথাওলা বড়িয়াছ রাজনীতিক মহাশয় জানিতেন না, তাহা নহে। তবে তুরস্ক ও গ্রীকের প্রত্যেকটাই যে তাঁহাকে এমন 'শয়তানী' মতলব দিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তুরস্ক বিজাতী, বিধর্মী, তুরস্ক বিজয়ী আর গ্রীস সধর্মী আর বিজিত! মামলাটা যে, এদিকেই পড়িবে —তাহাতে আর বৈচিত্র কি?

বিশ্ববিদ্যালয়কে মেউনিসিপাল হইতে বাঁচাইবার জন্য রেজেষ্ট্রেশন ফি দুই টাকার স্থলে পাঁচ টাকা করিবার প্রস্তাব করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সরকার প্রস্তাবে নাকোচ করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও নাই নাই শব্দ। অগত্যা, বিশ্ব-বিদ্যালয় অকস্মাৎ এতগুলি অতিরিক্ত ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা না করিয়া অমন বড়-দুটো খরচ কি প্রকারে পক্ষে সুবিধের কার্য্য হইতেছে?

বর্ত্তমানে অসহযোগীদলের কৌন্সিলে প্রবেশ লইয়া দেশময় একটা সন্দিগ্ধতা ও উত্তেজনার স্রোত বহিতেছে। কৌন্সিলে ঢুকিয়া বাস্তবিক পক্ষে স্বরাজ লাভের কোনও সহায়তা করা যাইবে কি-না ইহাই আলোচ্য বিষয়। কিন্তু যেরূপ উত্তেজনা ও রেষারেষির ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত আলোচনা হইবে কি-না সন্দেহ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, অসহযোগীদলের কৌন্সিলে প্রবেশ করার 'প্রবেশ' কথাটি লইয়া আন্দোলন করিলেই চলিবে না, অসহযোগীদলের উদ্দেশ্যটা সর্ব্বপ্রথমেই বুঝিতে হইবে। কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে চান সেইটাই আসল কথা। তাঁহারা চান, কৌন্সিল এবং সেই সঙ্গে সংসার অচল করিতে। দেশবন্ধুর মতে অসহযোগীগণের অসহযোগ নীতি মাত্র ধ্যান করিয়া কৌন্সিলে প্রবেশ করাটা ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে ইহাতে কার্য্য আরো বেশী হইবে। স্বরাজ প্রাপ্তিই যখন আমাদের চরম উদ্দেশ্য তখন দেখিতে হইবে যে পথে এতদিন চলা হইয়াছিল এবং এত দিন যে পথে চলা হয় নাই, দুইটার কোন্ পথ এখন গ্রহণীয়। দেশবন্ধু তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন, কৌন্সিলে প্রবেশ করিলে কার্য্য যে অগ্রসর হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি আদৌ সন্দিহান নহেন।

দেশবন্ধুর এই উক্তি লইয়া এখন বাংলা দেশের সংবাদপত্র মহলে বেশ খানিক গরম ভাব দেখা যাইতেছে। ফিরিস্তি, কাগজ-ওয়ালাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের অধিকাংশ অসহযোগনীতির প্রধান পোষক 'সার্চ্চিট' পত্রে যে সকল লেখা বাহির হইতেছে তাহা বাস্তবিকই কৌতুকজনক।

মতৈক্য ঘটিলে, সাধারণ মানুষের চেহারা, ঠিক একটা খোলসের মত করিয়া গিয়া, প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাধারণ ভালোমানুষের ভাবটা আর তখন তাহার মুখে থাকে না। এ গেল সাধারণ মানুষের কথা। কিন্তু সাধারণের চেয়ে উঁচুতে যাহাদের স্থান, একটু অ-সাধারণ বলিলেও যাহাদের বিশেষণ অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল লোকের সম্বন্ধে এই আশা করা বোধ করি দুরাশা নহে যে মত বিরোধ ঘটিলেই প্রকৃত হিন্দু প্রকৃতিটা নগ্ন হইয়া দেখা দিবে না।

এই অ-সাধারণ ও একটু উঁচু দরের লোকের কাছে বাহিরের ও ভিতরের ভাবটা একই রকমের আশা করা নেহাৎ অন্যায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একাজই যদি প্রকৃতিগত অনৈক্য ভাব অন্তরে থাকেই,

সেটাকে যে আর একজন মানুষের সঙ্গে মতের বা কার্য্যের বিরোধ ঘটিলেই মুখল মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে এই বা কি কথা?

* * * *

অন্ততঃ তাঁহাদের কাছে এরূপ আশা করা যায়, যাঁহারা ভারতপূজ্য মহাত্মার অহিংসনীতির পরিপোষক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন! সেই ত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের অসহযোগনীতির স্বাত্ত্বিক ভাবের অধিকারী বলিয়া আপনাদের জাহির করিতে দ্বিধা করেন না! তাঁহাদের সংযম আচারের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বাস্তবিকই দেশবাসীর দুঃখ ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

* * * *

সম্প্রতি এইরূপই ঘটিতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগীগণকে কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন, সার্ভেণ্ট পত্র তাহারই প্রতিবাদ করিতে গিয়া যে অসংযমের পরিচয় দিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই দুঃখের বিষয়।

* * * *

'সার্ভেণ্ট' পত্রের সম্পাদক মহাশয় না-কি কোন এক সভায় বলিয়াছেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু নাকি তাঁহার কারাবাসী পুত্র জহরলালকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই কৌন্সিল প্রবেশে আগ্রহান্বিত। প্রকাশ্য সভায় অনুরূপ চিত্তে যাঁহারা এত বড় অসত্যের প্রচারক তাঁহারা যে কোন্ সাহসে সত্যব্রত মহাত্মার অহিংসসহযোগনীতির পরিপোষক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, বুঝি না!

* * *

'সার্ভেণ্ট' পত্রের মতই আমরা কৌন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী নহি। তাই বলিয়া অহিংসনীতির দোহাই দিয়া দেশনেতাদের গালাগালি করিতে একান্তই নারাজ।

* * * *

কৌন্সিলে প্রবেশ লইয়া যে মতবিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা লইয়া দেশবাসীর মনের মধ্যে একটা ভেদ ও বিরোধ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাই এ সময়ে অনেকে একটা কাজের মধ্যে করিয়া লইয়াছেন। এ সময়ে দু'একটা দুষ্টব্রণও দেখা দিয়াছে। তাহারাই এই অনৈক্যাটুকু লইয়া বড়ই ঘাঁটাঘাঁটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই সঙ্কটকালে এই দুর্দ্দিনেই আমরা দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে, দুষ্টব্রণকে দুষ্টব্রণ বলিয়াই তাঁহারা যেন চিনিতে পারেন।

* * * *

এই বিপদকালেই আমাদের বেশী করিয়া মনে রাখিতে হইবে, বিদেশী-শাসন-নীতির মূলমন্ত্রই এই ভেদনীতি! এই ভেদনীতি শাসকের পক্ষে যতখানি উপকারক, আমাদের পক্ষে তাহার চেয়ে অধিক পরিমাণে অপকারী। স্মরণাতীত কাল হইতে, ভারতের ইতিহাস এই ভেদনীতির বিপক্ষেই সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে আমাদের যত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এমন আর কিছুতে হয় নাই। আজ যদি দেশবাসী উন্নতির পথে পা বাড়াইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই স্বরাজ-লাভের পথে চলিতে গিয়াই সেই দলাদলির অন্ধ-কূপে পা দেন, তবে দেশের ও দেশবাসীর যে কত ক্ষতি হইবে, তাহার পরিমাণ করাও অসাধ্য বিরোধের সৃষ্টিতে যে ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিতেও আমাদের হৃৎকম্প হয়! দেশবাসী যে এত বড় ভুলটা করিবেন না, এ বিশ্বাস আমরা রাখি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন এ-সময়ে দেশবাসীর হৃদয়ে সাহস একাগ্রতা ও বিবেক-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

* * * *

নরনারী ও বয়সন্ধিসমস্যামূলক উপন্যাস আমাদের দেশে আদৌ নাই। যেদিকে আমাদের লিপ্সা ও প্রবৃত্তি অসাধারণ সেদিকটা আমরা অস্পৃষ্টই রাখিয়া দিয়াছি। দেশের দুর্দ্দিনে, অভাবে অনটনে আমরা সংসারের চারিদিকে ওয়েসিস্ খুঁজিয়া বেড়াই, কোথাও যদি কোন শান্তি মিলে, সান্ত্বনার যদি কোন স্থান থাকে! কিন্তু যে-দিকে নজর দিলে, যে দিকে সতর্ক হইলে সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়, অভাব অনটনের প্রকোপ হ্রাস পায় সে-দিকটা আমাদের কেহ দেখায় না, আমরাও দেখি না। আমরা বাসন্তীতে বয়সসন্ধিমূলক কতকগুলি গল্প প্রকাশ করিয়াছিলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলি বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ গল্পগুলি ও তৎসঙ্গে নূতন অনেকগুলি গল্প একত্রিত করিয়া গল্পোপন্যাস আকারে শ্রীযুক্ত চিত্তি স্যান্যেল শিশির পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

* * * *

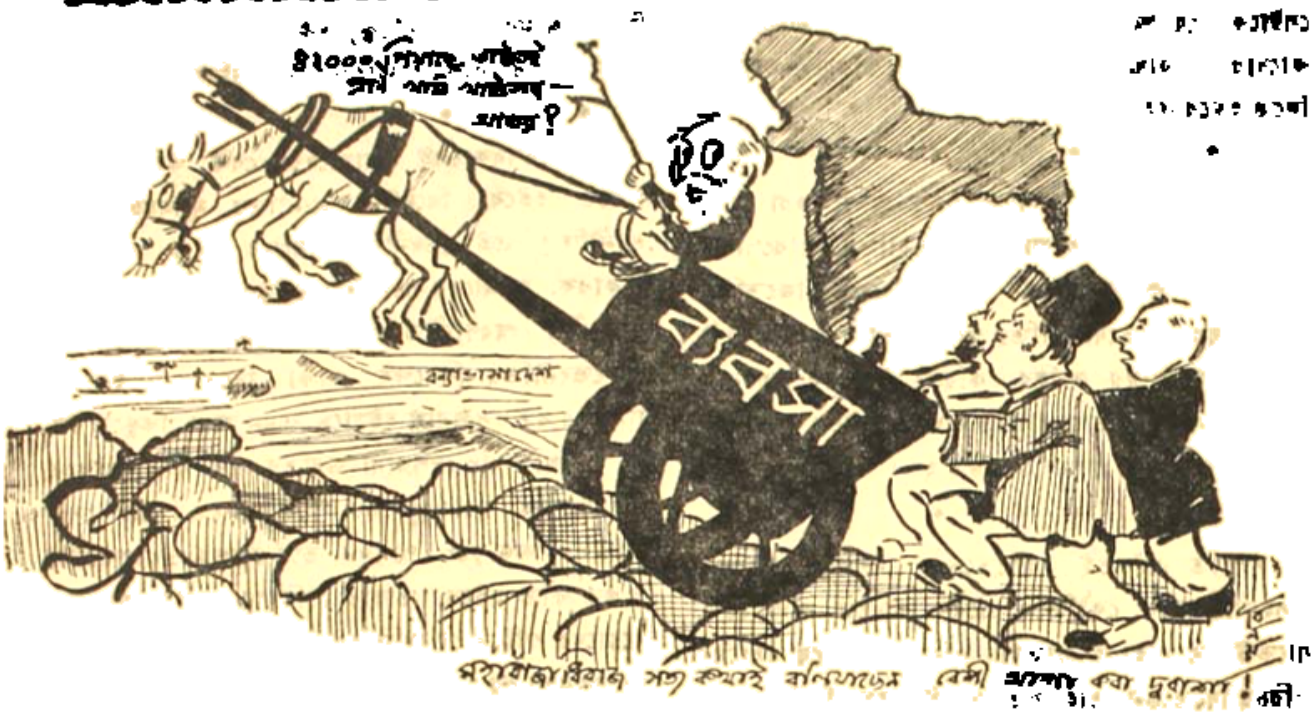

মাটির টান

[শ্রীরমেশ বসু এম্-এ]

কারও জন্য আমাদের মনের টান আছে কিনা তা' আমরা টের পাই যখন সে দূরে চলিয়া যায়। মাটির বা প্রকৃতির জন্য আমাদের যে একটা সহজ স্বাভাবিক টান আছে তা আমরা বুঝিতে পারিতেছি একালের সহরসর্ব্বস্ব সভ্যতার ধারে ঠেকিয়া। এখন সব দেশেই লোকে মাটির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যে যোগসূত্রটি প্রায় ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল সেটাকে আবার সবল ও কাজের মত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। কারণ, শিক্ষা, সমাজ ও স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে বর্ত্তমানের ব্যবস্থা বড়ই অসন্তোষজনক মনে হয়।

প্রথমেই এই কথা বলা দরকার যে মাটির ডাকে লোকে সবসুদ্ধ একেবারে সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাইয়া বাস করিবে—এরূপ ধারণা বড়ই উদ্ভট। মোটামুটি গ্রাম ও সহর এ দুটিকেই মানুষের বাসের উপযুক্ত করিতে হইলে উভয়েরই সংস্কার আবশ্যক। এইজন্য সহরগুলিতে প্রত্যেক বাড়ী একটি বাগানের মত হইয়া উঠিতেছে; এই সহরগুলিকে "garden cities" বলা হয়। তারপর সহরের কাজ-কারবার ও কল-কারখানা যেখানে সেখানে চলিতে পারিবে না এইরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। সহরের যাতে লোকে মাটির স্পর্শ অল্পতর করে তাহার জন্য লোকের যথেষ্ট চিন্তা হইয়াছে। সহরের ছেলেদিগের ও স্ত্রীলোকদের অস্বাভাবিক সাবধানের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় এরূপ ব্যবস্থার কতটা দরকার। কারণ, জল, বায়ু ও গাছপালার উপযোগিতাকে মানুষ প্রকৃতির হাত হইতে নিজে নিজে গ্রহণ করিতে না পারিলে সুখী হয় না।

শিক্ষার দিক হইতেই আলোচনা আরম্ভ করা যাক্, কারণ শিক্ষার জন্য যে স্থানাস্থানের কোন প্রশ্ন হইতে পারে তা' আমরা মনেই করি না। "আমরা যেখানে একটু ফাঁক পাই, সেইখানেই স্কুল বসিয়ে দিই।" এই প্রসঙ্গে বেলজিয়ামের অধ্যাপক Faria de Vasconcellos এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি বেলজিয়ামের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং নিজে একটি গ্রামে নূতন ধরণের স্কুল খোলেন। শিক্ষার জন্য স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলি দেওয়া গেল :—"প্রফেসার কারিয়ার শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র এই যে, স্কুলের উপযুক্ত

স্থান হচ্ছে পল্লীগ্রাম, সহর নয়।" "ছেলেরা, কিন্তু, শুধু মাটির উপর ছুটোছুটি করেই সন্তুষ্ট থাকে না, তারা গাছে চড়তে চায়, জলে নামতে চায়।...কিন্তু সহরের খেলার মাঠে তারা সাঁতারও কাটতে পাবে না, গাছেও চড়তে পারে না। সুতরাং স্কুল সেই জায়গাতেই হওয়া উচিত যেখানে মাঠ আছে, গাছ আছে, জল আছে।" (প্রমথ চৌধুরীর "আমাদের শিক্ষা")। এই সঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার যে প্রোফেসার কানিয়া এরূপ স্কুল যে সব গ্রামে করিতে বলেন সেগুলি সহরের খুব কাছে থাকা দরকার, কারণ আধুনিক মানুষের পক্ষে সহরের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করার অর্থ আধুনিক সভ্যতা ও কালচারকে ত্যাগ করা।

ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমরা এতদিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে শিক্ষাস্থানের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের কোনই ভাবনা হয় নাই! গ্রাম ও সহরের স্কুলগুলির মুখ্রী ও বিশ্রী চেহারা দেখিলেই আমাদের আতঙ্ক হয়। যেমন একদিকে টিনের ছত্রওয়ালা ব্যারাকের দৈন্য আরেকদিকে বড় বড় ইমারতের অপব্যয়। অথচ ছেলেদের দেহ মন যা চায় তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না! আমরা বিশেষ করিয়াই জানি যে গাছের তলায় দুর্ব্বাসনে বসিয়া পড়াশুনা করিতে ছেলেরা বেশ একটা মুক্তির আনন্দ পায়।

তার পর স্বাস্থ্যের দিক হইতে দেখিলে বোঝা যাইবে মাটির স্পর্শ মানুষকে কতটা স্বাস্থ্য দিতে পারে। সহরের কুলি বস্তিগুলি বোধ হয় আপনারা দেখিয়া থাকিবেন। ওরূপ স্থানে মানুষকে অবনত না করিয়াই পারে না তাই কুলিরা মদ খাইয়া জীবনটাকে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে। ঘরের দিকে মানুষের টান থাকিলে মানুষের চরিত্র ঠিক থাকে, কিন্তু যাদের টিনের দেয়ালের বাহিরে কোন স্থান নাই, তাহাদের [illegible] কি হইতে পারে কিংসফোর্ড চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন যে কুলিদের বস্তির চারিদিকে আবাদ করিয়া সামান্য তরি তরকারী ইত্যাদি উৎপাদনের উপযুক্ত জমী থাকিলে তাহারা ছেলেপিলে ও স্ত্রীকে লইয়া মাটির [illegible] খাওয়া ও বিশুদ্ধ [illegible] হইতে দেয় না।

শুধু কুলিদের কথা বলিলেই শেষ হয় না। সহরের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের ছেলেরা ও স্ত্রীলোকেরা যে কি ভাবে জীবন কাটায় আমরাও চোখের উপরেই দেখি অথচ অল্প কিছু জমি নিজের অধিকারের মধ্যে পাইলেই তাহারা ফুলগাছ ও শাকসব্জির জন্য কত ব্যস্ত হইয়া ওঠে। এইভাবে সহরের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও সহরবাস আর বনবাস প্রায় একই রূপ হইয়া উঠিত না! নূতন সহর নির্ম্মাণ করিবার সময় এই সব বিষয়ের দিকে আজকাল খুব দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

আমাদের স্বাস্থ্যের উপরেও মাটির প্রভাব খুব কম নয়। ছেলেরা ধূলা মাটি দিয়া খেলিতে না পাইলে তাহাদের মনও সুখী হয় না, দেহও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে না। জল ও মাটি তাহাদের অত্যন্ত দরকারী। শুধু ছেলেদের যে মাটি দরকার তা নয়। বয়স্ক লোকেরাও মাটিতে পা না ফেলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে এক অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আজকালকার দিনে হুক-পোকার ভয় খুবই থাক্, অন্ততঃ কতকটা সময় খালিপায়ে মাটির উপর চলাফেরা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই।

পূর্ব্বে মাটি দিয়া চিকিৎসা প্রসাধন উভয়ই চলিত। মহাত্মা গন্ধীজী মাটির উপচারে কতকগুলি অসুখের চিকিৎসার কথা লিখিয়াছেন। যাহারা নিত্য গঙ্গাস্নায়ী তাহারা অনেকে গঙ্গামাটি গায়ে মাখিয়া স্নান করেন, তাহাদের মতে উহা নাকি অনেক উপকার করে। কয়েকদিন হইল খবরের কাগজে দেখা গিয়াছে যে পাশ্চাত্য দেশেও নাকি কোন কোন স্থানে কর্দ্দম-স্নান (Mud bath) আরম্ভ হইয়াছে।

মাটির আর যা গুণাগুণ থাক্ বা নাক্, মাটির সম্পর্কে আসিয়া আমরা অনেকটা সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করিতে পারি—সঙ্গে সঙ্গে রুচিতা ও কল্পনার অবসর আসিয়া জোটে। সহরের মহিমায়ই আমরা হাঁপাইয়া উঠি—তখন এক একবার গ্রামে যাইয়া বাস করি। কিন্তু যাদের গ্রামে যাওয়ার উপায় নাই, তাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। সহরের বদ্ধ বায়ু ও উচ্চ সুরে বসিয়া যারা কবিতা লেখেন তাদের প্রাণ আরোও বেশী তাজা থাকিত মাটির—হাওয়ার—জলের ও গাছের প্রভাবের মধ্যে থাকিলে।

অনেকে "Back to land" এই মন্ত্রকে সার করিয়া সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাইয়া চাষবাস করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। যাঁদের সে ইচ্ছা বা সুবিধা আছে তাদের কোন কথা নাই। কিন্তু যারা সহরেই থাকিবে তাদের জন্যই ও ব্যবস্থার দরকার।

প্রেমিক প্রয়াণ

[শ্রীপঞ্চানন রক্ষিত]

(১)

গৌড়বাসী ভক্তগণে, বর্ষাগমে হৃষ্টমনে,
নীলাচলে উপনীত সবে
নিরখি চৈতন্যময়, সবে বলে ধন্য ধন্য,
পুণ্যজ্ঞানে পূজে নরদেবে।

(২)

'শিবানন্দ' ভক্তবর হইলেন অগ্রসর,
পুরীধামে লইয়া সকলে।
মহাচেতা 'হরিদাস', করিতেন তথা বাস,
উপনীত যথা ভক্তদলে।

(৩)

বেলাশেষ বুঝিবর, ধর্ম্মজ্ঞান হবে কয়,
জ্ঞানজ্যোতিঃ হরিদাস হবে
উপজিল সেই কালে, স্বীয় প্রেম তপোবলে
উদ্ধারিল আপন মানবে।

(৪)

মায়াবিনী পাপনারী, কামজাল বুঝিতারি
পরীক্ষিতে হরির কিঙ্করে
ধরাইল নিজ প্রাণ; হরিভক্তি ছুটে যান,
ধন্য হ'য়ে পূজিলা সাধুরে।

(৫)

সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়, হেন শিক্ষা দয়াময়,
বিতরিয়া জনসাধারণে
ত্যজিলেন কলেবর কাঁদাইয়া অপামর
কীর্ত্তি রহে আজন্ম প্রয়াণে।

(৬)

ধর্ম্ম যদি ভেদজ্ঞান, রহে মনে অনুক্ষণ,
মুক্তি কভু নাহি হবে জানে।
সমাজ বিপ্লব বিষে, জর্জ্জরিত হবে শেষে,
দেবাশীষ্ লভিবে কেমনে?

সত্যি-মিথ্যে "কেরাণীমহল" (নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক) বলতে পারেন!

স্মৃতিখানি

(চিত্র)

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

সে এক তপ্ত রবিকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে ট্রেণ থেকে লাল কঙ্করাবৃত প্ল্যাট ফরমের উপর নেমে দাঁড়াতেই যেন একটু পুলক প্রবাহ অনুভব করতে লাগলাম। ষ্টেশনে যত লোক চলাফেরা আনাগোনা করছিল, আর যত লোক ঐ ট্রেণ থানায় বলে তাদের দেখবার চেষ্টায় মগ্ন ছিল—আমার সঙ্গে সবারই সমান পরিচয়। তবুও এই ছোট্ট করদীপ্ত পল্লীশ্রীমণ্ডিত ষ্টেশনের অপরিচিত অজানা প্রিয় লোকগুলিকে পরিচিত মনে করতেই মনে অনন্ত বাসনা আর একান্ত আগ্রহ। তেমনি ভাবে তাদের দিকে চাই-ছিলাম,তারা কি ভাবছিল, কে জানে, সবে সবে অথবা আপন-উদ্বেগেই ব্যস্ত ছিল এই লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যকতা তাদের ছিল না। মাথার উপরের নীলাকাশ রৌদ্রে পুড়ে হ'য়েছিল ভারি নীল, নিষ্প্রভ, নিষ্ঠুর নীল। এতদিন দেখি-নি। তারও আনন্দ কম নয়।

হাতে ব্যাগ, একটা বেতের ছড়ি আর মুখে বিড়ি ধরিয়ে যখন ষ্টেশনের বেড়ার বাইরে পা বাড়ালাম তখনই কতকটা নিরানন্দ-ভাব মনের মধ্যে উঁকি দিলে। বেতেহবে যে বহুদূর। যতদূরে ঐ নীল গিয়ে মিশে গোপ পেয়েছে, সেই ততদূরে। নিজের নিঃসঙ্গ অবস্থাটা বেশ করে মনে পড়ে গেলো। কিন্তু তা'ও যদি সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। রেললাইন যখন একটা লম্বা কালো, সাপের মত এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেল ঠিক তখনি আমার দুই চক্ষুর দৃষ্টি পড়ল গিয়ে শ্যামল ক্ষেতগুলোর ওপর! কি সে শ্যামলতা তার বুকে মিশে রয়েছে, কি স্নিগ্ধ কমনীয়তা তার অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়াছে! দূরের ক্ষেতগুলোকে আর ধান ক্ষেত বলে মনে হ'ল না। মনে হ'ল আকাশই যেন একটু রং বদলে একটু নবীন হ'য়ে ঐখেনটায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমার আনন্দ জেগে উঠ্‌লো। এবারকার আনন্দ বুকের মধ্যে এমনি জমাট হ'য়ে বস্‌ল যে চল্‌তে পা'য়ের গতি কমে এল। কেবল চেয়ে দেখি, দেখি আর ভুলে যাই সেই ইটপাথরের নিষ্ঠুর শোভা আর কত দূর?

> গল্প।
> আতর
> বাসন্তী—অষ্টাদশ সংখ্যা

বাদ করি; মর জগতের অমরাবতী বলে যার পানে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যাই! হায় রে পাষাণ! তো'তে আর এতে! এ যে স্বর্গ থেকে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী মেয়ে সবুজ শাড়ী পরে বেশে প্রান্তিস্তরে এইখানে তার দেহ বিছিয়ে নিদ্রামগ্ন হ'য়ে গেছে, যেন এ সত্যি নয় একটা মস্ত স্বপ্ন, অলীক, অসত্য তথাপি সুন্দর শোভন। বর্ষে বর্ষে তার সঙ্গীত, ছত্রে ছত্রে তার সৌরভ!—তার সঙ্গে কার তুলনা!

মনে হ'ল, এই আমার জন্মভূমি! জন্মভূমি সবার কাছেই সুন্দর, পবিত্র কিন্তু আমার কাছে এ সুন্দরতম, পবিত্রতম! এযে সেই মা! যার কথাই শুধু আমি আজন্ম শুনেছি, যার স্নেহের মৌখিক পরিচয়ই আমার জীবনভোর পেয়ে এসেছি, যার গৌরব-গাথা যা কিছু আমার পরের মুখে শোনা—এ-যে আমার সেই মা! মা তার কাছে হয়ত কিছু পুরাতন, কিছু একঘেয়ে, কিছু বৈচিত্র্য-বিহীন ঠেকে—যে নিত্য তাঁকে পায়, নিত্য যে তাঁর সঙ্গী, প্রতি নিয়ত যে তাঁর সঙ্গী, প্রতি নিয়ত যে ব্যবহার করে! কিন্তু আমার কাছে এ-যে একেবারে নূতন, একেবারে অপূর্ব্ব! মুখ দেখে কোন শিশুরই যেমন মাতৃস্তনের পরিচয়টি অজানা থাকে না, ঐ সবুজ আবরণের নিচে আমার সে স্নেহময়ী মায়ের পরিচয় আমি পেলাম, তা'তে চলবার শক্তি দ্বিগুণ আর মনের আনন্দ চারগুণ বেড়ে গেলো।

ভাবে বুঝলাম, ড্যাক্‌সিনেটার, টিকে দিয়ে বেড়ান তাঁর কাজ,—মাথায় এক মাথা ঢেউড়ী, মুখে একমুখ গোঁফ আর দাড়ী—অবয়ব বেড়ে উঠেছে,—গায়ে আলপাকার এক শত তালিযুক্ত কোট, গলার কাছে একটি লাল কম্ফার্টার পরণে আন্‌কোরা নতুন কাপড়, কোঁচার লাট্টুর দাগ গুলো ফুটে রয়েছে, মুখে সিগারেট—একটা লাঠি হাতে লোককে ধাত্রী ও আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে যাচ্ছিলেন, বরাত ঠুকে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম—সাকুতি পোড় আর কত দূর?

রইল ধাত্রী ও আইন তাঁর। সাকুতিপোড়? কার

বাড়ী থাকেন? কোথায় নিবাস? ঠাকুরের নাম? জাতি?

লোকটার কথার উত্তর দিতে অপ্রস্তুত অন্ধকারেও দিলাম। ঠাকুরের নাম শুনে চম্‌কে উঠে, পায়ের ভ্যাক্সি-টেথেসে দু-টা খুলে দণ্ডবৎ হ'য়ে বল্লে—ওহ্! আপনি? —আমাদের অমুক।

তুমি কে বাবু?

আজ্ঞে আমি ছিরাম পাল। আজ্ঞে, এই দুয়োর ভ্যাক্সিন আমি, এ লোকটি দরোয়ান, আজ্ঞে আমার বাড়ীও ঐ সাকুত্তিগোড়েই আপনাদের সাবেক কালের...

কতদূর?

'ভ্যাক্সিন' হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে দরোয়ানটিকে বল্লেন—ওরে ফকীর, বাবুর হাত থেকে ব্যাগটা নে···তা বাবু এখন কোন্ মেসায় আছেন?

লোকটার কথা না বুঝ্‌তে পেরে চেয়ে আছি, ভ্যাক্সিন পুনশ্চ বল্লেন—আজ্ঞে কোন্ মহল্লায়...

ওহ্, না বাপু, আমি হাকিম-টাকিম নই, ওকালতী পড়তুম—সম্প্রতি তাও ছেড়ে দিয়েছি।

ব্যারিষ্টার পড়বার শেষ জীবনে ডেপুটির পেয়েছিলেন, এবং এই সব ডিভিসনেই বদলী হ'য়ে এসেছিলেন। হাকিমের ছেলে হাকিম নিশ্চয়—লোকটা এই ধারণাই পোষণ করে। হঠাৎ আমার উত্তর শুনে তা'কে বেশ মুষ্‌ড়ে যেতে দেখলাম।

বল্লাম—এখানে চাষবাসের অবস্থা কেমন? জমি-জায়গা পাওয়া যায় কি-না? পেলে, চাষবাস করব, আপাততঃ এই সঙ্কল্প নিয়েই এসেছি।

শুনে—'অমুকের পুত্র' অমুক বলে আমার উপরে তার যে বেশ-একটু শ্রদ্ধার ভাব উদয় হ'য়েছিল তা'ও অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো। বল্লে—হ্যাঁ, জমি-জায়গা পাওয়া যায় বৈ-কি! পকেট থেকে 'কলবিড়া' সিগারেটের বাক্স বের করে,"ইচ্ছে করতে' দিলে। সিগারেটে ইচ্ছা নেই বলে'—পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরালাম। ভ্যাক্সিন দেখে-শুনে নির্বাক হ'য়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

খানিকদূর এসে আমিই তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম—টিকেদারীতে পয়সাকড়ি কেমন?

লোকটার আবার স্ফূর্তি দেখা গেল। বল্লে, পয়সা-কড়ি মন্দ নয়—তবে চাষাভুষো লোক সব, বড় হ্যাঙ্গড়া সহজে টিকে দিতে চায় না। আর ভদ্দরলোক - যা দু'চার ঘর আছে তারা সহরে—কেউ মামার বাড়ী, কেউ মাসীর বাড়ী, কেউ পিসের বাসায় গিয়ে টিকে দিয়ে আসে—আর ভদ্দরলোক কালায়েণ্ট নেই বলে সাহেব ধমকায়। বলে' মুখটী ম্লান করে রইলো।

বল্লাম—ভদ্রলোক ক্লায়েণ্ট নইলে সাহেবেরা রাগ করে বুঝি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা—কত বয়সের লোকের অবধি টিকে দাও?

টিকের কি আবার বয়েস আছে না-কি?

আমাদের দেওয়া চলে?

চলে না? খুব চলে? আজ্ঞে—দেবেন?

তা দিতে পারি। কিন্তু এখানে ত হ'বে না, তোমাদের গ্রামে দু'একদিন থাকব, তার মধ্যে...

নিশ্চয়—আমি যাব। কিন্তু দেখুন, একটি কাজ করতে হ'বে—আপনার আর ঠাকুরের নাম—ও দু'টোই লিখে দিতে হ'বে!

তাহলে বলি, ওকালতী পাশ করাও হয় নি আর ডেপুটি হ'বার জীবিতও নেই—বলা হোল না। লোকটা বলে উঠ্‌লো—এই যা।

গ্রামখানি বেশ। কংগ্রেস-দলের ছেলেরা এসে খুব মেতে গেছে। একটা চরকা-বিদ্যালয় বসেছে আর একটা নৈশ-বিদ্যালয় বসাবার আয়োজন চল্‌ছিল। বেশীর ভাগই কৃষিজীবি লোক। তাদের ছেলেদের দিবাভাগে লেখাপড়ার অবসর খুবই কম। অতি ছোট ছেলেকেও বাপ-মাকে মাঠের কাজে সাহায্য করতে যেতে হয়—যে একেবারে অক্ষম, সে'ও মাঠে জলখাবারটা-আসটা পৌঁছে দিয়ে আসে। কাজেই এই সব ছেলেদের শিক্ষা দিতে গেলে রাত্রে ছাড়া উপায় নেই। গ্রামের লোক ও কংগ্রেসের ছেলেরা আমাকে পেয়ে খুব মেতে উঠ্‌লো। তারা বল্লে, কি-রকম ভাবে পড়ান হ'বে, না-হবে, আমি দেখিয়ে দিয়ে তবে-যেন যাই। কংগ্রেসের ছেলেরা বল্লে—তাদের বিদ্যালয়টা খুলে দিতে হ'বে—আমাকেই।

ভ্যাক্সিন দিনরাত আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতো। তার মনের বাসনা আমি-ও তারই মত আনুকূল্য কিন্তু অবসর তারও মিলছিল না, দিনরাত্রি এত লোক আমাকে ঘিরে থাকতো যে সে বেচারা শুধু আমার মুখের দিকে

ছেলেই কাল কাটাতে বাধ্য হতো। তাকেই বল্লাম—কি বল হে! ওপন কর্ব?

বল্লে—কর্বেন বৈ-কি! দু'দিন বা দু'একদিন দেরী!

কংগ্রেসের ছেলেদের বল্লুম, শুধু ছেলেদের পাঠশালা করলে হ'বে না হে! বুড়োদের আর মেয়েদেরও কর!

বুড়ো শুনে গ্রামের বুড়োরা লজ্জা হ'লো না। তবে মেয়েদের ছোটছোট—কোন আপত্তি নেই জানালে!

যদিও আমার এখনো বিশ্বাস, বাংলা দেশটায় বুড়ো-বুড়ীদের উঁচুতে তুলতে অথবা তাদের নরাতে না পারলে দেশটার কোনো আশা নেই, তবু কর্মীমণ্ডলের মুখেই বুড়ো-বুড়ীদের চটাতে সাহস হ'ল না। কংগ্রেসের ছেলেদের পরামর্শ দিলুম, বেশ, ছোট থেকেই সুরু হোক্।

কংগ্রেসের ছেলেরা গ্রামের যে দু'চারজন মাতব্বর আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করলে কাজের সুবিধে হ'তে পারে।—বেশ ত! যাত্রা করা হোল।

একটা ভাঙ্গাবোড়ীর মধ্যে ঢুকে ছেলেরা হাঁক পাড়লে মিত্তির মশাই! মিত্তির মশাই!

কে?—শুনে ভেতরে যাওয়া গেল। এক ত্রিশির বছরের বুড়ো রোয়াকে একখানা পিঁড়ি পেতে বসে ঘড়ি খুলে কি ভাবছিলেন, আমাদের দেখেই বল্লেন, ঘড়ি আছে? ক'টা

আড়াইটে!

ওঃ—তবে দেরী আছে। হ্যাঁ, কি খবর?

ব্যাপারটা এই, তাঁর পালা জ্বরের দিন, তিনটের জ্বর আসবে, তারই জন্যে ঘড়ি মেলাবার দরকার।

আর এক বাড়ীতে ঢোকবার মুখেই খুব হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। ঢুকে জিজ্ঞাসা বাদ করে জানা গেল, চরণ ডাক্তার যাবা বুড়োশিবের দিব্যি খেলে জ্বর আসবে না—এমন ওষুধ দিয়ে কর্ত্তার ঠেঙে ন'সিকে নগদ তুলিয়ে নিয়ে গেছে। পরিজন বিলে তাকেই এক অমৃত জগতে প্রেরণ করছেন।

আর এক স্থানে আর একটু মজা দেখা গেল। একটা লোক তার স্ত্রীকে প্রহার করছিল। কারণ, সে বেচারা আজ ভেঁতুলের অম্বলে কাঁচা তেঁতুল দিয়েছে বলেই তার প্রবল জ্বর এসেছে। নইলে আজ যে কিছুতেই জ্বর আসবার নয়—তা তিনি খুব ভালো জানেন।

যাক্—সব জায়গাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সুফল হো'ল। বিশেষ করে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর ছেলে দয়া করে' গায়ে পা'র ধুলো দিয়েছেন ইত্যাদি যখন ইত্যাদি।

আসল যে কাজের জন্যে আসা, তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। জমি প্রাপ্তির কোনো আশা ছিল না বলেই হয়। পাঁচ কাঠা করে জুইও কেউ ছাড়বে না। অথচ তরুণের দল আমার ওপর এমনই সন্তুষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো যে জমি দিয়ে হোক্, যে করে' হোক্ এ-দেশে রাখতে পারলে বাঁচে—কিন্তু তাদের বাপমায়ের মত একটু অন্য রকমের। তারা বল্লে গ্রামে এক জন ভদ্রলোক যদি করলেন সে ত সৌভাগ্যির কথা কিন্তু জমি! কিন্তে তাদের হবিল মাটি! অর্থাৎ হবিল যদি মাটি না-ও হয়, ভবিষ্যতে কি-হয়—আজ্ঞে, ওটা...

ভ্যাকসিন্‌কে বল্লুম—কি হে, আমি যখন যাব না—যাই, কি বল?

ভ্যাকসিন্ শুষ্কমুখে বল্লে—দু'দিন পেকে যেতে পারেই হ'তো!

কংগ্রেসের ছেলেরা বল্লে—কাল সকালে চাষিদের কি একটা পার্ব্বণ আছে, যাতে যাবে না, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ওপনিং করা যাক্!

ভ্যাকসিন বল্লে—বেশ! কটার সময়?

দশটা!

বেশ! বেশ!—যাবার সময় বল্লে—কাল সকালে আস্‌ব?—দেবেন?

আচ্ছা, তা দিতে পারি।

বেচারার অদৃষ্ট মন্দ! বিছানায় বসিয়ে যাদের বাড়ীতে ফিরে যাব, এ সংবাদ ইতিমধ্যেই প্রচার হ'য়ে গেছলো আর পার্ব্বণের দিন বলে চাষিরা কেউ মাঠে যায় নি - সকাল বেলা সব ভিড় করে এসে বস্‌লো। সকলের মুখেই এক-কথা! কর্ত্তাবাবু অনেক উপকার করে গেছেন, তাঁর ছেলে এসেছেন, কিছু—কিছু উপঢৌকন দিতে চায়—সবাই! কেউ—গাছে নাউ ফলেছে, তারই দু'টো; কেউ চাষ্টি মোয়া মুড়ি—। কেউ মোটা কত নারকেল। কেউ এক খুলি ছানা; কেউ দু'টো সয়না-জোয়ার চারা মাত্র, কেউ নিজের হাতে বোনা শেওড়া-পাটি; এমনি আরো কত কি!

*নাউ-নারকেলের বন্দা বরে ১১৯ বাইল পথ—ফলকাতা—

পৌঁছোন এক রকম অসম্ভব—বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে যখন কংগ্রেসের ছেলেদের ডাকে ঘরের বাইরে এলাম, পৌণে এগারোটা! গ্রামবাসীরা বিমর্ষমুখে ঘরে ফিরলো, কেউ বা আমাদের সঙ্গেই এলো।

স্কুল খোলা হ'য়ে গেলো। বক্তৃতায় যাকে যে সব স্নেহার্দ্র-হৃদয় বৃদ্ধ এইমাত্র স্মারকস্বরূপ আমাকে যৎকিঞ্চিৎ উপহার দিতে এসেছিল তাদেরও ধন্যবাদ দিয়ে—ষ্টেশনে এলুম। জ্যাকসিন ও আরও অনেকগুলি লোক ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলো।

একজন বল্লে—আজ্ঞে, একখুলি ছানা বৈ-ত নয়, গাড়ীতে তুলে দিতাম, তবু মনে করতে পারতেন, নন্দ ঘোষ দিয়েছেলো!

আর একজন বল্লে—আজ্ঞে, আমার ক্ষেতের সোণা মুগ—এ হুজোর সেবা। তবু মনে করতে পারতেন, নীলুবাস দিয়েছে। ঘোষের একটা সিঁরতি খেতো!

জ্যাকসিনকে এক পাশে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লুম—কি-হে, দেবে না-কি?

লোকটা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোরাছুরি বার করে বল্লে—আজ্ঞে হাঁ, একমিনিটে হ'য়ে যাবে!

কিন্তু একমিনিটের আগেই গাড়ী এসে পড়লো। তার উপহারও নেওয়া হোল না।

কাজ ফেলে কোন কিছু না নিয়ে চলে আসতে মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল।

তিনদিন পরেই জ্বরে পড়লাম। দশদিনের দিন অন্নপথ্য করে নীলু দাসের নামেই নিম্নলিখিত চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলাম!—

তোমরা আক্ষেপ করেছিলে, কিছু আনিনি বলে, তোমাদের মনে করবার মত কোন জিনিষ নিয়ে আসি নি বলে। তোমাদের মনে করবার মত কোন জিনিষ নিয়ে আসি নি বলে তোমরা সবাই দুঃখ করেছিলে। তোমরা শুনে সুখীই হ'বে তোমাদের ঘর-ঘরের সঙ্গী, তোমাদের নিত্যকার সঙ্গী—তোমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী—ম্যালে-রিয়াকে আজ ভুল হয় নি। আর বোধ হয় তোমাদের দুঃখ থাকবে না। তোমাদের স্মৃতিখানি আমার দেহে এমন বসে গিয়েছে—ছাড়াতেও বহুদিন লাগবে।"

কদিন পরে জবাব এলো, তারা দুঃখিত। তবে পাগলা টিকেদার বলছে, তার টিকে নিলে এমনটা হোত না!—আর ইস্কুল বেশ চলছে।"

আনন্দ-বরণ।

(একটি পাশী কবিতার ছায়াবলম্বনে)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

কীর্ত্তি-কিরীট পার নি লভিতে—চিত্ত কি তাই ব্যথায় দহে?
'বিত্ত সমান চকল বল' জান না কি তাই শাস্ত্রে কহে!
দুর্ম্মন্ ওই ধনের চিন্তা—আমোদ-আমোদ নষ্ট করে,
মিথ্যা কেবল ভাব্না বাড়ায়—ভেজীয়াজীতে স্ফূর্ত্তি হরে।
দণ্ডদুয়ের মানব-জীবন, ভাব্না ভাবিয়া করো না ছাই,
এস হে রঙীন সুখের সাগরে জীবন-তরণী বাহিয়া যাই।

বিহগের গীতি কুসুমের হাসি—তটিনীর মৃদু পেলব তান,
সৃষ্টি এদের বিশ্বমানবচিত্তে করিতে তৃপ্তি দান।
বর্ত্তমানের নিশ্চিত সুখ হেলায় ফেলিয়া এম্নি করি—
ভবিষ্যতের ভাব্না ভাবিয়া দুঃখ কেন যে নিতেছ বরি'।
সম্মুখে যা পাও আঁকড়িয়া ধর—আপ্ শোষ্ আর রেখোনা তাই,
পিয়ালা-সুধায় খোস্ করি দিল্ এস হে জীবন বাহিয়া যাই।

—•—

কাজের কথা।

[শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা, বি-এ]

ঘাসের উপর কোন রং লাগিলে তিনিপার গরম জলে সেই উঠিয়া যায়।

কোন কিছু হইতে প্যাঁজের গন্ধ উঠাইতে হইলে লবণ-জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

হাত বা পায়ের আঙুলের কড়া সারাইবার উপায়—তিনিপারের সঙ্গে পচা কলী মিশাইয়া তিনরাত্রি পুলটিস দেওয়া।

কোন কাচের জিনিষ পরিষ্কার করিতে হইলে সাবান-জল দিয়া ধুইতে হয়। দাগ থাকিলে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া মুছিলে পরে একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়।

রাজার পোষাকের মূল্য

ইউরোপের সকল রাজন্যবর্গের মধ্যে স্পেনের রাজাই সব চাইতে দামী পোষাক ব্যবহার করেন। অবশ্য বাবু রাজা ইউরোপে আর দ্বিতীয়টি নাই।

তিনি একবার যে পোষাক ব্যবহার করেন দ্বিতীয়বার আর তাহা স্পর্শ করেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

তাঁহার পোষাকাগারে একশ' থেকে দেড়শ' রাজ-পোষাক সর্ব্বদাই থাকে; তাঁর দরজী ঘরে প্রতি বছর সাড়ে বাইশ হাজার টাকা পায়। অবশ্য এর বেশীর ভাগ টাকাই লণ্ডনের দরজীরা পাইয়া থাকে।

বিশেষ কোন কাপড়ের উপর বেশী ঝোঁক দেন না, তবে গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জন্য ভোয়া ভোয়া ফ্লানেল তিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি কখনো ভারী পোষাক ব্যবহার করেন না, সর্ব্বদাই হালকা পোষাক পরেন, সময় সময় তার রঙ ঝক্‌ঝকে, সময় সময় বা ফ্যাড়।

ওয়েষ্টকোট সম্বন্ধে তাঁর পছন্দ বিশেষ একটা ফ্যাশনের অপেক্ষা রাখে। প্রতিটির দাম পঞ্চাশ টাকা থেকে আশি টাকা।

তিনি প্রতি বছর প্রায় এক শতটি "টাই" কেনেন, তাদের প্রতিটি প্রায় ১২৲ টাকা থেকে ৩৭৷৹ টাকা দামের এবং এগুলি তিনি প্যারী থেকেই ক্রয় করেন।

টাইয়ের মত সার্ট সম্বন্ধেও তিনি সমান খুঁতখুঁতে। তিনি দিনে তিনবার করিয়া "কলার" ও সার্ট বদলান এবং যে জামাটি দু'তিনবারের বেশী ইস্ত্রী করা হয়, তাহা কদাচিৎ ব্যবহার করেন।

রাজা তাঁহার সাধারণ পোষাকের জন্য বছরে কমসেকম প্রায় ত্রিশহাজার টাকা ব্যয় করেন। ইউ-রোপের আর কোন রাজারই এত টাকা ব্যয়িত হয় না।

রাজার জামা কাপড়, জুতো টুপী রাখিবার জন্য তিনটি সুবৃহৎ কামরা আছে। এই পোষাকাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিন তিনজন খানসামা আছে, তাদের মধ্যে যে-প্রধান, তার বেতন বছরে সাড়ে চার হাজার টাকা। ইহা ছাড়া যে সকল দরজী রাজ-প্রাসাদের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করে, খানসামা মহাশয় তাহাদের নিকট হইতেও বেশ মোটা দস্তুরী পাইয়া থাকেন।

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী]

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্ম্মিষ্ঠার' প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে কৃষ্ণধনবাবু 'শর্ম্মিষ্ঠায়' ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ গৌর দাস বসাককে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এক-খানি পত্র লিখেন। এই পত্রে শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ের কিরূপ আয়োজন হইতে ছিল তাহার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণধন বাবুর নাম নট তালিকায় লিখিত আছে:

"Sarmistha Kristodhon Baunirjee (a new Comer)"

কৃষ্ণধনবাবুর অভিনয় নৈপুণ্য রিহার্সালের সময়েই এরূপ প্রকটিত হইয়াছিল যে উক্ত পত্রে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র লিখিতেছেন:—

"You will see, from what I am going to show you, some new faces in our corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter is our heroine. He or she as you might choose real to call, is acquisition. To melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and to crown all he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, thongh not yet fully developed, for histrionic performances."

নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে এ প্রশংসা কম গৌরবের কথা নহে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তখন বহু ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অভিনয় করিতেন। কাজেই এমন নাট্যশালার সম্পর্কে আসিয়া কৃষ্ণধন বাবু বহু ধনী ও পদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই নাট্যশালার ঐক্যতান বাদন সম্প্রদায় গঠনে ও সঙ্গীত শিক্ষায় নিরত ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট কৃষ্ণধনবাবু সঙ্গীতশিক্ষা করেন। তাঁহার অসাধ্য রূপ প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীতের সকল বিভাগেই লব্ধপ্রবিষ্ট হন ও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন। দরিদ্রতানিবন্ধন পিয়ানো যন্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণধন বাবু কাগজের উপর পিয়ানোর চাবি আঁকিয়া তাহার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন অভ্যাস করিয়া পরে যন্ত্রে বাজাইয়াছিলেন। একদিন পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিলেন। কৃষ্ণধন বাবু এমন সময় তথায় উপস্থিত হইতেই ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিয়াছিলেন "সব বন্ধ কর। এখনই সব আদায় করে নেবে।" গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের প্রতি এ বাণী অতি উচ্চ প্রশংসা।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনবাবু মোয়াজিমের রাজপুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। শিক্ষকতাকালে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি 'চীনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। কর্ণেল হটনের সহিত কৃষ্ণধনবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল হটন কুচবিহারের মহারাজার হেটে কৃষ্ণধনবাবুকে ট্যাম্প অফিসার নিযুক্ত করেন। ১৮৭২।৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনবাবু দার্জ্জিলিং তেরাইয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। এই রূপ চাকরী করিতে করিতে সঙ্গীত চর্চ্চার বিশেষ বাধা ঘটায়, কৃষ্ণধন বাবু চাকরী ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন। সাধারণের চক্ষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীতচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ কলাবিদ্যার চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা সাংসারিক সুখ বা উন্নতিকে চরম লক্ষ্য স্বরূপ গণনা করিতে পারেন না। কৃষ্ণধন বাবুর আগ্রহ ছিল যে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতশাস্ত্রের বহুল প্রচারে সহায়তা করিবেন। তিনি যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উপায়ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ওস্তাদগণের নিকট বহুবর্ষ ব্যাপী হাটা-হাঁটির পর কিছুই শিক্ষা করা যায় না, নিজে ভুক্তভোগী হইয়া কৃষ্ণধনবাবু এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন ও তাঁহার লক্ষ্য হয় যে তিনি এমন সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিবেন যে বিনা ওস্তাদের সাহায্যেই সকলে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

জানা দরকার।

[শ্রীলীলা রায়]

মাছির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কাপড়ে একটু কেম্ফর (Camphor) বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়।

• • • •

সিল্ক পরিষ্কার করিতে হইলে ময়দা অপেক্ষা সাবানগোলা গরমজলে ধুয়া উচিত।

• • • •

ভিজা কাপড় দ্বারা ছোট ছোট কাচ-ভাঙ্গা অতি সহজে কুড়াইয়া তুলিতে পারা যায়।

• • • •

লবণ দ্বারা পাত্র হইতে পোড়া দুধের দাগ উঠাইতে পারা যায়।

• • • •

কাজ করিবার সময় ভাজিবার পাত্রের (Frying pan) উপর এক খণ্ড কাগজ রাখিয়া দিলে চর্ব্বিতে টেবিল নষ্ট হওয়ার বিশেষ কোন আশঙ্কা থাকে না।

• • • •

ঠাণ্ডা চা দ্বারা কালো লেস্ খুব সুন্দর রূপে পরিষ্কার করা যায়।

• • • •

ঠাণ্ডা জলে ময়দা মিশাইয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

• • • •

দুইবার জলে ভিম সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু দুইবার জলে ভিম দেওয়ার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জলে উহাকে ভিজাইয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।

(৪)

[ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এম্-এম্-এস্]

("স্বাস্থ্য-সমাচার" হইতে)

মানুষের বেলায় সকল কাজ করা যায় না বলিয়া, জন্তু জানোয়ার হইতে দু'চারটা দৃষ্টান্ত দিব। পুং-জাতীয় জন্তুদিগকে যদি শৈশব হইতে আলাদা রাখা যায়, তবে তাহাদের সামর্থ্য খুব বাড়ে, তাহারা খুব তেজাল হয় ও দুই হইতে পারে। যে সকল পুং-জাতীয় ঘোড়াকে গাড়ী টানান কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাদের অণ্ডকোষ যদি আস্ত থাকে, এবং সে সকল ঘোটক যদি কখনো কোন ঘোটকীকে স্পর্শ না করিতে পায়, তবে তাহারা যেমন তেজাল, তেমনি সহিষ্ণু হয়। অতিমাত্রা তেজের ফলে, তাহারা কখনো দুষ্টও হইয়া থাকে। যদি সেই সকল ঘোটকের অণ্ডকোষ কাটিয়া দেওয়া হয় ("আস্তা করা" হয়) এবং তাহারা কখনো কোনও ঘোটকীকে স্পর্শ না করিয়া থাকে, তবে তাহাদের তেজ, শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা কিছুই কমে না, কিন্তু তাহাদের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গাড়ীটানা ঘোড়া বা ষাঁড়কে স্ত্রী-সংসর্গ করিতে দিলে, তাহারা আর তেমন তেজাল, শ্রমশীল বা সহিষ্ণু থাকে না।

এখন তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে,—

(১) শরীর মধ্যে দুইটি প্রধান তন্ত্র (systems) থাকিলেও, তাহা পরস্পর পরস্পর সাপেক্ষ; কেহই স্ব স্ব প্রধান নয়।

(২) স্ত্রী-সংসর্গ করিলে অণ্ডদিগের কার্য্যকারিতা কমিয়া আসে। এই শেষের কথাটি সকল দেশের পালোয়ানেরাই জানেন। পালোয়ান, কুস্তিগীর প্রভৃতি ব্যক্তিরা অধিকাংশই অবিবাহিত থাকিয়া যান।

(৫)

"ভগবানই যখন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন যে, অল্প বয়স হইলেও, সেই কাঁচা বয়সেই (বালকদিগের বেলায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সে) আমাদিগের সন্তানোৎপাদন করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তখন, হইলেই বা তাহার, তোমার উপর প্রজননকারী করিবার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি কি ভগবানের চেয়ে বড়?" কেহ হয় ত এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইহার উত্তরে আমি বলি—তোমার উপরে প্রজননকারী করিবার স্পর্দ্ধা রাখি রাখি না। তবে, ভগবান্ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক বলিয়া যে জানটি দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি-বিবেকেরই পরিচালনা করিয়া বলি, কিছুকাল সবুর কর। কারণ শুন।—

প্রথমতঃ—মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা—সর্ব্বাংশে সু-সন্তানের জন্ম দেওয়া। চরম পরীক্ষা, খেলা করিতে করিতে দেওয়া চলে না। বহুদিন তপস্যা, বহু আরাধনা, কঠোর সংযম দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া লইয়া, তবে সন্তানোৎপাদন কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। বাস্তবিক সুসন্তানের জন্ম দিবার আজীবন ব্রতগ্রহণ করিয়া, বেশ পরিণত বয়সে, যখন নিজ দেহ ও নিজ মন সর্ব্বাংশে সুস্থ ও পবিত্র বোধ হইবে, তখন সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে পরম উপাদেয় ব্যবস্থা আছে। আজকাল অবিদ্যার বশে আমরা সে গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজ নিজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ—এই একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই মানবদেহে যে কোনও যন্ত্র-তন্ত্র অপর সকল যন্ত্র-তন্ত্রের উপরে বিশিষ্ট ভাবে কায করে। জননেন্দ্রিয়ের বিষয়ে এই কথাটি খুবই খাটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অণ্ডকোষে বীর্য্যের সৃষ্টি হয়। এই অণ্ডকোষ যদি কাটিয়া ফেলা হয়—অর্থাৎ বীর্য্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লোপ করা হয়, তবে যে পশুর তাহা করা হয়, সে মৃদু স্বভাব হয়, তাহার চেহারা স্ত্রীজাতীয়ের ন্যায় হয়—আবার যে রমণীদের আদৌ ছেলেপুলে হয় না, তাহাদের গোঁফের রেখা দেখা দেয়, তাহাদের মেজাজ রুক্ষ হয়।

যাহারা উর্দ্ধরেতা তাঁহাদের আয়ু, মেধা স্মৃতিশক্তি, দেহের লাবণ্য, শারীরিক সামর্থ্য—সমস্তই বাড়িয়া যায়। আর যাহারা অতিশয় বীর্য্যপাত করে তাহারা অল্পায়ু, জরা অকাল বৃদ্ধ হয়, এবং তাহাদের দৈহিক ও মানসিক অপকর্ষই ঘটিয়া থাকে। এখন যে জিনিষ (বীর্য্য)—যাহা রহিলে দেহ ও মন উন্নতির পথে যায়, এবং যাহা নষ্ট

করিলে, দেহ মন কিছুই ঠিকমত গড়িয়া উঠিতে পায় না, —সে জিনিষ নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কায। সারাজীবন পেটে ভাল করিয়া না খাইয়া, কত লাঞ্ছনা কত তিরস্কার খাইয়া পয়সা জমাও—কাহার জন্য? প্রাণের অপেক্ষা যাহাকে ভালবাস, সেই ছেলেরই জন্য ত? আজীবন কষ্ট স্বীকার কর যাহাতে ছেলে সুখে থাকিবে। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পয়সা ও বীর্য্য, কোন্‌টি তোমার ছেলের পক্ষে ভাল? যত ঊর্দ্ধরেতা থাকিবে (অর্থাৎ যত বীর্য্য তুলিয়া রাখিবে) ছেলেকে ততই সুন্দর পবিত্র দেহ, মন ও অপরিমেয় স্বাস্থ্য দিতে পারিবে। কৈ সেদিকে নজর কৈ? তোমার পয়সা তার স্বাস্থ্য ছেলেকে স্বাস্থ্য দিবে না। পয়সা তাহাকে আয়ু কিনিয়া দিতে পারিবে না; পয়সা তাহাকে মেধা দিবে না, কিন্তু আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া যে ছেলের জন্মদান করিবে—সে ছেলের আয়ু, মেধা, স্বাস্থ্য, রূপ, জ্ঞান ও যশ—অপ্রমেয় হইবে। ছেলের জন্য ইহা অপেক্ষা মূল্যবান আর কি দিবে?

তৃতীয়তঃ, তুমি যদি কামাতুর অসংযমী হও, তুমি যদি একটা ভোগের অধিকার পাইয়াছ বলিয়া ষোল আনা তাহা উশুল করিয়া লইতে চাও, তবে তোমার যে সন্তান হইবে, সেও অসংযমী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। পিতা-মাতার মনে যে যে প্রধান ঝোঁকগুলি থাকে, প্রায় সে সকলগুলিই সন্তানে বর্ত্তে। বোধ হয়, মায়ের মনের ঝোঁকটাই বেশী করিয়া সন্তানেরা পায় বলিয়াই, "মন্নানাং মাতুলক্রমঃ" এই কথাটার উৎপত্তি। কাযেই পিতামাতার সন্তানের মনের গতির উপরে আধিপত্য ও দায়িত্ব গুরু। এ দায়িত্ব বুঝিয়া কায করা চাই—মনুষ্য ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রকেই তুলিতে হয়। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, পিতা ঋষিতুল্য, পিতা পরম ধার্ম্মিক, পিতা সদাচারী—কিন্তু মাতার স্বভাব কিছু রুক্ষ বিধায়ে, সমস্ত সন্তানগুলিই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থতঃ—সন্তান ও সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, স্বার্থপর ভাবে শুধু নিজের দিক দিয়া দেখিলেও, অসংযমী-দের যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারা যাইবে। যত ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, তত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইতে পারে, তত রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং তত দীর্ঘায়ু হইতে পারা যায়। সামান্য ঘৃতের ভোগের লোভে, আয়ুকে খাটো করা, শরীরকে ব্যাধি-মন্দির করা, মনের ও দেহের পুষ্টিকে নষ্ট করা বোকামির পরাকাষ্ঠা নয় কি?

ভোগের পিচ্ছিল-পথ মরণের দিকে!
ব্যাধি-ক্লেশ ভোগ সাথে তুলে দিই মুখে!
কামের অনলে সঁপি' বিবেক ইন্ধন,
স্বেচ্ছা পশু হই, ত্যজি' মানবত্ব ধন!!!

(ক্রমশঃ)

একলব্য

[শ্রীকালিদাস রায় বি, এ]

সব জলধারা মিশে প্রণালীতে
সব পয়োনালী হ্রদে,
নবনদী দিয়া সব হ্রদে যোগ
নবমিলে মহানন্দে।
সব মহানদ উপনদীসহ
সিন্ধুতে একাকার,
সিন্ধুরা সব দিশ ভরিয়া
মহে মহাপারাবার,
সব উপাসনা সব নিবেদন
একেসিয়ে মেশে শেষে
মহাসিন্ধুতে একই মহাবাণী
বিঘোষিত দেশে দেশে।

শোক-সংবাদ

"ছেলেদের বঙ্কিম" গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী ভক্তিলতা ঘোষ অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার ইচ্ছা ছিল, ক্রমে ক্রমে ছেলেদের জন্য বাংলাভাষার ভাল উপন্যাসগুলি রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহার সাধু উদ্যম সফল হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহজগতের সম্বন্ধ কাটাইতে হইল। তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ আমাদের বান্ধবীর একজন লেখক। আমরা শোকসন্তপ্ত স্বামী ও আত্মীয় স্বজনকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, জানি না, মঙ্গল ময় জগদীশ্বর সে ভার গ্রহণ করুন।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সে চলিয়া গেলে ভূপতি বৈঠকখানায় পাশের ঘরে ঢুকিল, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিল। চিঠিখানা খোলা ছিল; জলে ভিজাইয়া সন্তর্পণে খাম খুলিয়া ফেলিল; তারপর ভিতরের চিঠিখানা লইয়া পড়িতে বসিল।

"প্রিয় তারানাথবাবু,

সেদিন আপনি যে সব কথা আমাকে বলতে এসেছিলেন, দুর্বলতাপ্রযুক্ত সে সব কথা শোনবার অবসর আমার হয় নি। ধাক্কাটা বড়ই আকস্মিক হওয়ায় কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি নি। সে জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে আমি দ্বিধাবোধ করি না।

শুনলাম, আপনি নাকি কাজ ছেড়ে অবসর নেবেন? যেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে আপনার অবসর লওয়াই উচিত, আমিও আপনাকে অবসর দিতে প্রস্তুত। যদিও বন্ধু বলতে—সহায় বলতে আর কেউ রইলো না, তবু আমি নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে রাখতে চাই না। যে চক্রান্তের সৃষ্টি হ'য়েছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আপনি কেন অনর্থক কষ্ট পাবেন?

আমি? আমার জন্য ভাববেন না। বেশ বুঝতে পারছি, ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল ক'রে দিয়ে, এই চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে শীঘ্রই আমি এমন এক জায়গায় চলে যাব, যেখানে পৃথিবীর স্বার্থসঙ্কলুষিত বাতাসটী পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। এটা ঊর্দ্ধে যেখানো কথা বা দুঃখদীর্ণ হৃদয়ের ব্যর্থ আক্ষেপ নয়—ধ্রুব সত্য কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা।

আপনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন? কালরাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, বাবা এসে মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে আমাকে অভয় দিয়ে বলছেন, 'ভয় করিস্ না অনি, কাঁদিস্ না। পৃথিবীর কান্না তোর শেষ হ'য়ে এসেছে। শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যেদিন তুই এই চোখের জল মুছে ফেলে, এই অত্যাচারের কেলেঙ্কারীর মর্ম্মঘাতের জ্বালা বিস্মৃত হ'য়ে, আমার বুকে এসে আবার সেই ছেলেবেলাকার অট্টহাসের হাসি হাসবি। আমি তোর তরে কোলপেতে দাঁড়িয়ে আছি।' আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি, বাবা জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নি। এখন তিনি স্বর্গবাসী; সেই স্বর্গীয় দেবতার উক্তি মিথ্যা হ'বার নয়।

মিথ্যা যে হবে না, তা আমি নিজের দেহের দিকে চেয়েও বেশ বুঝতে পারছি। যে রোগ চিকিৎসকের চিকিৎসা বিদ্যার অতীত, সেই রোগ যেদিন আমাকে আক্রমণ করেছে, সেই দিন থেকেই জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছি। ওঃ, সে একটা কি ভয়ানক বিভীষিকা! মৃত্যু তাদের কাছেই বিভীষিকা, যাদের জীবনে আশা আছে, সংসারে সুখ আছে, স্নেহ প্রীতি প্রেম যাদের চারদিক ঘিরে প্রস্রবনের মত ছুটে আসছে। কিন্তু আমার মত যারা মরুভূমির মাঝখানে ব'সে আছে, যাদের জীবনে নৈরাশ্য, দুঃখ, শোক ছাড়া আর কিছুর বিন্দুমাত্র আশা নাই, যাদের প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে অপূর্ণতা, অতৃপ্তি, নিষ্ফলতা তাণ্ডবের হুঙ্কারের মত বেরিয়ে পৃথিবীর বাতাসটাকে পর্য্যন্ত তপ্ত ক'রে দিচ্ছে, সেই মরুপথযাত্রী পথিকের কাছে মৃত্যু মরুদ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়, তার মত লোভনীয় আর কিছুই নাই। যে অশান্তি অতৃপ্তির হাত এড়িয়ে যাবার কাজে যাবার জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে, জীবন তো সে পথের অর্গলবদ্ধ দ্বার-স্বরূপ; মৃত্যু এসে যদি এই দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়, তবে সে মৃত্যু অপেক্ষা আর কি আমার কাম্য থাকতে পারে? আমি আনন্দের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি যে, সে কাম্যবস্তু আমার খুব নিকটবর্ত্তী।

অনেক আগেই আপনি অবসর চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন আপনাকে অবসর দিই নাই। এখন নিজেই যখন অবসর নিচ্ছি, তখন আপনাকে আর বাধা দেব কেন? তবে অবসর নেবার আগে আর একবার সাক্ষাৎ করবেন না কি? ইতি—

হতভাগিনী

অনুপমা।"

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে ভূপতির মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে সে পত্রখানাকে ঘরের মেঝের ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিল।

অনুপমা বাঁচিবে না ইহা কি সত্য? কেন সে মরিবে?

এত ঐশ্বর্য্য, এত সুখ, এমন আধিপত্য, এ সকল সত্ত্বেও সে মরিবার জন্য এত উৎসুক কেন? কিসের দুঃখ, কি অশান্তি, কি অভাব তাহার? কি এমন কালব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, যাহা তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করিবে, তাহার হাত হইতে মুক্তির কোন উপায় নাই? তাহার দেহ দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু ইহা ছাড়া তো রোগের আর কোন লক্ষণই দেখা যায় না। যদিই বা ভিতরে কিছু রোগ থাকে, তাহার কি চিকিৎসা নাই? সিভিল সার্জ্জন আছে, সাহেব ডাক্তার আছে, বড় বড় নামজাদা কবিরাজ আছে, তাহারাও কি ভিতরের এই রোগটুকুর উপশম করিতে পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। পয়সার তো অভাব নাই। লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও অনুপমাকে বাঁচাইতে হইবে।

ভূপতি উঠিয়া মেঝে হইতে পত্রখানা কুড়াইয়া লইল, এবং তাহাকে পুনরায় খামের ভিতর পুরিয়া, জনৈক চাকরের হাতে দিয়া তারানাথের নিকট পাঠাইয়া দিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া অতঃপর কর্ত্তব্য কি তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বেই তারকনাথ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং ভূপতিকে এই ভাবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "যাও সন্ধ্যা হ'তে যায়, একলা চুপ ক'রে ব'সে আছ? আটটার গাড়ীতে বর্দ্ধমান যেতে হবে না?"

যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় ভূপতি বলিয়া উঠিল, "বর্দ্ধমান!"

তাহার এই বিস্ময় প্রকাশে যেন অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া তারকনাথ বলিল, "হাঁ হাঁ, বর্দ্ধমান। একেবারে ভাকা হ'য়ে পড়লে যে। কাল না যোকেকমার দিন? আমি সাক্ষীসাবুদ সব ঠিক ক'রে এলাম, সন্ধ্যার পরই তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। নাও, এখন উঠে এর মধ্যে তৈরী হ'য়ে যাও।"

বলিয়াই তারকনাথ ব্যস্তভাবে বহির্গমনোদ্যত হইল। ভূপতি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি যেতেই হবে তারকদাদু?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঘোর গলায় তারকনাথ বলিল, "নিশ্চয়ই।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভূপতি বলিল, "না গেলে চলে না?"

ভ্রূকুটীতে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তারকনাথ বলিল, "তুমি তো আচ্ছা আহাম্মক। তুমি আর আমি দরখাস্তকারী, আমাদের দু'জন নিয়েই মামলা। তার মধ্যে একজন না গেলে মামলাই হবে না।"

ভূপ। ব্যারামের ওজর দিয়ে দরখাস্ত দিলে আর একটা দিন পড়তে পারে।"

তার। তা পারে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সাক্ষীগুলাকে কেউ যদি বিগড়ে দেয়?

ভূপতি চিন্তিতভাবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যেতে পারবেই বা না কেন শুনি। কি তোমার এমন কাজ আছে?"

ভূপতি বলিল, "কাজ—কাজ তেমন কিছু নাই, তবে শরীরটা—"

কক্ষস্বরে তারকনাথ বলিল, "ধ্যেৎ তোর শরীর! কেন শরীরে তোমার কি হ'লো?"

ভূপ। বেরটা কেমন ঝাঁঝ তার, মাথাটাও ধরেছে।

তার। মাথা-ধরা এখন রাখ! আজ সাহেবের হুকুম পেলেই মাথাধরা সেরে যাবে। হাঁটতে তো তোমাকে হচ্ছে না, ষ্টেশন পর্য্যন্ত মটরগাড়ীতে যাবে, তারপর ট্রেণে পড়ে ঘুমিও। নাও, উঠে পড়। আমি মোটামুটি ক'রে একটু জলযোগ ক'রে নিই।"

আদেশ দিয়া তারকনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া ভূপতি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "শুনুন তারকবাবু?"

তার। আবার কি শুনবো?

ভূপ। আমি আজ যেতে পারবো না।

তার। কেন বল দেখি, তোমার মতলবটা কি?

ভূপ। মতলব কিছুই নাই, মনটা আজ আমার ভারাপ্ত।

তারকনাথ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রোষকষায়িত দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ঘৃণাবিমিশ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আহাম্মক!"

ভূপতি এই তিরস্কারের কোন উত্তর দিল না। তারকনাথ তখন রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, তুমি তোমার মন নিয়ে থাক, আমি আমার কাজে চললাম, এরপর কিন্তু এই আহাম্মুকির ফল তুগতে হবে তোমাকে।"

রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া তারকনাথ চলিয়া গেল। ভূপতি দুই হাতে মাথা ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

জাহাজে প্রদর্শনী

[শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা বি, এ.]

গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদিগের বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য জাতিসমূহ এই অবসরে বাণিজ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক সুবিধা করিয়া লইয়াছে। আবার যাহাতে যুদ্ধের পূর্ব্বেকার মত ব্যবসা, বাণিজ্যে ব্রিটিশদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার হয় তাহার জন্য ব্রিটিশেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে এই সম্পর্কে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া ঠিক হইয়াছে যে একখানা বড় রকমের জাহাজে ব্রিটিশের বাণিজ্য শিল্পের সমস্ত জিনিস প্রদর্শনীর মত করিয়া সাজাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঘুরিয়া অজ্ঞতা লোকদিগকে দেখাইয়া ও ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জাহাজের নাম রাখা হইবে "ব্রিটিশ ইণ্ডাষ্ট্রী"। ব্রিটিশদের জাহাজ তৈরী করিবার শক্তি সামর্থ্য দেখাইবারও ইহা একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সুদূর পূর্ব্বদেশসমূহই ব্রিটীশ বাণিজ্যের অনুকূল স্থান। উক্ত জাহাজ এই সকল দেশে প্রথম প্রদর্শনী দেখাইবে। অন্য কোন্ কোন্ স্থানে গেলে সুবিধা হইবে তাহা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক একটি লিষ্ট তৈয়ারী হইয়াছে।

সাধারণত প্রদর্শনী খুলিতে গেলে অভাব অসুবিধা খুব। প্রত্যেক বন্দরে বন্দরে উপযুক্ত স্থান পাওয়া দুষ্কর। তারপর প্রদর্শনীর মাল এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাইতে বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়। সব জিনিষ প্যাক করা, মজুরী খরচ ইত্যাদি এবং প্রদর্শনীর জন্য ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতেও অনেক টাকা দরকার। আর যদি প্রত্যেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই সময়ে প্রদর্শনী খুলিতে হয়, তবে তাহার খরচের অন্ত থাকে না। জাহাজের ভিতর প্রদর্শনী খুলিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলে এসব অসুবিধা মোটেই সহ্য করিতে হয় না। একবার সুন্দর করিয়া সাজাইয়া লইলেই হইল। খুব বড় জাহাজ হইলে অনেক লোকের দেখার পক্ষেও কোন কষ্ট হইবে না।

এই সব কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি কম্পানী গঠন করা হইয়াছে। তাহার নাম "ব্রিটিশ শৌডদিপ লিমিটেড।" কানাডার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল আর্লগ্রে এই কম্পানীর সভাপতি এবং ইংলণ্ডের কয়েকজন নামজাদা ব্যক্তি ইহার সভ্য হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাতা "হ্যইয় এণ্ড বিলহম রিচার্ডসন লিমিটেড" এই জাহাজ নির্ম্মাণের ভার নিয়াছেন।

"ব্রিটীশ ইণ্ডাষ্ট্রী" জাহাজখানা ১০০০০ টন মাল বহন করিতে পারিবে। এর ইঞ্জিন বাষ্পে চালিত না হইয়া তেল দ্বারা চালিত হইবে। বড় চিমনিরও দরকার হইবে না, ধূমও বাহির হইবে না। সমস্ত জলকণা বর্ষাসত্ত্বর পশ্চাদ্ভাগের এক কোণায় বসান হইবে যাহাতে সম্মুখের ও ভিতরের সমস্ত জায়গা প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রধান চারটী প্রদর্শনীতে "লোকেশ" ও "হল" রাখা হইবে। এমন ভাবে সাজান হইবে যাহাতে দর্শকেরা জাহাজের এধারওধার হাঁটিয়া যাইতে পারে। জাহাজের উপরের ডেকে কর্ম্মচারীদের ও পরিদর্শকের আফিস থাকিবে। যাত্রী জাহাজে যে সব সুখ সুবিধা ভোগ করা যায় ইহাতে সে সমস্ত সুবিধার বন্দোবস্ত রাখার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে বরং তাহা অপেক্ষা আরও ভাল বন্দোবস্ত হইবে।

জাহাজের প্রত্যেক তলাতেই তিনটি করিয়া বড় রকমের প্রবেশদ্বার রাখা হইবে। এক ডেক হইতে অপর ডেক যাইবার জন্য সিঁড়ি ও লিফ্‌ট উভয়েরই বন্দোবস্ত থাকিবে। তিনটী প্রবেশদ্বারের মধ্যেরটী দেশের গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত লোকদের জন্য রাখা হইবে। এই দরজা দিয়া ঢুকিলে মস্ত বড় একটি অভ্যর্থনাকক্ষে পৌঁছান যাইবে। এই কক্ষের মধ্যে প্রদর্শনীর সর্ব্বপ্রধান আফিস বসিবে আফিসের মধ্যে ইনকোয়ারী আফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিশ্রাম গৃহ ও হাতমুখ ধুইবার সাজ পোষাক পরিবার কক্ষ থাকিবে। এই প্রধান কক্ষ পার হইলেই একটী সুবৃহৎ ভোজনকক্ষ। এই কক্ষে একত্রে ৫০০ লোক বসিয়া আহার করিতে পারিবে। বোটডেকে কর্ম্মচারীদের থাকিবার ঘর, কমিটী ভবন, অভ্যর্থনা ভবন ইত্যাদি থাকিবে। অন্য এক ডেকে একটী লাইব্রেরী, লিখিবার পড়িবার ঘর, ধূমপানের ঘর ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইবে।

বোট ছেড়ে দশ চব্বিশ একটী "বল নৃত্য" অনুষ্ঠিত হইবে। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড হইয়া ক্রমশঃ জাপান, চীন, ফিলিপাইন, জাভা, ষ্টেটস্ সেটেলমেণ্ট ইত্যাদি স্থানে প্রদর্শনী দেখাইয়া ভারতে আসিবে। তারপরে এখান হইতে ছাড়িয়া যাইবার পথে বড় বড় বন্দরগুলিতে ছুএক দিন করিয়া থাকিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবে।

জাহাজের ভিতর একটী ছোটখাট ছাপাখানা রাখা হইবে। তাহাতে প্রদর্শনীর, ক্যাটেলগ, প্রোগ্রাম, ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন ও একখানি দৈনিকপত্র ছাপা হইবে। এসব ছাড়া কায়েলী আফিস, বেতার টেলিগ্রাম আফিস, সর্ব্বসাধারণের পত্রাগার, পরামর্শ গৃহ ইত্যাদির বন্দোবস্ত রাখিতেও অবহেলা করা হইবে না।

যে সব জায়গায় এই জাহাজ যাইবে সেই সব স্থানে পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য কর্ম্মনির্ব্বাহক সমিতি ইত্যাদি গঠিত হইবে। অভ্যর্থনা সমিতি সহরে সহরে বিজ্ঞাপন দিবেন, বড় বড় ব্যবসায়ীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন ও অন্যান্য আবশ্যক খবর রাখিবেন। এসব কাজে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথাসম্ভব সাহায্য পাওয়া যাইবে। গ্রাম হইতে এসব দেখিবার জন্য লোক আসিতে চাহিলে তাহাদের আসা যাওয়ার জন্য ট্রেণ ইত্যাদির সুলভ সুবন্দোবস্ত করা হইবে এবং সে সব খবর পূর্ব্বাহ্নেই সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। মোট কথা এই প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য যাহা কিছু দরকার ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট তাহার কোন অংশই অসম্পূর্ণ রাখিবেন না।

১৯২৩ সালের ২৩শে আগষ্ট এই বাণিজ্যপোত ইংলণ্ড

হিন্দী পত্রিকা "আজ্ঞা" হইতে সঙ্কলিত।

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পরে)

যাদের তিনদিনের কথা আর নাই বলিলাম।

চতুর্থ দিনের প্রভাত হইতে-ই অজিত শয্যাত্যাগ করিবে, অকস্মাৎ তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। পালঙ ধরিয়া আবার সে বসিয়া পড়িল। তখনি বুঝিল, জিহ্বাটা কেমন তিক্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ কেমন যেন একটা অ-স্বচ্ছন্দতার ভারে ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে। ও কিছু না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল বটে কিন্তু সে যখন মুখ-হাত ধুইয়া পড়িবার ঘরটিতে খবরের কাগজ হাতে চায়ের প্রতীক্ষা করিতে বসিল, তখন সত্য সত্যই তাহার শরীরটা সিঁদ্ সিঁদ্ করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন জ্বর হইবে। খবরের কাগজটা টেবিলে ফেলিয়া রাখ হাতে নাড়ী টিপিয়া ধরিল,—অনুমান মিথ্যা নহে, সাধারণ হৃদ নাড়ীর অপেক্ষা তাহার গতি ও ভাব যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত বোধ হইল। মাথাটা টিপিতে টিপিতে সেখানেও একটু বেদনা ঠেকিল। বার দুই হাই তুলিতেই পীরের বেদনাটাও স্পষ্ট হইয়া আসিল। ডাক্তারের বুঝিতে বাকী রহিল না, বেশী দেরী নাই। শ্রীরামপুরে থাকিতেও অজিত প্রায়ই জ্বরে ভুগিত, আশা ছিল স্থান পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটিবে কিন্তু কয়দিন না কাটিতেই সঙ্গিনীর আগমন আকাশে ঘন-টা অতীব বিষণ্ণ হইয়া গেল। অথচ রাত্রেও সে বেশ সুস্থ-সবল ছিল।

ভৃত্য চা আনিয়া রাখিল। অজিত শয়নকক্ষের আলমারি হইতে কুইনাইন্ ট্যাবলেটের শিশিটা আনিতে বলিয়া খবরের কাগজ তুলিয়া লইল।

চা পানান্তে চুরুট ধরাইয়াছে, ভৃত্য পোষাক-আষাক আনিবে কি-না জিজ্ঞাসা করিল। তখন মাথার মধ্যে

যেন একটা গুরুভার চাপিয়া বসিয়াছিল, নাড়ীটা আর একবার অনুভব করিয়া, ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিল—না রে, আর আর বেরুব না, শরীরটে ভাল নেই।

ভৃত্য চলিয়া গেল। সেদিনের কাগজে দুর্ঘটনার সংবাদটা খুব বড় বড় অক্ষরেই ছাপা ছিল, পাঠে মনে অনুতাপ আনায় অনুকূল হইতে লাগিল। নীচে একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গচিত্রে তুরস্ক-গ্রীসের বর্ত্তমান অবস্থা যেমন হইয়াছিল, অজিত সেইটাই দেখিতেছে, সীতাও একটু প্রবল ভাব ধারণ করিল। মাথার উপর পাখা চালিত, পূর্ব্বে রেখে যায় নাই,—উঠিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আবার ব্যঙ্গচিত্রে মন দিয়াছে, পূর্ব্বের মত শীত করিতে লাগিল। তুষ্ট-টা দাঁতে চাপিয়া হাসল হাতে শয়ন কক্ষের দিকেই চলিতেছিল, আকবরী সহিস্ সেলাম্ করিয়া কহিল 'গ্রাম্ সে হুজুর।'

'নেহি আজ নেহি নিকলেগা।'

কিন্তু শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল—পাগল যে তাহার পথ চাহিয়া থাকিবে। দশ মিনিট দেরী হইলে যে কাঁদিয়া ফেলে, একদিন—'আসিবার দরকার নাই' শুনিলে যে রাগমুখে তর্কপত্রের মত করিয়া পড়ে—তাহার কি দশা হইবে? কয়দিনেই অবস্থা যেরকম কাহিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আজ ডাক্তারের উপদেশ ও নূতন ঔষধ না পাইলে ত একটা ঘাও করিয়া বসিবে। যে অধির আর ভীরু—হয়ত আবার কাহাকেও ডাকিয়া বসিবে।

চারিটা টাকার ক্ষত নহে, ডাক্তারের কেমন একটা ভোর পড়িয়া গিয়াছিল। অনুখটা তাহার এমন কিছুই ছিল না বটে কিন্তু ভিতরের সেই যে গ্লানির অনুভূতিটাই হাল, বাহিরে পাগলের অঙ্কে যে এমন ক্ষত করিয়া রেখা টিপিয়াছে, দিনের পর দিন সেই ক্ষুদ্র অনুভূতি তাহাকে যেরকম ক্ষত মলিন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ডাক্তারেরই একটা শঙ্কা আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ সে তাহার জ্ঞান বারিধি মন্থন করিয়া যেই রত্নরাজিই এই যৌবন রোগীটিকে দিবার চেষ্টা করিয়াছে ও দিয়াছে, সেগুলিকেও ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ডাক্তার কাল রাত্রেই একটু চিন্তিত হইয়া ফিরিয়াছিল। তার উপর, পাগলের সেই কথা। ডাক্তারবাবু এ রোগে মানুষ বাঁচে? ডাক্তারের কি বুঝিতে বাকী ছিল, ঘটৈশ্বর্য্যের বিলাস-ব্যসনের নীরব ত্যাগের কথা মনে আসিয়াছে তার ক্ষুব্ধ দুঃখে, ক্ষত করেছে। ডাক্তার কুক্ষ সান্ত্বনার বাণী বলিল, ক্ষুব্ধ অভয় দিল, কিন্তু পাগল তাহা বিশ্বাস করিল না। অতি ম্লান-মুখ তুলে বলিল—আপনি বুঝি রোগী ভুলোচ্ছেন? আমি কি আর বুঝি না?" "না, না, তা নয়, এ সামান্য..." "কৈ আর সামান্য ডাক্তারবাবু, আগে তবু রাত্রে একটু আধটু ঘুম হ'তো, দুবেলা দুমুঠো খেতেও বসতুম, আজ তিনদিন যে চোখে—পাতায় এক করতে পারি নি, ডাক্তারবাবু। এই তিনদিন খেতে গেছি, পাতের কাছে বসবার আগেই বমি হ'য়ে গেছে, একটু জলের জল ছাড়া যে আর কিছুই খেতে পারি নি ডাক্তারবাবু! আর আপনি বল্‌ছেন সামান্য! না ডাক্তারবাবু, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে লুকোবেননা আপনি—সত্যি করে' বলুন—কেউ বাঁচে?—বলিতে বলিতে সে অজিতের পা দুইটা ধরিয়া ফেলিয়াছিল। অজিত দুই মুহূর্ত্ত কথা বলিতে পারে নাই, তাহাতে পাগল তার পা ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিল তবে আর কেন? আর আমি এখুণি যাব না ডাক্তারবাবু। আপনি অভাগিনীর জন্যে অনেক করেছেন কিন্তু পরমায়ু ত আর আপনি দিতে পারবেন না। কাল থেকে আর আপনি আসবেন না, যেকটা দিন বাঁচি···অজিত বলিয়াছিল, এ সব আপনি পাগলের মত কি বল্‌ছেন? যে কটা দিন বাঁচি,—ওসব কি কথা? কি হ'য়েছে আপনার যে আপনি ওরকম করছেন?' কাল সকালেই আপনার মাথা আমি সারিয়ে দিচ্ছি।—অভাগিনী উত্তরে একটি কথাও বলে নাই কেবল অঞ্চল তুলিয়া চোখ মুছিয়াছিল।

মনে পড়িতেই অজিত বেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল। নীচের উঠান দিয়া জনৈক যৌবনবতী হিন্দুস্থানী ঝি দুই হাতে দু'খানতী ওঁচলা বহির্বাটিতে ফেলিতে যাইতেছিল, তাহাকেই ডাকিয়া বলিল—ঝি, দরওয়ানকে উপরে পাঠিয়ে দাও ত একবার।

দারবান আসিতেই, আজ্ঞামত গাড়ী আনিতে আদেশ দিয়া অজিত ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। শরীরে যেন এক তিল শক্তি ছিল না, তখনি শুইয়া পড়িয়া কম্বল চাপা দিবার ইচ্ছা অজিতেছিল, কিন্তু একবার শুইলে পরে না উঠিতে পারে—অজিত শুইল না, অতিকষ্টে খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈদ্যাতী চিকিৎসার ধারটা ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া লইতে হইবে, কম্পাউণ্ডারকে আনিতে বলিতে হইবে—চাকরটাকে ডাকিয়া তাহাকে আদেশ দিয়া অজিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী পাঞ্চলের দ্বারে আসিয়া থামিল। সিঁড়ি কয়টা উঠিতে পা দু'টা, কোমরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোনোমতে দেওয়াল ধরিয়া সে যখন উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল—ঠিক সেই সময়ে সিক্তবসনে একখানা কাপড় বুকে চাপিয়া পাঞ্চল আনমনা ছাড়িয়া বারান্দা দিয়াই আসিতেছিল,—সম্মুখে ডাক্তারকে দেখিয়া সলজ্জে দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

একটুখানি অবসর—বস্ত্র ত্যাগ করিবার সময় দিতেই ডাক্তার বাহিরের বারান্দাতেই অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু দাঁড়াইবার মত শক্তি তাহার ছিল না, সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

পাঞ্চল বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিনবার আহ্বান করিয়াও যখন ডাক্তারের সাড়া পাইল না, তখন বাহিরে আসিতেই দেখিল, ডাক্তার দুহাতে কপাল চাপিয়া চুপ্‌চাপ করিয়া বসিতেছে।

কি হ'য়েছে—ডাক্তারবাবু!—পাঞ্চল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার যে বসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, পাঞ্চল সবিস্ময়ে কহিল, এ কি! আপনার চোখ অমন লাল কেন ডাক্তারবাবু! একি, আপনি—আপনি কাঁপছেন যে!

ঠিক সেই সময়েই ডাক্তারের পা দুইটা টলিয়া গেল—পাঞ্চল হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ব্যস্ত-বিজড়িতকণ্ঠে কহিল—অসুখ করেছে! তাই ত! এ যে—জ্বর! গা পুড়ে যাচ্ছে যে ডাক্তারবাবু!

অজিত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—বড্ড জ্বর! ম্যালেরিয়া!

পাঞ্চল তাহার হাত ধরিয়া, ঘরে টানিয়া, বিছানায় বসাইয়া দিয়া বলিল এত জ্বরে বেরুলেন কেন ডাক্তারবাবু!

কাল যে তোমার—কাল যে আপনার বড় অসুখ দেখে গেলুম!

তাই বলে—

আমার কম্পাউণ্ডার ইলেকট্রিক বাল্ব আনতে আজ আপনার মাথার যন্ত্রণা আরাম করিবে দিয়ে যাই।

আমার মরে এক ফোঁটা ওষুধও নেই—ডাক্তারবাবু! বলিতে বলিতে পাঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার দেখিতে পাইল না বটে, যদি দেখিত, বুঝিত এ কান্না তাহারই জন্য বলা কহা নাই। অভাগিনীর অন্তরের স্তরে স্তরে উৎস আকারে এই বাহিরটা আসিতেছিল। তাহার কারণ ছিল। অভাগিনীর কালো রাত্রিকার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল, ধৈর্য্যহারা হইয়া দু'চারিটি কথা রাত্রে ডাক্তারকে যে সব কথা বলিয়াছিল, তাহারই যে আজ দেহ ডাক্তারকে পিঠমোড়া করিয়া আনিয়া হাজির করিয়াছে—তাহাতে দ্বিধা—সংশয় ছিল না। অথচ পাপিয়সী মনে জানে, অধৈর্য্যের কারণ তাহার অসুস্থতা নহে; অসুস্থতা যে নাই তাহাও নহে, কিন্তু তাহার কারণ যে সেই—সেই দৌর্ব্বল্য, সেই অপরিচিত-গর্ব্বে স্বিত-প্রিয়তম যাহার জন্য সে তাহার সাজের চিরদিনের মত বিদায় দিয়াছে, মঞ্চের মত প্রণয়ীকেও চৌকাঠ বাড়াইতে দেয় নাই—সরাই দিয়া যাইতেছিল, নারী তাহার লোনার পিঞ্জর হইয়া ঘুরিয়া হইয়া উঠিতেছিল। ডাক্তারের সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করিতেও তাহার ঘৃণাবোধ হইতেছিল, তাই তাহাকে বিদায় করিবার জন্যই বলিয়াছিল—যদি আপনি আসবেন না, আর আমি অপেক্ষা করে থাকি—সেই কথাগুলিই যেমন করিয়া এই যুবক ডিটেক্টিভকে এমন বিষ করিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে, পোড়ারমুখী যে মরেও তাহা ভাবে নাই।

মত ভাবে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। পাঞ্চল সন্তর্পণে চোখ দুটাকে মুছিয়া ফেলিয়া কাপড় পরিবার বেশে ডাক্তার বাবুর উপর অপরাধিতভাবেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া আছে—ঘুমিতেছে দেখিয়া পাঞ্চল ডাক্তার স্তম্ভিত হইয়া উঠিল, এ সে কি করিয়াছে! ডাক্তারের জামা টানিয়া আনিয়া একি ব্যবসায় করিয়াছে!

কি ভাবিয়া ডাকিল, ডাক্তারবাবু! অজিতবাবু!

অজিত অতিকষ্টে বলিল—মাথা—

একটু শোবেন?

শোবো? তা ভাই! উঃ—কম্পাউণ্ডার এলে তাকে বলবেন—আপনার মাথার সেটা দিয়ে ওষুধ দিয়ে এসে বাড়ী যাবে।—বলিয়া অজিত পাঞ্চলের বিছানাতেই শুইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

নয় বছরে ছয়বার

পৃথিবীতে শ্রীমতী লিজী ম্যাকারটীর ন্যায় এত অধিক বিবাহ করে এমন মহিলার মধ্যেই তাহাকে তালাক দেওয়াকারই এলি কোটস্ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া তাহার মানবজন্ম সার্থক করিয়া দেই। এবং নিরাপদে এই পঞ্চম স্বামীকে লইয়া প্রায় দুই বৎসর-কাল সুখে থাকিতে মনস্থ করে। কিন্তু তারপরই কি কারণে পঞ্চম স্বামীকে আদালতে পরিত্যাগ করিয়া টিটন হইতে এই মহীয়সী নারিকা মেরিয়ন নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে সে এড হাট নামক একজনের চৌদ্দপুরুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। এবং এই স্বামীকেও কোন অজ্ঞাত কারণে ছয় মাস মধ্যেই মুক্তি দিয়া নিজের মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বেচারী লিজীর বয়স এখন তেমন বেশী নহে। এই নয় বছরে সে যখন ছয়বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছে, তখন বাকী জীবনে কতবার কতটি স্বামীকে কৃতকৃতার্থ করিতে পারিবে, তাহা পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া স্থির করুন।

চুম্বন অপরিজ্ঞাত

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহাদের চুম্বনটা একেবারে অপরিজ্ঞাত ব্যাপার। জাপানী, চীনা, অনেক আফ্রিকান, মালয়বাসী, অনেক এস্কিমো, এবং উত্তর আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের মধ্যে চুম্বন ব্যাপারটা একেবারে অপরিজ্ঞাত।

জাপানীদের মধ্যে যে চুম্বন-প্রথা নাই তাহার অন্যতম কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, জাপানীরা সর্ব্বদাই রঙ্গন পাউডার ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে নাকি তাহাদের সৌন্দর্য্য বাড়ে এবং চুম্বনের ফলে সেই সৌন্দর্য্যের হানি হওয়া অত্যন্তাবী। ছেলে, বুড়ো, যুবক বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেও জাপানের কোন মা ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখে চুম্বন করিবে না, মুখে সেহসিক্ত জানাইয়া বাহুযুগলের অমীম কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে।

যখন ছেলেরা কোন খেলার সাথীকে অভিনন্দন করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা আপন আপন হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ে এবং অভিনন্দন বাণী উচ্চারণ করে।

যদি এই অভিনন্দন ব্যাপারটা বাড়ির মধ্যে হয় তাহা হইলে ছেলেরা মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া নীচু হইতে মাথা মেঝেতে ঠেকাইয়া থাকে।

চীনা বালকেরা আপন আপন হাত দুখানা বুকের উপর জড়াইয়া ধরে, তারপর তাহা মুখের উপর তুলিয়া ধরে এবং মাথা বাঁকাইয়া ঠিকে আপনাকে বিজ্ঞাপন করে "ভাত খাওয়া হইয়াছে কিনা।" বয়স্ক লোকেরা হাঁটু গাড়িয়া শ্লোকধ্বনি করিয়া সম্বর্দ্ধনা করে।

দেশ বিদেশ

[illegible] কিলার [illegible] কোলুইটোলা, নারেঙ্গা ও কোণাগাছার অঞ্চলে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ এই যে, ঐ স্থান হইতে সংবাদ আসার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিন রবিবার দিবসে কিছু বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে এক নরহত্যা লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। ইহা শুনিলে আমরা অনেক লোক দুঃখিত কোণাগাছার এবং কোলুইটোলা গ্রামের অন্যূন পাঁচশত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একথা যে, ইহার অধিবাসিদের অনেকগুলি গ্রাম ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

গত সোমবার মহাসমারোহে একটি খুন হইয়া গিয়াছে। শুনা যে, প্রসিদ্ধ মিল পরিবারের মাতব্বর মিল ও বলাইচন্দ্র বসু আসল বসু ছিল। সম্প্রতি আহারের অল্প বন্ধুতা হয়। গত সোমবার মাতব্বর অন্যান্য ৩টার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখে যে বলাই তাড়াতাড়ি সেজের গহনা নিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহাতে মাতব্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বলাইকে একটী চড়াস করে বসায়। ফলে বলাই ভূমিতে মূর্ছা হইয়াছে। [illegible] সম্পত্তি থানায় লইয়াই বাকি এই ঘটনা।

আকবর শাহী আমলে যাহা ছিল। একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বিলাপ করে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কন্ট্রোলিকোপলের সুবন্দোবস্তে যে সকল লোক ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নিরোদমনুষ্য করা হইয়াই হইয়াছে। আকবরের আমীরকে খলিফা করিবার যে কথা উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসাধক।

লক্ষ্মণের একজন বিখ্যাত সর্ব্বের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। সম্প্রতি তাহার [illegible] হইয়াছে। মেরিকা ভাইকাউন্ট কলোনিয়েল একমাত্র দুহিতা। পাত্রাপাত্রের অভাবে এতদিন আবেরিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। গত যুদ্ধের সময়ে ইনি ইংলণ্ডাকাশে ওজনে কার্য্যকরীর কাজ করেন। সেইখান হইতেই তাঁহার প্রেমের আরম্ভ হয়।

পাবনা জেলা পাবনা গ্রামের শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁর আদালতে একটী [illegible] করিয়া [illegible] মোকদ্দমা [illegible] তিন বাদীই [illegible] মেয়েদের আদালতে করিয়াছে। বাদিনীরা বিবাহ [illegible] করিয়াছে। [illegible] বিবাহ বিচ্ছেদ পাইবার [illegible] এইরূপ পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও অশান্তি বাদিনীরা মুছিয়া ফেলে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

বাসন্তী

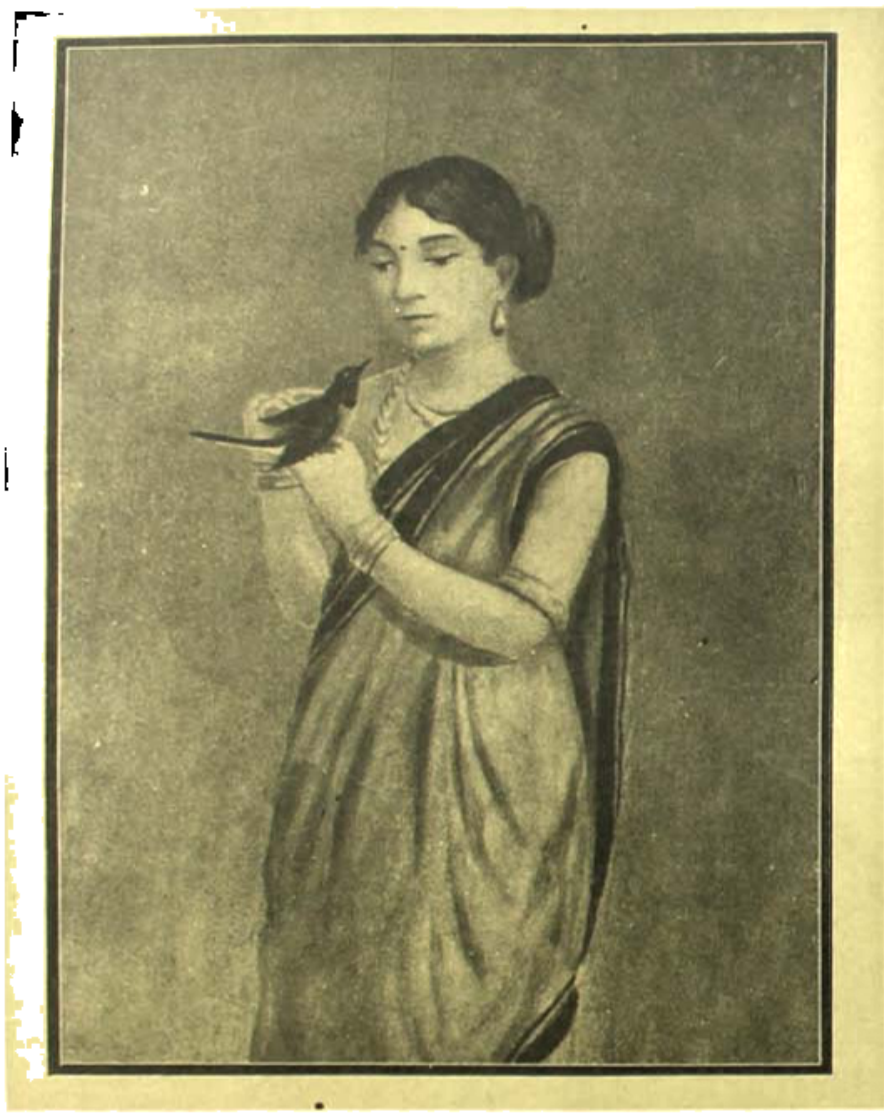

সাদর সম্ভাষণ।

শিল্পী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণারী।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

বন্যা চিত্র

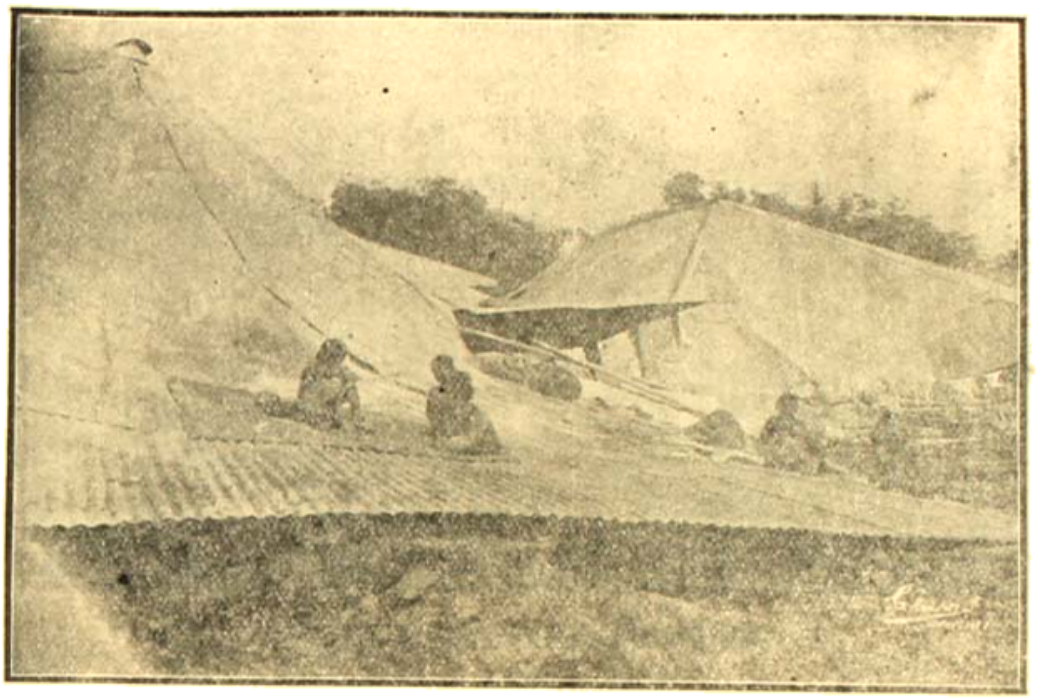

নসরতপুরের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদারের ২২ খানি ঘরের বর্ত্তমান অবস্থা।

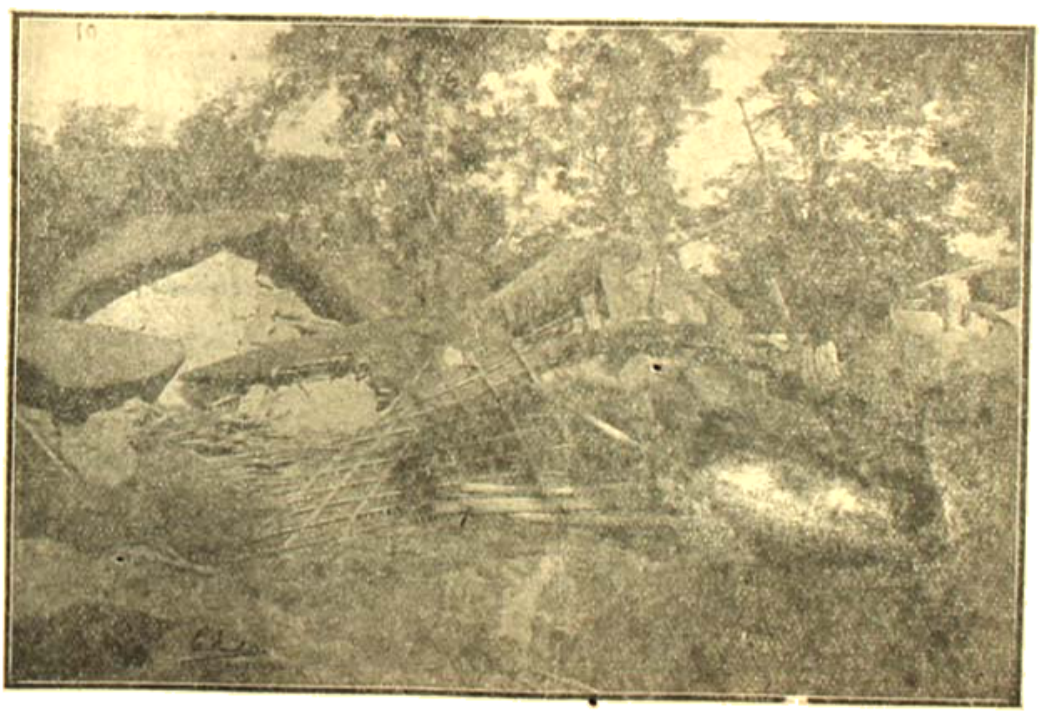

অধিকাংশ গৃহস্থের ঘর বাড়ীর যে দশা হইয়াছে। গৃহস্থ হৈমন্ত্য পত্রের সন্ধান করিতেছে।

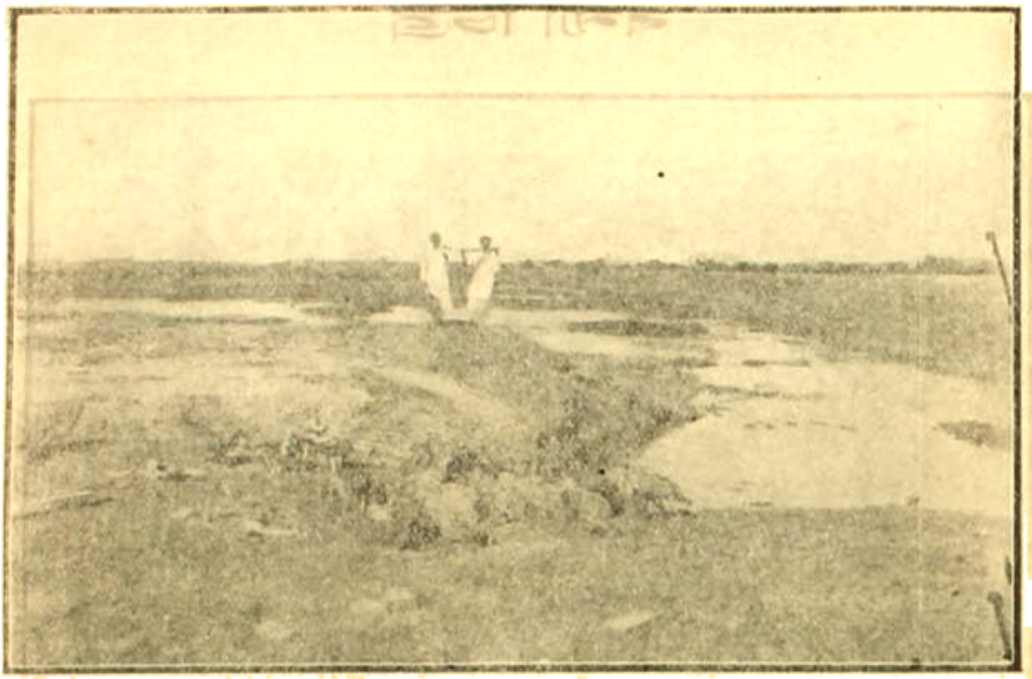

গৃহপালিত জীবজন্তুর সন্ধানে শম্বুনি-গৃধিনী।

সাহায্যপ্রার্থীগণ সমবেত হইয়াছে

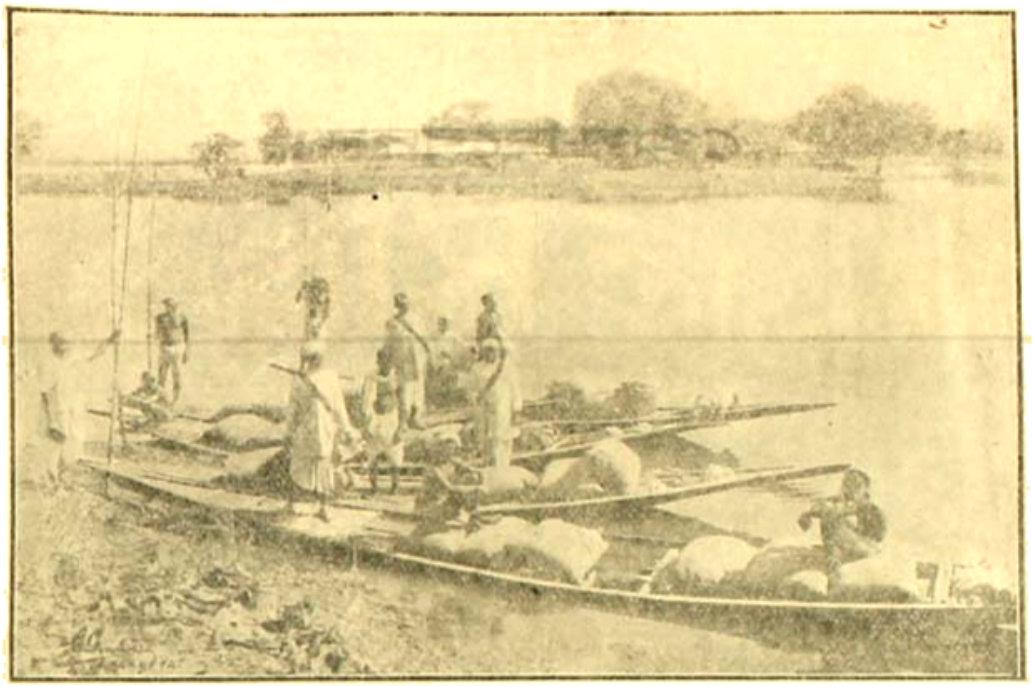

স্বেচ্ছাসেবকগণ চাল ডাল লইয়া সাহায্য-কেন্দ্রে চলিয়াছে।

মাড়োয়ারী সাহায্য-সমিতির প্রতিনিধি বাবু ভগবানদাস আগরওয়ালা দুঃস্থগণকে বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন।

প্রেম-নিবেদন।

অর্জ্জুন-সকাশে উর্ব্বশীর আত্ম-নিবেদন।

"দিনার্দ্ধ।" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'কুশলবের' একটি দৃশ্য।

অর্জ্জুন—শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী। উর্ব্বশী—মিস্ চারুশীলা।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৯ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩২৯, ইং ২৫শে নবেম্বর। [১৮শ সংখ্যা

"কি আর বলিব আমি ?"

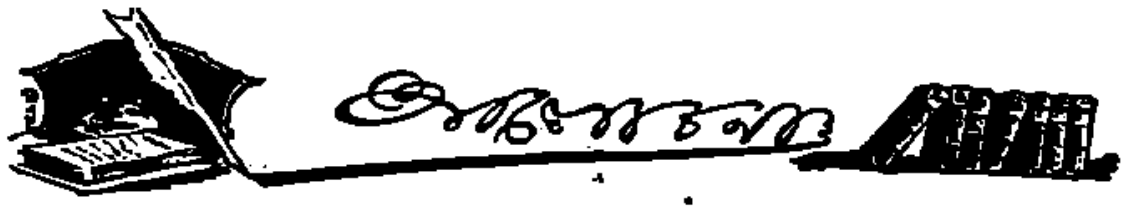

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে নিশ্চয়ই। তবে আমাদের দেশে রাজনীতিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া যেমন ঘরিৎ চট করিয়া আসে অপর কোন দেশেই বোধহয় তেমন আসে না। রাজনীতিক খেলা ও চাতুরী যদিও ভারতের পক্ষে এক হিসাবে নূতন—কারণ পরাধীন জাতির রাজনীতি বলিয়া কোন বালাই থাকিতে পারে না ইহাই বিজ্ঞজনের অভিমত—তবুও ভারত তাহার প্রথম কংগ্রেস জীবনের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত বহুপ্রকার রাজনীতিক খেলা দেখিয়া আসিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশের লোককে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে দেশনীতির সঙ্গে রাজনীতির যে অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে তাহা যে দেশে ফুটিয়া উঠিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশনীতি ও রাজনীতি এতকাল আমাদের দেশে সম্পূর্ণ পৃথকই ছিল। রাজনীতিক আন্দোলন দেশে হইত বটে—কিন্তু তাহা দেশের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—দেশের সর্ব্বসাধারণ—দেশের অধিবাসী যাহারা, দেশের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে ভোগী যাহারা দেশের সেই জনসাধারণ এ আন্দোলনে যোগ দিয়া আন্দোলনটিকে সার্ব্বজনীন করিবার সুবিধা বা সুযোগ তাহারা পাইয়াছিল না। ভারতের দেশনীতি ক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মার আগমনের পর হইতেই দেশের সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যেই রাজনীতিক অধিকার বোধ সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়।—সাধারণে মাত্র বুঝিতে শিখিতেছিল যে দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের হাত না থাকলে তাহাদের ক্রমবর্দ্ধিত দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগের নিরাকরণ তো কোন দিন হইবে না বরঞ্চ তাহারা ক্রমশঃ আরও দুঃখের অতলে, তলে ডুবিয়া যাইবে হয়তো অগতে কোন দিন তাহাদের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সার্থকতার হিসাবে মহাত্মার আন্দোলন দেশের সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যেই একটা আত্মবাধ ও আত্মকর্তৃত্ব জাগরিত করিবার প্রচেষ্টা পাইয়াছিল ঐখানেই তাহার সার্থকতা। এ সার্থকতার লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে দেশের লোকে—দেশের সর্ব্বসাধারণে দেশের অবস্থা কতকটা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছে পরে যোগ্য নেতার চালনে হয়তো আরও জানিতে ও বুঝিতে পারিবে ইহাই আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পরম লাভজনক মনে করি।

• • • •

আজ ভারতের জননেতা মহাত্মা গান্ধী রাজবিচারে ভারতেরই কারাগারে দীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় ও অসত্য ব্যবহারের প্রতিবাদের জন্যই—দেশের বিনষ্ট গৌরবমান উদ্ধারের জন্যই তিনি কারাবরণ করিয়াছেন। মহাত্মার এ কারাবরণ পৃথিবীর ইতিহাসের চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিবে। ভারতের জনসঙ্ঘ অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেই মহাত্মার প্রদর্শিত পথে চলিয়া কারাভীতি চিত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া কারাগমনে উৎসাহী হইয়াছিল—এই কারাগমনে দেশের সত্য লাভ কিছু হইয়াছে কিনা তাহা খতাইয়া দেখিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে এই ব্যাপারে দেশের হাজারো প্রাণ নিজ্জিব নিরবলম্ব পরবশতার মোহ ছিন্ন করিবার যে একটা উল্লাস ও প্রচেষ্টা জাতির মনে ও মুখে ভাষর হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কর্ম্মের ফল একদিনেই মেলে না—স্বরাজ বা স্বাধীনতা এক দিনে কোন দেশের কোন জাতির ভাগ্যে মেলে নাই। আত্মত্যাগ, আত্মদানের অধিকারী জাতি আগে না হইলে এ অমৃত ফলের আস্বাদ লাভ করা সম্ভবপর নয়। তাই জাতি আত্মত্যাগ ও আত্মদানে কতটা বদ্ধ পরিকর ও সক্ষম হইয়াছে এ তাহারই একটা পরীক্ষার কাল চলিতেছিল মাত্র। কিন্তু আত্মত্যাগের এ কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রব্রত সহিয়া স্বরাজ রূপ মন্ত্রকে বরণ করিবার প্রয়োজন জাতির পক্ষেও দেশের পক্ষে যেন এখন একটা

অসাধারণ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে মুক্তি না পাইয়া জাতি আবার স্রোতে গা এলাইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া একটা অভাবনীয় কিছুর প্রত্যাশায় জড় হইয়া পড়িয়া রহিবে।

• • • •

জাতির এই দীর্ঘ সঞ্চিত অবসাদ ও জড়ত্বের ভাব দূর করিয়া জাতিকে কার্য্যকরী শক্তিরূপে গড়িয়া তুলিবার যে প্রয়াস তাহাও কি মহাত্মার কারাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে? দেশের অবস্থাও বর্ত্তমান ভাব দেখিয়া সেই শঙ্কাই হয়।

• • • •

একদল দেশ সেবক কিছুদিন পূর্ব্বে কারাগমনের জন্য যেমন উন্মাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন আজ আবার তেমনি ভাবে লাট কৌন্সিলে প্রবেশের জন্য তৎপর হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মত হইতে জানা যায় পূর্ব্বেও ইঁহারা কৌন্সিল দ্বারা দেশের অবস্থার উন্নতির যেরূপ কোন আশা করিতেন না বা কৌন্সিলের উপর যেমন বিশ্বাসী ছিলেন না এখনও তেমনি ইহা দ্বারা তাহারা দেশের উপকারের কোন আশা করেন না কৌন্সিলে তেমনি অবিশ্বাসীই আছেন তবে ইহারা কৌন্সিলে প্রবেশ করিয়া দেশের কৌন্সিলের মারফৎ যে সব রাষ্ট্রীয় কার্য্য হয় তাহার প্রতিরোধ এবং শত্রু করিবেন। অপর দল দেশ সেবক বলিতেছেন, মহাত্মার আন্দোলনে যখন কৌন্সিল গমন বিধান ছিল না এবং ইহার কার্য্য প্রণালীর উপর যখন তাহাদের আস্থা নাই তখন এ ব্যাপারকে এতটা প্রাধান্য দিবার প্রয়োজন কি?

• • •

কৌন্সিল গমনে যদি দেশের ভাগ্য ফিরিয়া যায় অ-সহযোগীরা কৌন্সিলের এমন কি মন্ত্রী হইলেই যদি দেশ শাসকদিগের আসন টলে, দেশে অ-সহযোগীদিগের প্রার্থিত সমস্ত সুব্যবস্থার সন্ধান হয়—অ-সহযোগ আন্দোলন চালাইবার ইহাই যদি সঙ্গত বিধান হয় তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই কিন্তু যদি তাহা না হয় তবে কৌন্সিল প্রবেশ চেষ্টায় অথবা যে সময় ও উৎসাহ ব্যয় হইবে তাহার সার্থকতা কি? সার্থকতা বিচারের সময় এখনও আসে নাই তবে এই ব্যাপার লইয়া দেশসেবক ও কর্ম্মীদিগের মধ্যে যদি কোন মনোভঙ্গের কারণ আসে তাহাই সব চেয়ে ক্ষোভ ও দুঃখের কথা হইবে।

• • • •

উত্তর বঙ্গের বন্যার কারণ অনুসন্ধান ও অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বড় লাট কৌন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বন্যা বিধ্বস্ত স্থানসমূহে গিয়াছিলেন। তিনি রেলওয়েকেই এজন্য দায়ী করিয়াছেন। জেলার বেসরকারী প্রমুখ সরকারী লোকেও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু বলেন বন্যার জন্য দায়ী যাহারা তাহাদের নামে নালিশ রুজু করিতে। আমরাও পূর্ব্বে তাহাই বলিয়াছিলাম—এই যে সহস্র সহস্র গৃহহারা বিত্তহারা যাহারা বন্যার তাড়নে সব হারাইয়া আজ নিঃস্ব হইয়াছে ইহাদের দুরবস্থা যাহাদের অব্যবস্থা হইতে আসিল তাহাদিগকে কেন এজন্য দায়ী করা যাইতে পারিবে না? দায়ী করা উচিত, কর্ত্তব্য হিসাবেও, মানুষের জীবন যে ঘোড়া গরু ভেড়ার মত একেবারে মূল্য হীন নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্যও অন্ততঃ এমন একটা রেকর্ড রেখে থাকা দরকার।

• • • •

কিছুদিন পূর্ব্বে দুইটা পাহারাওয়ালা একজন লোককে ধরিয়া প্রকাশ্য রাজপথে তাহার পেটের উপর উঠিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিল—এসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী লিখিতেছেন পাঁচশত লোক ঘটনাস্থলে জমা হইয়াছিল—তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা মানুষের প্রতি এইরূপ অত্যাচার দেখিল, কেহ পাহারাওয়ালার বে-আইনী বলপ্রয়োগে বাধা দিল না ইহা কিরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয়···সত্য বটে, এই পৈশাচিক আচারণে কেহ বাধা দিলে 'সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা দেওয়া' অপরাধে তাহার নামে নালিশ ত হইতই, অধিকন্তু তাহার আগেই তাহার পেটের উপর নৃত্য করিতে পারিত। কিন্তু, পরাধীনতা ও পুলিশের অত্যাচার আমাদিগকে কাপুরুষ করিয়াছে, না আমরা কাপুরুষ বলিয়াই পরাধীন হইয়াছি ও পুলিশের অত্যাচার আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও আমরা যে ভীরু, ইহা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আমাদিকে মানিতেই হইবে। কোন স্বাধীন ও সাহসী জাতির দেশে পাঁচশত মানুষ দাঁড়াইয়া এইরূপ অত্যাচার নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখিতে পারিত না।'

সত্যকথা এদেশের লোক বড়ই আইন ভীরু। আইনের মর্য্যাদা ইহারা পদে পদে রক্ষা করিয়া চলে। পুলিসের কার্য্যে বাধা দিয়া আইন লঙ্ঘন করিতে গেলে তখাপি সেস্থানে জনতার উপরে মেসিনগানও তো আসিতে পারিত। জনতা কোন সাহসে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবে। রেলের বাঁধ জল আটকাইয়া রাখিয়া গ্রামকে গ্রাম ডাসাইয়া দিতেছে, বাঁধ কাটিয়া জল নিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দিলেই বহু গ্রাম ও বহু লোককে পথের ভিখারী হইতে হয় না কিন্তু সিছনে তয় আইন ও শৃঙ্খলা তাই তাহারা ডুবিয়া মরিতেও প্রস্তুত হইল—সব ডুবাইয়া দিল কিন্তু হাতে হাতে কোন ব্যবস্থা করিতে পারিল না।

• • • •

এবার বাঙ্গার কৌন্সিলে গুণ্ডা বিল উপস্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা পুলিসে অনেকগুলি বিভাগ আছে, তাহার মধ্যে গুণ্ডা নিবারণী বিভাগটি নূতন। এই বিভাগটি অন্য বিভাগের ন্যায় স্বতন্ত্র। ইহার বিশেষ কার্য্য যে কি তাহা আমরা সঠিক জানি না—তবে কলিকাতা সহরে সম্প্রতি গুণ্ডাদের যে অপ্রতিহত ক্ষমতা হইয়াছে তাহা নিবারণের জন্যই মোটা-মুটি এই বিভাগের সৃষ্টি। সরকার কলিকাতা পুলিসের এই বিভাগটি সৃষ্টি করিয়া কলিকাতার অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাহাতে এই বিভাগটির কার্য্য সুচারুরূপে হয় তাহার বিধান করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। কলিকাতার প্রত্যেক নাগরিকেরও এই বিভাগটির সহায়তা করিয়া গুণ্ডা দমনকার্য্যে সরকারের সাহায্য করা প্রয়োজন।

• • • •

কলিকাতা সহরে নানাপ্রকার লোকের স্থান হইয়াছে। অবাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার লুপ্ত হইতেছে কিন্তু বাঙ্গলা সোণার দেশ—এখানে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপ্রকার লোকের প্রভুত্ব অব্যাহত রহিয়াছে। এই সহরে কত প্রকার চুরি ডাকাতি রাহাজানী নিত্য সংঘটিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। পেশাদার গুণ্ডার দল—গুণ্ডামী করিয়াই এই সহরের বুকে বসিয়া তাহাদের দিন স্বচ্ছন্দে অতিবাহন করিতেছে। কলিকাতার প্রায় সর্ব্বস্থলেই গুণ্ডার দল আছে। তবে কতকগুলি স্থান আছে যে স্থানে ইহাদের মূল আড্ডা অবস্থিত। বেন্টাপল্লীর নিম্নটে বা সরাপের দোকানের পাশে ইহাদের অনেকের ছোট ছোট বাটি অবস্থিত। বস্তিতে অনেকের বাটি আছে—এই গুণ্ডার দলকে আইনের কবলে ফেলিয়া সাজা দেওয়াও মুস্কিল কারণ Bad livelihood বলিয়া Penal Code এর যে ধারা আছে সে আইনে ইহাদের সাজা হইবার উপায় নাই—সেদিন দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটও এই কথা বলিয়াছেন। তাহার উপর হাতে নাতে ছোরা মারিবার সময় বা রাহাজানী করিবার সময় ইহাদের ধরাও এক অসাধ্য ব্যাপার। দিনে পানের দোকান রাত্রে গুণ্ডামী যাহাদের পেশা তাহাদের পানের দোকান খুলিবার প্রবৃত্তি কমাইতে হইবে। কলিকাতার গুণ্ডাদের মধ্যে অনেকেই যুক্তপ্রদেশবাসী বা বেহারী—সরকারী রিপোর্টে তাহাই দেখা যায়—আমাদেরও ধারণা তাই। পুলিস বিভাগের লোক এ কার্য্যে অবহিত হইলে ইহাদের ধরাও দমন করা কঠসাধ্য হইবে না।

• • • •

হাওড়া ষ্টেশনে গত কয়েকমাস কতকগুলি প্লাটফরমের ধারে বেড়াজাল দিয়া ঘের করিয়া রাখা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদের হঠাৎ চমক ভাঙ্গে যে অনেক রেল-যাত্রী বিনি টিকিটে ষ্টেশে যায়—সেইজন্য রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি হইতেছে না বরঞ্চ দিনে দিনে হ্রাস পাইতেছে। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ তখন নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন কি উপায়ে যাত্রীগণ রেলকোম্পানীকে ফাঁকি দিতে না পারে। কর্ত্তৃপক্ষের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে অবশেষে এই বেড়াজালের উদ্ভব হয়। আমাদের দেশে পুষ্করিণী হইতে জল বাহিরে যাইবার পথে 'ঘুণি' পাতিয়া ছোট ছোট মৎস্যের গতিরোধ করা হয়—ঘুঁণির ভেতর যে সব মাছ পড়ে সেই ধৃত হয়। হাওড়া ষ্টেশনের বেড়াজালের বিশেষত্ব এই যে জালের ভেতর দিয়া একজনের বেশী দুই জন যাত্রী একবারে প্লাটফরমে প্রবেশ করিতে পারে না—টীকিট দেখাইয়া তবে একে একে বেড়াজাল পার দিতে হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ বেড়াজালের ব্যবস্থা তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য করা হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য দ্বার পূর্ব্বের মতই অবারিত। এই বেড়াজালের ভেতর দিয়া আরোহী-দের যখন যাইতে দেখি তখনি মনে হয় এদেশের

লোকদের চিরদিনই বেড়া তৈরী করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহা এস্থানে বেশ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। যাত্রীরা Subject to the Company's Laws & Regulations তাই বিনা বাক্যে তাহারা মেষপালের ন্যায় সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়—এবং একজন বেড়াজালের ভেতর দিয়ে গমন করে। কত লোক ইহাতে গাড়ী ফেল করে। কত যাত্রী বোট বহর হারায় কতজনে পত্নী পুত্রহারা হয় তাহার সংখ্যা নাই। কতজন এই বেড়াজাল প্রবেশের সময় বলপ্রয়োগ হইয়া গাঁটকাটার হাতে পড়িয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হারা হয়। এদেশের লোকের মনে আত্মসম্মান জ্ঞান আদৌ নাই তাহা হইলে রেলকোম্পানীর এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ তাহারা সমস্বরে করিত—পয়সা দিয়া এ নির্য্যাতন সহ্য করিতে দেশের লোক মোটেই রাজী হইত না। তৃতীয় শ্রেণীর ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অনেক কথা হইয়াছে কিন্তু বিধান যে কি হইতেছে তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না বরঞ্চ দিন দিন তাহাদের অধিকতর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে।

• •

রেলওয়ের এই অব্যবস্থা সম্বন্ধে কৌন্সিলে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—তারপ্রাপ্ত দেশীয় মন্ত্রী তিনি এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ পান নাই। ইহা সরকারের এলাকার ব্যাপার নহে—তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল বোর্ডের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে। দেশবাসী উত্তরে তৃপ্ত! তারপ্রাপ্ত দেশীয় মন্ত্রী কি সংবাদ পত্রগুলিতে এই বেড়াজালের ব্যাপার পাঠ করেন নাই? দৃষ্টি আকর্ষণের ফল কতদিনে ফলিবে দেশবাসী তাহা জানিতে অধিকারী কি?

• • • •

রেলে ক্লার্কিং চেকার আছে—গাড়ীতে যথেষ্ট টিকিট চেক্ হয় তবে আবার যাত্রী নির্য্যাতনের এ নব উপায় নূতন ব্যবস্থা বেড়াজাল কেন?

• • • •

কাউন্সিলে প্রশ্ন হইয়াছিল বাংলা গভর্ণমেণ্ট ১৯১৯-২০-২১ এই তিন বছরে তাহাদের চাকর বাকরদের ভ্রমণ—যাতায়াত ব্যয় বাবদ কত টাকা খরচ করিয়াছেন—উত্তর ১৯১৯-২০ সনে ৩২,১৬,৬৩০৲ ১৯২০-২১ সনে ২৫,৭৫,১৫৪৲ ১৯২১-২২ সনে ৪১,০০,৩১৭৲ মুদ্রা সরকারের চাকর বাকরদের ভ্রমণ ব্যয়ও কেমন বর্দ্ধিত হইতেছে!

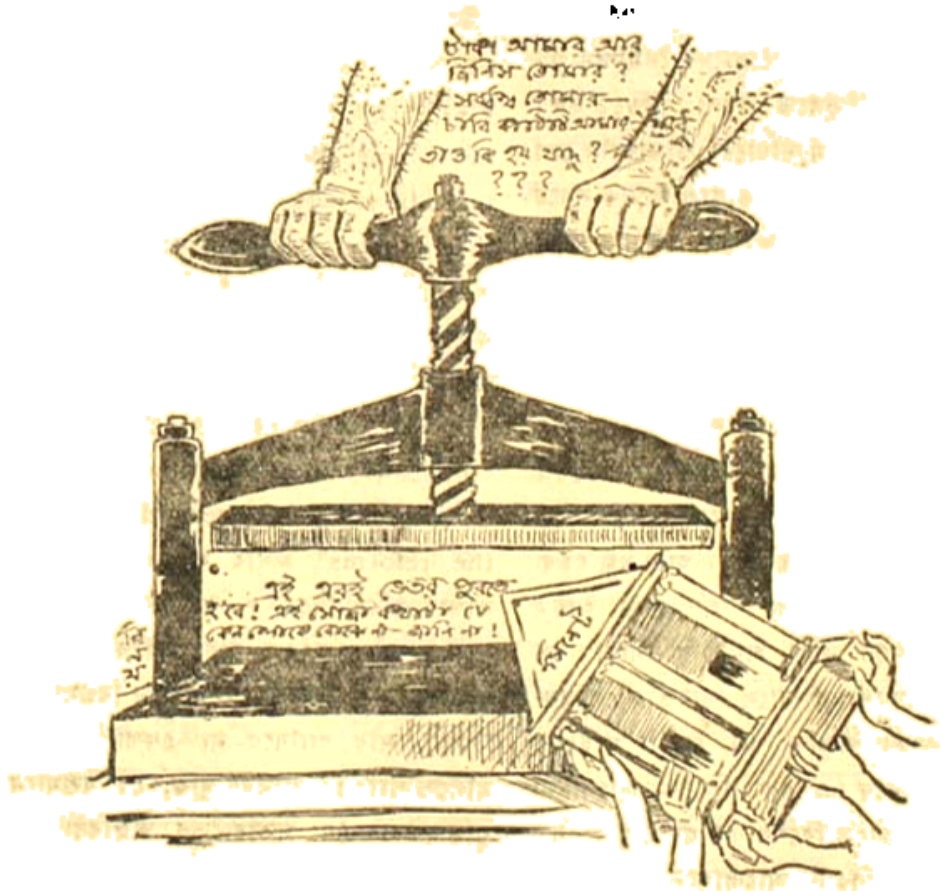

"এটা করতে হবে।"

ভারতীয় কয়লা খাদে—নারী শ্রমজীবি

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ।)

চা-বাগানের কুলীরমণীগণের দুর্দ্দশার চরমকাহিনী যখন আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করি, তাঁহাদের প্রতি যে নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় সে বিবরণ যখন আমাদের কর্ণগোচর হয় তখন আমরা মাত্র একটু হা হুতাশ ছাড়া প্রতীকারের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করি না। যাহারা অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ তাঁহারা হয়তো ঘটনার গুরুত্ব না বুঝিয়া তাহার আন্দোলন করিতে বাস্ত হইয়া পড়েন। ভারতীয় নানাবিধ কলকারখানায় অনেক নারী শ্রমজীবি কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের দুঃখদারিদ্র্যের দিকে কলওয়ালাগণের আদৌ সহানুভূতি নাই। এমন কি দেশবাসীও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যান্য বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ভারতের কয়লা খাদের নারী শ্রমজীবিদিগের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে তাঁহাদের অবস্থা কত শোচনীয়।

বর্ত্তমানে ভারতীয় কয়লা খাদসমূহে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নারী শ্রমজীবি আছেন। তাঁহাদের দৈনন্দিন গৃহ কর্ম্ম ছাড়াও কয়লা খাদে, ভূগর্ভে কয়লা খুঁড়িতে হয়। বলাবাহুল্য এই কঠোর পরিশ্রমে তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি তো ঘটেই পরন্তু নৈতিক চরিত্র রক্ষার ব্যাপারও অনেক সময়ে কলকারখানার আবহাওয়ায় অসম্ভবপর হইয়া পড়ে। আমরা যে জাতিকে এত দিন "কোমলা" বলিয়া অন্তঃপুরে দেবীরূপে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আসিতেছি আজ উদরান্নের সন্ধানে সেই দুর্ব্বল মাতৃজাতি ঘরে বাহিরে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া জাতি বৃদ্ধির পথে কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। জগতের কোন দেশের পূজ্য জাতি আমাদের মত হীনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এই অমানুষিক প্রথা অন্য কোন দেশে নাই; সর্ব্বত্র আইন দ্বারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা কয়লা খাদে বা ভূগর্ভে নারী শ্রমজীবি নিয়োগ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে কয়লা প্রভৃতি খনি সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধিত প্রস্তাব প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। যত দিন না এদেশে এ সম্বন্ধে বিরাট আন্দোলনের আয়োজন হইতেছে, দেশের জনসাধারণ এক বাক্যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইতেছেন ততদিন এ দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। 'রৌদ্রী সেনের' চাবুক ভারতের প্রতিনিধি সাজিয়া আনবীর শ্রীমোহন্দাস গান্ধী মহাশয়ের মত ভিখারীর ছাড় পত্রের গায়ে এ সম্বন্ধেও কি আবেদন ও নিবেদনের ধারা বহন করিয়া খাদ বাচাই করিতে হইবে? আমরা নিজেরা কি কিছুই করিতে পারি না?

লর্ড কার্জ্জন একবার স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় নারীগণ ভূগর্ভে পরিশ্রম করিয়া নিজেরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না কিন্তু তাহাদের মজুরী কম বলিয়াই তাহাদিগকে লওয়া হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন দ্বারা দশ বৎসরের কম বালক-বালিকাগণের ভূগর্ভে নিয়োগ বন্ধ করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু এই অনুগ্রহ হতভাগ্য নারীজাতির প্রতি প্রদর্শিত হয় নাই। যেহেতু খনী সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে বিশেষতঃ শ্বেতকায় মহাজনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারেন এই আশঙ্কায়—সরকার পক্ষ হইতে মিঃ ইনিস্ সাহেব যত্ন করিয়া বলিয়াছেন"The government was, however, mindful that reform must be slowly introduced with-out injuring the industry." সরকারের এ বিষয়ে লক্ষ্য আছে, তবে যাহাতে ব্যবসা নষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া ক্রমশঃ সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু কতি কোন স্থানে, যাহাতে একণে এই নিষিদ্ধ কর আইন হইতে পারে না তাহা Mr. Innes দেখাইয়া দেন নাই। তিনি আবার বলিতেছেন "When the 'time was ripe' the local Governments Concerned would carry out the reforms" অর্থাৎ যখনসময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই সংস্কার করিয়া দিবেন। এই চিরন্তন প্রথানুযায়ী সংস্কার সরকার তরফ হইতে যাহা হইবে তাহা দেশবাসী বেশ বুঝিয়াছেন। বিহারে যেখানে বিদ্যমান আছে সেখানে "সময়" আর আসিবে না একথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমরা বুঝি, যে বর্ত্তমানে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ায় এবং গভর্ণমেণ্টের অসুবিধা বিষয়ে (transport) কয়লার ব্যবসায়ের অবস্থা অনেকটা মন্দ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিব যে কয়লা খাদের ভূগর্ভে নারী

শ্রমজীবি নিয়োগ নিষিদ্ধ ভারতবাসী আর সহ্য করিবে না। সঙ্ঘ স্বগতের সহিত এক শ্রেণীতে মিশিবার বহু খনির মালিক গণকে সঙ্ঘর চেষ্টা করিতে হইবে। কয়লা খাদে নারী শ্রমজীবি নিযুক্ত করিতে আপত্তি কেন ইহা বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। তাদের খাটিয়ে তাঁহাদিগের গৈরিক গৃহবাসীর কার্য্যের জন্য সময় ও সামর্থ্য বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজন। সকাল হইতে পর্য্যন্ত ক্রমাগত ১০ ঘণ্টা খাদে পরিশ্রম করিয়া হতভাগিনীগণ মাতার গর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সন্তান পালন করিতেও অবসর পায় না। সহস্র দুঃখ কষ্টের মধ্যেও পুত্র মুখচুম্বন করিয়া যে অপার্থিব শান্তি লাভ করা যায়, আমাদের উদাসীনতার দোষে আজ তাঁহারা সে সুখ-ভোগেও বঞ্চিতা। আর সেই দরিদ্র অনাথ শিশুগণ মাতার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিতে না পারিয়া অরক্ষিত অবস্থায় নানা ব্যাধি বিষে পতিত হয় এবং বিবিধ রোগে ভুগিয়া অল্পে ও বিনা চিকিৎসায় অকালে ইহলীলা সংবরণ করে। হতভাগ্য ও অভিশপ্ত রমণীর বক্ষ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়া চির শান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়। এই যে শিশুমৃত্যুর বর্দ্ধিত হার আজীর জন বৃদ্ধির পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে, আমরা কি তাহার কোন উপায় করিব না? ইহা ছাড়া নারীজাতীর পারীবারিক গঠন ও অস্থিরতা। এই জীবনীশক্তি নাশক বিপদসঙ্কুল বর্ষের যোগ্য কোনমতেই হইতে পারে না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত হইয়া যায় তখন ধনী সম্প্রদায় বহুই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল জন মতের বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বের দাবীর নিকটে তাঁহাদের স্বার্থ মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতীয় মহাজন কি এতেবারেই প্রাণ হীনা? তাঁহারা কি এই অমানুষিক অত্যাচার নিবারণ কল্পে সাহায্য করিবেন না। এ যাবৎ যথেষ্ট লাভ তো হইয়াছে। এক্ষণে দেশের ও নিঃসহায় নারীজাতীর মঙ্গল হেতু তাঁহাদের কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন শোভন হইবে না। মজুরী বেশী দিয়া পুরুষ শ্রমজীবি নিযুক্ত করুন এবং তাদের মর্য্যাদা, মাতৃজাতীর সম্মান ও জন-পুষ্টির আয়োজন প্রভৃতি মহৎ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া প্রভূত বিত্তের সদ্ব্যয় করুন। তাহা যদি না করেন তবে পতন—অনিবার্য্য। বিশেষ আনন্দের বিষয় কারবীরু ধনকুবের টাটা কোম্পানী দেশবাসীর দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং ভারতবাসীর কলঙ্ক কালীমা মোচন উদ্দেশ্যে তাঁহাদের এক কয়লা খাদে নারী নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে জাতী বিদ্বেষের কথা নাই, রাজনৈতিক দলাদলির নাম গন্ধ নাই। চাই শুধু সহানুভূতি, প্রেম আর সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্ব।

সাধারণতঃ নারীদিগকে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা ভূপৃষ্ঠে ও সপ্তাহে ৩৩ ঘণ্টা ভূগর্ভে পরিশ্রম করিতে হয়। অনেক স্থলে হয় তো কিছু বিশ্রাম পাইবার আশায়ে তাঁহারা ক্রমাগত কয়েকদিন বেশী ঘণ্টা করিয়া ভূগর্ভে পরিশ্রম করিয়া সপ্তাহের বাকী ৫ দিনে করেন কিন্তু ইহাতে অতি মাত্রায় পরিশ্রম হেতু স্বাস্থ্যহানী ঘটে। আইনে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই যাহাতে ইহা নিবারিত হয় কেননা কর্ত্তারা সাপ্তাহিক হিসাবে করিয়া ঘণ্টা মিটাইয়াই নিশ্চিন্ত। ফলে পরিশ্রম করিয়া একটু আরাম পাইবার মানসে শ্রমজীবিগণ মদ্যপানে আসক্ত হইয়া দুর্নীতি পরায়ণ হয় এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে তাহাদের এই দুষ্কার্য্যের ফল হইতে নারী চরিত্রের ও অনেকস্থলে অধোগতি হয়। এদিকে কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়াই সেই পরিশ্রান্ত দেহে সন্তানগণের শুশ্রূষা, স্বামীর পরিচর্য্যা ও অন্যান্য সংসারের কাজ কর্ম্মে আবার নিয়োগ করিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে শ্রমজীবিগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন মদ্যপায়ী, সুতরাং মাতাদের নির্য্যাতন ভোগও আছে। বলা প্রয়োজন যে আমি বেন্থাম কারোপযোগী সংস্কারের পক্ষপাতী। ইহাও স্বীকার করি যে আমাদের দেশের নেতাগণ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে অনেকদিন হইতেই মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে এদেশে আজ বহু বিদুষী মহিলা পুরুষের সমকক্ষরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে প্রবেশ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে সহায়তা করিতেছেন। নারী জাতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যে আত্মকর্তৃত্ব বা জাতীয় উন্নতিলাভ অসম্ভব তাহা আজ দেশের সকল সম্প্রদায় অল্প বিস্তর বুঝিয়াছেন। তাই জাতীয় মহা সমিতিতে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার একণে স্বীকৃত হইতেছে। এই নবজাগরণের দিনে, গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশকালে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশেরও অধিক ভারতীয় রমণীগণকে শুধু হিসাবের উপকরণ বা 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' বলিয়া

[ভাবিলে আর চলিবে না। এই অজহানীর বিষয়ও কম আজ ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতীসমূহের সংঘর্ষে আসিয়া বুঝিতে পারিতেছে। সামাজিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব বা বর্তমান স্বরাজ আন্দোলন প্রভৃতি অতি জটিল সমস্যা সমূহ ভারতের নরনারীর চিত্তে এক অননুভূত নব ভাবের সঞ্চার করিয়াছে। যাহারা এতদিন ঘৃণিত, পদানত, উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে, অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরিয়া রহিয়াছে, যাহাদিগকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের দল বা আভিজাত্য গর্ব্বী অনুন্নমনী উচ্চবর্ণ শ্রেণী এতদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই জনসাধারণ আজ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে উদ্বুদ্ধ হইয়া মাতৃঃ মন্ত্রে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া কীর্ত্তনচ্ছলে বিশ্বের দরবারে হানা দিতেছে। সংকীর্ণ চেতা স্বার্থান্ধ ধনী সম্প্রদায় বা অন্তঃসারশূন্য ক্ষমতা প্রিয় মতলববাজ শ্রেণী ইচ্ছা করিলে এই বিরাট আয়োজনে সানন্দে যোগদান করিয়া, জাতীয় মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন অথবা মূর্খের ন্যায় স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখিতে যাইয়া বিরুদ্ধাচারণের ফলে নিজ নিজ সমাধির ব্যবস্থা করিবেন। এই স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। প্রমাণস্বরূপ বলিয়া, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা দেখান যাইতে পারে। যদি সেই সমস্ত দেশে গণতন্ত্র সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশে তাহা অবশ্যই সম্ভব বিশেষ যখন এই দেশে একদিন স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত ছিল। তাহাতে যতই আপত্তি তোল না কেন, বলশেভিজম্, কমিউনিজম্, সোসিওলিজম্ বা সিনডিক্যালিজম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মতের যে দোহাই দেওয়া হউক না কেন এবং যত বিভীষিকাই দেখান হউক না কেন কালস্রোতের গতিরোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই এবং যিনি বিরুদ্ধাচারণ করিবেন তিনি শুধু দেশের নহে সমগ্র মানব জাতীর শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যেন আমার জাতীয় বৈশিষ্ট্য না হারাই। ভাবের আতিশয্যে বাহ্যিকতার প্রাচুর্য্যে এবং অপরিণামদর্শিতা হেতু আমার যেন আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য রীতিনীতি বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া শুধু আমাদের মনে আনন্দ পাই।

এই কথা, ছবি আঁকিয়া বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। অবশ্য যেরূপ অবস্থা তাহাতে দেখিবার কিছুই নাই। চাই শুধু অনুভূতি। নারীগণ সারাদিনের পরিশ্রমান্তে গুরুভার গৃহে ফিরিয়া কোথায় প্রস্তুত করা অন্ন গ্রহণ করিবেন তাহা না হইয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুগণের আর্ত্তনাদে ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ আপনি আল্লাহকে বিধাতা দিয়া তাঁহারই অচল দেহখানাকে রোদ্র করিয়া গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করেন। তার পরে এই দুঃখের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যখন আবার সন্তানের জননী হইতে বসেন তখনকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। পূর্ণ গর্ভাবস্থায়ও পরিশ্রমের বিরাম নাই। কাজে না লাগলে অন্ন জুটিবে না। নিটুর মানব প্রসবের পূর্ব্বে অন্ততঃ ২ মাস ও পরে ৩ মাস এই মাসের মজুরী দিবে না। কাজেই উপায় নাই। ফলে অনেক সময়ে অতিরিক্ত গর্ভিনী ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্য দেশে ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে শ্রমিক সঙ্ঘ, শ্রমজীবি সমবায় প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে। তাহারা কি এই গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন? বরিশাল শ্রমিক সম্মিলনীতে (Labour Congress) নারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। আজ এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকিলে চলিবে না। জাতীয় মহাসমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে আন্দোলন করুন। কোমল হৃদয়া রমণীগণ তাঁহাদের ভগিনীগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে উত্তেজিত করুন। সংবাদ পত্র সেবকগণ প্রতিদিন নানা কথায় ও ভঙ্গীতে তীব্র লেখনী দ্বারায় আন্দোলন সজাগ রাখুন। যেন এই পাশ্চাত্য জাতীর শরণাপন্ন না হইতে হয় অথবা শ্রমজীবি সঙ্ঘ মিঃ বেনসপুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে না হয়। যাঁহারা নারীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া দয়া গলায় সর্ব্বাগ্রে লইয়া ব্যস্ত আছেন এবং অন্তঃপুরে চারিদীগকে বিনা প্রয়োজনে ঘোমটা খুলাইয়া সমরে বিবিসাজে বাহির করিতে শক্তিক্ষয় করিতেছেন তাঁহারা দয়া করিয়া একবার এই দিকে দৃকপাত করুন। জানি না কতজন বিধবা এই সংস্কারকগণের নিকট দুঃখ পূর্ণ আবেদন পেশ করিয়াছেন কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে কয়জন স্বামীর নারী শ্রমজীবিগণ তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা বাস্তবিক নারী জাতীর দুঃখ দূর করিতে চান এই তাঁহাদের একটী উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র।

আতর

[শ্রীসরসীবালা বসু]

দুই ভাই, রামচাঁদ বড়। ফুলচাঁদ ছোট যখন ঢাক ঢোল বাজাইয়া, পাল্কী চড়িয়া বউ লইয়া ঘরে আসিল, বড় বউ সুন্দরী, বরকনে বরণ হইয়া গেলে, দেবরকে একটু আড়ালে পাইবা মাত্র নাক চোখ ঘুরাইয়া কহিল "এইবার কালবরণে মন ভুলবে তো?"

ফুলচাঁদ একটু হাসিয়া কহিল, তোমার গায়ের বাতাস লেগে অতো টা কাল থাকবে না বড় বউ!"

সুন্দরীর তার সদ্য বিবাহিতের সেই আনন্দের হাসি যেন বিদ্যুটির আঘাতের ন্যায় সপাৎ করিয়া গিয়া লাগিল, সে রাগে ও ক্ষোভে ঠোঁট ঠোঁট চাপিয়া রাখিল, জবাব দিল না।

ফুলচাঁদের বৃদ্ধা মা চন্দনার অনেক দিনের সাধপূর্ণ হইয়াছে, বড় ছেলের বিবাহ দিয়া সে আজ তিনচার বৎসর হইল, ঘরে বউ আনিয়াছে, তারপর বুড়ার মৃত্যু হয়, তাহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার কিছু ঋণ করিয়া কাজকর্ম সেব করে। সেই হইতে, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছুতেই আর এ বার বৎসর মধ্যে সে টাকার সন্ধান করিয়া ফুলচাঁদের আর বিবাহ দিয়া উঠিতে পারে নাই, অথচ সেই-ই বাড়ীর মধ্যে বেশী উপার্জ্জন করে, বড় গরুর গাড়ী বহিয়া রোজ ছয় আনা আটখানা আনে, চার বিঘা ধানজমি আছে আবাদ করিয়া কিছু ধান হয়, ফুলচাঁদ ছুতারের কাজ করিয়া রোজ দশ বার আনা পায় কিন্তু রাজা মহাজন শোধ করিয়া সে সব কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না, অতি কষ্টে দু-চার আনা করিয়া যাহা সে জমাইয়াছিল বড় বউকে চারখানা রূপার গহনা দিয়াছে, পরের মেয়েকে নেহাৎ লেড়া বোচা করিয়া রাখিলে লোক মানিবে কেন? বিশেষ যখন সে স্বামীর ঘর সংসারকে এখনও নিজের বলিয়া চিনিতে শেখে নাই, তার উপর পাড়ার বউ ঝির মধ্যে সেই পরম সুন্দরী, তাহ বাবা মা সাধ করিয়া এমন তার নাম ও রাখিয়াছিল সুন্দরী, এহেন সুন্দর বধূকে অলঙ্কার দিয়া না সাজাইলে পাড়ার লোকও যে খোঁটা দিতে ছাড়ে না, তবে সত্য কথা বলিতে গেলে চন্দনা বউ লইয়া সুখী হইতে পারে নাই, যেহেতু সুন্দরীকে গোবর ঘাঁটিয়া খুঁটে দিয়া, ধান সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিয়া, আগুনতাতে বসিয়া মুড়ি ভাজিতে হইত, ভাত রাঁধিতে, ইহাতে নিজের সৌন্দর্য্য প্রভার অপমান করিয়া তাহার ফলে অসদ্ভাব অসন্তোষের সৃষ্টি অনিবার্য্য। চন্দনা ইতর ঘরের স্ত্রীলোক হইলেও তাহার কিন্তু ধৈর্য্যের অভাব ছিল না, বধূর নামে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মক্লান্ত ছেলেদের সুখ শান্তি ভঙ্গ করিতে সে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল, সুতরাং বৃদ্ধা বয়সে ঘরে বউ আনিয়াও দিনরাত্রি অকাতরে পরিশ্রম করার জন্য পাড়া-প্রতিবাসীনীর কাছে তাহাকে অনেক মিথ্যা কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হইত। বধূর সুনাম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে চন্দনার সে দিকে খুব লক্ষ্য ছিল কিন্তু পাড়ার বুড়ীর দলকে কথার ফাঁকি দিয়া ভুলাইলেও দুঁড়ীর দল চন্দনার সে সব কথা বিশ্বাস করিত না, সেজন্য তাহারা সুন্দরীকে "সোহাগী, সোহাগী, ঠমকী, কাপড়াভিনী, মনভোলানী" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছিল, তবে সৌভাগ্যবশতঃ চন্দনার অন্তরাল ভেদ করিয়া সে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণগুলি সুন্দরীর দেহকে লক্ষ্য করিতে পারিত না, এই যা রক্ষা।

নানা রসের আধার
সাহিত্যের মণি-মুক্তা
সম
সাথীর গল্প
উনবিংশ সংখ্যা—
বাসন্তী।

"হ্যাঁরে ফুলচাঁদ আতরকে তুই মারলি ক্যানে রে, পরের ঝিটি সারাটা দিন গোহালে গোবর করছে, বাইকে জল আনতে যাচ্ছে, ধান সিজেনো, কুইনো বাইনা রান্না-বান্না সবই করতে লেগেছে, তাকে তুই মারতে গেলি মিনি অপরাধে কিসের লেগে?" ফুলচাঁদ হাতের তেলোয় এক খাবল তেল লইয়া দুই হাতে সেই তেল ক্ষিপ্রতার সহিত মাথায় ও গায়ে হাতে চটচট শব্দের সহিত মাখিয়া লইতে লইতে কহিল, "বেশ করেছি মেরেছি, তুই বেটি আবার বিয়েই ত মাথা খেলি। বিয়ে করেছি মারব না ত কি, মাথায় করে রাতদিন নাচব না কি?

চন্দনা চীৎকার করিয়া কহিল, "বহর কিনতে না কিনতে না কচি বউ ঘর করতে নিয়ে এলাম তাকে তুই মারবি কিসের লেগে ভ্যাবুরা? ওর ভাই বাপ তো পাঠাতেই চায় না, ওকি পেটের ভাতের লেগেই আসছে যে তুই বলছিস্? ঐ একরত্তি মেয়ের কাজ কাম দেখে পাড়ার লোক পর্য্যন্ত কত পেশংসা করছে, তুই-ই শুধু ওকে দেখতে নারিস্।"

ফুলচাঁদ গামছাখানা টানিয়া লইয়া পুকুরের পথে যাইতে যাইতে কহিল, "তাই সোহাগীর ভাইদের যদি বুনের ওপোর অতোই টান্, তবে ঘরে রাখেনি কেন? বুনকে সোয়ামীর ঘরকে না পাঠালেই পারতো? ষাট্‌কে জল আন্‌তে যায়, ঘোমটা না কেড়ে পথ হাটে কেন? পুরুষ ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে ওর রাকাড়বারই বা দরকার কি? বউ মানুষের লজ্জা সরম নাই?…

চন্দনা বাহুর খুঁটিতে বাঁধিতে বাঁধিতে আপনার মনে বকিতে লাগিল, গাঁয়েরই ঝিটি, গাঁয়েরই বউ, কত বা ঘোমটা টান্‌বে, আর কার সঙ্গেই বা কথা না কইবে? এগরন্তি মেয়ে, সবাই ওর দাদা, জেঠা, খুড়ো। পাড়ার যত লাগানী ভাঙানীর বাস, তারাই সব লাগিয়ে ভাঙিয়ে বউটোকে মার খাওয়াচ্ছে, তা লাগান ভাঙান করে কার কত ধন হবে, হোক্ না, আমি তো কার কথায় কোনো দিন কাণ দিইনে বাপু।…

নিস্তারিণী দুয়ার দিয়া, কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল, মৃদু পদশব্দে যখনি যাহা কিছু ঘটে, তখনি টেলিফোনের তারের সংবাদের মত সে খবর ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না, সুতরাং সে টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "পাড়ার লাগানী ভাঙানীদের খোঁজে দরকার কি পিসী, নিজের ঘরেই কেউ আছে কি, না, একবারে চোখ মেলে দেখ না ক্যানে?

বড় বউ অদূরে বসিয়া, আঙিনায় ধান্ মেলিয়া দিতেছিল, তার মুখ যেন পলকে রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কথা কহিল না।

আশুতোষের বাবা মরিবার সময় আতরকে কাছে ডাকিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "তোর ভাবনাটা আর এখানে ফুরে যেতে পারলাম না মা, সাধে করে নিয়েই চল্লাম, তা ফুলচাঁদ যদি তোকে নিয়ে যেতে চায়, যাস্, বিয়ে হ'য়ে পুরুষের ভাত গুহলে ছাড়িস্ না, বস্তু বার ধোর করছিল বলে তোকে নিয়ে এসে ছ বছর ঘরে রাখলাম, যদি বুদ্ধি হয়ে থাকে তাহ'লে চাই কি, আর যার ধোর না করতেও পারে, সাধুচরণ, মুকুন্দ, বুলটিকে তোরা দেখিস্ বাপ, নেহাৎ না-নিয়ে যায়—পায়ে ঠেলিস্ না।"

আশুতোষের ছোটবেলা হইতে মা ছিল না, বুড়ী ঠাকুরমা দুই পুত্র ও এই ছোট মেয়েটি তাহারা মেয়েটিকে বড় যত্নে মানুষ করিয়াছিল, চোখে চোখেই রাখিবে বলিয়া, ভাল সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, পাড়ার ফুলচাঁদের সহিতই বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু বুড়ার অদৃষ্টে, কন্যার সুখ দেখা ঘটিয়া উঠিল না। পিতাকে হারাইয়া, আতর যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিল, যার কথা তত মনে ছিল না, কিন্তু ঠাকুরমা একাধারে তাহার পিতামাতা দুই-ই ছিল সুতরাং এহেন স্নেহময় পিতৃশোক সামলাইতে তাহার কিছু বেশী সময়ই লাগিল। ছোট ভাই মুকুন্দদাসের স্ত্রীর চক্ষে এটা কিছু বাড়াবাড়ি ঠেকিল, সুতরাং সে বলিতে লাগিল, "বাপ মা কিছু ছেলেকাল কাল বেঁচে থাকে না, তাবলে পতর লুটিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? সেটি যখন আছে তখন ঘর সংসারের কাজ কর্ম সবই তো আছে, যে গেছে সেই-ই চলে গেছে।

বড় বা, ছোটর এ কথা সহ্য করিতে পারিল না, সে কহিল, "দুইকী, তুই ছোটবেলায় বাপমায়ের পাট খুচিয়ে বসে আছিস্ বলেই ও শোকের মর্ম বুঝবি ক্যানে?" আর যায় কোথা? দুইকী তখনই রাগে গর গর করিতে করিতে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিল, সাধুর স্ত্রী বড় আর উচ্চ বাচ্য করিল না, আতর কিন্তু ভ্রাতৃবধূর কথায় কাঁদ ভুলিয়া আশু সচেতন হইল। সত্যই সে পিতার শোকে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে, দুই বেলা সাধুর স্ত্রীর তাকাতাকিতে নিয়মিত আহারে বসিলেও, সংসারের কাজকর্ম কিছুই সে আগেকার মত আর নিয়মিত ভাবে করে না, সাধুর স্ত্রী ছোট ছেলে কোলে লইয়া ঘর-কন্নার কাজ বড় দেখিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং মুকুন্দর স্ত্রীকেই খাটুনির হইতে মানুষের ঝঞ্ঝাট সবই বেশীর ভাগ পোহাইতে হয়, আতর সর্বাংশে তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিত, কাজেকাজেই সে সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া তার রাগটা কিছু বেশী রকমই হইবার কথা। যাহা হউক, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া আতর আবার গৃহস্থালীর কাজে মন দিল। এদিকে ফুলচাঁদ তাহাকে আর লইতে আসিল না, পৌরুষের অভিমান বজায় রাখিয়া আবার বিবাহ করিল। কিন্তু হায় রে কপাল, ফুলচাঁদের ঘরে আসিয়া সেও বেহায়া পনা করিতে লাগিল, পথে ঘাটে যাবার বেলাটা তার অকারণেই খসিয়া পড়ে, ফুলচাঁদ তো যখন তখন তাহাকে আড়চোখে অপর পুরুষের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখে, হাজার নিষেধ দিলেও কাণে লয় না, বরং মুখোমুখী

চইপই জবাব দিয়া বলে, আতর বউ যে এর চাইতে ঢের ভাল ছিল।

সেদিন আতর যখন দোকান হইতে তেল ছন ইত্যাদি কিনিয়া ঘরে আসিতেছে পথে চম্পনার সহিত সাক্ষাৎ—চম্পনা বধূকে পথে ঘাটে দেখিলেই গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে কুশল প্রশ্ন করে, এমন লক্ষী বউ লইয়া ঘর করিতে পার না বলিয়া আক্ষেপ জানায়, আজ আবার একটু বিশেষ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, "এদিন যদি সবে থাকলি, আরও দুদিন থাক্ না, দাদাদের কথায় যেন স্যাঙাট্যাগা করে বসিস্ না, ফুলচাঁদের আজকাল মন ফিরেছে, বলে, "আতর বউকে নিয়ে আসব" আমি বলেছি, "তুই যাবযোর করিস্, তার ভাইয়া পাঠাবে ক্যানে?" লাজে তখন কথা কইতে পারে না, আরও দুদিন দেখি, তবে তোকে নিয়ে যাব না, তুই আমার ঘরের লক্ষী। বিয়ে করেছে তা কি হয়েছে, তুই যে বড়, সেই বড়ই আছিস্"।

আতর মায়ের স্নেহ পায় নাই, শাশুড়ীর প্রাণ ভরা স্নেহ হয়ে সে বাস্তবিকই তাহাকে মায়ের মতন ভালবাসিয়াছিল, পিতার অছিয় ইচ্ছা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল, "নিতে এলে তো বেঁচে যাই, যাবার মরণ কালের কথা যে আমায় রাখতেই হবে, তবে বেচে তো যেতে পারি না।"

খুব সম্ভব, চম্পনা গিয়া পুত্রের কাছে, পুত্রবধূর সহিত সাক্ষাতের কথা নিজের মনের মতন ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিল, যেহেতু পরদিন হইতে, পথে ঘাটে যখন তখন ফুলচাঁদের সহিত আতরের সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল, আতর মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া পাশ কাটাইয়া যায়, ফুলচাঁদ তখন মনে মনে গালি পাড়ে। সেদিন আতর গরুবাছুর মাঠে বাস কাটিতে চলিয়াছে, ফুলচাঁদ পাছু লইল। আতর দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, অগত্যা ফুলচাঁদ হাঁকিল, কাঁদিল, হতভাগী আতর তবু একবারও পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল না, তখন সে সহজ ভাবে সরাসর আতরের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "আমায় কেয়ে (কাস্তে) দে, আমি ঘাস কেটে দিই।"

তুই আতর চীৎকার করিয়া জানিল, "ওলো ছোট পিসী, দেখ ক্যানে কে এক বিদ্যে পথের সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে।"

ফুলচাঁদ সত্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ও আতর বউ, চেঁচাস নে, চেঁচাস নে, আমি যে ফুলচাঁদ, ভাল করে চোখ চেয়ে ভাখ্ না কানি, চিনতে পারিস্ নে?"

আবার একদিন আতর ধান ক্ষেতে কাঁকড়া ধরিতে গিয়াছে, কোথা হইতে ফুলচাঁদ আসিয়া হাজির! পাশের পাড়ার নিস্তারিণী কাঁকড়া ধরিতেছে, ধান গাছের আড়ালে তাহা আর নজরে পড়ে নাই, সে আতরের কাছে গিয়া মিনতির স্বরে বলিতে লাগিল, "আতর বউ, তোকে আবার আমি নিয়ে যাব, লক্ষিটি রাগ করিস্ না, এবারে আর তোকে যাবযোর করব না, আবার বিয়ে করেছি তা কি হয়েছে? তুই বড়, সে ছোট, তুই বড়র মত থাকবি, সে তোর হাত তোলা হয়ে থাকবে" আতর কহিল, "এসব আমায় বলে কি হবে, আমার মাথার ওপোর যারা আছে তাদের গিয়ে বলতে পার না? মাঠে মাঠে বেহায়ার মত বউ ঝির পাছে ঘুরতে তোমার সরম লাগে না?" নিস্তারিণী সবই দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল, সে এইবার গলা ঝাড়িয়া হাঁকিল, "বলি ও—আতর, মাঠে মাঠে জোয়ান পুরুষের সঙ্গে, লোকর মেয়েরা কথা কিসের ন্যা? তোর ভাইয়াই বা শুনলে বলবে কি? আর ফুলচাঁদ যে আবার "আতর বউ" "আতর বউ" করছে, সেই বা শুনে বলবে কি? আর তাকে যদি ঘর না করিস, অপর ঠেঁয়েই বা তোর স্যাঙা সোমোত্ত হবে ক্যানে?"

ফুলচাঁদ তাড়াতাড়ি আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিল, "নিস্তার দিদি, পুরুষ বাটোছেলে আর কেউ নয় গো, আমি! এদিকে যাচ্ছিলাম, আতর বউকে দেখ্তে পেয়ে বলতে এলাম, "তুই আর কদিন ভাইয়ের ভাত খাবি? পাড়ার লোক আমায় ঘুষছে, গাঁয়ের লোক ছি, ছি করছে, তুই আমার ঘরকে চল্, আবার বিয়ে করেছি তা কি হয়েছে, তুই বড়, বড়র মতন থাকবি।"

নিস্তারিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তুইও বুঝি ঘরের লেগে মাঠে কাঁকড়া ধরতে আস্ছিলি রে? তা আতর বউকে যে নে যেতে চাস্ তা বড় বউকে শুধিয়ে ছিলি কি? সেই তো ঘরের গিন্নী, তার হুকুম না নিয়েই—" বাকী কথা শুনিবার জন্য ফুলচাঁদ আর দাঁড়াইয়া রহিল না, কানের আইল বাহিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

চয়না আওরের দাদাদের বলিয়া কহিয়া, আবার বউ লইয়া আসিল, আওর আসিয়াই সতীনের সহিত বেশ ভাব করিয়া লইল! সে ছেলে মানুষ, তার দোষ কি? পরের মেয়ে কিছু আপনি আসিয়া ঘাড়ে চাপে নাই একজনা মাথায় করিয়া আনিয়াছে তাই না আসিয়াছে, সুতরাং সতীনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব আসিল না।

সুন্দরী আশা করিয়াছিল দুই সতীনে গোড়া হইতেই আসা যাওয়া বাদি সেটা যথারীতি হাতাহাতি করিতেও ছাড়িবে না, সে ঘাকে দাঁড়াইয়া মজা দেখিবে যাহা কিন্তু সে রকম কোন কিছুর লক্ষণ না দেখিয়া হতাশ হইয়া সে তখন দেওরকে সতর্ক করিয়া দিল, "দু ছুটো দুঁড়ি একসঙ্গে মুখোমুখী হয়ে থাকে; মন্দ পরামর্শ করতে দেরী লাগ্‌বে না, একটু শাসন রেখো।"

নূতন বউ সুলীকে সুন্দরী চক্ষে দেখিতে পারিত না, সে সুন্দরীকে বড় বলিয়া মোটেই গ্রাহ্য করিত না, তাহাকে দু'কথা বলিলে সে তখন পালটা জবাব শুনাইয়া দিত যেন সংসারে নিজ কাজ সে যখন করিয়া করিত। আওরের মতন সারাদিন সবকাজ একহাতে সামলাইয়া লইত না। সুলচাঁদ বাহিরে গেলে সে তৎক্ষণাৎ পাড়া পরশীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, আবার চয়না গিয়া তাহাকে সাধিয়া তবে ঘরে আনিত, কখনও বা আলী গ্রামে যায় বাড়ীও পলাইয়া যাইত, সুতরাং সুলচাঁদ ও তাহাকে খাঁটিতে পারিত না। এখন সুন্দরীর বিশেষ করিয়া ভয় হইল, আওরের ভাল মানুষী মেজাজকে এ বউটাকে না বিগড়াইয়া তায়।

এ দিকে সুলী ও আওরকে চুপি চুপি বলিল, "দিদি-লো, ঐ বড়কীকে জব্দ করিতেই হবে ঐ বিষ ঢোঁড়ীর নজরে বিষ আছে, ওইবে আমাদের পুড়িয়ে মারবে।

আওর কহিল, "ওকে জব্দ করা সহজ নয় বুন, দিদের যে ওর হাত ধরা, ওকে যে ভয় করে বশ করেছে তা জানিস্ কি?

দু'চার দিন পরেই সুলচাঁদ ছুতো নাতি করিয়া সুলীকে প্রহার আরম্ভ করিল। সেদিন রামচাঁদ খাইয়া কাজে গিয়াছে, সুলচাঁদ খাইতে বসিয়া তরকারী মুখে দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, নুনে পুড়ে গেছে মুখে তার ভাত দাদ্যি? দিদের সময় একি বজ্জাতি! সুলী রেখেছে বুঝি? বলিয়া সে এঁটো হাতে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে যেখানে সুলী নিজের জন্য তরকারী বাড়িতেছিল, তাহার পিঠে এক লাথি বসাইয়া দিল, আওর পুটিয়া আসিয়া সুলীকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তরকারীতে নুন কিসের দেখে হবে, এই তো বড় জনা খেয়ে উঠে গেল, কিছু বল্‌লে না, নুনে পুড়ে গেলে তারও তো মুখে লাগ্‌ত, এ তবে নাদ করে কেউ তরকারীতে নুন মিশিয়ে দিয়েছে।"

সুন্দরী ক্রোধ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, "কার এত বাড় সাধতে গয়ল যে তুমি, তোরা দু'সতীনে রাতদিন কিল্‌ কাল করছিস, তোদের মজা সারাদোষ তোরাই জান্‌ছিস্। নুন দিয়ে তুই তুক করছিস কি না করছিস, তার কি আমি? সুলচাঁদের মনে সন্দেহের আগুন জ্বলা করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে উত্তম মধ্যম আওরকেও তার দু চার ঘা বসাইয়া দিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। চয়না বাড়ী ছিল না, দূরে এক গ্রামে দু-চারদিনের জন্য কুটুমবাড়ীর নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল।

আওর কিছুক্ষণ, কাঁদাকাটা করিয়া সামলাইয়া লইয়া সুলীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল না। সে আজ ভারী রাগিয়াছিল, সে কহিল, তাত না, ছোটে দুই এক ঘরে পড়ে থাক্ দিদি, আমি গড় করি, এমন পুরুষের ভাতের পরে, যার বেচে যান জেনে খায়, তার আমার গড়র বেঁচে থাক্ গোয়ারীতে, মায়া নেই, এমন সাধি আমাকে যে কাঁকাল ভেঙ্গে যাবার গোয়াড়, তোর গোয়ারী তুই নিয়ে থাক্ দিদি, আমি আজই মা-ঘরে পইটান্ দিচ্ছি।

আওর ভয় পাইয়া সুলীকে চোখে চোখে রাখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সন্ধ্যার পর কোন্ ফাঁকে সে তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে ফাঁকী দিয়া সত্যই সরিয়া পড়িল। সুন্দরী ইহাতে ভারী খুসী হইল। একটা কাঁটা তো ঘুচিল, সুলচাঁদ বাড়ী আসিয়া সুলীর সোহাগ সংবাদ শুনিয়া রাগিয়া কহিল, যে ভুলোয় গেছে সে ভুলোয় থাক্ এ মুখে এলে খেঁটিয়ে তাড়াব।

বিমাতাদিনীর ছোট বোন জামিনী বেড়াইতে আসিয়াছিল, দিদির মতন তার ও মুখের বড় আগল ছাড়া ছিল না সে কহিল, দুঁড়ী কিন্তু বেচে ঘুমিয়ে দিনে খেয়ে বাঁচবে। সে কহিল পরের ঘরে গতর খাটিয়া খাবে সে ও ভাল, কিন্তু এমন ভাত আর এ ঘর সে আর

বাক্যবেচনা। মুলচাঁদ শুনিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল, কিন্তু ভাবিনীর সহিত কথায় যে সে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না তাহা সে ভাল রকমই জানিত, সুতরাং একথা তুলা আর কানে তুলিতে চাহিল না।

আতর কোন কথা গায়ে মাখে না, সে দিবারাত্র ঘরের কাজকর্ম সারে, গরু বাছুর, গুলির সেবা করে, অবসর সময়ে, পাড়ার লোক ডাকিয়া তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়।

সে বেড়ানর কথা শুনিয়া দিনে দিনে স্ফীত হইয়া মুলচাঁদের কাণে উঠিতে লাগিল, সে তখন আবার তাহার পুরাতন শাসন প্রণালী ঠিক করিয়া দিল, আতর কিন্তু পিতার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা স্মরণ করিয়া, মুখ বুজে সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চয় করিত, কিন্তু মন না ভাঙ্গিলেও অভাগিনী উর্বরার, কীট-প্রায় দেহটী আর বুঝি এ পীড়ন সহ্য করিতে পারে না, এই ভাব মুখে খবর শুনিয়া সাধুচরণ একদিন আতরকে দেখিতে আসিল। আতরের চেহারা দেখিয়াই সে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "এত মাতি করেছে তবু তুই মুখ বুজে, তার বাড়ী কামড়ে পড়ে আছিস্? আমার ঘরে কি ভাত নেই না-কি? এখনই তুই চল্ আমার সাথে," সে এসে কি করে তা দেখি, মেয়ে পার ঘরে আন্‌তে দিয়েছিল বলেই মা পাঠিয়েছিলাম, এখানে আর পাঠাব না, ঐ তো আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে আন্‌লে, কদিন ভাত খেলে? এখনি তো আর একজনার গলায় গাঁদা করে বেশ সুখে আছে, সেদিন গিন্নীর বাড়ী গিয়ে দেখে এলাম। আমুক আজ মুলচাঁদ, মেয়ে মেরেটার হাড়মাস কালী করে ফেলেছে! আজ এর একটা বিহিত ব্যবস্থা না করে আর উঠ্‌ছি না—"

মুলচাঁদ বোনের উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব চালাইলেও, তার ভাইয়ের সহিত মুখোমুখী হইতে মোটেই রাজী ছিল না, সুতরাং সাধুচরণের আবির্ভাব শুনিয়া, সে আর কথা মাত্র হইতে সন্ধ্যার সময়ও বাড়ী ফিরিল না, রামচাঁদ গাড়ী লইয়া ফিরিতেছিল, তাহাকে বলিয়া দিল, সে আজ সাতগাঁয়ে বন্ধুবাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছে, কাল সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবে, রামচাঁদ ছোকরা লোক ভালমানুষ, যাচেক না, পাঁচেক না, একা একা বাড়ী ফিরিয়া যাবে হইতে উত্তর সাধুচরণের কতকগুলা চোখা চোখা ধারাবাহী মীরবে তাহাকেই পা পাতিয়া লইতে হইল। কথাগুলার উত্তরের সাড়া কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় পড়িল গিয়াই আতরের পিঠের উপর। পিতাপিতীর বড় অনুরোধ বোধ হইল, সে গিয়া পরদিন সকালেই সাধুচরণকে সব কথা বলিয়া, বলিতে লাগিল, "তোমরা দুই ভাই-কেমন ধরণ? মেয়াটাকে নেহাৎ খুন করতেই কি দিয়েছিল্? ঘরে এনে ভাত দিতে না পারিস্, অত চেঁচে তাড়া দিয়ে যে, না হয়, আতরের তো গতর আছে, কাজ ছুয়ারে খেটে খাক্, এতো কিসের কি, যে দিনরাত খাক মুখ গুঁজে কাজ কাম করেও পঁড়ে পঁড়ে তোদের মার খেতে হবে? আমি হলে তো আমন পুরুষের আর মুখও দেখি না"

সাধুচরণ তৎক্ষণাৎ বিনাবাক্যব্যয়ে আতরকে লইয়া ঘরে ফিরিল। ইচ্ছা না থাকিলেও দাদার আহ্বানকে আজ আর আতর উপেক্ষা করিতে পারিল না।

মুকুন্দ দাস ভাত খাইতে বসিয়া হাকিল, "ছোট বউ, আজ কি তোর মাথা খেয়ে ভাত খাব? শুধু পুঁই ডাঁটা আর ছাত রেঁধে রেখেছিস্? আজ কিহেনে হাট গেল, তরকারী বুঝি কিনিস নি?"

ছোট বউ গর্জিয়া উত্তর দিল, "হাটকে কি আমি নিষেধ করি? তা যদি হুকুম দিস্ তো তাই যাব, এদিন বেতে দিস্ নি, বললেই পা বাড়াই না, ঘরের বউ, ঘরের কাজ করি, এনে নিয়ে দিস্ রেঁধে দিই, আমার আবার মুখ বাঁকা দিস্ কিসের লেগে?" মুকুন্দ দাস সভয়ে কহিল, "তোকেই কি আমি হাট যেতে বল্‌ছি? আতর বোধা, সে কেন যায় নি? সে যদি না গিয়েছিল, বিয়েন তোমার দাদাকে কি আমাকে বল্‌লেই হোতো।"

ছোট বউ সম্মুখে আসিয়া হাতের বালা কাটা ঝাঁকনী ঘুরাইয়া কহিল, "তোদের সোহাগী মুনের মনের গতিক আমি ক্যামনে জানি বল্? সোয়ত বোনকে পুরুষের ঘর থেকে এনে সোহাগ করে, ঘরে জমি, ঘরে একটা বুড়ো কুটী কেউ নেই, আগল না থাকলে পাগল হতে কতক্ষণ? দীহ সোয়ত ষাটা ছেলে, দিন পাঁচবার এসে আমাদের বহুকে বলে, পুরুষ মানুষ কেউ থাকে না, মেয়ের মনে তার কিসের ব্যথা? আমি কোনো কিছুতেই কথা কহাই না, আমার ওসব ভালও লাগে না।"

বড় বউ ঘরের মধ্যে ছেলে ঘুম পাড়াইতেছিল, এতক্ষণে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "ছুঁড়ী ছুই বাজা ছোরা মিন্সের কথা কইছিল্ ; না ? ঠাকুরপো উল্টো বুঝবে যে ? আজ ঘরে থাকলেই তো হাই ওঠে, কার কোন্ কাজে লে না করে ? তার আজ গা জ্বর, ঘরে বসেই না ভবে আছে ? বীজ ক'দিন থেকে আস্তে লেগেছে, তা সে-তো সব লোক না, আমার অদ্দেষ্টে সে তো বল্লেই যে আজরের সঙ্গে আমায় ছাড়া দিয়ে যাও, সে তো পারব ভালোই, ঘর দুয়োর খেত খামার গরু সব সেই আছে, মানুষটাও ভালো, এ ঠাকুর জামাইএর মতো কটোমটো না, তা আজর যে ছাড়া করতেই রাজী নয়, ঠাকুর জামাইএর মনকে এখনো ওর মুঠোয় চায়, সে তো, আচি কাল্ বাকি আমার কোন গাঁয়ে বিয়ে কর্‌তে গ্যাছে, লোকের বিচি না গাছের কম— এমন দজ্জিকে ভিন সন্ধো মেয়েও ছোটে গা ?

মুকুন্দ লাল আর কথাটি কহিল না, কাঁচা লঙ্কা ও পেঁয়াজ ছাড়িয়া লইয়া আলের থালা চাটপুট করিয়া উঠিয়া পড়িল। সাধুচরণ বাড়ী নাই, দুয়ের মাঠে চাষ দেখিতে গিয়াছে, সে আসিলে তাহার সহিত আজরের ছাড়া সম্বন্ধে কথা কহিবে স্থির করিয়া রাখিল, ভাইয়ের আচরণে তার চিরকাল যার যে নিকটের নয় আজ সে স্ত্রীর কথার আভাসে আজ তাহারকমই বুঝিয়া লইয়াছে।

সেইদিনই বৃহস্পতি বেলা তিনেকটা মৃদঙ্গ বাজাইয়া, ঢাক ঢোল বাজাইয়া, বরবেশে গাড়ী চড়িয়া কুলটায় গ্রাম হইতে কুলীনবার বিবাহ করিয়া, ফিরিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে "হায় বেলের" দল অবতরণী করিয়া নাচিয়া গাইতেছে—

"ব্যাঙ রইছে ডিঙল পিঙল দিয়ে লো—
সেই ব্যাঙটি রাঁধতে হয় জোড়া বঙ্গন দিয়ে লো,
ঘরণী কি এতোই ঘুম ঘুমাইচে,
হারামণি তারে জাগাই যে লো—
জাগাই যে লো
কুলীতে বর দাঁড়াইচে—"

বাউরী ছেলেদের শ্রীবেলের এই অভ্যর্থনা রীতিমত জেলাবাসীর একটি উপভোগের জিনিষ—অনেকগুলি ছেলে, মেয়ে, বউ ঝিরা ভিড় করিয়া বর দেখিতে ছুটিয়াছে, সাধুচরণের বাড়ীর সম্মুখে বর আসিয়া ইচ্ছা করিয়াই কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী থামাইল, বর বেলেরা তখন মহানন্দে নাচিয়া নাচিয়া আর একটী গান জুড়িয়াছে—

"কুলীতে হেঁচ কী লাগায়,
সোন্‌টে সোন্ জামাইকে আজ গ্রাহণে হাত চাটায়"

সাধু ও মুকুন্দর স্ত্রী—একজন, অন্যের কলসী ভর করিয়া উঠানে নামাইয়া—আর একজন ছেলেদের চাপড়াইয়া ভয় পাড়াইতেছিল, তাহারা হিঁচড়িয়া কোলে লইয়া ঝড়ের এ যেন নৃত্যগীত দেখিতে ও শুনিতে ছুটিল, সাধুচরণ বা মুকুন্দ কেহই তখন বাড়ী ছিল না, থাকিলে 'রায়বেলে'দের নৃত্যগীত বড় নিরাপদ ছিল না, বেচারী আজর অন্যের শরীরে ঘরের মধ্যেই শুইয়াছিল, বাজনার শব্দে তার নাড়ী বড় ছেড়ী ধরিয়া উঠিল, সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতেই লুটাইয়া রহিল।

সুখী দম্পতি

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

(১)

আমি যাই যবে কহিতে প্রিয়ারে কত না প্রেমের কথা,
জানাতে আমার চিত্ত—লালায়িত, ভূষিত হৃদয় বাথা।
ভালবাসা মোর কত যে গভীর, কত যে অসীম-হারা।
"পিতার স্নেহের নিত্য ঝরণা" বলি প্রিয়া হয় কেমে সারা।

(২)

আমি যাই যবে বুঝাতে প্রিয়ারে কলেজের সেরা বুলি,
দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্বগুলি ;
সেক্সপীয়র মিল্টন আদি। প্রিয়া বলে—বাপ্‌রে !
মাথা নীচু করে বলে প্রিয়া মোর "আমি পড়ি ক-খ-গ" ॥

(৩)

নীলান্ হৃদে প্রণয় পত্র আমি যবে লিখি তারে,
তাহার মধুর—কোমল ভাবটী প্রিয়া না ধরিতে পারে ;
ধরা করি যবে দেখেন প্রেয়সী তাঁহার অবয়বনে,
অক্ষরগুলি শ্রীযুত ভাবা সব আমার নয়নে ভালে।

(৪)

আমি কহি যবে "চল যাই আজ বেড়াতে গড়ের মাঠে,
দেখিবে তো চল 'সাহাজান' আজ 'মিনার্ভা' রঙ্গমাটে ;
'হুরেনবাবুর' বক্তৃতা শুনো, চল যাই সেথা প্রিয়ে"
কয়ে প্রিয়া "আজ পারিব না যেতে আমার খুকুর জিরে" ॥

রোকশোধ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

"অনু!"

চমকিতভাবে চক্ষু উন্মীলিত করিতেই সম্মুখে ভূপতিকে দেখিয়া অনুপমা ব্যস্তভাবে চাদরখানা গায়ে টানিয়া দিল। তাহার এই ব্যস্ততা দর্শনে ঈষৎ হাসিয়া ভূপতি বলিল, "আশা ভরসা, সুখ সাধ সব বিসর্জ্জন দিলেও অনু, ছাড়তে পার না তবু এই লজ্জাটুকু।"

অনুপমা মুখটাকে বালিসে গুঁজিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইল। ভূপতি বলিল, "মরণটাকেই যে একমাত্র কাম্য-বস্তু ক'রে এনেছে, তার পক্ষে এতটা নারীসুলভ সঙ্কোচ ভাল দেখায় না।"

অনুপমা কেন একটু শিহরিয়া উঠিল; সে ভূপতির দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত করিল। ভূপতি অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ?"

অনুপমা মুখ না তুলিয়াই যেন নিতান্ত উপেক্ষার সহিত উত্তর দিল, "ভাল আছি।"

"কোন অসুখ নাই কি?"

"না।"

"সত্যই কি নাই?"

ঈষৎ ক্রোধ রুদ্ধস্বরে অনুপমা বলিল, "আপনার কাছে মিথ্যা বলবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই।"

ভূপতি একটু হাসিল; বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয় অনু, প্রয়োজন কিছু না থাকলেও আমার কাছে তুমি এমন একটা সাংঘাতিক রকমের মিথ্যা বলতে দ্বিধা হচ্ছো না।"

তর্জ্জন সহকারে অনুপমা বলিল, "কি মিথ্যে বলেছি আমি?"

"কিছু অসুখ নাই এই কথাটা।"

"কি অসুখ আছে আমার?"

"ঐটুকুই জানি না, তবে অসুখ একটা আছে এটা বেশ জানি।"

অনুপমার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। সে আর কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভূপতি বলিল, "আবার এই ধারণাটা মিথ্যা বলতে চাও কি?"

অনুপমা বলিল, "এই নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না।"

সহাস্যে ভূপতি বলিল, "তর্কে আমারো রুচি নাই। তবে একটা কথা আমি জানতে চাই।"

"কি কথা?"

"তোমার অসুখটা কি?"

"বলেছি তো, আমার অসুখ কিছু নাই।"

"দুঃখের বিষয়, সে কথাটায় আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।"

তীব্রকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসের জন্য আমি দায়ী নই।"

ভূপতি বলিল, "কিন্তু নিজের অবহেলায় নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করায় জন্য নিশ্চয়ই তুমি দায়ী।"

সতীক্ষ্ণ বিরক্তির সহিত অনুপমা বলিল, "আমার স্বাস্থ্য আমি যতটা বুঝি, ততটা বোঝবার সম্ভাবনা আপনার নাই। আর সেজন্য আপনার এতটা চিন্তারও কোন দরকার নাই।"

বলিয়াই সে গায়ের চাদরখানা মাথা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল। ভূপতি নীরবে খাটের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক পরে অনুপমা মুখের চাদরটা একটু সরাইয়া অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলিল, "যদি আমি কোনরূপ কথা ব'লে থাকি, সেজন্য মাপ চাইচি। আমার মনের অবস্থা ঠিক নাই জেনে আমাকে মাফ করবেন।"

ম্লান হাস্য সহকারে ভূপতি বলিল, "দেহের সঙ্গে মনের খানিই সম্বন্ধ। দেহের অবস্থা ভাল না থাকলে মনের অবস্থা যে ভাল থাকে না এটা আমার বেশ জানা আছে। সুতরাং তোমার রূঢ় উক্তির জন্য আমি একটুও দুঃখিত নই।"

বিরক্তিপূর্ণস্বরে অনুপমা বলিল, "আমার সেই অসুখের কথা তুলছেন? আচ্ছা, আমার অসুখের কথা জানবার জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন?"

ভূপতি বলিল, "অসুখটা কি জানতে পারলে তার চিকিৎসা চলতে পারে।"

"কে চিকিৎসা করবে?"

"আমি।"

"ধন্যবাদ! কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি আছে?"

"লাভ না থাকলে আমি এত চেষ্টা করবো কেন?"

"নিশ্চয়। তবে লাভের মধ্যে আমারই এই সম্পত্তি তো? কাগজপত্র নিয়ে আসুন, আমি এই দণ্ডে সমস্ত সম্পত্তি আপনার নামে লিখে দিচ্ছি।"

গায়ে চাদরখানা জড়াইয়া অনুপমা জলদমন্দ্রে উঠিয়া বসিল। তাহার উত্তেজকফল মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফুলতি ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি কি মনে কর অনু, আমি শুধু তোমার সম্পত্তির জন্যই লালায়িত?"

তীব্রকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "আমার এ বিশ্বাস টলাতে পারবেন না ফুলতিবাবু।"

"কিছুতেই পারবো না?"

"কিছুতেই না।"

মনে একটা অস্বাভাবিক জোর আনিয়া ফুলতি জিজ্ঞাসা করিল, "যদি পারি?"

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া অনুপমা বলিল, "যদি তা পারেন, তখন আপনি যা বলবেন তাই শুনবো।"

"উত্তম" বলিয়া ফুলতি ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

যশোদা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার নিয়ে আসবো দিদিমণি?"

"না" বলিয়া অনুপমা শুইয়া পড়িল। যশোদা বলিল, "না খেলে, সেই তো কোন্ সকালে ভাতের আগে একবার বলেছিলে। রাত আটটা দশটা বাজে, এখনো কিদে হয় নি? আবার তাদের বুড়ি দিয়ে ঘরে পড়লে যে?"

বলিয়া সে অনুপমার পায়ের দিকের চাদরটা একটু সরাইয়া পায়ে হাত দিয়া এক হাত দিয়াই যেন অতিমাত্র ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, গা দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। জ্বর হয়েছে নাকি?"

গা টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "তোমায় মানা করেছে, যাও, খাবার নিয়ে যাও।"

যশোদা বলিল, "তা আমুক, কিন্তু না এত গরম।"

অনুপমা বলিল, "সারাদিন রোদে বৃষ্টি দিয়ে এসে আছি, তাতে গা কি ঠাণ্ডা থাকবে?"

কথাটা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া যশোদা আর কোন প্রতিবাদ করিল না; খাবার আনিতে চলিয়া গেল।

একটু পরে যশোদা খাবার লইয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এবার সে একা আসিল না, পিসিমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। তবে পিসিমা তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকিলেন না; তিনি তখন জপে নিরত ছিলেন, সুতরাং শুচিত্ব রক্ষার অনুরোধে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মা, জ্বর হ'য়েছে তোমার?"

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া অনুপমা বলিল, হাঁ, জ্বর হ'য়েছে! যদি বুদ্ধি এর মধ্যে গিয়ে তোমায় বলেছে?"

খাবারের থালাটা যথাস্থানে রাখিয়া যশোদা বলিল, "কেন, আমি কি মিছে কথা বলেছি? তুমি একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখ দেখি পিসীমা, আমার কথা সত্যি কি মিছে?"

কিন্তু গায়ে হাত দিয়া দেখিবার উপায় পিসীমার ছিল না; তাহা হইলে সেই রাত্রে তাহাকে পুনরায় স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। সুতরাং যশোদার কথার উত্তরে তিনি একটু বিনয় অনুনয় করিয়া যতদূর ইতস্ততঃভাবে বলিলেন, "তা তুই কি আর মিছে বলছিস্ বাছা, তবে—"

তবে এ-সময়ে অনুপমাকে স্পর্শ করিয়া তিনি যে আপনার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে পারেন না ইহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না, অথচ ইহার পর কি যে বলিবেন তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া যেন একটু চঞ্চল ভাবে হাতের মালাটা বন বন ঘুরাইতে লাগিলেন।

অনুপমা তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল। সে যশোদাকে একটা ধমক্ দিয়া বলিল, "তুমিও যে পিসীমা, ঐ পোড়ারমুখীর কথা শুনে ছুটে এসেছ! সারাদিন বিছানায় পড়ে রয়েছি, বিছানায় শরীর একটু গরম হ'য়েছে। তাই মেয়ে পোড়ারমুখী জ্বর জ্বর হ'য়ে হাসিতে পড়েছে।"

পিসীমা যেন অকূলে কূল পাইলেন; মুখে একটু আহ্লাদের হাসি আনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক ঠিক, বিছানার গরমে অমন হয়। এই শীতকালে যেন বৃষ্টি দিয়ে ভরে থাকলে গা হাত পাওনের মত গরম হ'য়ে ওঠে। না না, জ্বর হ'তে যাবে কেন? যাচ্ছি, যাই, সন্ধ্যের যে ঢের অনেক। সে যশী, তুই তবে খাবার আন। আমি থালাটা নেবে নিই। সহজ স্বরে, অন

শুনেই বুকটা ছাৎ ক'রে উঠেছিল। মুখে আগুন পোড়া মুখের, আগে অলক্ষণের কথাটাই মনে আসে।"

অন্তর্যামী মনের উপর তীব্র উক্তি প্রয়োগ করিতে করিতে পিসীমা সত্বরপদে দ্বারপ্রান্ত ত্যাগ করিলেন। অনুপমা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

যশোদা পাশের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া অনুপমা বলিল, "তুই দাঁড়িয়ে রইলি যেন? আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে চলে যা।"

যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, "খাবে না?"

"একটু পরে খাব।"

যশোদা নিঃশব্দে চাদরের উপর দিয়াই অনুপমার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি খানা দিয়ে এসেছিস্?"

ঈষৎ চমকিতভাবে যশোদা বলিল, "ওমা, দিয়ে আস্‌বো না আবার! তখুনি গিয়ে দিয়ে এসেছি।"

অনু, কার হাতে দিলি?

যশো। ম্যানেজার বাবুর হাতে।

অনু। কিছু বল্‌লেন তিনি?

একটা ঢোঁক গিলিয়া যশোদা বলিল, "না, বলেন নি কিছু, তবে বল্‌লেন—আমি এক সময়ে গিয়ে দেখা ক'রবো।"

তাহার কথার ভাবে, মুখ চোখের ভঙ্গীতে অনুপমার যেন একটা সন্দেহ হইল। সে যশোদার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা আর কেউ দেখে নি তো হ'লে?"

ব্যস্ততার সহিত যশোদা বলিল, "কত কথা দিদিমণি, কে আবার দেখবে? আমি যা পেটের কাপড়ে ক'রে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছি। হ্যাঁ, বলি সে পাত্তরই নয় যে, একজনের চিঠি আর একজনকে দেখাবে।"

বলিয়া সে অনুপমার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। অনুপমা নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

যশোদা কিছুক্ষণ নীরবে অনুপমার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুমি যাই বল দিদিমণি, বিছানার গরমে গা এত গরম হয় না।"

"তবে কিসের গরমে হয়?"

"এ যেন জ্বরের গরম।"

অনুপমা কোন উত্তর দিল না। যশোদা বলিল, "আমি যাই দিদিমণি. জামাইবাবুকে ডাক্তার ডাক্‌তে বলি।"

সবেগে মাথা তুলিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "দেখ্ যশী, শুধু শুধু এমন জ্বর জ্বর ব'লে যদি আমাকে ব্যস্ত করবি, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি। আমি ম'লে কি তোরা বাঁচিস্?"

ভয়ে যশোদার মুখ শুকাইয়া গেল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না; নীরবে আর কিছুক্ষণ পায়ে হাত বুলাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

পথের দান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

রথ-ঘর্ঘরে
তরু মরমরে
　　শব্দ পাই
ছেয়া বৃহতী
তপনা অতি
　　সকল ঠাঁই
চক্রের ধূলি
উঠিছে আকুলি
　　বহু খানি

রথের চূড়ায়
ওইকে উড়ায়
　　ধ্বজ পাখী
কোকিল কণ্ঠে
কি মধু বর্ষে,
　　নিঝর গীতি
গিরি গরীষর
দিতেছে অকয়
　　জাগায়ে প্রীতি

আলি ওগুরে
ভরা মুকুরে
কুঁড়িতে ফুল
কতনা ছন্দে
হৃদয় বন্দে
জাগিল দুল
দুলিছে দোদুল
ফল আর ফুল
পাতার আড়ে
শিশিরের কোঁটা
মৌক্তিক গোটা
বাহার বাড়ে
বেতসের তলে
তটিনীর জলে
একি এ তান
কদম ছায়ায়
দখিন হাওয়ায়
ওঠে কি গান ?
ওগো মহারাজ
ফেলি' রাজকাজ
হেথায় বুঝি
তুমি এলে রথে,
আমি পথে পথে !
বেড়াই খুঁজি,—
—করিবে ধন্য
আমার দৈন্য
তোমার দানে
পথের কষ্ট
করিবে নষ্ট
আমার মানে !—
একি হ'ল আজ
ওগো রাজরাজ
পথের মাঝে
নিজে মিলে দেখা
ভাগ্যের লেখা
মরি যে লাজে,
"মহারাজ" নও
সে কি কথা কও
'বন্ধু' তুমি
বরণ মালায়
তুষিলে আমায়
আদরে চুমি !'
বন্ধুর পথে
বন্ধুর রথে
পেয়েছি ঠাঁই
ভাবনা মুখ্য
পথের দুখে
আরম্ভ নাই !
বাসনা বাহুকি
উঠিল কি কহি'
এমন করে
অসীম সাগরে
অপার সাগরে
রাখিল ধরে ?
অন্তর আজ
মন্থার রাজ
মথন তরে
দাঁড়াইয়া থির
তীব্র গভীর
সাগর পরে।
হে মোর বন্ধু
হৃদয় সিন্ধু
মথন করি'
কি সুধা উঠিল
পিয়াসা মিটিল
এমন করি ?

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাকল দেখিল অজিতের ঠোঁট দু'খানি নড়িতেছে মাত্র, ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে, দেহের অন্য সমস্ত অঙ্গই অসাড়, স্পন্দনহীন। দেখিতে দেখিতে পাকলের সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, ভয়ে বুকের ভিতরটাও যেন কেমন দুরু দুরু করিতে লাগিল। সে অতি ভয়ে ভয়ে তার হাতখানি অজিতের ললাটের উপর ন্যস্ত করিল। হাতটা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। পাকল তাহার কম্পিত অধরোষ্ঠের দিকে চাহিয়া ডাকিল, অজিত বাবু! অজিত বাবু।

অ্যাঁ?

কোন সাড়া নাই!

ভয় আরো বাড়িয়া গেল। এই অল্পক্ষণ—বোধ হয় পাঁচটা মিনিট আগেও যে লোক নিজে চলিয়া আসিয়া বিছানায় বসিতে পারিয়াছে, এখনি তাহাকে এমন অজ্ঞান-অচেতন দেখিয়া কাহার না ভয় হয়? বিশেষ সে রমণী! একাকিনী, অসহায়া রমণী! অজিতের দিকে চাহিতে চাহিতে তাহারও যেন চেতনা লোপ পাইয়া আসিতেছিল। রোগীর পানে চাহিতেও ভয় হইতেছে; আবার তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতেও কেমন সাহস হইতেছে না। যদি কিছু—নাঃ, পাকল উঠিয়া পড়িল।

কি-করিবে ভাবিতে ভাবিতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। খোট্টা বৌ নিচের রোয়াকে শিল পাতিয়া মসলা পিসিতেছিল, তাহারই অদূরে বসিয়া কালীচরণ তামাক খাইতেছে দেখিয়া তাহাকেই ডাক দিল। কালীচরণ হুঁকা নামাইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, কি ভাবিয়া বলিল—থাক্, কালীচরণ।

এদিকের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, গাড়ীর কোচবক্সে কোচম্যান সহিস দু'জনেই বসিয়া আছে। তাহাদেরই ডাকিতে গিয়া থমকিয়া গেল। কি বলিবে? লইয়া যাইতে বলিবে? এই অবস্থায়?

ভাবিতে ভাবিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। অজিত কুণ্ডলী পাকাইয়া সঙ্কুচিত হাত দুইটি জানুর মধ্যে পুরিয়া শুইয়াছিল—বুঝিতে বাকী রহিল না, শীতেই সে অমন জড়সড় হইয়া শুইয়াছে। কিপ্রহস্তে আলমারী খুলিয়া ধোপদস্ত হাসিয়াদার শালখানি বাহির করিয়া অজিতের গায়ে ঢাকা দিতে দিতে পুনরায় ডাকিল, অজিত বাবু? অ্যাঁ?

অজিত সাড়া দিতেই, আবার বলিল—শীত করছে অজিতবাবু?

না, আর করে নি।—বলিতে বলিতে সে আরক্ত নেত্র মেলিয়া পাকলের দিকে চাহিল।

আর কিছু কষ্ট হ'চ্ছে অজিতবাবু? পা কি মাথা—টিপে দেব?

মাথাটা কামড়াচ্ছে।

টিপে দিই—বলিয়া পাকল মাথার কাছে বসিয়া সস্নেহে মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে আর-একবার জিজ্ঞাসিল—কমছে অজিতবাবু?

আবার সাড়া নাই।

আস্তে আস্তে উপাধানটি সরাইয়া অজিতের মাথাটী কোলের'পরে তুলিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। যেন সে অজিতের কতকালের আত্মীয়! কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তাহার রোগের সেবা করিবার অধিকার সেই পাইয়াছে! এ যেন হিন্দুনারীর জন্মান্তর অর্জিত পুণ্যের প্রেমের পবিত্র অধিকার! নির্বিষ্টমনে, একান্ত চিত্তে নারী আপন কর্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে।

খোট্টা বৌ—কি শাক করিবে জানিতে আসিয়াছিল, পাকল তাহাকে হস্তেঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া বলিল—যা হয় কর্-গে বৌ! আমি আজ খাব কি-না তার ঠিক নেই! বেশ্ছিস্ত?

খোট্টা বৌ বিস্ফারিতনেত্রে দুইজন দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—কোন্ দ্বার?

পাকল সে কথার উত্তর না দিয়া, একটুখানি হাসিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। এই মৃদু হাসির অর্থ দুই জনেকেই বুঝিবেন না, কিন্তু খোট্টা বৌ বুঝিল, বুঝিয়া চলিয়া গেল। 'কাপ্তেন'টা যে পুঁটী বাটা নহে, তদ্বিষয়ে খোট্টা বৌয়ের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, যেহেতু এ

জান তাহার ছিল যে অল্প ওজনের কই মুগেলের ভাগ্যেও এমন সেবা ক্বচিৎ মিলে! একমাত্র মিলে তাহাদেরই, যাহাদের সৌধা প্রস্থের খ্যাতি—কলিকাতা সহরের লোকের মুখে মুখে ফিরে—তারাই এ সৌভাগ্য যদিও পায়।

খোঁড়া বৌ চলিয়া যাইতেই নিজের ঘরের আলোতে তখনকার সেই মৃদু হাস্যরঞ্জিত মুখের ছায়া দেখিয়া পাক্কল নিজেই চমকিয়া উঠিল। এ কে? এ ত নিশাচর মাতাল নয়—এ যে জীবন-মরণের সমস্যা লইয়া তাহার কোলের 'পরে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে শুইয়া আছে!—না, না—ইহাকে এখনি বাড়ী পাঠাইয়া দিতে হইবে, কি-জানি, এত জ্বর—যদি কিছু ভালো-মন্দ হয়?

এই ভালো-মন্দর চিন্তা মনে আসিতেই সারা মনটা বর্ষার জলভারাবেষ্টিত আকাশের মতই আঁধার করিয়া আসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সেই অন্ধকার-আকাশের বক্ষ ভেদিয়া এক প্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ রেখা উঠিয়া সমস্ত আকাশখানাকে মুহূর্ত্তের জন্য রাঙ্গা করিয়া দিয়া আবার এক প্রান্তে মিলিয়া গেল। আর সেই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন আকাশের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া নারী বলিয়া উঠিল—কেন—সেও ত নারী? অজিতকে বাড়ী পাঠাইতে হইবে কেন-না সেখানে নারী আছে, সেবা করিবে! পরিজন আছে—চিকিৎসা করাইবে! কেন, সে যদি অজিতের সেবা করে? সে যদি তাহার সর্বস্ব ব্যয় করিয়া সহরের বড় বড় ডাক্তার ডাকাইয়া অজিতের চিকিৎসা করায়—কি দোষ তাহাতে? পারিবে না? কেন? সেকি নারী নয়? ভগবান তাহাকে পূর্ণমাত্রায় নারী করিলেন, দেহে-মনে নারী সে—আর সেবা করিতে পারিবে না? অজিত সে-দিন নিজেই কথায়-কথায় বলিয়াছে, সে অকৃতদার, এখানে এক বৃদ্ধ মাতুল ছাড়া আপনার জন কেহ নাই—শ্রীরামপুরে ভাই, ভায়ের বৌয়েরা আছে বটে! কিন্তু এখানে ত কেহ নাই। এখানে সেবা করিবার, শুশ্রূষা করিবার, যত্ন করিবার, দেখিবার শুনিবার মাইনে-করা চাকর-বাকর ছাড়া কেহ নাই! সে কি তাহাদের চেয়ে কম সেবা করিবে? কম যত্ন করিবে?

এই নারী মেয়েটির চিরদিনের স্বভাবই এই যে উদ্যম প্রবৃত্তির গতি রোধ করা কোন দিনই তাহার ক্ষমতার বা সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না। আজ যখন তাহার মনে হইল যে, যে লোকটি এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার সঙ্গে এমন অকপট বন্ধুর মত আচরণ করিয়া আপনার লোকের মতই হইয়া গেছে—তাহার অসুখের সময় নিজের হাতে সেবা করিয়া রোগমুক্ত করিয়া তুলিবে—তখন আবার সর্ব দেহ-মন একই সঙ্গে তাহার নারীত্বের মূলে এমনই বল সিঞ্চন করিয়াছিল যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনটী স্থির করিয়া ফেলিল, তাহার সর্বস্ব একদিকে আর অজিতের রোগমুক্তি—অন্যদিকে!

নারী-চরিত্র চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়! এই অজিতকে তাহার কতটুকুরই বা প্রয়োজন ছিল? তাহার জন্য এই পণ করিতেও সে দ্বিধা করিল না। এই সর্বস্ব-পণের বিনিময়ে কি পাইবে, কতখানি পাইবে, কোনকালে কিছু পাইবে কি-না তা'ও ভাবিল না। আর সেই নারী—যে জ্ঞান হওয়াবধি হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছে! যৌবন বিলাইবার ছলে দু'গুণ দশগুণ মূল্য লইয়াছে! জীবনে পরের জন্য যতটুকু ব্যয় করিয়াছে, আপনার সিন্দুকে তাহার অনেকগুণ বেশী তুলিয়া লওয়াই ছিল যাহার পেশা! সেই নারী!

আস্তে আস্তে মাথাটি সরাইয়া আবার উপাধানে রক্ষা করিতেছে, অজিত মুখে কি-একটা শব্দ করিয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। বার দুই হাত দুইটা এলোমেলো ভাবে এদিকে ওদিকে ফেলিয়া আবার নিস্তব্ধ হইতেই, পাক্কল তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—অজিতবাবু?

কে?

কিছু বলছেন?

না!

কোন কষ্ট হ'চ্ছে?—কথাগুলা যেন ভিজিয়া ভিজিয়া বাহির হইতেছিল।

অজিত চক্ষু মুদিয়াই বলিল—না। একটু জল?

জল খাবেন—দিই!—বলিয়া গৃহ-কোণস্থিত কুঁজাটা স্পর্শ করিয়াছিল, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, তাকের মাথায় দুইটা পূর্ণ সোডার বোতলের উপর। তারই একটা নামাইয়া ডাকিল। ছোট একটা কাঁচের গ্লাসে খানিকটা ঢালিয়া অজিতের পার্শ্বে বসিয়া ডাকিল—অজিতবাবু?

অজিত হাঁ করিল, পাক্কল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সোডাজলটুকু ঢালিয়া দিল, বলিল—আর দেব?

অজিত ঘাড় নাড়িল। পাঙ্কল আবার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে দেখিল, অজিত পূর্ববৎ অঘোরে রহিয়াছে।

বাহিরে আসিয়া কালীচরণকে ডাকিয়া বলিল—কালীচরণ, একজন বড় ডাক্তার ডেকে আন্‌তে হ'বে—পার্‌বে?

কালীচরণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

যত টাকা চায়—এখুনি আন্‌তে হ'বে। সবচেয়ে যে বাঙ্গালী ডাক্তার বড়—তাঁকে আন্‌বে। সাহেব নয়, তাদের কথা আমি বুঝতে পার্‌ব না। তোমার কাছে ত টাকা আছে, ট্রামভাড়া, গাড়ীভাড়া যা লাগে—যাও।

কালীচরণ জিজ্ঞাসিল—কি হ'য়েছে দিদিবাবু?

ডাক্তারবাবুটির হঠাৎ অসুখ করেছে।

তাঁর গাড়ী যে এখনো···

তাদের বলে যাও···যাক্, তুমি যাও, তাদের আমিই বলে দিচ্ছি—তুমি আর দাঁড়িও না কালীচরণ, যাও!

কালীচরণ গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। তাহার মোটরের শব্দ মিলিয়া যাইতেই পাঙ্কল সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িল। মনে হইল, রাস্তায় পড়িয়াই কালীচরণ যদি কোন বড় ডাক্তারের দেখা পাইয়া লইয়া আসে, দেখিয়া ডাক্তার 'ভয় নাই' বলিয়া যান—তবেই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কতক্ষণে ডাক্তার আসিবে, কতক্ষণে দেখিয়া যাইবে ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দু'হাতে রেলিংটা ধরিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বসিয়া থাকাও কঠিন। বুকের মধ্যে হু হু করিয়া যেন কেমন একটা কি হইয়া যাইতেছে—বসিয়া থাকা যায়। মনে হইল, তাহার চেয়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে হয়ত শান্তি মিলিবে। কিন্তু কোথায় শান্তি? আবার সেই বিভীষিকা!

হঠাৎ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, যুক্তকরে কার উদ্দেশে বলিল—মা, কোনদিন তোমাকে এমন করিয়া ডাকি নাই, ডাকিবার চেষ্টাও করি নাই। আজ তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, মা নারীর একটা মান তুমি রক্ষা কর। উহাকে সুস্থ করিয়া দাও, তারপর লইতে হয়, এই অসার, এই হতভাগিনীর প্রাণ আমিই তোমার চরণে হাসিমুখে বলি দিব। তোমার দু'টি পায়ে এই প্রার্থনা, মা আমার নারীর মুখ রক্ষা কর!

বিহ্বলচিত্তে কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তখন দীরপদে ওদিকের বারান্দায় আসিয়া কোচম্যানকে ডাকিয়া কহিল—গাড়ীমে বোল্ দেও, ডাক্তারবাবু আজি শ্রীরামপুর চলা যাতা, ছুটিমে নেহি লোটেঙ্গে।

কম্পাউণ্ডারও সেই সময় আসিয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী চড়িয়া সেও চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য সংবাদ

চিরস্থায়ী, অভাব-ক্লিষ্ট, অনাহার-শীর্ণ কেরাণীমহলে আগমনের একটা সাড়া পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কেরাণী-মহল নাম লইয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে কেরাণীদের অধিকন্তু সেই চিরাচরিত জগতের খবর, অভাগ্যের অভাব অভিযোগের কথা, তাঁহাদের ধর্ম-বাণী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইবে। এই কাগজখানিকে আমরা সানন্দে বরণ করিয়া লইতেছি। যাহাদের মুখ চাহিবার কেহ নাই, ঘরে-পরে লাঞ্ছিত কেরাণীকুলের যদি কিছুমাত্র উপকারও সহযোগী করিতে পারেন, আমরা অধিকতর আনন্দিত হইবে। কেরাণী-মহলে প্রকাশিত গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ—সবগুলিই কেরাণী-দের বিশেষত্ব পূর্ণ! "কেরাণীমহল" কেরাণীমহল হইতে প্রকাশিত হইয়া উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির কর্ণে তাহার কথা শুনাক্—ইহাই আশা করি। কাগজখানির দাম বাৎসরিক ৩৲ নগদ মূল্য ৵১০। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত বি-এ ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বেরা বি-এ "কেরাণী-মহলের" পাণ্ডা।

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী]

কল্পনায় এইরূপ নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিয়া কৃষ্ণধনবাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন ও এক সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে সঙ্গীতচর্চ্চার দিকে সাধারণের বিন্দুমাত্র ..আগ্রহ নাই ও সঙ্গীত বিদ্যালয় চালাইয়া তাঁহার কোনও রূপ আসাচ্ছাদনের সংস্থান হওয়াই অসম্ভব। তাঁহার বহুদিনের সাধ এইরূপে বিলীন হইল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবার কৃষ্ণধনবাবু কুচবিহারের মহারাজার ষ্টেটে চাকরী গ্রহণ করেন। এ চাকরীর কিছু বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার পদ Excise officer এর হইলেও সঙ্গীতালোচনায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিবার অবসরও সুবিধা তিনি পাইয়াছিলেন। কুচবিহারের মহারাজ

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণের বদান্যতায় কৃষ্ণধনবাবুর "গীতসূত্রসার" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ কুচবিহার ষ্টেট প্রেসে মুদ্রিত হইয়াই প্রথম প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত মহারাজ বিলাতী Staff notation এর বহুমূল্য টাইপ আনাইয়া কুচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে কৃষ্ণধনবাবুর গ্রন্থ ছাপিবার সুবিধা করিয়া দেন। কুচবিহারের দেওয়ানী আহ্লিকার পদে অভিষিক্ত ৺রামচন্দ্র ঘোষ একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কারক ছিলেন। কৃষ্ণধনবাবু বহু সেতারের মত ইহার সঙ্গে বীণাতরঙ্গার তালে বাজাইয়া তালের নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। Excise officerএর কার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য ছিল না। প্রচুর অবসরে তিনি সঙ্গীতচর্চ্চার বিশেষ সুবিধা পাইয়া এ পদ পরিত্যাগ করার অভিপ্রায় আর করেন নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনবাবু কুচবিহারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কৃষ্ণধনবাবু গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণধনবাবুর মৃত্যুর পর গৌরীপুররাজ কৃষ্ণধনবাবুর 'সেতার শিক্ষা' নামক গ্রন্থের নবসংস্করণ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীতামোদী-মাত্রকেই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

গৌরীপুরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কৃষ্ণধনবাবু পরলোকগমন করেন।

এখন আমরা কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব আলোচনা করিব। এই গ্রন্থগুলির প্রধান উপযোগিতা এই যে ইহাতে Practical সঙ্গীতচর্চ্চার দিকেই ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার নিজ কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কৃষ্ণধনবাবু প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত গ্রন্থগুলিও আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলির দোষগুণ অকুণ্ঠিতভাবে আলোচনা করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই।

কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "ঐক্যতান" প্রকাশিত হয়। ইহাতে কেবল ঐক্যতান বাদ্যের মত লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর বৎসর কৃষ্ণধনবাবু "Hindusthaine Airs arranged for the Pianoforte" এবং "সঙ্গীতশিক্ষা" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনবাবুর "সেতার শিক্ষা" মুদ্রিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধনবাবু "গীতসূত্রসার" প্রকাশিত করেন।

কৃষ্ণধনবাবু গীতসূত্রসারের ভূমিকায় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন "আমাদের দেশে এই প্রকার সঙ্গীতগ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করা যথেষ্ট অর্থব্যয় সাপেক্ষ। আমার তাদৃশ ব্যয়সঙ্গতি থাকিলে, এ পর্য্যন্ত বহু আবশ্যকীয় সঙ্গীত

পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিতাম।" যাহা হউক যে কয়খানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। 'বঙ্গৈকতান' গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কৃষ্ণধনবাবুর "সঙ্গীতশিক্ষা" গ্রন্থের টাইটেল পেজে আছে "শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীতশিক্ষা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রথম শিক্ষার্থি যাবতীয় মূলসূত্র সম্বলিত এবং অভ্যাসার্থ সাধারণ প্রচলিত গৎ ও গীতাদি সম্বলিত, গান, সেতার, এসরাজ, বেহালা, বংশী ও হারমোনিয়ম শিক্ষার সহজ উপায়।"

এই গ্রন্থ নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মুখবন্ধে ইয়োরোপীয় সাঙ্কেতিক লিপির (Staff Notation) উৎকৃষ্টতা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু বরাবরই এই ইয়োরোপীয় ষ্টাফ নোটেশন চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি যে সকল যুক্তিদ্বারা নিজ মত সমর্থনের প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সঙ্গীত লিখিবার ইউরোপে প্রচলিত সাঙ্কেতিক স্বরলিপি প্রণালী অতি সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং হিন্দুসঙ্গীতলিখন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপযোগী। আমি চারি পাঁচ বৎসরের বারম্বার দৃঢ় অনুশীলন, পরীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান দ্বারা আরও দেখা গিয়াছে যে এই স্বরলিপিদ্বারা হিন্দুসঙ্গীত সহজে ও শীঘ্র শিক্ষা করা যাইতে পারে (ইউরোপীয় স্বরলিপি এরূপ যথার্থ ও সম্পূর্ণ যে, কোন শিক্ষিত লোকের নিকট উহার সঙ্কেত সকল বুঝিয়া লইয়া, কিরূপ স্বরলিপি দেখিয়া গত্তাদি যন্ত্রে বাজাইতে হয় তাহা একবার জ্ঞাত হইতে পারিলে যে কোন প্রকার নূতন গৎ ও গান শিখিবার নিমিত্ত আর কাহারও নিকট যাইতে হয় না।" যন্ত্রে বসিয়া একখানি গ্রন্থ লইয়া নিজ চেষ্টায় অভ্যাসকালে যত ইচ্ছা অভ্যাস করা যাইতে পারে। এমন কি সাধারণ ওস্তাদের নিকট পাঁচ বৎসরেও যাহা না শিক্ষা করা যায়, এইরূপ গ্রন্থের সাহায্যে এক বৎসরেই তাহার অধিক শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কোন আধুনিক সঙ্গীত গ্রন্থকার ইয়োরোপীয় স্বরলিপির নিগূঢ় তাৎপর্য্য ও তাহার সঙ্গীত সাধনাকে সহজ করার গুণ উত্তমরূপে না বুঝিয়া, উহাকে অতিশয় কঠিন ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু উহা যে-কেহই রীতিমত অভ্যাস করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ইউরোপের সাঙ্কেতিক স্বরলিপি অপেক্ষা সহজ, নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী স্বরলিপি এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 'ইউরোপীয় হইতে হিন্দু সঙ্গীতের প্রকৃতি অনেক ভিন্ন' এই কথা বলিয়া অনেকে হিন্দুসঙ্গীত লিখা পক্ষে ইউরোপীয় স্বরলিপির অনুপযুক্ততা স্বীকার করাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় এ বিষয় অনুধাবন করেন না যে সঙ্গীত মানবজাতির সাধারণ ধন, কেন না ছন্দ অনুসারে নির্গত সুস্বরাবলী শ্রবণে মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়াকৃষ্ট হয়। তবে কোন জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা সঙ্গীতে অধিক ব্যুৎপত্তি রাখিতে পারেন, এইমাত্র প্রভেদ। পরন্তু ইউরোপীয় হইতে হিন্দুসঙ্গীত অনেক ভিন্ন হইলেও উভয়েরই মূল পদার্থ যে ধ্বনি, মাত্রা ও সময়, তাহা একই বিষয়। অতএব ইউরোপীয় স্বরলিপিতে যখন ঐ সকল সহজে ও বিশুদ্ধরূপে লিখিবার চমৎকার সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতাবলী রহিয়াছে, তখন তদ্বারা হিন্দুসঙ্গীত যথোচিতরূপে লিখা না যাইবার কোন কারণই নাই। এবং তাহাতে লিখিত হইলে উহার স্বকীয় প্রকৃতি নষ্ট হইবার কথা যিনি বলিবেন তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমরূপে পতিত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

ঢাকায় ভূ-পর্য্যটক :—ঢাকার ২২শে তারিখের খবরে প্রকাশ, ভূ-পর্য্যটক মিষ্টার সি, এইচ, ব্লাইথ সোমবার দিন কুমিল্লা হইতে ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি ঢাকা-জুবিলী কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রগণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরদিন ঢাকা হলে তিনি তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। ২২শে তারিখে তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন। ব্লাইথ অদ্য কলিকাতা আসিতেছেন। তিনি একজন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট জানাইয়াছেন যে তাঁহাকে তিনি বহুবার দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। সিঙ্গাপুরে বহুবার বন্য হস্তীর সম্মুখে এবং আরাকানে ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িয়াও তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।

ফুলাইয়ামের "সিউইয়ার্ড আবেরিভার" নামক মার্কিনের একখানি সংবাদপত্র গতি পুণ্যাহ সম্বন্ধে তাহাদিগের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন, "গত ১৮ই মার্চ ফ্রিডম গবর্ণমেণ্ট নবাগত গতিকে কারাগার করিয়াছেন। সেই অবধি প্রত্যেক মাসের ১৮ই তারিখে গতি পুণ্যাহ হয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এই দিনের আর সকলে মেলের স্বাধীনতার জন্য দান করে। মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এবং এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলনকের অনেক অগ্রসর করিয়া দিয়াছে বলিয়া ভিন্নদের জাতীয় বল গতি পুণ্যাহ করে। আমেরিকাতেও এই মাসিক উৎসব আসিয়া পড়িয়াছে। ফোর্টস অনেক প্রসিদ্ধ আমেরিকা বাসীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বার এই উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বল তন্মধ্যে প্রধান কর্তা আমেরিকার ধর্ম্ম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিষয় সেই ধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে সফল করিয়া তুলিয়াছে।"

সাধু পরিষদ—আগামী ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর মাদ্রাজের ডিরেক্টারালাই সহরে ভারতের সাধু সন্ন্যাসিদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। মহাত্মা [illegible] সভাপতি আসন গ্রহণ করিবেন।

ইলেক্ট্রিক ট্রামওয়ে ধর্ম্ম —সংপ্রতি ইলেক্ট্রিক ও ষ্টীমের ভোট ১৫০০ জন ভারতীয় ভদ্রলোক অবগত করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ আফ্রিকান্দিগ প্রেরিত হইয়াছে। এবং অধিকাংশই কয়লাখনিতে নিযুক্ত হইয়াছে।

আগামী ১২ই ডিসেম্বর বোম্বেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ কনভোকেশন হইবে। ভূপালের বেগম সাহেবা সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

ব্রহ্মদেশে সংবাদে প্রকাশ, আরাকেলে মিঃ। স্যার মহম্মদ শফি ব্রহ্মদেশের শাসন পরিষদের আইনসচিব হইলেন এবং মিঃ এ, সি, চাটার্জি (আই, সি, এস) আয়ারীভাবে শিক্ষাসচিব হইলেন।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর স্যার উইলিয়াম ডিসেণ্ট ভারত ত্যাগ করিবেন। স্যার স্যামুয়েল হোর ভিসাউন্টকেটের ভার গ্রহণ করিবেন। উক্ত দিবস হইতে মিঃ ই, এস, মুক অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিবেন। জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে স্যার মেরিল ব্রাকেট তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধাবলা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ৪ বৎসর বয়স একটী মেয়ে হাতে খুব হইতে উঠিয়া অবধি বোবা। পিতা পুত্রের ধরণা অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহার পিতা ঘরে মৃগাল প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া মেয়েটিকে দাও দিয়া আঘাত করে—বালকের শরীর সাংঘাত কাটা গিয়াছে। এখন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে আছে।

গান্ধি সেবক সভার মুক্তপুর্ণ নিবারণে সভ্য মিঃ জোসিয়ে ১০০১ পাউণ্ডের একখানা চেক দান করায় আপাতত অভিমুক্ত হইয়াছেন।

"মুক্তকেতন" মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বাবদাত ২৯শে তারিখ পর্য্যন্ত দাখা হইয়াছে।

"ষ্টাইমস" নামক একখানি ইংরেজ সাপ্তাহ হংকংয়ে পৌঁছিয়া আরও ৬৫ জন লোক বাসী হিসাবে ইংরেজে আক্রমণ করে। পরে ইহারা জাহাজের নাবিকদিগকে এবং কর্ম্মচারিগণকে আক্রমণ করে। ইহাতে এক ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত হয়। দাঙ্গার ফলে অনেক ভারতীয় খুন হইতে হইয়াছে। জাহাজের কাপ্তেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আহত হইয়াছে। আক্রমণকারিগণ জাহাজখানি লুট করিয়া নিয়াছে।

সরকারী ঘোষণাপত্রে মৃতের খলিফাকে "হিজ ইম্পিরিয়াল ম্যাজেষ্টি" (সম্রাট) এর স্থলে "হিজ হাইনেস" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আগামী শুক্রবার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। এজন্য রাষ্ট্রসভার সদস্য ছয় সপ্তাহ এই উপলক্ষে কনস্তান্তিনোপলে আসিয়াছেন।

প্রতিজ্ঞাপালিনী অভিনেত্রী মৃতাগীত পটিয়সী ফ্রন্সী ভিয়োবণি আজ পরাজয়োজ্জা ভিয়ই ভারতে আসিয়াছেন।

২৩শে নভেম্বর তারিখে বেলা ১৯টার সময় চাটোটনিয়ে সমস্ত লোককে বাহির করিয়া দেয়। ফলে সই কর্ম্মন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। স্থির হইয়াছে যে, ডিসেম্বর হইতেই পালা ক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবেন। অদ্য ৩টার সময় পুনরায় বৈঠক আরম্ভ হইবে।

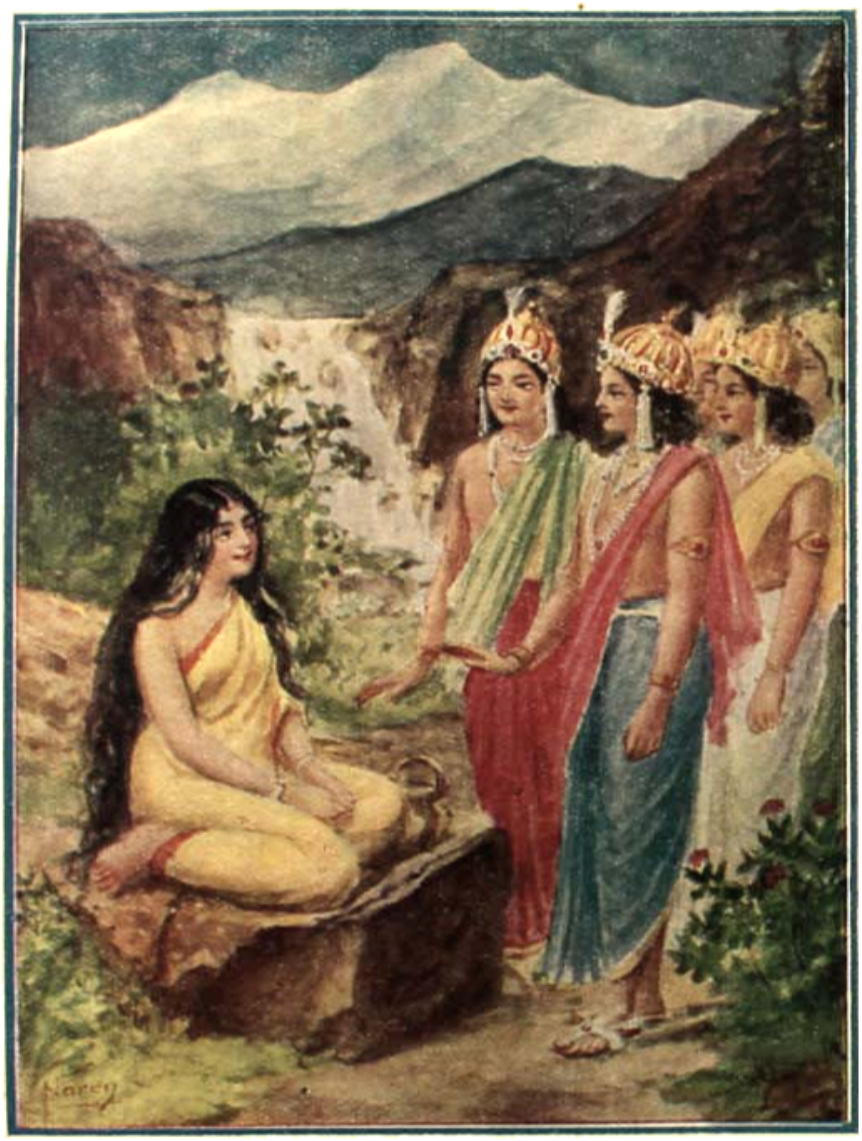

ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী।

সুবোধবাবুর "দ্রৌপদী" হইতে গৃহীত।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩২৯, ইং ২রা ডিসেম্বর। [১৯শ সংখ্যা

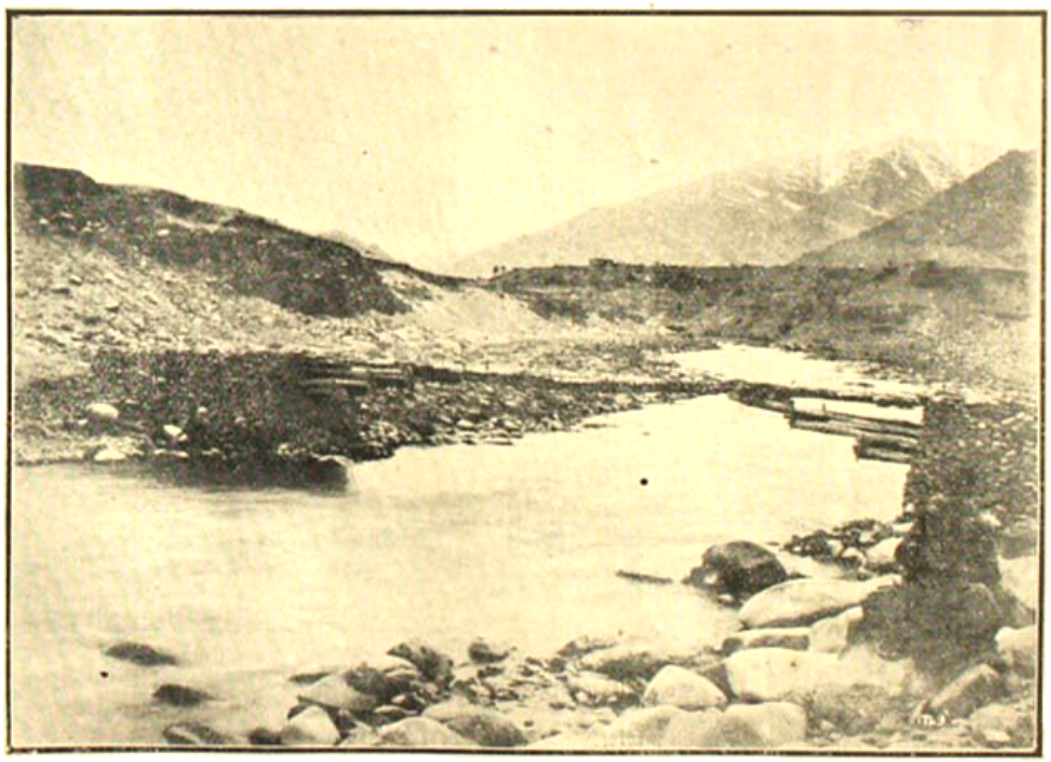

কাশ্মীর প্রদেশের হেমাই সেতু নিম্নে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী।

গোধূলিতে—পল্লীবধূ।
শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

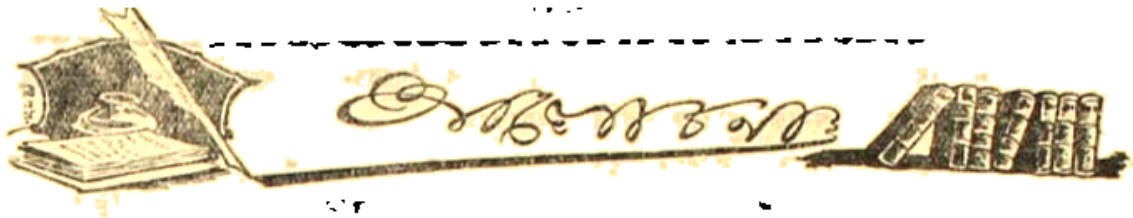

অসহযোগ আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, একত্ব ও মমত্ব বোধ জাগাইয়াছে—জাতিক ত্যাগের প্রবৃত্তি জাগাইয়াছে—কষ্ট সহিবার ও দুঃখ বরণ করিবার একটা শক্তিও আনিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন ভারতের সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে ভাবের বিকাশ, ইহা অপূর্ব্ব। অ-সহযোগ আন্দোলন সার্থকতা হিসাবে এই খানেই তাহার মূল ভিত্তি সুদৃঢ় রূপে গড়িয়াছে। এই ভিত্তির উপরেই জাতির উত্থানের ও গৌরবের বিচিত্র-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতে হইবে। জাতি আজ গতি চাহিতেছে—বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে জগতের অন্যান্য আত্ম-সম্মান বোধ সম্পন্ন জাতিদিগের মত নিজ পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে। ভারত আজ স্বাধীনতাকামী হইয়া উঠিয়াছে—দাসত্বের ও শৃঙ্খল তাহার পায়ে বড় বাজিতেছে—মন যেন আর এ দুর্ব্বহ পাষাণ ভারের পেষণ সহিতে পারিতেছে না। আজ নিখিল ভারতের অনন্ত জন-সঙ্ঘ ও নেতৃবৃন্দ তাই জাতীয় মুক্তির পন্থা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত! এই পরাধীন জাতির মুক্তির পথ যে কি হইবে তাহার নির্দ্দেশ লইয়াই আজ যত আন্দোলন যত আলোচনা চলিতেছে।

• • • •

নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার বিলাতে কৌন্সিলের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "আমি একজন পরম বৈষ্ণব—কিন্তু স্বাধীনতার পথে যাহা অন্তরায়—আমি তাহা ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা করি। কারণ স্বাধীনতা মানবের শ্রেষ্ঠ ধন। স্বাধীনতা ভিন্ন জীবন ধারণ বৃথা।"

• • • •

দেশবন্ধু আরও বলিয়াছেন "জাতীয় প্রাধান্য ও দেশের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য তিনি দেশের মধ্যে সকলে একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখিতে চাহেন। দেশবন্ধু সত্য কথাই বলিয়াছেন। যুগ যুগান্তের পরবশতায় জাতি ও দেশ আজ ক্ষমতা ও আত্মসম্মানের জ্ঞান একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এ জাতিকে ও দেশকে আত্ম-ক্ষমতা ও আত্ম সম্মান বোধে সজাগ প্রবুদ্ধ রাখিতে হইলে জাতি ও দেশের মধ্যে আত্ম প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য সতত একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা সত্যই জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

• • • •

অ-সহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় দেশবাসী আইন অমান্য করিয়াছিল। আইন অমান্য করিবার ফলে তাঁহাদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা নির্য্যাতন দুর্ভোগও সহিতে হইয়াছিল। দেশের মুক্তি কামনায় জাতির মুক্তি কামনার কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতাকামী যাহারা নামেন তাহাদের চিরদিনই এ দুর্ভোগ লাঞ্ছনা সহিতে হয়। স্বাধীনতাকামী জাতি ও দেশ যদি প্রাণের মমতা ও সম্পত্তির মমতা করিত তবে তাহারা কখনও স্বাধীন থাকিতে পারিত না। জগতের কোন স্বাধীন জাতির ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নাই। মরণকে বরণ করিবার সাহস যাহার আছে স্বাধীনতা লক্ষ্মী সেই জাতি ও সেই দেশের গলেই নিজ অম্লান মালা চিরদিন হাসিমুখে পরাইয়া দিয়া থাকেন।

• • • •

আজ দেশের অনেক নেতাই বলিতেছেন অ-সহযোগ পথে চলিয়া লোকের কষ্ট ও নির্য্যাতন দেখিয়া তাঁহারা এ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন সুগম পথের অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু সে কোন কালেই সম্ভব হইবে না। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে পথেই যাওনা কেন সেই পথেই সহস্র কণ্টক। অসীম অনন্ত কণ্টক রাজ্য পার হইয়া যদি সে অমৃত রাজ্যে পৌঁছান যায়। কণ্টক বেদিয়া ভয় পাইয়া পিছু হটিলে সে অমৃতরাজ্যে পৌঁছানের আশা দুরাশা মাত্রই রহিয়া যাইবে।

আসছে বারে
মিসর-উদ্ধার—হেমন্ত সরকার।

দেশ যদি আইন অমান্যই বরণ করিয়া লয় তবে যাহাদের উচিত আইন দেশবাসী অমান্য করিতে যাইবে তাহারা উলটিয়া ছুটিতেছে দেশবাসীকে তাহা করিতে দিবে না। দেশে একটা ভীষণ বিস্ফোরক অশান্তি আসিবে। আইন অমান্য তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় দেশ সে জন্য প্রস্তুত হয় নাই। অথচ নেতারা অনেকেই যার যার বলিতেছেন দেশ যদি আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইত তবে তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে পুরোভাগে দাঁড়াইতেন। প্রচলিত আইন অমান্য করা ভিন্ন দেশের মুক্তির আর যেন পথ নাই ইহাই সকলের ভাবে ব্যক্ত হইতেছে।

•

অত্যাচার হইলে জাতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিবে না অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইবে ইহা লইয়াও একটা মহা সমস্যা উপস্থিত। অস্ত্রবল যারা যে জাতি সর্ব্বদা লক্ষিত অস্ত্র গৌরবে গৌরবান্বিত যে জাতি তাহার কাছে নিরস্ত্র জাতির আত্মশাসন ও স্বরাজ চিরদিনই হাস্যকর মনে হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। মহাত্মা গান্ধী যখন বলিয়া ও কাগ্রেসে তাঁহার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন 'দেশের সম্মুখে প্রতিকারের অন্য এক প্রকার উপায়ও আছে বটে, সে হইতেছে তলোয়ারের খেলা, যদি তাহা সম্ভব হইত —তবে ভারত অ-সহযোগের এ নীতি মানিতে প্রস্তুত হইত না।' মহাত্মার এ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনও সর্ব্বোতভাবেই রাজনীতিক আন্দোলন। তলোয়ারের খেলা ইহাতে না থাকিলেও ইহা যুদ্ধ—ইহা বরাবরই কথিত হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধে অবস্থা বুঝিয়া সময় সুযোগ সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া নীতি ও রীতির পরিবর্ত্তন সব সময়ই প্রয়োজন হয় তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের শক্তি ও সামর্থ্য বিবেচনায় কোন নীতি পরিহার্য্য কোন নীতি অপরিহার্য্য তাহাই দেখিতে হইবে। দেশের এই সঙ্কট সময়ে যাহাকে চালাইবার যোগ্যতা যাঁহার ছিল তিনি কার্য্যভার। যাঁহার কথা ও কার্য্যপ্রণালী দেশবাসী নিঃসঙ্কোচে নির্ভরযোগ্য বরণ করিয়া লইত তিনি নিজে কার্য্যভার নির্দ্দেশ করিয়া যাহাকে সেই পথে চালাইতেন তিনি আজ জাতির মধ্যে নাই। তাই আজার নেতৃত্বের অভি ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

• • • •

কৌন্সিলে রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া দিবার জন্য পুনরায় প্রস্তাব হইয়াছিল। কোন কোন কৌন্সিলর এ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন কৌন্সিলের মতের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট আর রাজনৈতিক বন্দীদের কতকাল এ ভাবে আটকাইয়া রাখিবেন, উত্তরে ভারতরাষ্ট্র শাসন পরিষদের সদস্য রাজনীতিক অপরাধের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে বিচারালয়ে দণ্ড যাহা একবার বাহির হইয়া গিয়াছে—তাহা উল্টাইবার আবশ্যক কিছু নাই। বিশেষতঃ অসহযোগীরা আবার আইন অমান্যের দিকে জোর দিতেছেন - কখন কি হয় তাহার স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় কি করিয়া রাজনৈতিক বন্দী অসহযোগীদের উপর দয়া প্রকাশ করা যায়। সেন্স কমিটির মতে বোধ হয় রাজনৈতিক অপরাধ ও যাহা গাঁট কাটা, চোর, ডাকাতের অপরাধও তাহাই—সুতরাং উভয়ের বিচার না করিয়া তাহাদের সব এক সঙ্গে ছেলাই ভাল।

• • • •

বিলাতের হাজার হাজার বেকার প্রধান মন্ত্রীর দ্বারে হানা দিয়াছিল। বেকার সমস্যা লণ্ডনে বড় বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেকারের দল এপর্য্যন্ত বলিয়াছে তাহারা এ অবস্থা হইতে সত্ত্ব মুক্তি চাহে। ইহাতে যদি তাহাদের লক্ষ লক্ষ দেহ হইতে প্রাণপাখী বন্দুকের গুলিতে উড়িয়া যায় তবু তাহারা পিছু হটিবে না। অনাহারে বেকার অবস্থায় স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যে মৃত্যু সে বড় শোচনীয় বীভৎস মৃত্যু। এমন মৃত্যু হইতে বন্দুকের গুলিতে মরাও ভাল। বিলাতের এই বেকার সমস্যায় তথাকার রাজনীতিক মহলে যথা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রেরণাই হোক আর যে কারণেই হোক পেটে যখন খাদ্য চায় তখন লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বড় থাকে না। হয় অভাব হইতে মুক্তি—নয় আত্ম হত্যা ইহাই লোকের কামনা হইয়া দাঁড়ায়।

• • • •

বিলাত ধনীর দেশ তথাকার এই অবস্থা। আর আমাদের দেশের অবস্থা বিরূপ। ভারতে কত লোকের বাস—রোগ হয় কতগুণ বেশী। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক

লোকই বোধ হয় পূর্ণ আহার জোগাইতে পারে না—আহার অভাবে তাহারা মলিন বিশুষ্ক অবসাদ গ্রস্ত। পাশ্চাত্যভাবে নিত্য নূতন ব্যাধি পীড়া তাহাদের আক্রমণ করিয়া তব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতেছে। অন্ন সমস্যার মত বড় সমস্যা জাতির অপর কিছুই নাই। ভারতের অসীম জন সঙ্ঘের মধ্যে এক কোটি লোকেও কিছু অমন ভাবে আসিয়া হানা দিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ যদি 'অন্ন দে অন্ন দে' রবে ভারতের বুভুক্ষুর দল আসিয়া হানা দিয়া দাঁড়ায় যদি সুজলা সুফলা ভারতের অন্ন হীন ব্যাধি মণ্ডিত সন্তানেরা অন্ন জোর করিয়া চাহিয়া লইতে যায় তবে কাহারও কাহারও চোখ হয়তো তখনি কপালে উঠিবে—তাহারা হয়তো বলিবে ঐ এল বুঝি বলশেভিজম—ঐ বুঝি দেশ যায়। চালাও এই ক্ষুধিত দলের উপর বন্দুক হাও ইহাদের শেষ করে। কিন্তু মানুষের অন্ন চাহিবার অধিকারই যদি পাপ হয় তবে মানুষের আত্ম-হত্যা করাই কি শ্রেয় নহে। ভারতের নিরস্ত্র বন্দীরা কিন্তু মরে পড়িয়া মরিবে তবু এ ভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ তাহাদের নাই।

• • •

ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি বসিয়াছেন। দিল্লীতে তাহার অধিবেশন হইতেছে। ইউরোপীয় সম্প্রদায় হইতে এক আর্জি কমিটির নিকট পেশ হইয়াছে—সে আর্জিতে তাঁহারা আবশ্যকীয় ব্যয় কমাইবার কথা মোটেই বলেন নাই বরঞ্চ তাহা রাখিবারই পক্ষে গাহিয়াছেন। অথচ ভারতীয়েরা বলিতেছে সৈন্য পরিপোষণের ব্যয় ১৮৭৬, ৭৭সনে যেমন ছিল ১৬ কোটি টাকা আবার তাহাই করিলে ক্ষতি কি। বাজেটে এ কারণে কেন আয় ৬৬ কোটি টাকা ধরা হয় ও ব্যয় করা হয়। পুলিশের ব্যয় এত বাড়াইবারই বা আবশ্যক কি। হাজার হাজার মুদ্রা বেতন দিয়া বিদেশী আনিয়া ব্যয় বাহুল্য করিবার অর্থ কি সে কাজ তো ভারতীয়দের দ্বারাই চলিতে পারে।

• • • •

আমাদের দেশে নানা কমিশন বটে—বসিবার পূর্বে ও বসিবার সময় খুব নাম শোনা যায় পরে যখন তাহার ফল বাহির হয় তখন দেখা যায় এ পূর্বেও যে অবস্থা ছিল পরেও তাই রহিয়া গিয়াছে—কোন পরিবর্তন নাই। তখন মনে হয় ইহার সার্থকতা কি! কি-সকাল কমিশন বসিয়াছিল তাহাতে দেশের খরচ হইয়াছে বোধ হয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচটাকা মাত্র। অথচ কাজ কি হইল দেশের ইহাতে!

• • • •

আইন অমান্য তদন্ত সমিতিতেও দেশের বিখ্যাত বিলাসী বড় বড় পণ্ডিত ও মান্য লোকেরা ছিলেন। ইহারাও নিখিল ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন ও রিপোর্ট দিয়াছেন ইহাদের খরচ হইয়াছে মোট বার হাজার একশ' চল্লিশ টাকা মাত্র। খরচের পার্থক্যটা একবার দেখুন।

• • • •

এককালের সুরেন্দ্রনাথের গৌরবের বেঙ্গলী পত্রিকা আজ তাঁহার হস্ত-চ্যুত। জাতির নেতা সুরেন্দ্রনাথের সময় বেঙ্গলী একসুরে গাহিত। সার সুরেন্দ্রের বেঙ্গলী এক সুর গাহিত—এখন হস্তচ্যুত বেঙ্গলী পত্র অপর ভাবে গাহিতেছে। হস্তচ্যুত বেঙ্গলীর মারফৎ আজকাল বাজারে অনেক নূতন খবর বিলি হইতেছে।

• • •

এ যুগে আমরা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা বড় গলায় সব সময় কহি। অপরের নিকট হইতেও তাহা চাহি—আপনাদের মধ্যেও তাহা দেখিতে চাহি। না পাইলে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হই ও মানুষের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দর্শনে ম্রিয়মান হই। সত্য সব সময় উদ্ঘাটিত করিতে চাহি—মিথ্যার ঘোমটা দূরে পরিহার করিতে চাহি। মুখে এই সব উচ্চকথা সর্বদা বলিয়া কার্যতঃ যখন তাহার বিপরীত আচরণ করিতে যাই তখন লজ্জা সঙ্কোচে অনুভব করি। সম্প্রতি বাংলা দেশেরই কোন খ্যাতনামা সম্পাদকের এইরূপ আচরণ শুনিয়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি। শুনিলাম—ব্যাপারটি এই—কিছুদিন পূর্বে বাংলার একখানি মাসিক পত্রে বাংলা দেশেরই কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের একটি অতি সুন্দর গল্প বাহির হয়, তেমন সুন্দর গল্প বোধ হয় সাহিত্যে অতি অল্পই বাহির হইয়াছে। গল্পটি প্রকাশিত হইবার পর কোন সমিতি হইতে লেখকের নিকট প্রস্তাব যায় যে তাঁহারা গল্পটিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করিয়া ছাপিতে চাহেন; তাহাতে সমিতির হিতসাধন কার্যের সুবিধা হইবে। গল্প লেখক তাহাতে অনুমতি দিলে গল্পটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন কোন বিখ্যাত

ইংরেজ সাহিত্যিক। ইংরেজী অনুবাদটি কোন ইংরেজী মাসিক পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইলে সম্পাদক লিখিলেন "আমি—ধর্ম্মের লোক—সুতরাং লেখকের লেখা গ্রহণ করিতে পারি না কোন মতেই আমার কাগজে। সম্পাদক এ স্থলে গল্পের গুণ বিচার করিতে না গিয়া সাহিত্য রাজ্যে লোক বিদ্বেষ ও নিজ ধর্ম্মনীতির প্রাধান্য দিলেন। ধর্ম্মের চেয়েও ইহাতে লেখকের উপর ব্যক্তিগত বিদ্বেষই ফুটিয়াছে বেশী! কোন নীতি অনুসারে—সম্পাদকীয় নীতি না ধর্ম্মনীতি অনুসারে ইহা অনুমোদনীয় তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে সক্ষম। হয়তো পরে এ ব্যাপারের নীরবই বিশদ আলোচনা হইবে আমরা শোনা কথা এই টুকুমাত্র শুনাইয়া রাখিলাম! এমন ব্যাপারও শিক্ষিত সমাজে এ যুগে চলে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!

• • •

সেবা কার্য্যে রামকৃষ্ণ মিশন চিরদিনই অগ্রণী। কিন্তু সম্প্রতি মিশনের কর্তৃপক্ষ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উত্তর বঙ্গের বন্যা লইয়া যে পত্র বিনিময় হইয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই দেশের পক্ষে কলঙ্কের কথা। রামকৃষ্ণ মিশন নিজকার্য্য কিছু আর করিবার না থাকিলে বন্যা বিধ্বস্ত স্থান হইতে চলিয়া আসিলেই পারিতেন। তাহা লইয়া সংবাদ পত্রে তাহাদের এ ঘোষণা করিবার কারণ কিছু ছিল না যে বন্যা বিধ্বস্ত স্থানে সাহায্য করিবার আর কোনও আবশ্যক নাই। আমরা জানি সাহায্য করিবার আবশ্যক এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে।

• • • •

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান রাজ্যচ্যুত অবস্থায় ইংরেজের আশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। ইংরেজও তাহাকে সাদরে আশ্রয় দিয়াছেন। মাঝে কথা উঠিয়াছিল তাঁহাকে ভারতে আনা হইবে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের রাজ্যচ্যুত খলিফার প্রতি ভক্তির তেমন অনুভূতি বুঝিতে না পারিয়া ইংরেজ ঘোষণা করিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব খলিফাকে ভারতে আনিবার তাহাদের কোন অভিসন্ধি নাই। সুলতান নিজ ক্ষমতায় মুসলমানের ক্ষমতা গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এই আশাই মুসলমানেরা খলিফের নিকট করেন—অপর শক্তিবর্গের হাতের পুতুল হইয়া তিনি খলিফ নাম বজায় রাখিবেন। এ আশা কেহ করেন না।

• • •

সুদেন কনফারেন্সে এ্যাসোয়া গবর্ণমেণ্টের ভাগ্য নির্ণয় হইবে। প্রণালী, তুরস্কের সীমা ও সামরিক বিষয়ের আলোচনার সভাপতি হইয়াছেন ইংরেজ—তুরস্কে বিদেশীদের ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা হবে তার সভাপতি হবেন ইতালী, রাষ্ট্র রক্ষার রেলওয়ে রক্ষিত প্রভৃতি নিয়ে যা আলোচনা হবে তার সভাপতি হবেন ফ্রান্স। কনফারেন্স যারা ডেকেছেন তারাই সভাপতির কার্য্য করবেন। সুতরাং তুর্ক এখন নীরব। সুদেন কনফারেন্সের ব্যবস্থা দেখবার জন্য জগত উন্মুখ!

• • • •

এইবার হইতে ভারতীয় কৌন্সিলগুলি বোধ হয় বিলাতের পার্লামেন্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ হইবে। অন্ততঃ বাংলার লাটসাহেবের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় সেই আভাষই পাওয়া যায়। দেশের লোক এখন কৌন্সিলের পার্লামেন্টারী রীতি দেখিবে।

বয়েল গাড়ী

[শ্রীহরদয়াল প্রসাদ দাসগুপ্ত]

কাচ কাচ কাচ—আমি বয়েল গাড়ী—শ্রীশ্রীবয়েল গাড়ী—তোমরা আমাকে প্রণাম কর। কেন? আমি বিশ্ব সনাতন—যেদিন হইতে মানুষের প্রাণাহারের কথা তার যানের প্রয়োজন হইয়াছে সেইদিন হইতে আমি আছি পরেও থাকিব—অতএব তোমরা আমাকে প্রণাম কর। আমি নিরাকার—আমার আকার-জ্যামিতির কোন আইন কানুন সূত্রে ধরা পড়ে না—অতএব আমাকে প্রণাম কর। আমি নির্ব্বিকার,—রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে যাহা ছিলাম আজিও তাহাই আছি, কালপ্রভাবে আমার কোনই বিকার বা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এবং আমার পক্ষে সোণার বোঝা, চিনির বোঝা বা গলিত শবের বোঝা সকলই সমান—অতএব আমাকে প্রণাম

করি। "আমি অবশ্য,—তোমাদের আধুনিক যান বাহনাদি পুষিতে এবং চালাইতে যাহা ব্যয় বা খরচ পড়ে তাহার তুলনায় আমার ব্যয় কিছুই নয়, ঘাটে মাঠে বনে বাদাড়ে যেখানে ইচ্ছা আমাকে ফেলিয়া রাখিতে পার, শুধু ঘাসের জমি, চোরের ভয় না থাকিলেই হইল—অতএব তোমরা আমাকে বার বার প্রণাম কর।

"তোমরা ভাল লাগিতেছে না আমার এই ক্যাচ্ ক্যাচ্!" কি করিব, নাচার! আমি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ঐ একই বুলি শুনিয়াছি,—আর কিছু শুনিতে পাই নাই, শিখিও নাই। হাটে বাজারে মেলায় মাঠে রাস্তায় ঘাটে কাঁছারী ইস্কুল আদালতে সভাসমিতি বৈঠকে "থিয়েটারে বায়স্কোপে" কবি পাচালী আজ্ঞা গুলতুনিতে ঘরে বাহিরে স্ত্রীপুরুষ ছেলেবুড়ো সকলেরই মুখে শুনি, ঐ এক ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ। আদালতে উকিল

আস্‌ছে বারে
প্রেম-অভিযান পর্য্যায়ের প্রথম স্তবক
নীলা—জ্ঞানচক্রবর্ত্তী।

বক্তা সভায় জনমণ্ডলীকে হিলেন তোমরা সবাই শুনিতে ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—যেহেতু আমার সভাপতি করিয়াছ, আমার একটা নমস্য নই করিয়াছ—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্। ডাক্তার কবিরাজ রোগীর নাড়ি টিপিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিবার পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা করিয়া বলেন "ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্ আমার কি দায়"; গৃহিণী নথ নাড়িয়া স্বামীর কোঁচাইয়া কর্ত্তাকে বলেন "ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—আমার হীরার নেক্‌লেস চাই"; ছেলে চোক রাঙাইয়া বাপকে বলে, ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—আমার বিলাতী সাইকেল চাই রিম্‌লেস্ চশমা চাই"; এমন কি মেছুনী পর্য্যন্ত বধূমেয়ের গায়ে জল ছিটাইয়া চোক ঘুরাইয়া বলে "ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্ সরে পড় না বাপু, কেন মিছে ক্যাচ ক্যাচ্ করা"—"ক্যাচ্ ক্যাচ ক্যাচ্"—কত আর বলিব, কল কথা যেখানেই যাও সর্ব্বত্র ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাকেচক্রে ঐ একই কথা—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—অর্থাৎ "কাণা কপির ভিখ মাগে যে বাবা।" তবে আর আমার দোষ কি?

আমি গরিব গোবেচারী তাই কি আমার যত দোষ? আমি তার বহন করি? করিলামই বা! তোমরা কি কর না? গরিব ধোপার গাধা হইতে সুরু করিয়া তোমার রাজা মহারাজা লাট বেলাট অবধি কে না আর বহন করে? একবার দিব্য চক্ষে দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখ দেখি—দেখবে কেউ বাদ নাই, "চোর যাচ্ছতে গা উজোড়।" একদিন বেলা ন'টার সময় হাওড়া পুলের উপর দাঁড়িয়ে থেকো তো ভাই,—দেখতে পাবে দলে দলে কাতারে কাতারে ধাপারে ধাপারে গরিব ভে'লি-প্যাসেঞ্জার কেমন চলেছে,—তাদের মুখপানে চাই-লেই বুঝতে পারবে ব্যাচারীরা দুঃখের ভারে চিন্তার ভারে একেবারে নুয়ে পড়ছে, সবাইকার মুখে বিপদের ছায়া কাঁক মুখে এতটুকু হাসি নাই। বুনিয়াদি বড়-মানুষরা যেমার ভারে নুয়ে আছে, নতুন বড়মানুষ কণ্ডা-গিন্নী ভুঁড়ির ভারে, মেদের ভারে কহিল, গরিব গেরস্ত ভাবনার ভারে চাকরের ভারে ম্যালেরিয়ার ভারে ব্যতি-ব্যস্ত, অধ্যাপক টিকির ভারে বাবুনাবুর বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার পসারের ভারে বিব্রত, নতুন বা চাকরে ভারে রাহী তাক ছাড়ছে। সাহেবেরা হুইস্কীর ভারে ইউনিফরমের, নেটিভরা পিলের ভারে কাবু মাদ্রোয়ারী

যোক্তার সামলা মাথায় দিয়া দাড়ি নাড়িয়া হাতমুখ খিঁচাইয়া হাকিমকে বলেন—"আমার মক্কেল নির্দ্দোষ—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—যেহেতু আমায় পয়সা দিয়াছে—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্"; ইস্কুলে মাষ্টার মহাশয় নাকের ডগায় চশমা পরিয়া বেতের চোটে ছেলের ভূত ভাগাইয়া বলেন—"পড় পড় পড় 'কি ইউ টী বাই' 'পি ইউ টা পাই'—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—তোমার চাকরী মিলিবে, আমার চাকরী বজায় থাকিবে—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্"; বাজার গোক কামান মা ষষ্ঠোরা নাকিসুরে বলেন—"বাবা ধীর ছেড়ে দে, কি নিমন্তে আমার ইস্তের কষ্ট গ্রহণ কর—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—(জনান্তিকে অগত অধিকারীর প্রতি)—বেহাই মেরে শালা, বড় কিপ্টে পেয়েছে—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্" থিয়েটারের নটী নয়নের ওঁড়া মুখে মাখিয়া খুঙুর বাজাইয়া দর্শক বিশেষকে ইঙ্গিত করিয়া সভোগে গাহে—"লেও সাকী দো তর পিয়ালা—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—অর্থাৎ যে ভাংলে আমার বাড়ী এলো কিছু টাকা আর গয়না নিয়ে, আর পারতো একটা বোতল—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্"; ভণ্ড দেশ হিতৈষী চাঁদার খাতা খুলিয়া গরিব গৃহস্থকে বলেন—"তোমার আজকের ভাতটী আমায় বেচে দাও—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—যেহেতু আমি তোমার চতুর্দ্দশ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতেছি আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই—ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—

পাশী ইহদীরা বুঝির ভারে বাঙ্গেহালী কে নয়?—তাদের টিটিগুলা ছাপের ভারে, ভক্তপোষগুলা ছারপোকার ভারে, বাজারের নক্সেল ও বাসিকগুলা ছবির ভারে নিতান্তই কাবু নয় কি? এমন কি লোগাগাহীব বারাণসী পর্য্যন্ত সোনাদানোর ভারে বিব্রত। তদুপরি আমার বৈজ্ঞানিকরা বলেন সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই বায়ুর একটা বিষম ভার অষ্টপ্রহর বহন করিতেছে, সাধুরা বলেন ভক্তের ভার বহন করে বলে ভগবান ব্যাচারীরও একমুহূর্ত্তের মুক্তমুৎ নাই। তোমরা স্বীকার কর আর না কর আমি তো দেখি তোমরা সবাই আমার ভগবান মাত্র,—আসলে তোমরা সবাই আমি—অর্থাৎ বয়েল গাড়ী। এ দ্বারা—আরও প্রমাণ হচ্ছে যে আমি সর্ব্বব্যাপী,—অতএব তোমরা আমাকে আর একবার প্রণাম কর। বিশেষ তোমরা ভার বহন কর নিজের জন্ত আমি ভার বহন করি তোমাদের জন্ত। তোমরা স্বার্থপর, আমি পরার্থপর—সে কালেও আমি তোমাদের নমস্ত।

ভাবিয়াছ বুঝি মোটাকত মটর গাড়ী মোটর লরি এরোপ্লেন আনিয়া আমাকে তাড়াইবে? তা হয় না বাপু তা হয় না।" তোমাদের ঐ সব আনুষঙ্গিক জঞ্জালগুলা কি জান? ওগুলা কতকগুলি জমাটবাঁধা নিছক মিথ্যা,—নিজের মনকে তথা পরস্পরকে চোক ঠারবার ব্যর্থ চেষ্টা-মাত্র। ওই যে তোমার মটরের ভেঁপু আর ঘই ঘই তাল করে কাগজেতে শোন দেখি, ওর ভেতরেও শুনতে পাবে সেই পুরাতন নিত্য সত্য সেই ক্যাচ্ ক্যাচ্ ক্যাচ্—মূলে সেই ভার বহন। তোমরা তো বুঝিবে না, বুঝিলেও স্বীকার করিবে না। তোমাদের আর কত বুঝাইব?—

"অবোধকে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকীরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।"

আসাইবরণ্ডীত জীবন্ত ভাস্কর।

তোড়া

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ]

সাড়ে চুয়াত্তরের কথা

আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন যে সকল রাজপুতবীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন, কথিত আছে যে তাহাদের সকলের উপবীত খুলিয়া আকবর নাকি তাহা ওজন করিয়া ছিলেন। ঐ সকল পৈতার ওজন ৭৪॥০ মণ হইয়াছিল। সেই হইতেই পায়ের শেষ পিঠে রাজপুতগণ এই অঙ্ক লিখিয়া দিতেন। ঐরূপ পত্র নাকি পত্রের অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ খোলে তাহা হইলে চিতোরের নরহত্যার পাপ তাহার লাগিবে সকলেরই এরূপ একটা প্রবল বিশ্বাস ছিল। এ সংস্কার কালের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের নাগপাশ-বদ্ধ বাঙ্গালা দেশেও যে না পৌঁছিয়াছিল তাহা নয়।

যুবরাজের পত্র-সংখ্যা

ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রত্যহ দৈনিক গড়পড়তা পত্র পান। কোন কোন সময়ে পত্রের সংখ্যা ১৫০০পর্য্যন্ত হয়। ভারতবর্ষে আসিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে তিনি দৈনিক ২০০০ পত্র না কি পাইয়াছেন।

খুচরা খবর

দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা হইতে সুধার ন্যায় দুগ্ধ পাওয়া যায়।

মক্ষিকার বল এক ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের একভাগ মাত্র দীর্ঘ।

চীনে প্রথম ছাতি প্রস্তুত হয়।

লণ্ডনের অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে একদিন এক বৃদ্ধার পৃষ্ঠে এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখা গিয়াছিল—"চাকুরী চাই! যদি আহারও জানা থাকে, দয়া করিয়া আমাকে ডাকিবেন।"

আমেরিকার লোকেরা খুব বড় নখ করে। এমন কি অনেক সময়ে স্ত্রীলোকগণ রৌপ্য দ্বারা নখ বাঁধায়।

পাখীর না কি দাঁত থাকে না।

ব্রিটিশ যাদুঘরে ১৬,০০০ খণ্ড বাইবেল আছে।

যুক্ত-সাম্রাজ্যে প্রায় ৩০০০ মহিলা মন্ত্রী আছেন।

যুক্ত-সাম্রাজ্যে ৩০,৭০৬ জন অন্ধ আছে।

চিকাগোর এক কটিশীলা রমণী স্বামী ত্যাগ করিয়াছেন। অপরাধ?—স্বামী, তাহার শিশু কন্যার মিষ্টি চুরি করিয়া খাইয়াছে'।

দেশ-বিদেশের।

বর্মার ডরিস্, সি ব্যারার্ডের কথা বিলেস্ বেলা খুব খুশিয়ার হাল, বাজারে খবর কেলা পরিবর্তন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে [illegible] আসে মাত্র অধিয়ার ষ্টেজ পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭৫ হাজার টাকা এজন্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

এই অধিবেশনে মাদ্রাজ খ্রীষ্টিয়ান সাহিত্য সমিতির ও বলের ইংরেজিমাধ্যম করুক—ইহাই আমাদের কামনা।

[illegible] এক অধিবেশনে মহীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইংলণ্ডস্থ বিদেশীয়দের সেবা করিবেন। ডক্টরের উচ্চ শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়াছে বিলাত হয়। যাহারা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে বিলাতযাত্রার অর্থের বিষয় আলোচন করিতে হইবে। আহার খরচাদি বাদে মাসে ২০০ টাকা ব্যয় হইবে।

ফুলপুরী নূতন দণ্ডবিধির ধারায় অপরাধকে যে ব্যয় হইবে তৎসম্বন্ধে মুদ্রিতের দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলোর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে মোশাতে ব্যাকলীন বলেন, ফুলপুরী গুলতানের ধারার অবমাননাকালে যে টাকা বিলাত পক্ষে ব্যয় হইবে, তাহার কি পরিমাণ অংশ মুদ্রিত ব্যবস্থেট বহন করিবেন এ সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা হইতেছে। ফুলপুরী গুলতানের নিজের কি পরিমাণ অর্থ আছে তৎসম্বন্ধেও তদন্ত চলিতেছে।

অভিনেতাদের সে ইংরিসিনাটোর ছুরা-বিদ্যা-বাহক এক্সন ব্যক্তির গত ৮ই মার্চের বক্স 'বলিই' টীম যে ক'রয়ু ব'ষীপুরের থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল, তখন তাহাদের পাশ্ববর্তী একটী বৃদ্ধাকে পাওয়া যাইতেছে না। ইনি বিনা তৎকর্ণে একটী বনা লইয়া জলে লাফাইয়া পড়ে এবং ইংরেজীতে ছইয়ে উঠে বটে। আর কিছুক্ষণ জলে থাকিলে ইনোকটি মারা যাইত।

১৯১৯ সালে প্রথমতঃ পাঞ্জাবী লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রচারের সময় পাঞ্জাবে একটী বেশী বিলাতী পর্দা প্রথা ছিল। স্বয়ং লাটপত্নী বিদেশ ভক্ত সমাজসেবী। শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্তচৌধুরী মহাশয়ের পত্নী স্বর্গগতা শ্রীমতী সরলা দেবী সেই প্রতিনিধির একজন "মেম্বর" ছিলেন। ১৭ই নবেম্বর, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাব সরকারের হুকুম রামভুজ-গৃহ বিশ্লেষিত হয়। ঠিক তাহারপরই লাটপত্নী হুকুম বাহির করিলেন যে, শ্রীমতী সরলা দেবী যে ক্লাবের মেম্বর, তিনি সে ক্লাবে থাকিতে পারিবেন না, কেন না সরলা দেবী বিবাহিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর স্ত্রী। অবশ্যই বেশী বিলাতী মহিলা মেম্বর আমনি সরলা দেবীকে ক্লাবের সভ্যপদ ত্যাগ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা বিলাতের কি প্রত্যুত্তর অপেক্ষায় ছিলাম: ৩ ৩ যে সব মহিলা সরলা দেবীকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন নাকি, আজকাল Y. W. C. A. আন্দোলনের বড় প্রচারক—তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু ও মেয়ের বাড়ী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। আজব তাহাতে সবই সম্ভব।

—(আনন্দবাজার)

বিটিশিলন মোটরে ১লাইয়া ২৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করায় আপনারে ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারার্থে ও মাইকেল উইলিয়ম ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ব্রাকবর্ণ ও ডাবের উপর সেবার ভারও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে আরবিনকে খালাস দিয়াছেন।

মামলা ২৭ মাস চলিয়াছিল। মাইকেলের মতে লাভারের পক্ষে মোট ৭ লক্ষ টাকা মামলার খরচ করিয়াছেন।

পাঠকের সরল থাকিতে পারে যে ব্রকবার্ণ ও মে, সি, ব্যানার্জী এই মামলাতেই অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তবের বিষয় দু'জনেই মুক্তি পাইয়াছিলেন।

পাঞ্জাবে এই মাসেই একসঙ্গে পাঁচটী সভার সভব করিয়াছেন। তবু তাহাই নহে "ছেলেগুলিও জমণী সভাতেই যেন যুদ্ধ আছেন। ঘটনা অধিবাসে অধিবেশ কেন করা নাই, কেবল সুখময় বিরামের মোটকের ভিন্ন মেয়েরিয়াল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্তা দেখা চাহার।

গ্রীসের কুতপূর্ব মন্ত্রীগণের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। মোশাতে, ট্রাটেস, ডাউোপাপা চাকিস, ভিওরোকিস, ভাসটাটিস ও জেনারেল লাস্কিস বিচারে, ইহাদের একলেই প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। ডাক্তারিয়াল মৌতান ও জেনারেল ট্রাসিলাস ইহাদের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে এই সঙ্গে ইহাদের প্রতি ধর্ম্মাধিকারীর ও আদেশ হইয়াছে।

গ্রীসের বরজন কুতপূর্ব মন্ত্রীর বন্ধুগণের উৎসাহে প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে।

রামবাগান মাধী সমিতি যে আত্মবিক্রয় লইয়া বিদ্যা সাধারণ কাজে অগ্রণী হইয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেদিন তাঁহারা তাঁর থিয়েটারে অভিনয় করে ২১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অভিনয়ের ব্যয় যে ৪১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী একাই বহন করিয়াছেন।

খেত হত্যা :—ক্লিভল্যাণ্ডের পশ্চিমে প্রপাত, পা পো ষ্টেট নামক বাসিন জেলার অধিবাসী এক ব্যক্তি একটী শ্বেত হত্যা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৎসর বৎসর পূর্ব্বে এই বাসিন জেলাতেই আর একটী শ্বেতহত্যা করা হইয়াছিল।

আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। একটী বর্ণও পরিবর্ত্তন করি নাই।—সঃ

শ্রীযুক্ত সম্পাদক "বাসরী"

মহাশয়েষু—

কোন এক-নামজাদা actorএর স্ত্রী, তাঁহার কোন ছবিটীকে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী আমার নিজস্ব পাঠকবর্গের আশ্রমমধ্যে ভালমন্দ বিচার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়ে যে প্রবন্ধটী তাঁহার নামে ছাপা হয়, তাই যাচা হইয়া আমার নামে দিতে হইল। এখন থিয়েটার যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থান দেন, তবে বাধিত হইব। যদি একথায় থিয়েটার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখুন তবে দেখিবেন যে লেখিবার কথা সত্য। এ সম্বন্ধে বেশী লেখা আবশ্যক হইবে না। ইতি বিনীত নিবেদক—শ্রীহরিদাস বেদবর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক "বাসরী"

মহাশয়েষু—

মহাশয়, আপনার সুর থিয়েটারের কথা এবং অনেক থিয়েটারের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতেছি যে ইহা আগে আপনাদের পত্রিকা লাভের লেখা উচিত নহে। আপনারা থিয়েটার দেখিয়া আসেন শ্যাম, তখন বেশ প্রফুল্ল মনে, ঐ সম্বন্ধে যাহা ভালবোধ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আপনারা তখন actor লাভের শ্রীমুখের বিষয় একবার চিন্তা করেন কি? এমন খুব কম actressএর স্ত্রী আছেন, যাঁহারা সুশিক্ষিত মাতাল স্বামীর হাতে লাঞ্ছনা প্রাপ্ত না হন? যেদিন হইতে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে যাত্রা বিদ্যা থিয়েটার আরম্ভ হইয়াছে সেদিন হইতে actorএর শ্রীমুখের সুখ ও চলিয়া গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়। আপনি বলিতে পারেন কি ২।১ জন (বিদ্যমান অথবা মৃত) অভিনেতা এখন কোন actor দেখিয়াছেন কি যে তাহারা মাতাল না হইয়া বিয়াছে? যদি আপনাদের অভিমত প্রকাশ করিতে হয়, তবে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব। আজ আর বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না, যদি উহার বিষয় লিখিতে ভবে পুনরায় ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব।

শ্রীহরিদাস বেদ বর্ম্মা।

খেলার সাথী

[শ্রীউমাপ্রসন্ন দে, বি-এ]

সেদিন কাছারী হ'তে ফিরেই বাবা মাকে বল্লেন "কি গো একবার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এলে হতনা? অনেক দিন যাওয়া হয়নি।"

মা তখন সেলাই নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলেন, মুখ নীচু করেই বল্লেন "তা তোমরা জান—বাড়ী যাওয়া-না যাওয়া তোমরা বোঝ, এ কথা জিজ্ঞেস করবারও কোন-কিছু দরকার ছিল না—আমার মত নিয়েই সব সময় কাজ হচ্ছে, কিনা?"

"আচ্ছা, আজ হ'তে না-হয় তোমার কথা-মতই চল্‌ব;—এখন বল, তোমার কি মত?—যাব, কি, না?"

"তাই যদি হয় তবে মতটা বল্‌তেই হ'ল,—তোমার যা' ইচ্ছে আমারও ঠিক তাই।"

"বাহবা, বেশতো; মত জিজ্ঞেস করি তোমার কাছে, তুমি বল্‌ছ কিনা তোমার মতেই আমার মত। আচ্ছা, সিদুকে জিজ্ঞেস করে দেখি।"

আরও—
একটি মনমুগ্ধকর গল্প
ভুলের মূল—বিজয় মজুমদার

বাড়ী যাওয়ার কথা উঠ্‌তেই খেলা ছেড়ে ছুটে এসে নিবিষ্ট-চিত্তে কথা গুলো শুন্‌ছিলুম। শেষটা সব ভার পড়্‌ল কিনা আমার উপর। হঠাৎ একটু গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করে বল্লুম "বাবা, তা, ছেলে মানুষ আমি কি বল্‌ব? তোমরা সবাই যদি যাও তো যাব, নইলে এ বিদেশেই পড়ে' থাক্‌ব।" কিন্তু মনের হাসি চেপে যাওয়া সহজ নয়—আপনিই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। বাবা বল্লেন "কিরে সিদু, তোর মুখে যে আর হাসি ধরে না। বাড়ীর নামে পাগল হয়েছিস্ বুঝি! আচ্ছা, এবার বাড়ীই যেতে হচ্ছে, কাল হ'তে অফিস বন্ধ; সোমবার দিন রওনা হব—তোরা সব তৈরী হ'য়ে থাকিস্।"

রাত্তিরে বিছানায় শুয়েছি—কিন্তু আজ চোখে ঘুম নেই। বার বার ঘুরে ফিরে কেবলি বাড়ীর কথা মনে হয়। যে জিনিষটা চোখে দেখা যায়না মনের আলোতে তা' বড় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। চার বছর হ'ল বাড়ী-ছাড়া—তাই বাড়ীর মমতা বেজায় বেড়েছে। যতদিন যায় সে পুরানো স্মৃতি-গুলি ততই মধুময় হয়ে দেখা দেয়। চার বছর আগে—বাঃ কী আরামের দিনই না গিয়েছে! স্কুল থেকে এসে জলখাবার টুক্ খাওয়ারও একটু অবসর থাকতনা। বাইরে হরি মল্ল, ভোলা টেনা সব দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর হৈহৈ রৈ রৈ করে বুড়ি-মজর ও হা-ডু-ডু খেলে বাড়ীটিকে মাতিয়ে তুল্‌তাম্, এক একদিন দৌড়াদৌড়িতে কাপড় ছিঁড়ে যেত—মা বেজায় বক্‌তেন। কিন্তু কার কথা কে শোনে? তার পরদিন আবার যে-সেই।

তারপর একদিন হঠাৎ চলে আস্‌তে হ'ল। হরি, ভোলা, টেনা ষ্টেশন পর্য্যন্ত পিছু পিছু এলো। সকলে নীরবে কালো হ'য়ে দাঁড়িয়ে। বিদায়ের বেদনা সবারই মুখের হাসি লুটে নিয়েছে। ট্রেণ যখন ছাড়ে-ছাড়ে তখন টেনা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্লে, "তুই যাচ্ছিস্ বুঝি ভাই, সিদু। সেখানে নতুন-নতুন কত সাথী জুটবে। তাই ব'লে আমাদের ভুলে যাস্‌নে কিন্তু—আর পারিস্ তো মাঝে মাঝে চিঠি দিস্।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চোখ দুটী জলে ভরে এল, ট্রেণ ছেড়ে দিল; ওরা সব আকুল হ'য়ে চেয়ে রইল।

এসব কথা—এ-সব ছোট-ছোট হাসি-কান্নার ইতিহাস আজ একটা অস্পষ্ট ছবির মত—একটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। তা' যাক্—এবার তো যাচ্ছিই আবার! এবার দেখে নেব কে কত খেল্‌তে পারে, নিকটা ভারী পাজি—ওকে কিছুতেই আঁটা যায় না—যেমি করেই হোক্" এবার নিকুকে জব্দ করতেই হ'বে। প্রথমটা ওর সাথে কথাই বল্‌বনা—একেবারে আড়ি!

এমনি সব ভাব্‌তে ভাবতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। চোখ দুটী কোন সুযোগে বুজে এলো, তা, জানিনে।

(২)

পোড়া রাত্তিরটা শেষও হয় না। শুয়ে শুয়ে কেবলি রাত্তিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিলাম। সত্যি বড় স্বেচ্ছাচারী এ গুলো, নিজের মনে গরুর গাড়ীর চাকার মত ঘুমুতে ঘুমুতে চলেছে। কারো কথাটাও শুন্‌বেনা। অত করে বল্‌ছি, একটু তাড়াতাড়ি বিদেয় নিয়ে ভোরের আলো ছড়িয়ে যাও—আজ, শুধু আজকের জন্য একটু

আলো—তা'লে মোটেই গ্রাহ্য কচ্ছেনা,—বরং একটু দেরী করেই যেন যাচ্ছে। হরি, নিরুর সাথে দেখা কর্ব্বার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছি, আর রাত্তির হতভাগার একটু হুঁশও নেই! কি অন্যায়! কাল রাত্তিরে এসেছি, ওদের সাথে দেখা কর্ব্বার সুযোগ-সুবিধা যে এখনও জোটেনি।

যেই পূব আকাশে একটু মিটমিটে আলো দেখা দিল, অমনি আমি বিছানা হ'তে উঠে বল্লাম, মা বাবা দিয়ে যত্নের "এখনো যে রাত্তির রয়েছে—এত ভোরে কোথা যাচ্ছিস্?" উত্তর দেওয়ার অবসর ছিল না—একদৌড়ে বাহির-বাড়ীতে, কিন্তু কই, তখনো তো একটী ছেলেও আসেনি!—সব চুপ চাপ—একেবারে নিঝুম—কোন দিকে সাড়া-শব্দ নেই। আমরা যে এসেছি ওরা বুঝি এখনো টের পায়নি, তা'হলে নিশ্চয়ই এসে এতক্ষণ হট্টগোল সুরু করে দিত।

কি আর কর্ব্ব! একা—একা, একটু ভয়ও কর্ত্তে লাগ্‌ল। তাই বাধ্য হয়ে আবার ঘরে ফিরে গেলুম।

দুপুর বেলা "চোর চোর" খেল্‌ছি। টেনা দেবার এমি পালাল যে কেউ আর তাকে খুঁজে বা'র কর্ত্তে পারে না। সন্ধ্যারই হার মান্‌তে হ'ল। টেনা শেষটা বেরিয়ে এসে বেশ বাহাদুরী নিচ্ছিল। আমার কিন্তু আর সহ্য হল না, বল্লুম "আজ যদি নিরু এখানে থাকৃত তবে বোকা যেত তোমার ওস্তাদি," হরি পাশে দাঁড়িয়েছিল, নিরুর কথা মনে পড়তেই তাকে জিজ্ঞেস্ কর্লুম "হ্যারে হরি, নিরু এখনো আস্‌ছে না যে,—কোথাও গেছে বুঝি?" "কেন সে তো এসেছে—অনেকক্ষণ—হ্যাঁ ঐ তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

চারিদিক চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলুম—কই কোথাও কেউ নেইতো!

"ঐ যে দেখ্‌ছনা—ঐ যে; ঐ যে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই নিরু, দিদুবাবু তোকে ডাক্‌ছে, শুনে' যা—খুব্‌লি।"

আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বেস হ'লনা এ যে খিট্‌খিটে, নেংটী-পরা একটা ভিখারীর ছেলে, মুখ খানা কালো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিরু হ'লে এতক্ষণ চুপ করে' এম্‌নি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকৃত না, ছুটে এসে হৈ-চৈ সুরু ক'রে দিত। আর নিরুর এ অবস্থাই বা হবে কেন? গায়ে নেই কাপড়, মুখে নেই হাসি—দেখ্‌তে যেন দস্তুরমতের উপোসী।

"যাঃ যাঃ তোরা সব চালাকি কচ্ছিস্—আমায় বোকা পেয়েছিস্ বুঝি! আমায় এতটা বোকা মনে করিস্‌নে।" ওদের চালাকি বুঝতে পেরেছি বলে' বেশ একটু হেসে নিলুম। কিন্তু আবার ভাল করে' চেয়ে দেখ্‌তেই কেমন যেন একটা খটকা এল,—এ যে অনেকটা নিরুরই মত!

ধীরে ধীরে পাশে গিয়ে দেখি—হাঁ, নিরুই তো! কিন্তু এমি চুপ করে যে! বিশেষ-কিছু ভাববারও সময় ছিল না, একেবারে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্লুম, কিন্তু সে তখনি সড়াৎ করে' সরে' গেল, "ওকি কচ্ছেন দিদু-বাবু, আমাদের ছুঁতে নেই—আমরা যে ছোট লোক।" সে আমার হাতের বাঁধন থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিলে—আমি অবাক হ'য়ে ভ্যাবাচেকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম, এ কেমন ধারা কথা? যার সাথে ভোর হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এত খেলেছি, এত মারামারি করেছি, সেই আজ বল্‌ছে "ওগো ছুঁয়োনা আমায়—আমি যে ছোট-লোক।" যে একদিন ছেলেদের সর্দ্দারি ক'রে বেড়াত, সে আজ খেলা দেখ্‌ছে এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে, মনে ফূর্ত্তি নেই, মুখে কথাটি নেই। এত বড় পরিবর্ত্তন এ ক্ষুদ্র চার বছরের মাঝে! সন্ধার মাঝখানে এমনি এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে' আমি একান্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌লাম। কি কর্ব্ব তাও ঠিক কত্তে পাচ্ছিনে। ধীরেন বল্‌লে "নিরু অমনিতরই হয়েছে ওর বাপ-মরা থেকে, কারো সাথে মিশ্‌তে চায় না—কেউ ওর সাথে মিশেও না।"

"বাপ মরেছে!—তা'হ'লে ওদের সংসারে কে আছে এখন?" "কে থাকবে আর—এক বুড়ো মা দেখেছো তো ওর পরিণাম, ওর সাথে কে মিশ্‌তে যাবে বল।"

সংসারের কথা ভাল করে বুঝবার বয়েস তখনো আমার হয়নি, তবুও আজ নিরুর এ অবস্থা দেখে প্রাণে কেমন একটা বেদনার আঘাত লাগ্‌ল,—হৃদয়ে কেমন একটা নতুন তোলপাড় সুরু হ'ল। সবার চেয়ে কষ্ট হ'ল এই কথা শুনে যে নিরুর সাথে কেউ মিশে না, কেন, গরীব হওয়া কি এতই অন্যায়—এতই ঘেন্নার কথা! ছিঃ ছিঃ! নিরু দূরে দাঁড়িয়ে—তার চোখ্ দুটী ছল্ ছল্ করছিল। এ অল্প বয়সেই সে তার ছোটত্বের পরিচয়

অনেক পেয়েছে। তাই বড় লোকের সাথে মিশ্‌তে এসে তা'র এত ভয় হয়েছিল। দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখ্‌ছিল—আর হয়তো—চার বছরের অনেকার ছবি খানা তার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছিল!"

"আজকে আর খেলা হলনা," বলে নিরুর কাছে গিয়ে বল্লুম "এমন করিস্‌নে নিরু ভাই, তা'হ'লে যে আমারো কষ্ট হয়—চল্, ওখানে একটু বসিগে।" এবার সে কোন বাধা দিল না, এতটুকু আদরও হয়তো তার ভাগ্যে কখনো জোটেনি। তাই সঙ্কোচে সে একবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। তার বুক দুরু দুরু করে উঠ্‌ল। সে স্পন্দনের তালটা এখনো আমার বুকে ধ্বনিত হচ্ছে।

ব্যাপার খানা এই, সেদিন নিরুর বাপ যাওয়ার বসে তামাক খাচ্ছিল; এক পিয়াদা এসে শমন হাতে করে বল্লে রথ-খোলা খুনের মকদ্দমায় তুমি সাক্ষী—বুঝ্‌লে ত? হরিচরণ অবাক হ'য়ে গেল। সাক্ষী!—কেন?—সে তো এ মকদ্দমার কিছু জানেনা—সেদিন যে সে বাড়ীই ছিল না। বৃদ্ধ শমন হাতে নায়েব মশায়ের কাছে গিয়ে নমস্কার করে বল্লে, "এ কি কচ্ছেন, নায়েব মশাই, আমি যে এর বিন্দু-বিসর্গ কিছু জানিনে—মিছে আমায় কষ্ট দিচ্ছেন," নায়েব ম'শায় মুচকি হেসে বল্লে "তা অতটা ভাব্‌তে হ'বেনা, হরিচরণ,—আমি নিজেই সব শিখিয়ে দিব, সে জন্যে চিন্তা নেই।"

বৃদ্ধ রাগে গর্‌গর্ কর্ত্তে লাগ্‌ল "ছিঃ ছিঃ নায়েব মশাই, তিনকাল গেরিয়ে এককাল রয়েছে, এখন যাব যি-না মিথ্যে কথা বল্‌তে?—তা কখনো হ'বে না, বাবু। "তারী ধর্ম্ম পুত্তুর এসেছেন দেখ্‌ছি—যা' এখন; কিন্তু মনে রাখিস্ সাক্ষ্য তোকে দিতেই হ'বে।"

"কখ্‌খনো না—প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু ধর্ম্মের মাথা আমি খাবই।" বৃদ্ধের মুখে একটা জ্যোতিঃ ফুটে উঠ্‌ল।

নায়েব হরিচরণকে বেশ চিন্‌ত, তাই সে চুপ করে রইলো, কিন্তু তাকে যে চাই-ই চাই। নইলে মকদ্দমায় পরাজয় সুনিশ্চিত, সহজে কিছু হবে না বুঝে সে একদিন মিথ্যে খাজনার নালিশ করে' তার জমি-জমা নিলাম করিয়ে দিলে—বৃদ্ধ তবু অটল, অচল। জমি-জমা হারিয়ে ঘরে এসে বস্‌ল। সংসার আর চলে না। আজ ঘরে ভাত নেই—কাল হয়তো এক ফোঁটা তেল নেই—নানান গণ্ডগোল। সেদিন চা'ল ছিলনা—দুপুর উৎরে যায়, তবু খাওয়া নেই, বাপের পরাণ আর কত সইতে পারে? যখন একান্ত অসহ্য হ'ল তখন বুড়ো একদিন এক চোখ জল নিয়ে 'দুর্গা' বলে' বেরিয়ে পড়্‌ল। চাটগাঁতে ওর এক আত্মীয় থাকৃত—সেখানে যাবে।

কিন্তু দু'দিন পরেই খবর এল পথে কলেরা হ'য়ে সে মারা গিয়াছে। মুহূর্ত্তে সব ওলট পালট হ'য়ে গেল। নিরুর ভুলে যাওয়া বন্ধ হ'ল। ভাল ছেলে বলে মাষ্টার 'ক্লি' দিতে চেয়েছিল—কিন্তু কি খেয়ে যাবে ইস্কুলে? বই-ই-বা কে যোগাবে? মা প্রথমতঃ ঘরখানি বিক্রী করে' কয়েকদিন চালালো। কিন্তু তাও বা ক'দিন চলে?

এখন নিরুর মা এ-বাড়ী ওবাড়ী কাজকর্ম্ম করে' যা কিছু পায় নিয়ে আসে; নিরুও সুবিধে মত এদের ক্ষেত নিড়িয়ে ওদের ধান গুলো ঝেটে যা পায়, তাই দিয়ে সংসার চালায়।

সমস্ত শুনে আমার রাগ গিয়ে পড়্‌ল ওই নায়েব বেচারীর উপর, তার এতটা আস্পর্দ্ধা হ'ল কিসে? কেন সে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে বল্‌লে? কেন সে মিথ্যে নালিশ সাজিয়ে জমি-জমা নিলেম করিয়ে দিলে?—নইলে তো আজ নিরুর এই দশা হোত না, না-হয় হ'তই আমাদের মকদ্দমায় হার—সে জন্যে কি একজনের এমনি সর্ব্বনাশ কর্ত্তে হয়! কিন্তু রাগের চেয়ে দুঃখই হ'ল বেশী। রাগ করে তো এখন কিছু হবে না, নিরুকে ডেকে বল্লুম "তুই আর কখনো এমনি কাঁদ্‌বিনে—কেমন বুঝ্‌লি ত?"

সে মুখে যদিও বল্ল "না ছোটবাবু, আর কাঁদ্‌বনা," তবু তার চোখ দুটী তখনো টল টল কচ্ছিল।

"এমনি চুপ করে থাক্‌লেও চল্‌বেনা—বেশ দিল্‌তে মিশ্‌তে হ'বে—আগের মত—বুঝেছিস্ তো, নইলে তোর সঙ্গে আমার আড়ি!

"না—তাও কর্‌ব না।"—কিন্তু সে উত্তর নীরস, প্রাণ-হীন। তার হাসি, তার সে মধুর চপলতা—তার সে অনাবিল আনন্দ, আর কিছুতেই সে ফিরিয়ে আন্‌তে সক্ষম হ'লনা।

কিন্তু তবুও—তবুও তাকে আমার পুরাণো খেলার সাথীটিকে বড় ভাল লাগ্‌ত।

সাদীর গল্প

(শ্রীমতী খুরসিদ আঁহা বেগম)

মধু বিক্রেতার গল্প।

একটী লোক তার মধুর হাসিতে আর সরল ব্যবহারে সকলের মন ভুলিয়ে মধু বিক্রী করে বেড়াত। আকের ক্ষেতের চারিদিকে যেমন মৌমাছি ঘুরে বেড়ায় তেমনি সব বন্ধের ছুটে যেত তার ঘরে—সে যদি মধু বলে বিষও কিরি করে কিরত তাও লোকে মধু বলেই কিনত।

একটা অদ্ভুত চেহারার লোক দিন দিন তার ব্যবসায় কেমন উন্নতি হচ্ছে তাই দেখে তার উপর হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল। একদিন সে মধুর ভাঁড় মাথায় নিয়ে মুখখানা কালো পানা করে তার সহরময় ঘুরে বেড়াল। মধু মধু করে হেঁকে সে সহরের সব পথ, গলি ঘুরে বেড়াল—কিন্তু কেউ তার মধু কেনবার জন্য কোন আগ্রহ দেখালে না। ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে এল—লোকটা সারাদিন মধুর ভাঁড় কাঁধে করে, ফিরেও একটি পয়সা রোজগার করতে না পেরে মুখখানা আরও কালো পানা করে ঘরের কোনে গিয়ে বসল। তার মুখ দেখে বোধ হচ্ছিল সে যেন পাপী—ঘণ্ডের ভয়ে ভয় পেয়ে গেছে।

তার একজন প্রতিবেশীর স্ত্রী ঠাট্টা করে বললে 'যার মেজাজ ভাল নয়, তার কাছে মধুও তেঁতো।'

মুখখানা দেখবে যার বেচার ভারী আর যে আদলে বলেছ তারই মত কৌচকান তার খাবার খাওয়াও একটা বোঝা।

তাই বেশ নিজের তার আর বাড়িও না, কারণ খারাপ মেজাজ সব কাজ নষ্ট করে দেয়। স্যাদির মত মিষ্টি জিভ যদি তোমার না থাকে তবে তোমার ভাগ্যে সোনা রূপো কিছুই মিলবে না।

মহতের ধৈর্য্যের গল্প।

আমি শুনেছি যে একজন মহা মস্তপ একজন পরম সাধু লোকের ঘাড় ধরেছিল। সাধু লোকটী নীরবে মাতালের ঘাড় ধাঁকুনী সহ্য করলে—মাথা তুলে তাকে কিছু বললেও না।

পথ দিয়ে এক পথিক যাচ্ছিল—সে বললে—তুমি কি মানুষ নও? মাতালটার এরূপ ব্যবহারেও ধৈর্য্য ধরে থাকা কাপুরুষতার লক্ষণ।

ধার্ম্মিক উত্তর করলে,—ওকথা বোলো না—মূর্খ মাতাল আমার ঘাড় ধরে মনে করেছিল সে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে, একজন জ্ঞানী লোক যে একটা মহা মূর্খের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে সে ভয় তো আর তার নেই।

ধার্ম্মিকেরা জীবনে এই পথই অনুসরণ করেন—যখন তারা অত্যাচার সহ্য করেন, তখনও তারা দয়া দেখান।

জোনাকির গল্প

রাত্রে বাগানের ভেতর, ঝোপের ধারে জোনাকী পোকার আলো জ্বলতে তুমি বোধ হয় দেখছ। একদিন একজন জোনাকী পোকাকে বললে 'ওগো রাত-জ্বল-জ্বলে পতঙ্গ—দিনের বেলায় তোমরা বাইরে বের হওনা কেন?'

জোনাকী পোকা মহা জ্ঞানীর মত উত্তর করলে :—কারণ সূর্য্যের সামনে আমাদের আর দেখা যায় না।'

সেদিন রাত্রে আমি জেগেছিলুম। শুনলুম একটা পতঙ্গ মোমবাতিকে বলছে, 'আমি তোমার প্রেমিক, আমি তোমায় ভালবাসি—আমি যদি পুড়ে মরি, সেই ভাল। তবে তুমি কাঁদ কেন?'

মোমবাতি বললে :—'ওগো বন্ধু আমার, প্রেম করা তোমার কর্ম্ম নয়। শিখার সম্মুখ থেকে তুমি দূরে সরে উড়ে চলে যাও, কিন্তু যতক্ষণ না আমি পুড়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাই ততক্ষণ ঠিক দাঁড়ায়ে থাকি। প্রেমের আগুনে তোমার ডানা দুখানা শুদ্ধ যখন পুড়ে যাবে—আমার তখন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায়।'

'প্রেমের এই পরিণতি' এই বলে সে একজন মাতাল ভোর হবার আগেই মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলে।

সত্য প্রেম

কেউ তার বন্ধুর জন্য জীবন দিলে তার কবরের উপর গিয়ে দোষ প্রকাশ কোরো না। এতে মরুক মনকে খুশী কোরো কারণ সেই তার একান্ত প্রিয় ছিল।

যদি তুমি প্রেমিক হও তাহলে প্রেমের ব্যাধি থেকে তোমার মাথা উঠিয়ে তা বুঝে ফেলবার চেষ্টা কোরো না; সাধির মত তোমার হাত দু'খানা শুধু স্বার্থপরতা হতে মুক্ত করে নিও।

সত্য প্রেমিক যে হয়—তার মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির মত সহস্র তীর ও অস্ত্র শস্ত্র চলে গেলেও সে তার ভালবাসার জিনিস ছেড়ে দূরে সরে চলে যায় না।

সাবধান থেকো,—যদি সমুদ্রেই যাও—তবে ঝড়ের আঘাত সইতেই হবে।

অল্প বিদ্যার গল্প

একজন লোক জ্যোতির্বিদ্যার অল্প স্বল্প কিছু জানতো, সেই গৌরবেই সে একেবারে আত্মহারা হয়েছিল। দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে সাধু হুসায়ের আশ্রমে উপস্থিত হোল, কুসায় কিন্তু তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন—তাকে কোন উপদেশ বা শিক্ষার কথা কিছুই বললেন না। অজ্ঞানী নিরাশ হয়ে যখন ফিরে যাবার জন্য উঠেছেন—সাধু হুসায় তখন তাকে বললেন :—'তুমি মনে ভাব সব জানে জানী হয়েছ তুমি। একটা পাত্র যদি কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে থাকে তবে আর কিছু সে ধরবে কোথায়? যা না তুমি সে ভুল ধারণা ছেড়ে দাও—তবেই তুমি পূর্ণ হতে পারবে। অহমিকায় পূর্ণ হয়ে থাকলে—শূন্যহাতেই তোমায় ফিরে যেতে হবে যে!'

বধিরের জ্ঞান

অনেকে বলেন—পরম জ্ঞানী হাতিম বধির ছিলেন না।

একদিন তিনি একটা পশুদের করুণ আর্তনাদ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন পশুটা একটা ঝাকড়ার জালে আটকে পড়ে গেছে। হাতিম বললেন :—'ওরা লোভে পড়েছে—তারা ধৈর্য্য ধর। লোভের কিছু সমুখে দেখলেই মনে করবে শিকারী আর কাঁদ তোমার চারিদিক ঘিরে রয়েছে।

হাতিমের একজন শিষ্য বললেন :—'একটা মাছির গুণ গুণ যা আমাদের কানেও মোটেই পৌঁছায় নাই—তাও আপনি দিব্যি শুনতে পেলেন—তবে আর ওরা আপনাকে বধির বলে কেন?'

সেই বললেন 'বাজে কথা শোনার চেয়ে বধির হয়ে থাকাই ভাল। ওরা সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে তারা আমার দোষগুলি লুকিয়ে রেখে গুণগুলিই সকলমুখে গায়—এইভাবে তারা আমায় মৃদা গর্ব্বিত করে তোলে। তাই আমি বধিরের ভাণ করে তাদের স্তুতি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি। আমার এই বধিরের ভাণ করাতে তারা তখন নিঃসঙ্কোচে আমার দোষ গুণ সবই আমার সমুখে আলোচনা করে—তখন আমার দোষ যা তা জেনে আমি দোষের কাজগুলি থেকে আপনাকে নিবৃত্ত করতে পারি।'

প্রশংসার ঘড়িতে ভুলে সুখের কিস্তর নেমে পোড়ো না। 'হাতিমের মত বধির হয়ে তোমার নিন্দুকদের নিন্দা শোন।'

সুলতান মামুদের দাস প্রীতি

আয়াজ ছিল সুলতান মামুদের একজন দাস। অনেকেই বলত দাস আয়াজের না আছে রূপ না আছে কিছু। এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে রূপ গুণ হীন একটা ভৃত্যকে সুলতান মামুদের মত লোকে এত ভালবাসেন।'

এ কথা শুনে মামুদ বললেন 'আমি ভালবাসি তাকে তার গুণের জন্য তার রূপের জন্য বা তার দেহের লাবণ্যের জন্য নয়।'

সুলতান মামুদ একদিন তার অনুচরদের নিয়ে পাহাড় পথে চলেছেন। দু'ধারে খাড়া পাহাড়—মাঝে সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম। সেই গিরিবর্ত্মে চলতে দেখা গেল কতকগুলো উট নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক। একটা উটের পিঠ থেকে একটা বাক্স পড়ে গেল। পাথরে পড়ে বাক্সটা ভেঙে যেতে দেখা গেল তার ভেতর থেকে বহু মূল্যবান রত্নাদি বেরিয়ে পড়ল। সুলতান মামুদ তার অনুচরদের ধন রত্ন লুণ্ঠনে আদেশ দিলেন। অনুচরদের সকলেই লুণ্ঠনে ব্যস্ত। সুলতান ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন—রাজা মামুদের সঙ্গে কেউ নাই—শুধু তার সঙ্গে ছিল তখন একমাত্র আয়াজ।

আয়াজকে সঙ্গে দেখে মামুদ বললেন 'তুমি এখানে যে—লুণ্ঠনে কি পেলে?

আমার বললে কিছুনা সম্রাট্—আমি তো ধন রত্ন লুঠতে যাই নি—আমি বরাবর আপনার সঙ্গেই চলে এসেছি।'

রাজদরবারে উচ্চ সম্মানের কার্য্য পেয়ে অন্যদিকে বেশী লাভের সম্ভাবনা দেখেও রাজার প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা দেখিও না।

শৃগাল ও নির্ব্বোধ

একজন দেখলে একটা শেয়ালের পা দুটো একেবারে ভেঙ্গে গেছে। নড়বার চড়বার শক্তি হারিয়ে শেয়ালটা এক জায়গায় চুপ করে পড়ে আছে। লোকটা ভাবছিল শেয়ালটা এ অবস্থায়ও কি করে বেঁচে আছে—খাবার পায় এ কোত্থেকে! এমন সময় দেখলে একটা প্রকাণ্ড বাঘ একটা হরিণ মুখে করে এনে সেই জায়গায় ফেললে—বাঘ হরিণটা খেয়ে গেলে যা রইল শেয়ালটা তাই খেলে, তাতেই শেয়ালের পেট ভরে গেল। এই ভাবে পর দিনও শেয়ালের আহার জুটে গেল।

নির্ব্বোধ লোকটার চোখ এইভাবে খুলে গেল। সে ভাবতে লাগল 'এর পর—আমিও এক কোণে চুপটি করে পড়ে থাকবো, যেখান থেকে যা হোক কিছু খাবার জুটবেই, চেষ্টা করেও তো ঐ দুধ টুঁড়েই জুটছে।

তাই নীরবে নিষ্কর্ম্মাভাবে সে এককোণে বসে রইল। আশা অবশ্যই খাবার জোটাবেই। কিন্তু দিন্ যায় রাত্রি যায়—দিনের পর দিন আসে খাবার আর তার কিছু জোটে না। লোকটা জমে অস্থি চর্ম্ম সার হয়ে গেল! অবশেষে সে ক্ষুৎপিপাসায় যখন প্রায় জ্ঞানহারা তখন দৈববাণীর মত তার কাণে আসল।

'ওরে অবিশ্বাসী—পা হারা শৃগালের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে উচ্ছিষ্ট পাবার প্রত্যাশায় বসে থাকিস না। বাঘের মত নিজ আহারের সন্ধান নিজে কর রে। শৃগালের মত উচ্ছিষ্ট খাবারে এত লোভ কেন? নিজের চেষ্টার ফল খাও—মানুষের মত বল চেষ্টা কর, নিজের অভাব মেটাও—পরের অভাবও দূর কর।

ওরে মূরুক—বুদ্ধি যে অপারগ যে, তারই হাত ধরে টেনে তোল। নিজের ক্ষমতা থাকতে হাত ধরে তোলা—তোল বোলো না।

আব্দুল আজিজ ও মুক্তা

আব্দুল আজিজের একটি পরম সুন্দর বহু মূল্যবান মুক্তা ছিল। আজিজ সেটি সব সময় নিজ হাতের আংটিতে পরতেন। রাজ্য মধ্যে তখনকার দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হোল—রাজ ভাণ্ডার অর্থশূন্য। রাজা আজিজ নিজ মুক্তা বিক্রয়ের হুকুম দিলেন।

একজন হিতৈষী রাজাকে বললেন 'এ মুক্তো যে একবার গেলে আর পাবেন, এমন জিনিস আর মিলবে না।'

রাজা বললেন 'রাজ্যের প্রজারা না খেয়ে মরছে—এমন অবস্থায় রাজার হাতে বহুমূল্য প্রস্তর বিক্রয়ের মত দেখায়। প্রজার মুখে হাসি ফিরুক, আমি মুক্তোহীন আংটিতেই খুসী হব।'

নিজের সুখের চেয়ে পরের সুখ যে দেখে সেই সুখী। পরকে বাধা দিয়ে সাধু জন নিজে সুখী হতে চান না।

ভোরের আলো

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়]

ভোরের আলো পড়ল দেব-মন্দিরে;
নেমে এল কোন্ লোকের
কোন্ তীরে?
রাতের নীরব নিঝুম পথে একলাটি,
চল্‌ছিল কোন্ শক্র-পুরের পথ হাটি;—
গোপন পদে কাহার প্রতিধ্বনী সে!
চল্‌তে পথে স্বপ্ন-পুরীর রঙ্গিমা
চপল চোখে পড়্‌ল আসি উচ্ছসি';
ঢেউ খেলানো নিদলাগরের ভঙ্গিমা
পরাণ-তটে পড়্‌ল মুহুঃ মূর্চ্ছাসি'।
স্বপ্ননিবিড় ঘুম জড়ানো অন্তরে,
বাঁধনহারার গান বাজে কোন্ মন্তরে;—
মুক্তি দিল আঁধার কারার বন্দীরে!!

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জ্বর যে নূতন তাহা নহে, মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাস কতক পর হইতেই এই জ্বর ধীরে ধীরে আসিয়া অনুপমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখন স্পষ্ট জানা যায় নাই; কখন দেহের জড়তা, কখন সামান্য মাথাব্যথা, কখন আহারে অরুচি, এইরূপে কিছুদিন চলিল। তার পরি জ্বর যখন স্পষ্ট প্রকাশ পাইল, তখন ডাক্তার ডাকিতে হইল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধের গুণে জ্বর বন্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহার মূল উৎপাটিত হইল না, চাপা পড়িয়া রহিল মাত্র।

কিন্তু বেশীদিন চাপা রহিল না, আবার তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুপমা নিজের মধ্যে যেন একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে থাকিল। পুনরায় ডাক্তার আসিলেন, ঔষধও দিলেন, কিন্তু এবার আর ঔষধ সহজে ফলপ্রদ হইল না। অথচ ডাক্তারও প্রকৃত রোগ নির্ণয়ে সক্ষম হইলেন না, তিনি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়া যাইতে লাগিলেন। অনুপমা কিছুদিন কুইনিক কথার ঔষধ সেবন করিয়াও যখন ফল কিছু দেখিতে পাইল না, তখন বিরক্ত হইয়া ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিল। পিসীমা বা তদ্রূপ কোন আত্মীয় ইহার কারণ জানিতে চাহিলে অনুপমা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিল যে, সে সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, ঔষধ সেবনের কোন প্রয়োজন নাই। তাহার রোগমুক্তিতে আত্মীয়েরা নিশ্চিন্ত হইলেন।

রোগ কিন্তু চুপ করিয়া রহিল না, বড়বুল বৃক্ষের ন্যায় তাহা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। তবে এবার জ্বর আসে তেমন জানা গেল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দৈহিক ক্ষয় চলিতে লাগিল। এই জন্য অনুপমা সেইদিন বুঝিতে পারিল, যেদিন সামান্য শুষ্কমা কাসির সঙ্গে একটু রক্ত উঠিতে দেখিল। এই একবিন্দু রক্ত দেখিয়াই অনুপমা শিহরিয়া উঠিল, এবং অন্তর মহাকাল যে কালব্যাধি রূপে আক্রমণ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে জীবনের আশা ত্যাগ করিল।

আশা অনুপমা অনেকদিনই ত্যাগ করিয়াছিল। হেমচন্দ্র যেদিন তাহার প্রাণঢালা ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেইদিন হইতেই অনুপমা আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছিল, শুধু কাঠের পুতুলের মত জীবনটাকে কোনরূপে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল—পিতার মুখের দিকে চাহিয়া। তাঁহারই জন্য সে বুকের ভিতর দাবানল চাপিয়া বাহিরে সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় প্রেম প্রীতির অভিনয় দেখাইয়া আসিতেছিল। তারপর সেই পিতা যখন চলিয়া গেলেন, তখন সংসারটা তাহার নিকট একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। এই ব্যর্থ জীবনটাকে খাড়া করিয়া রাখিবার আর কি প্রয়োজন? মৃত্যুর পরশনে ইহাকে লুটাইয়া দিলেই সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইয়া যায়!

কিন্তু পিতা চিরদিন উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন, মানুষের জীবন একমাত্র কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ; কর্ত্তব্যের সাধনাই জীবনের একমাত্র ব্রত; তাহাতেই সুখ, তাহাতেই সান্ত্বনা। অনুপমা পিতার এই সার উপদেশের অবমাননা করিতে পারিল না, কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সংসারবন্ধনের সহিত জীবনটাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সুতরাং মহাকালের আক্রমণে সে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে পথ হইতে ফিরিবার ইচ্ছা অনুপমার একবারও হইল না।

ফিরাইবারও কেহ ছিল না। পিসীমা আপনার পূজা আহ্নিক ও শুচ্যাচার লইয়া ব্যস্ত; অনুপমার শারীরিক অবস্থা দর্শনের মধ্যে মধ্যে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াই আপনার স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভূপতি ও তারকনাথ স্ব স্ব স্বার্থচিন্তায় ব্যাকুল। তারানাথ অনুপমার দেহের অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু অনুপমা হাসিয়া তাহার সে আশঙ্কাকে উড়াইয়া দিত, এবং এইরূপে হাসিতে হাসিতেই মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিত।

ক্রমে ব্যাধি যখন বড়বুল বৃক্ষের ন্যায় শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বেশ সতেজ হইয়া উঠিল, তখন ভিতরের চাপা জ্বর প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। জ্বরের এই প্রাবল্য দর্শনে অনুপমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ব্যাধি এবার দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুর আর

হইতে পারে। তাহার আর ব্যাঘাত কি? তজ্জন্য ঐ স্বরলিপির মূলভাগের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

সঙ্গীতশিক্ষা সহজ করাই স্বরলিপির উদ্দেশ্য। আমি ইউরোপীয় স্বরলিপির সহিত এদেশের নবোদ্ভাবিত স্বরলিপি সমূহ লইয়া বহুবিষয়াবধি বিশেষ যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ভারতের মধ্যে ইউরোপীয় স্বরলিপি দ্বারা লোকে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র স্বরাদি সাধন করিতে শিখে। আপাততঃ কেহ ঐ সঙ্কেতাবলীর ঘটা দেখিয়া, তাহা বুঝা কঠিন বলিবেন বটে, এবং সেই কারণেই এদেশের বর্ণমালা প্রণালীর উদ্ভাবকেরা উহা ইউরোপীয় স্বরলিপি অপেক্ষা সহজ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেননা তাহার বর্ণপরিচয় থাকা হেতু সকলেই কিছু না কিছু বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাতেই যে ইউরোপীয় স্বরলিপি অপেক্ষা উহাদের অধিক সহজতর প্রমাণ হইল, ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ সহজ হইলেই কি তাবৎ বিষয় কার্য্যতঃ সহজ নয়? আরও জিজ্ঞাসা করি, ইউরোপে কি কোন ভাষার বর্ণ নাই? তবে তথায় ইহা পরিত্যক্ত হইয়া সাঙ্কেতিক স্বরলিপি কি জন্য ব্যবহৃত হইতেছে? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুকালাবধি সুচতুর চর্চ্চা করিয়া দেখিয়াছেন যে সঙ্গীত যেমন একটা ভিন্ন বিদ্যা, তাহার নিমিত্ত পৃথক সঙ্কেতাবলী ব্যবহার না করিলে, ভাষার বর্ণাদি দ্বারা সহজে তাহার কার্য্যসাধন হওয়া সম্ভাবিত নহে। তজ্জন্যই ঐ সাঙ্কেতিক স্বরলিপির ব্যবহার প্রচলিত হয়। ইউরোপীয়েরা যখন তখনই আমাদের ন্যায় প্রাচীন প্রথার দাস নহে, তখন ঐ প্রাচীন প্রণালী কঠিন বোধ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদের বাধা কি ছিল? অতএব আমরা আশি দুই দিনমাত্র সঙ্গীত লিখনের চর্চ্চা করিয়াই যে ঐ প্রাচীন সাঙ্কেতিক স্বরলিপি অপেক্ষা সহজতর স্বরলিপি প্রকাশ করিব, ইহা মনে করাই দুষ্কর কার্য্য।

এখনকার নবোদ্ভাবিত স্বরলিপি সমূহের সহিত তুলনায় ইউরোপীয় স্বরলিপির অসুবিধা কি কি, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় স্বরলিপিতে গীতাদি লিখিতে অতিশয় আয়াসনের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা দৃশ্যতঃ অতি কুৎসিত, এবং উহাতে কেবল একইরূপ বাদুড় মোটা মোটা রেখা ও বড় বড় বিন্দু ব্যবহৃত হয়, তাহা দূর হইতেও তাহার বর্ণাপেক্ষা স্পষ্ট দেখা যায়, ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। তৃতীয়তঃ সঙ্গীতের সুরনিচয় যেমন উচ্চনীচ, ঐ স্বর লিপিতে তাহাদের লিখন সঙ্কেতও তৎপ্রতিরূপে উচ্চনীচ নিয়মের অনুগত, অতএব চিত্র যেমন সামান্য বর্ণাপেক্ষা শীঘ্র হৃদয়গ্রাহক, ইহাও তদ্রূপ। চতুর্থতঃ, ইহাতে একই সঙ্কেত দ্বারা সুর ও মাত্রা উভয়ই লিখিত হওয়াতে স্বরলিপি দেখিয়া দ্রুত বাজাইবার ও গাইবার সুবিধা অধিক। পঞ্চমতঃ, ইহাতে অসংখ্য প্রকার উচ্চ ও খাদ স্বর লিখনের, এবং অসংখ্য প্রকার মাত্রা অর্থাৎ স্বরের স্থায়িকাল লিখনের সঙ্কেত চিরবর্ত্তমান, এবং ইহার লিখন-প্রণালীতে গতের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য মাত্রার ভাবৎ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশগুলিও পূরচিত্রের উপর ভূরি অলঙ্কার চিহ্ন, কিম্বা অন্য কোন প্রকার চিত্রচয় যোজনা করিলে কখনই অস্পষ্ট কি বোধ দুরূহ হয় না। ঐ ছয়টি কি সাধারণ সহৎ গুণ? এবং উহারা কি অল্প বুদ্ধিতে ও চর্চ্চায় উৎপাদিত হইয়াছে? উহাদিগকে পরাস্ত করা দূরে থাক্, আধুনিক নূতন স্বরলিপি সমূহ যে নিয়মে প্রস্তুত তাহাতেই ঐ সকল গুণ বর্ত্তমানই উপায় নাই। (ক্রমশঃ

পরিহাস।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী]

বাল্যে বিমল জননীর স্নেহে
ডুবায়ে রাখ গো প্রাণ;
যৌবনে প্রভু প্রণয়-মদিরা
আমারে করাও পান;
প্রবীণা বয়সে সন্তান-স্নেহে
মত্ত করগো মোরে,
সুফল প্রকারে বাঁধগো আমায়
ওই মায়ার ডোরে।
সে মায়া বাঁধন ছিঁড়িতে আমার
রহেনা শকতি লেশ।
ঘুম হ'তে জেগে তায় তুমি, একি
পরিহাস পরমেশ!

দ্বাদশ গোপালী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরে)

ডাক্তার যত আশ্বাসই দিয়া যান্, পারুল কিন্তু কিছুতেই নির্ভয় হইতে পারিতেছিল না। দুইবার বগলে থার্মোমিটার দিয়া জ্বর পরীক্ষা করিবার কথা, পারুল ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজিতের বগলে থার্মোমিটার বসাইয়া জ্বর দেখিতে লাগিল। প্রতিবারই ঘড়ির ছোট ছোট কাঁটা দুইটার দিকে চাহিয়া আপন মনে ভাবে, এইবারে নিশ্চয়ই কম উঠিবে! একমিনিট কাটিতেই তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া যায়! সেই যা ছিল, তাহাই আছে। না কমিয়াছে, না বাড়িয়াছে। মাথায় আইস-ব্যাগ দিবার কথা ডাক্তার বলিয়াছিলেন, পারুল এক মুহূর্তের জন্য থলিটা নামায় নাই। একটায় বরফ নিঃশেষ হইয়াছে, কালীচরণ অন্য একটা ভর্তি করিয়া দিয়াছে, পূর্বেরটা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহার ভয় হইতেছিল, আইস-ব্যাগ নামাইলে যদি আবার জ্বর দ্রুত করিয়া বাড়িয়া যায়!

কালীচরণ কত অভিযোগ, অনুযোগ করিল, কতবার বলিল—ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানায় খবর দেওয়া যাক্, তাহারা আসিয়া লইয়া যাউক্, কিন্তু পারুল রাজী হইতে পারিল না। পূর্বে যদি বা তাহার খুব একটা ভয় জমাট বাঁধিয়া তাহার সর্বাঙ্গে চাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল, নামজাদা ডাক্তারের আশ্বাসে সে ভয় তাহার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। এখন সে চক্ষু মুদিয়া অজিতের সুস্থাবস্থা কল্পনা করিয়া আপন অন্তরে যথেষ্টই সুখানুভব করিতেছে। এখন তাহাকে পাঠাইয়া দিবার কথা পারুল মনেও ঠাঁই দিতে পারে না। এখন যে তাহার নারীত্ব সার্থক হইবার পথ ধরিয়াছে; আজীবনের লাঞ্ছিত, অনাদৃত নারীত্ব—তাহার সারা অঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে; প্রতি ধমনীতে নারীত্ব তাহার উষ্ণ-মধুর রক্তের স্রোত বহাইয়া দিতেছে আর তাহারই স্রোতে গা ভাসাইয়া নারী অভূতপূর্ব অপরিচিত স্বর্গ সুখভোগ করিতেছে। এ যেন গরম গ্রীষ্মে বটবৃক্ষছায়াতলবাহিত ভাগিরথীর শীতল জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া আছে। মৃদুমন্দ স্রোতগতি তাহার দেহে মৃদু আন্দোলন দিয়া, অধিকতর পুলক-প্রবাহ দিয়া আপনার মনে চলিয়া যাইতেছে—নারী আকণ্ঠ ডুবাইয়া স্থল-জল সব ভুলিয়া পড়িয়া আছে!

দ্বিতীয় দিনের রাত্রি। কালীচরণ এইমাত্র কোথায় গিয়াছে, পারুল মাথার উপরে বরফের থলিটা চাপাইয়া, বসিয়া ভাবিতেছিল। জ্বর কমিতে সুরু করিয়াছে। ডাক্তার কালই বলিয়া গিয়াছিলেন, কাল না হয় পর্শু জ্বর ছাড়িবে। পারুল এইমাত্র থার্মোমিটারে এক ডিগ্রী উত্তাপ কম দেখিয়া প্রফুল্লমনে থলিটা চাপাইয়া বসিয়াছিল। অল্প কয়েকদিনের পরিচিত বন্ধুর জ্বর-বিয়োগের চিন্তাও তাহার পক্ষে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ মিনিট কাটে আর ভাবে, এখন হয়ত আর এক ডিগ্রী কমিয়াছে, একবার দেখিলে হইত! আবার ভাবে, না, খানিক পরে দেখিব। তখন দেখিব, অনেক কমিয়া গিয়াছে। আবার থাকিতে পারে না। পনেরো মিনিটের মধ্যেই দু'বার দিয়া বসে। দেখে, সেই আছে। মুখটি ম্লান হইয়া আসে; অন্তরও যেন বেদনার ভারে অবনত হইয়া পড়ে—আবার নারী আপনাকে উৎসাহিত করিয়া তুলে, এখনই না হোক্, একটু পরেই কমিবে। কমিলেই হইল, দেরী হইলেও ক্ষতি নাই!

আজ সে সত্য সত্যই হিন্দু নারীর শুচিতা পবিত্রতা লইয়া ভাগিরথী বক্ষে নামিয়াছিল। আজ তাহার আজীবনের আবিলতা, মলিনতা, কালী সব ফেলিয়া, একান্তমনে পতিতোদ্ধারিণী মর্ত্য-মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করিতে আসিয়াছিল। আজ আর পুণ্য সলিলে নামিয়া পাপের চিন্তা নাই, আজ আর গঙ্গাবক্ষে থাকিয়া স্তেন-দৃষ্টিতে শিকারের সন্ধান নাই, আজ তাহার সে গঙ্গাস্নান নহে, যাহা এতদিন এতকাল সে করিয়া আসিয়াছে! যে গঙ্গা-সলিলে আজ সে নামিয়াছে, তাহার কূলে কেহ নাই, এপারে ওপারে কোথাও কেহ নাই, কাহারও জন্য কোন দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা নাই, একমাত্র সেই আছে! আর আছে, ভাগিরথীর পবিত্র বারিবক্ষ! চল চল, ছল ছল, পুণ্য প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে! আর নারী, চির দুশ্চারিণী, পাপ-নারী তাহাতেই ধন্য হইয়া যাইতেছে!

যে মন্দার-সুষমের নামও কোনদিন তাহার জানা ছিল না, যে সুখ-ভোগের কল্পনাও কোনদিন তাহার মানসপটে উদিত হয় নাই, যে ধর্মের দিক দিয়াও তাহার গতিবিধি ছিল না—আজ মনে হইল, চিরদিনই মন্দার সৌরভের আশায় সে উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিল! এই সুখ-

তোমের যাহাই তাহাকে চিরদিন উদ্ধতশীর্ষ করিয়া রাখিয়াছিল, নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ গর্ব চিরদিনই পালন করিবার আকাঙ্ক্ষায় সে তাহার হৃদয়মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বিধাতা আজ তাহার সম্মুখে সেই গর্বখর্বার মোচন করিয়া দিয়াছেন, আজ তাহাকেই ধন্য করিতে পুণ্যতোয়া তাহার পূর্বাভ্যন্তর দিয়াই বহিয়া যাইতেছে, মানুষের সেবা করার গর্ব যে কত বড় আজ সে শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছে।

সেবা! সেবা ত চিরদিনই সে করিয়াছে! রূপের সেবা করিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াছে, বিলাসের সেবা করিয়াছে, অর্থের সেবা করিয়াছে এবং ইহারই কোন একটার জন্য মানুষেরও সেবা করিয়াছে! কিন্তু আজ মনে হয়, সে সেবা নয়, এতকাল যাহা করিয়াছে, তাহাকে সেবা বলে না, সে ভাণ! নিছক মিথ্যা অভিনয়! মিথ্যায় আরম্ভ, মিথ্যায় তার অবসান!

এ কিসের অনুভূতি—কোথায় এর উৎপত্তি এবং কোথায় নিবৃত্তি—নারী তাহা জানে না। তবুও এমনি আবেশময় তাহার স্পর্শ যে নারী তাহাতেই চেতনা হারাইয়া আপনা ভুলিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। এই দুইদিন সে মুহূর্তের তরে অজিতের শয্যা ছাড়িয়া উঠে নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন সব ভুলিয়া গিয়াছিল! অথচ হায়রে! আপনপর তাহার অল্পই জীবনে কোনদিন তাহাকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই! দুনিয়ায় এমন একটী প্রাণীও ছিল না যাহার শয্যাপার্শ্বে এতখানি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া একটী মুহূর্ত-ও সে কাটাইয়াছে!

আমি জানি না, বলিতে পারি না—এ কি! কেন এমন হয়, কিসে এমন হয়—আমার তা জানা নাই! সে কথা বলিয়া কাহারো কৌতূহল নিবারণ করা আমার সাধ্যাতীত! তবে এইটুকু বলিতে পারি রমণী নিজেই তাহা জানিত না। সারা রাত্রি রোগীর শিয়রে কাটাইয়া ভোরের দিকে অবসাদক্লিষ্টচিত্তে রমণী বার বার এই প্রশ্নই করিয়াছিল, এ-কি! কেন এমন হইল! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া নারী তাহার উত্তর পায় নাই।

আইস্-ব্যাগে বরফ ভরিয়া শয্যা নিরিখানে ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, অজিত চক্ষু মেলিয়াছে। কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি বুলি ফেলিয়া কি-যেন দেখিয়া, চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। পারুলকে দেখিয়াই চক্ষু মুদিল।

পারুল ডাকিল—অজিতবাবু?

অজিত সাড়া দিল না। তবে সে-যে জাগিয়া আছে এবং ইচ্ছা করিয়াই কথা কহিতেছে না, পারুল তাহা বুঝিল। ব্যাগটা তোয়ালের উপর নামাইয়া রাখিয়া, অজিতের ললাট স্পর্শ করিয়া ডাকিল—অজিতবাবু?

অজিত কোন কথা না বলিয়া পায়ের বালিশটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, পারুল তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—উঠবেন না অজিতবাবু! ডাক্তারে বারণ করে গেছে!

অজিত তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমিও নিষেধ ডাক্তার!

পারুল কথা বলিল না; কিন্তু সেই মুহূর্তে তাহার সুন্দর মুখখানা পাংশু হইয়া গেল।

অজিত উঠিয়া বসিয়া বলিল—কাল থেকে আমি এখানেই পড়ে আছি?

পারুলের কণ্ঠে অল্প উদ্বেগ হইয়া উঠিল; সে কম্পকণ্ঠে কহিল—পড়ে থাকবেন কেন—অজিতবাবু!

হুঁ। আমাকে খুঁজতে আসে নি?

না।

আমি ত কাল গাড়ী করে এসেছিলাম, আমার গাড়ী?

চলে গেছে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আরও অনেককথা কি তাহার জানিয়া লইবার ছিল কিন্তু কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না। অজিত তখন এতই দুর্বল যে দুই তিন মিনিটের মধ্যেই শরীরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিতে লাগিল—আর সে বসিতে পারিল না। তবুও সে সজোরে বালিশটাকে চাপিয়া বসিয়া থাকিবারই চেষ্টা করিতেছিল, পারুল তাহার কম্পিত মাথাটাকে বুকে চাপিয়া শোওয়াইয়া দিল, বলিল—কি হ'য়েছে অজিতবাবু?

দুই মুহূর্ত পরে অজিত জিজ্ঞাসিল—আমাকে কেউ খুঁজতে আসে নি?

না। আমি বলে দিয়েছিলাম, আপনি জীরাবপুর যাবেন।

গাড়ী—একখানা গাড়ী ডাকতে বলুন—আমি বাড়ী যাব।

এখন ত আপনি যেতে পারবেন না অজিতবাবু।

কালথেকে আপনি জ্বরে অজ্ঞান-অচৈতন্য হ'য়ে ছিলেন। একটু পাঁউরুটি পর্যন্ত একবার মুখে তুলতে পারেন নি—এখন কি আপনি খেতে পারেন! ডাক্তার বলেছেন, কাল সকালে জ্বর ছাড়বে, তখন যা-হয় করা যাবে। এখন শুধু চুপ-করে' জ্বর এখনও বেশ রয়েছে।

অজিত তীব্রদৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পারুল প্রসঙ্গটা একটু ঘুরাইয়া গিয়াছিল, একটু পরেই মেয়ে মনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া কহিল—হঠাৎ আপনার অসুখ হ'য়ে পড়েছিল আমার বাড়ীতে এসে! আপনার হয়ত মনে নেই আপনি নিজেই এই বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই অজিত কক্ষটির চারিধার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। বিছানার পার্শ্বেই দুইটা আইস্ ব্যাগ, থার্মোমিটার, ঘড়ি, ঔষধের শিশি—সবই দেখিতে পাইল।

পারুল বলিল—তেমন অবস্থায় কেমন করে' ছেড়ে দিই আপনাকে বলুন। তার আপনি নিজেই বলেছেন, আমার বাড়ীতে আপনার চাকর বাকর ছাড়া এমন কেউ নেই যে অসুখ বিসুখে দেখে-শুনে, সেবা করে!

অজিত কথা কহিল না বটে তবে তাহার মুখের বিরক্তির ও ঘৃণার চিহ্ন তখনো সুস্পষ্ট দেখিয়া পারুল বলিল—অজিতবাবু, আপনার যদি একটি বোন্ থাকত, আর তার বাড়ীতে সে যদি আপনার অসুখে সেবা করত, আপনি কি খুব অসন্তুষ্ট হ'তেন? তার বাড়ী থেকে কি এমনি রোগা দেহে চলে যাবার কথা আপনি বলতেও পার্তেন।—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর সিক্ত হইয়া উঠিল। পারুল ওদিকে মুখ করিয়া বলিতে লাগিল, আমি না হয় আপনার কেউ নই কিন্তু এই এক রাত্রির দু'টো দিন আমার যে কি করে' কেটেছে তা আপনি কি জানবেন, অজিতবাবু?—আর সে একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না, বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অজিত আস্তে আস্তে কহিল—সত্যি তুমি—আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করলেন কেন?

পারুল বোধ করি কথা কয়টা শুনিতে পায় নাই, উত্তর দিল না।

অজিত আবার বলিল—আমিত জেনেই গেছি, না জেনে কোথাকার কে আমি··· গেছলেন বলেই আপনি অসুখ গায়ে দু'বুতে দু'বুতে আমার বাড়ী এসেছিলেন কেন!

সে আমার কর্ত্তব্য!

আমারও যদি একটা কর্ত্তব্য থাকে অজিতবাবু!

অজিত স্তব্ধ হইয়া গেল। আর কি বলিবে? সে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে, পারুল হঠাৎ এদিকে ফিরিয়া তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমার বাড়ীতে চাকর বাকর ছাড়া আর কে ছিল অজিতবাবু? তারা কি আমার চেয়েও প্রাণ ঢেলে আপনার সেবা করতে পার্ত? তা যদি হয় বলুন, গাড়ী ডাকিয়ে এখনি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না—পারুল··

পারুল আকুলস্বরে বলিয়া উঠিল—তবে তবে বলুন, যতদিন না বেশ সেরে ওঠেন এখানে থাকবেন বলুন?

অজিত বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে কহিল—সে কি.....

না, অজিতবাবু! সে আপনাকে আমি ছাড়বো না। অভাগিনীর এ অনুরোধটি আপনাকে রাখতে হ'বে।—বলিয়া যেন সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এমনি ভাবে উঠিয়া গিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দুধ গরম করিতে লাগিল।

দুধ খাওয়াইয়া পার্শ্বে বসিয়া কহিল—অজিতবাবু! আপনার যদি একলা একলা বোধ হয় আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব···

অজিত সাগ্রহে বলিল—পারেন? খবর দিতে পারেন একবার বিমান দা'কে?

সে কে অজিতবাবু?

বন্ধু, আত্মীয়—যা বলেন।

এ অভাগিনীর বাড়ী তিনি পায়ের ধুলো দেবেন?

অজিত এক মিনিট কি ভাবিল, বলিল—আমার অসুখ শুনলে নিশ্চয়ই আসবেন।

তাঁরও বাড়ী কি শ্রীরামপুর?

না। তবে শ্রীরামপুরেও তিনি গেছেন। এই সেদিন বাদশগোপাল দেখতে গিয়ে·····

নারী অজিতের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে বারান্দায় গিয়া রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণ ভরিয়া বোধ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

(৩)

[ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্]

("স্বাস্থ্য-সমাচার" হইতে)

যে যে কারণে কামোদ্রেক হয়, তাহা এইবারে বলিব। (১) যাহারা যুবক হইয়াও অলস ভাবে জীবন যাপন করে, তাহারা সহজেই কামের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাতদিন শুইয়া-বসিয়া থাকা, "আড্ডাধারী" হওয়া, সকাল সন্ধ্যা ঘরের কোণে বসিয়া গল্প গুজব করা—যুবকদিগের পক্ষে নিন্দনীয় এবং অনিষ্টকরও বটে। (২) যাহারা যুবা বয়সে অথবা পরিমাণে, গুরুপাক খাদ্য দ্রব্য খায় অথচ তদুপযুক্ত পরিশ্রম করে না, তাহাদিগেরও অল্প বয়সে কামোদ্রেক ঘটিবার সম্ভাবনা। মাংস, ডিম, গরম-মসলা, পোলাও, রসুন, অধিক অন্ন, অধিক ঘৃত যেওয়া খাদ্য ঐ সকল নিত্য খাইলে, অথবা মধ্যে মধ্যে খাইয়াও যথোপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম না করিলে—কামোদ্রেক ঘটে! ছাত্রদিগের পক্ষে ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু এই কথা সাত্ত্বিক-ভাবে যাহারা জীবন যাপন করে ও সাত্ত্বিক আহার খায়, তাহাদেরই পক্ষে প্রযোজ্য। মাংসাশী, ভোজন-বিলাসী এবং অলস ছাত্রদিগের পক্ষে ঘৃত অমৃততুল্য নহে। নিত্য অসুরের মত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ঐ সকল খাদ্য খাওয়া যায়। এইজন্যই সে কালে মৃগয়া করিয়া তবে মাংস ভোজনের অধিকার ছিল। সাহেবেরা যেমন অবস্থাপন্নই হউক, যেমন-তেমন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক, তাহারা অসুরের মত পরিশ্রম নিত্যই করে। যে যুবকেরা অলস ভাবে, "বাবু" সাজিয়া, শুইয়া বসিয়া, "ভদ্র" লোকের মত গল্প-গুজব করে, বা আড্ডা দিয়া বেড়ায়—তাহারা যেন ঘৃত, ঘি, মাংস, "ডিম, কালিয়া-পোলাও, পোলাও-রসুন না খায়। (৩) রাতদিন নভেল পড়া, পদ্য লেখা, প্রেমের কাহিনী বা কবিতা পড়া, নিত্য থিয়েটার-বায়স্কোপ যাত্রা দেখা, সখ করিয়া বা দুএকদিন "পরীক্ষা" করিবার ছলে আফিম, মদ, বা "অমানিশিযোগে" খাওয়া বা খাইতে শুরু করা—এ সকলই কামোদ্রেক ঘটায়। (৪) কচি "ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সে "বউ-বউ" খেলে, সেটাকেও আমি যৌবনীয় বলি। (৫) কি সহরে কি পল্লীগ্রামে, হিন্দু বিদ্যালীর বাড়ীতে এমন সকল ক্রিয়াকাণ্ড, কথা-বার্ত্তা, আচার-অনুষ্ঠান হয়, যাহার ফলে, অল্প বয়স হইতেই, বালক বালিকা কামরাজ্যের সন্ধান পায়। যদি এ সম্বন্ধে পাঠকগণের আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়, তবে পরে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা বুঝিলাম যে,—(১) স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে অজীর্ণাদির ফলে, (২) কতকগুলি শারীরিক অবস্থার দোষে তাহা বজায় থাকে এবং (৩) মনের দৌর্ব্বল্যের জন্য তাহা সারিতে পারে না। এক্ষণে স্বপ্নদোষ "সারান" যায় কেমন করিয়া, তাহার কথা বলিব। প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি যে, স্বপ্নদোষ একবার আরম্ভ হইলে, জীবনে কখনো তাহা সারে না। কিন্তু সারিলেও, কাযে এক রকম সারে বটে। অর্থাৎ, চেষ্টা করিলে, স্বপ্নদোষ এত কমিয়া যায় যে, তাহাকে এক রকম সারাই বলা যাইতে পারে। মাসে একবেলা স্বপ্নদোষ হইলে, তাহাকেও "দোষের বলিয়া ধরিবে না।—তাহার চেয়েও কমান যায়। বিবাহ করিলে, যতদিন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে ততদিনের মত ঐ ব্যায়াম আর দেখা দেয় না।

যে যে চেষ্টা করিলে ঐ ব্যায়াম খুব কমিয়া যায়—এক রকম প্রায় সারিয়াই যায়—সেগুলি এই :—

(১) আহারে সংযত হওয়া চাই। যাহাতে পেট নরম হয়, এমন কিছুই খাইতে নাই। রাত্রে খুব হাল্কা খাদ্য খাওয়া চাই। রাত্রের দিকে জলীয় পদার্থ নিতান্ত খাইবে না। রাত্রি ৭॥-টার মধ্যে খাইয়া, ৯॥-টার মধ্যে শুইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশ না লইয়া, সরু বিছানায় শুইবে।

(২) শুইবার আগে প্রস্রাব করিয়া, মাথাটি ভিজা

গামছায় মুছিয়া, ভগবানের নাম করিয়া এবং মনে মনে খুব জোর সঞ্চয় করিয়া শুইবে যে, আজ আর স্বপ্নদোষ হইবে না।

(৩) যদি চিৎ হইয়া শোয়া অভ্যাস থাকে, তবে শুইবার সময়ে, কোমরে একটা ঘুন্সিতে একটা কাটিম এমনভাবে বাঁধিবে যে, চিৎ হইলে কাটিমটা পিঠে আঘাত করায় আপনিই ঘুরিয়া পাশ ফিরিয়া যাবে।

(৪) যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তাহার জন্য সুরেসরাই, কল মূল এবং প্রয়োজন হইলে, রীতিমত জোলাপও ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে স্নানের অভ্যাস করা চাই। কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া, অথবা পিঠের শির দাঁড়ার উপরে শীতল জলধারা দিয়া স্নান করিতে পারিলে ভাল হয়। কুচকি প্রভৃতির আশ পাশ পরিষ্কার রাখিবে।

(৬) সহজ একদিন না খাইলে, তবু যেন একটি দিনও ব্যায়াম ও ভগবানের আরাধনা বাদ না যায়। "ব্যায়াম" বলিলে, এমন কোন অঙ্গ-চালনা বুঝিবে যাহাতে শরীর খুব হাল্কা ও ঝরঝরে বোধ হয়—যাহার পরে ক্লান্তি না আসে। বোধ হয়, ক্লাবের ডাম্বেল সকলের পক্ষে সুবিধাজনক। ভগবানকে আঁকড়াইয়া ধরিবে—দিন দিন তাঁহারই একান্ত শরণাপন্ন হইবে—ভয় থাকিবে না।—"অভী"—তাঁহারই অংশ তুমি, অমৃতের অধিকারী তুমি,—তুমি তাঁহার ধন, তাঁহার আশ্রয় এবং তাঁহার আশির্ব্বাদ বুঝিবে। দুশ্চিন্তা দূরে পলাইবে, দুষ্কৃত তোমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না, মনের কোণে, যেখানে কুবাসনা লুকাইয়া আছে, সেও সন্তর্হিত হইবে। মায়ের কোলে আশ্রয় পাইলে শিশুর যেমন অবস্থা হয়, তোমারও তেমনি হইবে। যদি নিজ পিতামাতার ছবি থাকে, তবে তাহা সর্ব্বদা এমন জায়গায় রাখিবে যেখানে মনে কুচিন্তা উদিত হইবা মাত্রেই—সেই নরদেবতার মুখন চিত্র তোমার দৃষ্টিপথে পড়িবে। তাঁহাদের পবিত্র দেহ দেখিয়া, তাঁহাদের মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাপ কার্য হইতে বিরত হইবে।

সমাপ্ত।

রঙ্গালয়।

সংবাদপত্র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে প্রবীন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে বঙ্গ-নাট্যমঞ্চের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় সুবিলি উৎসব সুসম্পন্ন করা প্রত্যেক নাট্যামোদী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নাট্যাচার্য্যের প্রস্তাবটি অনুমোদন করি। আজ নাট্যশালা আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছাবস্থা হইতে বর্ত্তমান আজ বাঙ্গালীর গৌরব স্বরূপ হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে কয়েকটি যুবক মিলিত হইয়া "নীলদর্পণ" অভিনয় করিয়া যে প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন আজ দেশের সাহিত্য ও সমাজের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বঙ্গ নাট্যমঞ্চেই আমরা বিদ্যোৎসাহী মিনিষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল প্রসাদের মত নাট্যকার পাইয়াছি, এইখানেই রসরাজ অমৃতলাল বসুর সেই প্রথম বাহাদুরী দিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃত মিত্র, ভিনকড়ি বাঈ উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীর অভিব্যক্তির দর্শন পাইয়াছি। রানী, শিশির ভাদুড়ী, তারাসুন্দরীর মত কলাকুশল অভিনেতা ও অভিনেত্রী যে কোন দেশের নাট্যালয়ের গর্ব্ব।

এই প্রতিষ্ঠানকে সজীবিত রাখিতে হইলে ইহাকে সমাজের সহিত আরো ঘনিষ্ট ভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। আগে নাট্যমঞ্চে যাঁহারা অভিনেতা হিসাবে প্রবেশ করিতেন তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন বড়ই হেয় বিবেচিত হইত। সুখের বিষয় সে ভাবটা এখন অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। এখন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণও নাট্যমঞ্চে অভিনেতারূপে অবতীর্ণ হইতে দ্বিধা করেন না। এই নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে আমাদের নাট্যমঞ্চগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হৌক, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

বঙ্গ নাট্যমঞ্চের সুবিলি উপলক্ষে সহরের সমস্ত নাট্যমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মিলনে কোন একখানি সুপ্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় করাই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। মিনার্ভা, মনোমোহন, ষ্টার, কর্ণওয়ালিসের

কর্তৃপক্ষীয়গণ খুব সম্ভবতঃ ইহাতে আপত্তি করিবেন না। এবং যদি সম্ভব হয় কি থাকার নিকট হইতে এ্যাসিষ্টেন্স রঙ্গমঞ্চটি সে রাত্রির জন্য পাওয়া যাইতে পারে। এবং পর্ব্ব রঙ্গমঞ্চের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মিলনে যে অভিনয় হইবে, বিশেষ করিয়া ফুবিলি উৎসবে প্রবেশমূল্য দ্বিগুণ করিলেও দর্শকের সহানুভূতি পাইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয় এখন হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বরে যদি দুইবার করিয়া এইরূপ অভিনয় করা যায় এবং সেই রাত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাধারণের মনোনীত ও উপযুক্ত ট্রাষ্টির অধীনে ব্যাঙ্কে রাখিয়া বা কাগজ কিনিয়া তাহারই সুদ হইতে আতুর, অক্ষম ও অবসর প্রাপ্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী বা যে সকল কলাবিদ রঙ্গমঞ্চের হিত সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই শেষ বয়সের সম্বল স্বরূপ সাহায্যাদি করা যাইতে পারে তবে মন্দ হয় না। থিয়েটারে ঢুকিয়া জীবনের চরম কাল অতি বাহিত করিয়া শেষ জীবনে যদি এইরূপ সাহায্য পাইবার আশা থাকে তবে সাধারণ হইতে অনেক কৃতবিদ্য লোকও রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়া ইহার উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন।

ফুবিলি উৎসবে অভিনয়ার্থ আমরা আমাদের জনৈক নাট্যামোদী বন্ধুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত নাট্য দু'খানি ও উহাদের চরিত্র কয়টিনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি নাট্যাচার্য্য অমৃতলালকে দিয়া ও গঠনের ভার লইতে হইবে।

প্রফুল্ল

যোগেশ—বাবুবাবু (মনোমোহন) রমেশ—কার্ত্তিক চন্দ্র (মিনার্ভা) সুরেশ—শিশিরকুমার (তাজমহল) ঈশ্বরহরি—রাধিকানন্দ (মিনার্ভা) পীতাম্বর—লক্ষ্মীনারায়ণ (ঐ) শিবনাথ—ক্ষেত্রমোহন (মনোমোহন) কাদম্বিনী—নরেশচন্দ্র (তাজমহল) মদন ঘোষ—কুঞ্জলাল (মিনার্ভা) ডাক্তার—সত্যেন্দ্রনাথ (কর্ণওয়ালিস্) উমাসুন্দরী—প্রকাশমণি (মিনার্ভা) জানদা—তারাসুন্দরী—পরিবর্ত্তে কুসুমকুমারী (মিনার্ভা) প্রফুল্ল—কুসুমকুমারী (কর্ণওয়ালিস্) জগদম্বা—নীরদাসুন্দরী (ঐ) যাতনাময়ী—আশুতোষী (মনোমোহন) যাদব—সুশীলা (কর্ণওয়ালিস্)

শিরী ফরহাদ

খসরুসাহ—চুণীলাল (ষ্টার) কামরাণ—হীরালাল চট্টো (মনোমোহন) হামবাদ—নৃপেন্দ্রচন্দ্র (কর্ণওয়ালিস্) মহবুব—মহীন্দ্রনাথ (মনোমোহন) ফরহাদ—হাবুবাবু (ষ্টার) শিরী—বীণাপাণি পরিবর্ত্তে—কুসুমকামিনী (ষ্টার) শুলবাহার—চারুশীলা (মিনার্ভা) পরিজান—শশিমুখী (মনোমোহন) মদনী—কুসুমকামিনী (ষ্টার) পরিবর্ত্তে—নবতারা (মিনার্ভা)

ভূমিকা বর্জন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। কেহ ঐ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিলে আমরা সাদরে তাহা প্রকাশিত করিব। সম্পাদক—বাসন্তী।

গ্রন্থ সমালোচনা

মুকুল, সন্ধ্যা—উপন্যাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৷০। সহায় হীনা নারী নীহারবালা কন্যাকিনী নিজ যোগ্যতা দ্বারা সংসারোদধনে দাঁড়াইবার চেষ্টায় গুরুদেবের শিক্ষা প্রেম ও সহায় দ্বারা কি ভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল—কি ভাবে নিজ বিবেক ও ঘটনা চক্রের অদ্ভুত আবর্ত্তনে যোগেন্দ্রের শিক্ষা প্রেম হইতে এককালে আত্মরক্ষা করিয়াও আবার বার বার তাহারই কবলে নিপতিত হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারই চিত্র এখানি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যোগেন্দ্রের স্বার্থশূন্য নিষ্কলঙ্ক ভালবাসার পাশে অমরের নিস্বার্থ অন্তরের আত্মত্যাগ সুন্দর ফুটিয়াছে। যোগেন্দ্রের সুন্দর স্বভাব, সাধ্বী প্রফুল্লর তুলনা এ গুলি বেশ দেখানো হইয়াছে। এখানি পড়িতে বসিলে আগাগোড়া পাঠের আগ্রহ, সমভাবে থাকে। এখের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

"কেন বাজাও কাঁকণ কনকন, কত
ছল ভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে
জল ভরে'।
কেন জলে ঢেউ তুলি, ছলকি ছলকি
কত খেলা।
কেন চাহ খনে-খনে চকিত নয়নে
কার তরে,
কত ছল ভরে।"

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩২৯, ইং ৯ই ডিসেম্বর। [২০শ সংখ্যা

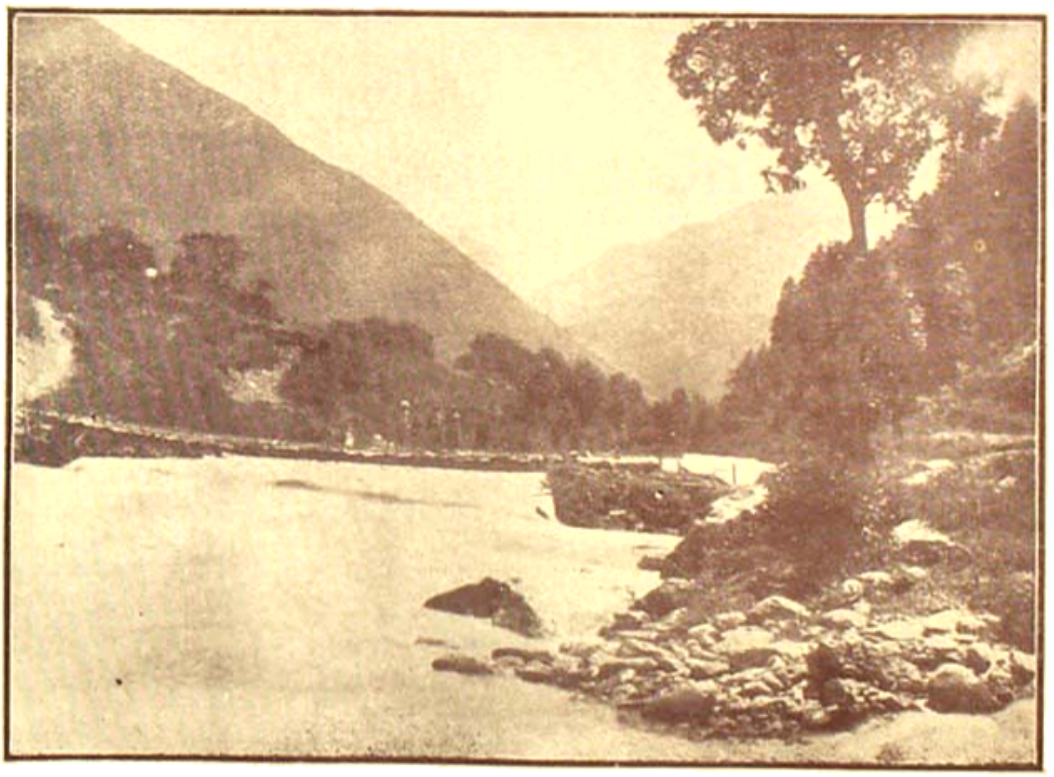

ক্যাপ্টেন-পুত্রিকা।

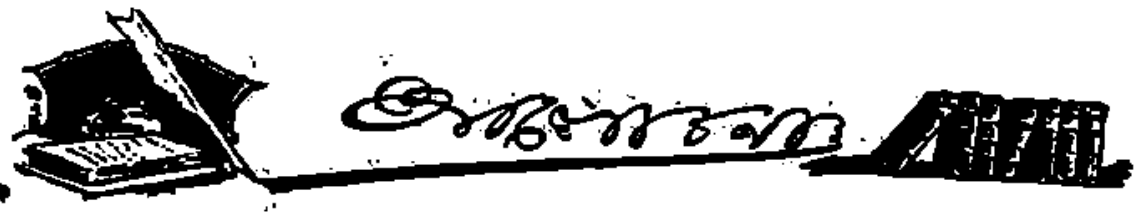

কথারম্ভের পূর্ব্বেই বলি, ধন্য আশুতোষ! ছলে, বৈতে, অভাবে, পীড়নেও যে জাতিয়তা ত্যাগ করিতে নাই, স্বদেশ-বোধ ভুলিতে নাই, স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে নাই, গত সপ্তাহের সিনেট সভায় তোমরা বুঝাইয়া দিয়া তুমি বাঙ্গালী জাতির মুখ রক্ষা করিয়াছ। আসুক অভাবের তাড়না, আসুক দুর্ভিক্ষের লেলিহান জিহ্বা, তা'ও সহিব, ভগবানের নাম লইয়া দুর্ভিক্ষের জঠরজ্বালা জুড়াইব—তবুও স্বাধীনতা বিক্রয় করিব না। কথার মত কথা বটে!

• • • •

যাঁহারা এ দেশের হিতকামনার পবিত্র দায়িত্বভার লইয়া উপবিষ্ট তাঁহাদেরই, মনাতে যদি উচ্চশিক্ষার দ্বার এ-দেশবাসীর সম্মুখে এমনি করিয়া অর্গলবদ্ধ হইয়া যায়, হৌক, সে মহা ক্ষতিও আমরা মানিয়া লইব—কিন্তু স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া অধীনতার স্বর্ণমুকুট পরিয়া সে পথে ভিক্ষা বাড়াইব না; পরমেশ্বরের যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তাহাই পূর্ণ হৌক। তাঁহার কোন্ ইচ্ছা কবে অপূর্ণ থাকে, হৌক, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হৌক। না-হয় উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ হইবে তাই বলিয়া উচ্চশিক্ষা দিতে যাইবার মূলে, পথে তোমাদের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া "উচ্চশিক্ষার" বড়াই করিব না। তাঁহাদের পবিত্র দায়িত্ব লইয়া তাঁহারা সুখাসীন থাকুন, আমরা ভিক্ষা করিয়া পারি, যেমন করিয়া পারি নিজেদের পথে অনশনে চলিব। বাগদেবতার মন্দিরে হীনসর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-কলুষিত করিব না। আবার বলি, ধন্য আশুতোষ!

• • • •

বহু সরকার ইতিপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ যে আড়াই লক্ষ মুদ্রা দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন সে তোষের নিম্নেও যে এমন একটা হীন প্রস্তাব লুকাইয়াছিল তাহা অনেকেই সে-সময় কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তখন সকলেই এই আশা করিয়াছিলেন যে যদিও আড়াইলক্ষ মুদ্রা প্রাপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হইবে না—তবুও সরকার তাঁহাদের 'সাধ্যমত' সাহায্য করিতেছেন বলিয়া আড়াইলক্ষ মুদ্রা-ই তাঁহারা মাথা পাতিয়া লইতেছিলেন কিন্তু তখনি সরকারের চাল প্রকাশ হইয়া পড়িল। সরকার যে সর্ত্তে টাকা দিতে চাহিলেন, সেই সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়া দান গ্রহণ করা অতি ছোট ভিক্ষুকেরও অসম্মানকর। অথচ এ দান—এ যেন শিক্ষাবিভাগকে। যে দেশের পবিত্র দায়িত্বভার লইয়া সরকার অধিষ্ঠিত সেই দেশেরই অধিবাসীদের শিক্ষাকার্য্যে ব্যাঘাত হইত।

শুধু তাই নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণের চক্ষে হেয়, ইহার পরিচালকগণকে অপদার্থ প্রতিপন্ন করিতে এমনই একটা গোপন ষড়যন্ত্র নাকি চলিয়াছিল যদ্দ্বারা ৩০০০ মাইল দূরদেশ বিলাতের কাগজেও সেউলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা স্যার আশুতোষের মুখের কথাই তুলিয়া দিতেছি:—টাইম্‌স্ পত্রিকায় এই প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় প্রবন্ধটির জন্ম ভারতবর্ষেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব জন্মাইবার জন্যই এরূপ গ্লানিসূচক সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।" আমরা জানি-না এরূপ প্রবন্ধ ছাপাইয়া একটা সুগঠিত বিদ্যামন্দিরের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহারো কোন উচ্চ কার্য্য সমাধা হইতে পারে কি-না! তবে যিনি বা যাঁহারাই এই প্রবন্ধের জনক হৌন্ তিনি বা তাঁহারা যে কোন প্রকারের পবিত্র দায়িত্ব লইয়া উপবিষ্ট নাই তাহা নিশ্চিত। এবং ইহাও সত্য যে তাঁহার বা তাঁহাদের দুরভিসন্ধি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যে উদ্দেশ্যেই তিনি বা তাঁহারা এই মহা কার্য্য সাধিয়া থাকুন, উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গিয়াছে। কারণ স্যার আশুতোষ বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে এই হীন দুর্নাম হইতে রক্ষা করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম, আমাদের সুনাম জাতির সুনাম, দেশের সুনাম রক্ষা করিতেই হইবে।

• • • •

গবর্ণমেণ্ট যখনই কোন বড় কাজ করিয়াছেন, দেশবাসীর কোন পরামর্শই তখন কাজে লাগে না। ও'ডোয়ায়ার কার্য্যে পাঞ্জাববাসীর মতের অপেক্ষা করা দরকার দরকার বলিয়া বুঝেন নাই, মালাবার চলন্ত ট্রেণের বেলাতেও তাই, আকালীদের সময়েও তাই, কত বলিব, সকল সময়েই তাই—আজ এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে—এই ছোট্ট ব্যাপারে যে তাঁহারা সুপরামর্শের জন্য কাহারো দ্বারস্থ হইবেন, এমনটা আশা করাই বাতুলতা কাযেই আমরা অরণ্যে রোদন করিয়া গলা ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। তবে এ ব্যাপারেও মা-র চেয়ে মাসীর টান বেশী সেই মাসীর জাত—হেয়ার-ষ্ট্রীটের হাত যখন খুব একচোই কাল কাটিয়া লইয়াছে। অবশ্য পরামর্শ দিবারই বল আর ইউনিভার্সিটিকে দাত খিঁচাইবার কথাই বল, তাহার অধিকার ও সরকারের চেয়ে কম নয়। সে যে দু'কথা বলিয়া দিবে—তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? পবিত্র দায়িত্ব রক্ষাকর্ত্তা ত—তাঁহারাই!

পাঠক-পাঠিকা শুনিয়া সুখী হইবেন বিলাতে ব্যারিষ্টারের তালিকা হইতে এতদিন পরে মহাত্মা গান্ধীর নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নাম যে এতদিন সে তালিকায় ছিল এইটাই আশ্চর্য্যের কথা!

• • • •

যাঁহারা সত্যমন্ত্রের উপাসক, হৃদয় মধ্যে যাঁহাদের সত্যের আলোক প্রজ্বলিত, সাধারণ মানুষ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সত্য-জগতে উঁকি মারিয়া থাকে। সকলে সত্যমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না, সত্যালোকের দীপ্তি অনেকেরই চক্ষে অত্যধিক উজ্জ্বল ঠেকে, তাহারা সত্য-জগতের দ্বার স্পর্শ করিতে অক্ষম হয়। কিন্তু যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সত্য-মন্ত্র যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান, তিনি যে সাধারণের চেয়ে কত উচ্চে তাহা আমরা অনেক সময় ধারণা করিয়া লইতেও অক্ষম হইয়া পড়ি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একজন সেই সত্যাশ্রয়ী, যিনি সত্যমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সত্যের আলোক যাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে!

• • • •

চিত্তরঞ্জনের শরীর অসুস্থ। আজ তাঁহাকে দেখিলে সেই চিত্তরঞ্জন বলিয়া চেনা যায় না। এমন অসুস্থ দেহ লইয়া সিকেটিং কার্য্যে বাহির হইতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নহেন। তিনি স্বয়ং নেতা হইয়া সিকেটিং-এ বাহির হইবেন, স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করিয়াছেন। দেশের যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী মনীষিগণ অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেও দেশদ্রোহী চিত্তরঞ্জনের মুক্তির ঘটনায় মনঃপ্রাণ নিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এখন বক্তব্য কি জানিতে ইচ্ছা হয়!

• • •

দেশবন্ধু স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করিয়াছেন, বিলাফত সংঘও স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করিয়াছেন—একই উদ্দেশ্য—বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করাইতেই হইবে। দেশবন্ধুর ডাকে খেলাফত সংঘের আহ্বানে সেই সব অকাতর কর্ম্মী, স্বদেশ প্রাণ, নির্ভীক যুবকবৃন্দ যে আগুয়ান হইয়া আসিবেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা যে স্বচক্ষে সেই সব বীরের আচরণ দেখিয়াছি, সেদিনের কথা ত সে নয়। সেই যে সেদিন, যেদিন পুলিশ আমাদের জননীসমা বাসন্তী দেবীকে গ্রেফতার করিতে সাহসী হইয়াছিল, সেদিন আমাদের তরুণ আমাদের স্বাধীনতাকেও হাত দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল—সেই যে ছেলের দল, মুখে দাড়ি-গোঁফ ভেদ করে অকুতোভয় সাহস, প্রাণে পুঞ্জীভূত বেদনা ও আনন্দ বহিয়া চলে দলে, শতে শতে, হাজারে হাজারে এই মহলের প্রাঙ্গণে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাজারা এখনো কারাগারে প্রহারের ক-কথাই নেই, বাকী যাহারা সঙ্গীহারা, বলহারা বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহারা যে তাহাদের বন্ধুদের, সঙ্গীদের, সহকর্ম্মীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কাতারে কাতারে দেশবন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে এ আশা করা একেবারেই দুরাশা নয়। সাধু ভগীরথের সঙ্খধ্বনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গ-মন্দাকিনী জাহ্নবী এই মর্ত্তে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া কল-কল্লোলে নাচিয়া চলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার আশা, জাতির ভরসা, দেশের প্রাণ বীর যুবকগণ তেমনি করিয়া কল-কাকলী তুলিয়া, দেশমাতৃকার স্তব গাহিতে গাহিতে চিত্তরঞ্জনের পুণ্যপথের অনুগামী হউক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

• • • •

স্ত্রীকয়েদীবর্গের প্রাণদণ্ড লইয়া বিলাতের কমন্সসভায় আলোচনা চলিতেছিল। গ্রীক ইওরোপবাসী, গ্রীক খৃষ্টান, গ্রীকমন্ত্রীবর্গের হত্যাসাধন করিয়া জগতে যে কীর্ত্তি স্থাপিত হইল তাহাতে ইংরেজ প্রভুদের বড়ই বাধা বাধিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা-ই যে এই অমানুষিক ও পৈশাচিক কর্ম্মের সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন, কমন্স সভার সভ্যগণ নাকি স্পষ্ট ভাষাতেই সে-কথা বলিয়া দিয়াছেন। কথাটা ত মিথ্যা নয়—মই ধরিয়া তাঁহারাই না এই মন্ত্রীদিগকে গদিতে তুলিয়াছেন, নামাইয়া লইয়া মই সরাইলে মন্ত্রী হইত না? যাক্—তবু সত্য কথাটা শোনা গেল। সৌভাগ্য তোমাদের যে মৃত গ্রীকমন্ত্রীগণ, বাধার বাধী জুটিয়াছে! আর অভাগা পাঞ্জাবমেধের ও জোয়ারীলীলা খেলার মৃত অধিবাসীগণ, অপরাধ তোমাদের! শতবার তোমাদের সহস্রবার তোমাদের এবং তাহার একমাত্র কারণ তোমরা ভারতবাসী!

• • • • •

সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মে, এফ, মাস্তোনের খ্যাতি আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য সাধু উদ্দেশ্যে প্রগাঢ় সহানুভূতির বহু বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার মহত্ত্বেরও আর এক নূতন পরিচয় পাইলাম। কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চ মিনার্ভা হস্তান্তরিত হওয়ার পর মিঃ ম্যাডান উপর্য্যুপরি কয়েকরাত্রি তাঁহার সুন্দর, শোভন, মনোরম এ্যালহ্রেড ও কোম্পিটিয়ান রঙ্গকক্ষে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্রকে বিনা ভাড়ায়, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এখনও দিতেছেন। দুইটি সমব্যবসায়ীর মধ্যে সহানুভূতি থাকা অসম্ভব—এই পুরাতন প্রবাদবাক্য মিঃ ম্যাডানের ব্যবহারে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। মিঃ ম্যাডান উপেন্দ্রবাবুর মতই আনন্দ ব্যবসায়ী, বাঙ্গালা থিয়েটারের তিনিও কর্ণধার, তাঁহারও থিয়েটার আছে, তা সত্ত্বেও তিনি দুর্দ্দিনে মহত্ত্বের, মহত্ত্বের যে পরিচয় দিয়াছেন, কোনও বাঙ্গালী যদি তাহার শতাংশের একাংশও দিতে পারিতেন, আমরা—বাঙ্গালীজাতি ধন্য হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য!

দুর্ভাগ্য তো শুধু তাঁহাদেরই নয় দুর্ভাগ্য আমাদের

আতিরই। কত আবর্জনাই ত আমরা প্রতিনিয়ত সম্মুখে পাইতেছি, তার কয়টা এই হৃদয়ের লৌহকপাটে আঘাত করে? আর যদি বা কখনো করে সে শব্দ কি আমরা শুনিতে পাই? আমাদের চিরনিদ্রিত কর্ণে কখনো কি সে শব্দ প্রবেশ করিতে পারে? না আর্থ-বালাই দূর হইতেই দূরমপসর করিয়া দেয়!

• • • •

বেলুথ অকিসের রিপোর্ট দেখি নাই, খোলা চক্ষে যাহা দেখিয়া বেড়াইতেছি তাহাতে বলিতে পারি এবছর সহরে ভীষণ দুর্যোগ আসিয়াছে। এমন একটা বাড়ী দেখি না যেখানে কয়েকটি ব্যক্তিও এককালে ভুগে আছেন! ছোট-খাট অসুখ, অরজারি ম্যালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলাম, টাইফয়েড, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া ঘরে ঘরে—এ'ও যে কত হইতেছে, বলা যায় না। বড় সহরের—বড় কাও এই বোধ করি একমাত্র বৈশিষ্ট্য!

• • • •

হাবড়া ষ্টেশনে কুলী সমিতি হইয়াছে। সমিতি হওয়াটা যে খুব খারাপ, তা নয়। সমিতি যদি তাহার সভ্যদিগকে অপেক্ষাকৃত সংযত, অল্প লোভে সন্তুষ্ট হইবার পরামর্শ দেন, তবেই মঙ্গল। নতুবা, সেই বিশের উপর বিস্ফোটক না-কি বলে, তাহাই যদি হয় ত ষ্টেশন পরিত্যাগ ছাড়া অন্য উপায় ত দেখি না।

• • • •

বোম্বাই সহরের বাড়ী ভাড়া আইনের আয়ু আরও তিন বৎসর বৃদ্ধি পাইল। ১৯২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আইন বলবৎ রহিবে। কলিকাতা সহরের বর্ত্তমান বাড়ী ভাড়ার স্থায়ীত্বকাল শেষ হইয়া আসিল। আমাদের দেশের কৌন্সিলের সভ্যগণ বিলটির আয়ুকাল বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

• • • •

যুক্তপ্রদেশের মাইলা-কর্ম্মী পার্ব্বতী দেবীর রাজদ্রোহ অপরাধে দুই বৎসর সশ্রম-কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ভারতবর্ষে নারীর প্রতি এহেন গুরুতর কারাদণ্ড—ভারতের আইন ও শৃঙ্খলার ইতিহাসে এই প্রথম। যে আইন ও শৃঙ্খলার হাতে বিশ্বজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, মানবের মহাহিতব্রতধারী মহাত্মা গান্ধী ছয় বৎসর কারারুদ্ধ থাকিতে পারেন—সেই আইন-শৃঙ্খলার যাদুদণ্ড যে ভারতে আরও অনেক কীর্ত্তি স্থাপিত করিবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি!

• • • •

পার্ব্বতী দেবী আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়াও যে কথাটি বলিয়াছেন আমরা সেটির আলোচনা না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন সরকারী রিপোর্টার সভাস্থলে বক্তৃতা লিখিয়া লয় নাই, স্মৃতি হইতে যেচ্ছামত লিখিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে যে সব আরবী পার্শী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে পার্ব্বতী দেবী সে সকলের অর্থ বা অস্তিত্ব জ্ঞাত নহেন। তিনি বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পুলিশ তাহার সুবিধামত রিপোর্ট প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছে। মনে হয় গভর্ণমেণ্ট দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামীর কথার কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন না। অন্ততঃ এ কথা মনে করায় আমাদের ক্ষতি নাই।

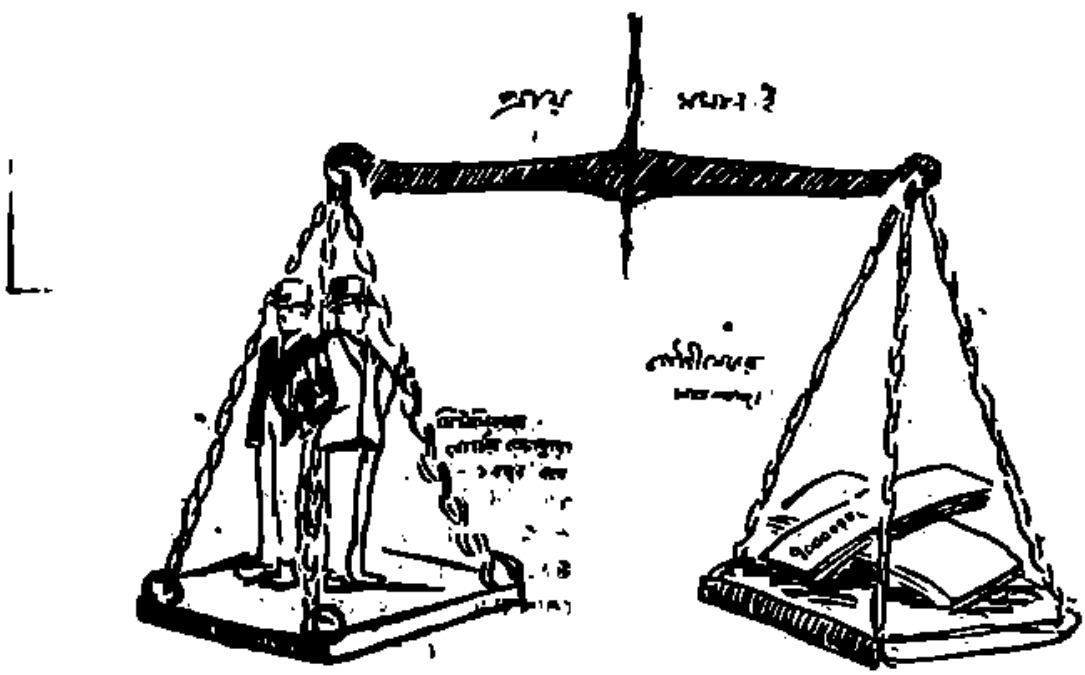

নীলা

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

চোখ দুটি ছিল তার সাগরের মত অঞ্জনীল, কুন্তল রাশি গলিত স্বর্ণের মত, গায়ের রং ছিল যেন দুধে আলতায় মেশান। অঙ্গের গঠন তার এত মনোরম ছিল যে হীরে মণি মুক্তো দিয়ে সে অঙ্গের সৌন্দর্য্য বাড়ানোর কোন প্রয়োজন হত না। বিধাতা যেন সকল সৌন্দর্য্য সুষমা দিয়েই বিশেষ ভাবে এই সুন্দরী নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন। ইনিই ছিলেন রোম নগরের সুন্দরী শিরোমণি পপিয়া।

রোম তখন বিলাসিতার সাগরে মজ্জমান। সমস্ত জগতের ঐশ্বর্য্য রাশি করায়ত্ত করে রোম তখন বিলাস সাগরে ভরপুর। আনন্দ উৎসব, নাচ গান, ভোজ এ সব তখন রোমনগরের প্রতি ঘরে ঘরে চলত। এত বিলাসিতার মোহে পড়েই বুঝি জগতের সেরা রাজ্য রোমের এই দুর্দ্দশা হয়েছিল।

পপিয়ার মত সুন্দরীরা তখন দুধসাগরে স্নান করতেন, দুধ ও মধু মিশিয়ে তারা প্রসাধন করতেন, স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি করতেন। সহস্র পুষ্প ও ঔষধির গন্ধে তাদের স্নানের দুধ সারস গন্ধভরা হয়ে উঠত। হাজার হাজার লাল নীল গোলাপ ফুলের পাপড়ির উপর তারা সুখ নিদ্রা যেতেন।

রোমের সম্রাট ছিলেন তখন ক্লডিয়াস। তিনি ছিলেন অতি দুর্ব্বলমনা। মেসালিনা নামে এক অখ্যাতি সম্পন্না সুন্দরীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। নামে ক্লডিয়াস সম্রাট হলেও রোম শাসন করতেন এই নারীই। এগ্রিপিনা নামে রোমনগরের বড় ঘরের এক বিধবা ছিলেন। তিনি দেখলেন কোন রকম করে মেসালিনার প্রভুত্ব খর্ব্ব করতে পারলে রাজ্যের ভার তিনি অনেকটা নিজ-হাতে নিতে পারেন। তাই এগ্রিপিনা মেসালিনাকে সরাবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এগ্রিপিনার মনের ইচ্ছা তাঁর শিশুপুত্র নিরোকে রোম রাজ্যের সম্রাট করবেন—কিছু দিন পরেই তিনি বুড়ো সম্রাট ক্লডিয়াসকে এমন ভাবে হাত করিলেন যে সম্রাট মেসালিনাকে হত্যা করবার আদেশ দিলেন। এগ্রিপিনা বুড়ো রাজাকে বিয়ে করে নিজ পুত্র নিরোকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করালেন ক্লডিয়াসের নিজ পুত্র ব্রিটানিকাস থাকা সত্বেও এগ্রিপিনার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

কি রকম ঘরে পপিয়ার জন্ম—বাপ মা কি রকম ছিল তা না জানতে পারলেও তার আনোৎসব কত মহার্ঘ ব্যাপার ছিল, কি ভাবে রোজ আড়াই শ গ্যালন দুধ তার স্নানের জন্য ব্যয়িত হোত সে আমরা জানতে পারি।

শাদা মার্বেল পাথর দিয়ে তাঁর দুধের একটি উঠান বাঁধানো ছিল। সে উঠানের ছাদ ছিল নীলা পাথরের তৈরী যাতে তার চোখের রংয়ের সঙ্গে মিল করে। এই উঠানের মাঝখানে ছিল তার দুধ সায়র—দুধ সায়রের ভেতরটা স্বর্ণমণ্ডিত। এই দুধ সায়র রোজ দুধে ভরতি হয়ে গেলে সুন্দরী অতি সূক্ষ্ম সোনালী রেশমী বসনে দেহ আবৃত করে দুধ সায়রে জলকেলি করতে নামতেন। পপিয়ার এই দুধ সায়রে স্নানের কথা রোমনগরের ঘরে ঘরে প্রচার হয়ে গিয়েছিল।

সুন্দরী পপিয়াও এই চাইত। পপিয়ার মা মেয়েকে বাল্যকাল থেকেই শিখিয়ে এসেছিলেন বিয়ে করতে হবে যেন দেশের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী লোককেই বরমণে বরতে হবে। দেশের আর কোন নারীরা যা করবে না এমন ভাবের কোন বিলাসিতা দ্বারাই রোমানদের দৃষ্টি আকর্ষিত করতে হবে—নূতন কিছু দেখলেই রোমনরা সেই দিকে ঝোঁক দিবে। তাই পপিয়ার এই দুধ সায়রে স্নানের কাহিনী বিজ্ঞাপনের মত রোমনগরের অর্থবান লোকদের কানে যাচ্ছিল।

নীলা। (পপিয়া)

পপিয়া যখন বাইরে বের হতেন তার তখনকার বেশভূষাও বিচিত্র রকমের। এমনি একটা অপূর্ব্ব রথের ওপরে তিনি নিজ মুখখানি ঢেকে বের হতেন যে তাতে মুখখানি ঠিক না দেখা গেলেও সে সুন্দরীর মুখের সৌন্দর্য্য ও শ্রী ওপরে ওপরে যেন আরও শতভাবে বিকশিত হয়ে উঠতো—তার অঙ্গের পোষাক পরিচ্ছদ ছিলও ঐ রকম। সৌন্দর্য্যের সে তার ভেতর দিয়ে উছলিত হয়ে পড়ত। যে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত।

গরীব ধনী সকলেই সেই মনোহারিণী সুন্দরীকে

দেখতো কিন্তু গরীবের সে দিকে যে সবার সাহসও সামর্থ্য ছিল না। কত ধনবান তাকে যদি মুক্তো উপঢৌকন পাঠিয়ে দিত। অবশেষে পপিয়া চিউকাস ক্রিসপিনাসে বাবে এক পরম ধনী সন্তানকে স্বামীরূপে বরণ করলেন, যুবক যেমন ধনবান পপিয়াকে তেমনি ভালবাসতেন, কিছুদিন তারা বেশ সুখে কাটালেন।

এর পরে পপিয়া প্রেমে পড়ে গেলেন।

স্বামির সঙ্গে তার ভালবাসা কোন দিনই ছিল না। তাকে বিয়ে করে ছিলেন তিনি শুধু অর্থ ও সম্মানের জন্য। সে সম্মান ও অর্থের অধিকারী হয়েই তিনি দেশের একেবারে সেরা সেরা লোকদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন মার্কাস সালভিয়াস ওটো। ওটো ছিলেন নিরোর পরম বন্ধু—আর অমন সুন্দর সুপুরুষ সে কালে রোমনদের মধ্যেও দু'জন ছিলেন কি না সন্দেহ। দেশের সেরা সুন্দরীদের সকলেরই প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি—অবিবাহিতা নারীরা তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল ছিল।

ওটো পপিয়ার প্রেমে পড়ে গেলেন, পপিয়াও ওটোর প্রেমে পড়লেন। বাইরে এই প্রেম ব্যাপার নিয়ে কানা ঘুষো চলতে লাগল, কিন্তু পপিয়ার স্বামী ক্রিসপিনাস এ ব্যাপার কিছুই জানতেন না। ওটো ও পপিয়ার প্রেম তখন বেজায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছে—কেউ জানুক বা জানুক সে দিকে তাদের কোন লক্ষ্যও ছিল না।

একদিন ক্রিসপিনাস এ ব্যাপার শুনলেন। শুনে কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না—সুন্দরী স্ত্রীর উপর তার এমনি অগাধ বিশ্বাস ছিল। অবশেষে নিজ চোখে যখন তিনি সব দেখলেন সুন্দরী পপিয়া তখন মধুর হাসি হেসে ধীর ভাবে বিবাহচ্ছেদ করে ফারগৎ নিতে বললেন।

বিবাহচ্ছেদ হয়ে গেল। পপিয়া যেটি চাইতেন সেটি তার পাওয়া চাই-ই। হতভাগ্য ক্রিসপিনাস মনের দুঃখে আর সমাজে বের হতেন না। এর পরেই আবার সুন্দরী রাণী পপিয়া বিবাহের কনে সেজে বিবাহ আসরে গেলেন।

কি ভাবে কখন কি করলে পরে সুন্দর ও শোভন হয় পপিয়া তা জানতেন। বিবাহ আসরে যখন তিনি কনে সেজে বসলেন তখন তার দিকে চেয়ে মনে হতে লাগল এ যেন পরিত্যক্তা নারী নয়, এ যেন অনাঘ্রাত সুন্দর পরম শোভনীয় পুষ্প প্রথম ফোটা শিশির ধৌত ফুল রাণী। কবিরা নব বিবাহিত দম্পতী যুগলের প্রশংসা গাথা গাইতে গেলেন। রোমরাজ আগুর ঘরের উৎসব চলতে লাগল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ফুল ও ফল সে বিবাহ উৎসবে এসেছিল।

ওটো ও পপিয়ার মধ্যে সত্যিই ভালবাসা এসেছিল। পপিয়া এর পূর্বেও বহু প্রেমিক পেয়েছিল বটে কিন্তু কাকেই সে ভাল বাসে নাই—কিন্তু ওটোকে সে সত্যিই যে সে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। পপিয়ার প্রেমে ওটো অজ্ঞান—পপিয়া ছাড়া তার মুখে আর অন্য কথা নাই। ওটো তার পরম বন্ধু ও রোম সম্রাট নিরোর কাণে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে সব সময় পপিয়ার প্রশংসা করতেন যে নিরো পপিয়াকে দেখবার জন্য স্বভাবতই উৎসুক হয়ে উঠলেন।

সম্রাট নিরো বন্ধু পত্নীকে দেখতে গিয়ে তার প্রেমে পড়ে গেলেন।

পপিয়া দেখলেন তাঁর আজীবনের কামনা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। বিশাল রোম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতির পাশে স্বর্ণসিংহাসনে বসবার সুযোগ তার এসেছে। এই ছিল পপিয়ার বাসনা—এই তিনি ভালবাসতেন।

পপিয়া তার আজ সর্বস্ব কপটতার প্রেম দিয়ে ওটোকে নিজ হৃদয় রাজ্য হতে নির্বাসিত করে উচ্চাকাঙ্খার কাছে ভালবাসাকে বলি দিয়ে নিরোর প্রতিই ভালবাসার আবেশ দেখাতে লাগলেন।

সম্রাট নিরো নারীর মোহে পড়ে বন্ধু ওটোকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। ঠিক নির্বাসন না তবে ওটোকে তিনি কোন সুদূর প্রদেশের শাসক নির্বাচিত করলেন—সে এমন স্থান যেখান তার ভালবাসার পপিয়াকে নিয়ে যাবার উপায় নাই। ব্যাপার বুঝতে পেরে ওটো বন্ধু নিরোকে মনে মনে অভিশাপ দিতে লাগলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তার বড় ভালবাসার পত্নীও যে সমদোষী এ কথা তার মনে একবারও জাগল না।

ভাঙ্গা প্রাণ নিয়ে ওটো বিদেশ চলে গেলেন কিন্তু বন্ধুর এ অত্যাচারের দাগ তার হৃদয় থেকে কোন দিনও মোছে নাই। এর পর দশ বছর পর্যন্ত তিনি নিরোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসেছেন। রোমের বিখ্যাত সুন্দরী—তার পত্নী—একমাত্র তারই উপভোগ্যা যে তাকে স্বামীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অপর কেউ স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে এ কি প্রাণে সয়? পপিয়া যা চেয়েছিল তাই পেয়েছেন। সম্রাট নিরোর পত্নী অক্টেভিয়া ছিলেন বড় ভাল মেয়ে। স্বামীকে তার হাত ছাড়া করে নেওয়ার জন্যও তিনি পপিয়ার উপর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হলেন না। পপিয়া আবার ছিলেন এমন যে অক্টেভিয়া তার উপর ঈর্ষা দেখাচ্ছেন না—এতেই তিনি তার উপর বেজায় ঈর্ষান্বিতা হয়ে উঠলেন—কাঁটাকে রাখে? অবশেষে সম্রাট নিরোকে দিয়ে তার বিবাহিতা পত্নী অক্টেভিয়াকে হত্যার আদেশ দিয়ে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

এর পরে পপিয়াও নিরোর যথারীতি বিবাহ হয়ে গেল—সুন্দরী পপিয়া রোম সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হলেন।

রোম সম্রাট নিরো ও সম্রাজ্ঞী পপিয়ার প্রথম সন্তান হয় একটি কন্যা। কন্যাটি অল্প বয়সেই মারা যায়—তাতার শোকে নিরো নিজে একটি শোকগাথা রচনা করে

সর্বসমক্ষে দেখেছিলেন। সম্রাট নিরো ক্রমশঃই যেন উন্মাদ রোগগ্রস্থ হচ্ছিলেন—পপিয়ার উত্তেজনায় তিনি অধিক পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন। নিরোর বুদ্ধি বিশেষ কিছু ছিল না—অথচ আত্মম্ভরিতা ও গর্ব ছিল প্রচুর, পপিয়া তার এই আত্মম্ভরিতার খোরাক দু'হাতে জোগাতেন। নিরো স্বভাবতঃ ছিলেন নিষ্ঠুর পপিয়া তাকে নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের নূতন নূতন উপায় শিখিয়ে দিতেন—রাজ্যের লোক সব তাদের রাজা ক্রমশঃ নিষ্ঠুরতায় অধীর হয়ে উঠলো।

এমন অবস্থায় পপিয়া যখন বিচিত্র পোষাক পরে রোমের রাজপথে বের হলেন রোমবাসীরা তখন সভয় দৃষ্টিতে সেই সুন্দরীর নয়নমুগ্ধ একবার দেখতে পেলে ধন্য হয়ে যেত। এমন পোষাকের বিলাসিতার লীলা ক্ষেত্র রোমনগরেও কেউ কখনো দেখে নাই। পোষাক যাত্রার সঙ্গে যে ঘোড়াগুলো চলতো তাদের পায়ের খুরগুলি থাকতো সোণা দিয়ে মোড়া, হাজার দাসদাসীর কম তার সঙ্গে বের হত না—রোমবাসীরা এত অর্থের এমন অপব্যয় দেখে শিউরে উঠতো। কিন্তু সুন্দরী রাণী পপিয়া একবার তার মুখের ওড়নাখানি সরাইয়া রোমবাসীদের দিকে চাইলেই তাদের অভিশাপবাণী আনন্দধ্বনিতে পরিণত হয়ে যেত।

এই নীল নয়নাসুন্দরীর প্রতি রোমবাসীদের আক্রোশের অনেক গল্প শোনা যায়। রোমনরা ইহার প্রতিমূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। অত্যাচারে নির্যাতিত হয়ে এরা নীল নয়নাকে যা-তা বলত কিন্তু একবার তাদের দিকে ফিরে হাসিমুখে চাইলে তারা একেবারে গলে যেত। নীল নয়নার উপর আক্রোশ ঘৃণা আর তাদের কিছু থাকতো না। এমনি ছিল পপিয়ার নীল নয়নের মুগ্ধির মোহিনীশক্তি।

সম্রাট নিরোরাজ্যের সব সুন্দর মধ্যেই নিজমূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই পপিয়ার মূর্তিও অঙ্কিত করাতেন। পপিয়ার সম্মানের জন্য রাজ্যমধ্যে তার অনেক প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এর মধ্যে অনেকগুলি মূর্তি হাতীর দাঁত ও সোণা দিয়ে রচিত হয়েছিল—পপিয়ার ইচ্ছা মতই সম্রাট উঠতেন বসতেন। পপিয়ার প্ররোচনায় তিনি নিজ মাতাকে পর্যন্ত হত্যা করেছিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যার পর নিরো যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ভাবলেন হায় কি নিষ্ঠুর তিনি! নিরোর এই ভাব দেখে পপিয়া শঙ্কিত হয়ে উঠে আবার সম্রাটের মন কি নব উত্তেজনায় ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বিবেকের বন্ধন ও চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হোল—পপিয়া সম্রাটকে বললেন রাজ্যমধ্যে ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলেছে রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করবার জন্যে।

নিরো রাজ্যের সব বড় বড় লোকদের এই আশঙ্কা-জনের নেতা জেনে তাদের হত্যা করতে লাগলেন—এই নির্দোষ লোকদের মধ্যে নিরোর বাল্যশিক্ষক বৃদ্ধ সেনেকাও ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডে সারা রোম স্তম্ভিত হয়ে গেল—কিন্তু নিরো এখন পূর্ণ উন্মাদ। সম্রাট নিরোর আদেশে রোমনগরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোল—প্রায় সমগ্র নগরীই এই অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কত অমূল্য সম্পদ—সুপ্রসূত সঞ্চিত জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার বিচিত্র পাঠাগার সমূহ, কত বিচিত্র কলাসম্ভার অগ্নির লেলিহান জিহ্বা বের করে গ্রাস করছে—আর উন্মাদ সম্রাট তখন ধ্বংসোন্মুখ নগরের পানে চেয়ে বৈহালা বাজাতে বাজাতে নিজ রচিত একটি ধ্বংসের গাথা গাইছিলেন।

রাজার এই নূতন অত্যাচারে বহু সম্পত্তিহারা সৌন্দর্য হারা রোমনের কিংপ্রায় হয়ে উঠলো। পপিয়া কিন্তু তাঁর স্বামী প্রভুকে বললেন 'কোন ভয় নাই—এ সব খৃষ্টান নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দাও—এ সব তাদেরই কাণ্ড এই রাজ্যমধ্যে প্রচার করে দাও।' রাজ্যে তাই প্রচার হয়ে গেল,—আবার নূতন হত্যা উৎসব—নূতন ধরণের উত্তেজনা সহস্র সহস্র খৃষ্টান নর নারী রাজাদেশে হত্যা হতে লাগল।

এমনি চলতে চলতে দেখে এমন সময় এলে উপস্থিত হোল যে পপিয়াও উন্মাদ সম্রাটের জন্য নূতন উত্তেজনা কিছুর আবিষ্কার করতে পারেন নি। উন্মাদের সঙ্গে বাস করতে করতে তার খেয়াল মেটাতে মেটাতে পপিয়া ক্লান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে পপিয়ার আবার সন্তান সম্ভাবনা হয়। নিরোর ইচ্ছা ছিল এবার নিশ্চয়ই তার একটি ছেলে হবে তিনি তাই নিয়ে গর্ব করেও বেড়াতেন—পপিয়ার কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন ভরসাই ছিল না। মন প্রাণ তার ভয়ে দুরু দুরু কাঁপছিল।

পপিয়ার সৌন্দর্য ও যেন ম্লান হয়ে আসছিল—নিষ্ঠুর নিরো একথা তার মুখের উপর প্রায়ই শোনাতেন—পপিয়া শুধু মৃদু হাসতেন, কোন উত্তর দিতেন না। পপিয়ার মনে এখন শুধু মাত্র এক আশা যদি এইবার তার একটি ছেলে হয় তবে নিরোকে সিংহাসন চ্যুত করে ছেলেকে তার সিংহাসনে বসাবেন এবং নিজে রাজমাতারূপে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী হবেন। এইভাবে জগতের শাসন দণ্ড তারই হাতে এসে পড়বে।

সম্রাট নিরো একদিন সার্কাস দেখতে গিয়ে অনেক রাত্রে প্রাসাদে ফিরে আসছেন। পপিয়ার এখন প্রায়ই মনে হোত সম্রাট যেন তার হাত ছাড়া হয়ে তাদেরই দূরে সরে পড়ছেন। তাই সে রাত্রে সম্রাট আসতে পপিয়া তাকে যা-তা বলতে আরম্ভ করলেন। একে নিরোর মাথার ঠিক নাই তার উপর সেও তিনি সেদিন প্রচুর পান করেছিলেন। নিজের বিবেককে আর ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিতা পপিয়াকে মারলেন

এক নাম্বি—ভীষণ নাম্বি—এই নাম্বির আঘাত সহ্য করতে না পেরে পপিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মরণের পরেও লোকে এই সুন্দরীকে ভুলতে পারে নি। সুনিটোনিয়ার বসে বসে পপিয়ার মৃতপূর্ব্ব স্বামী ওটো ভাবছিলেন যে তার জীবনের ভালবাসার জনকে ছিঁড়িয়ে নিয়ে গেছে কি উপায়ে তাকে সিংহাসন চ্যুত করে তার শাস্তির বিধান করা যায়। ওটো পপিয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, নিরোর উন্মাদভাব ও অসুস্থতার কথা শুনলেন—শুনে তিনি ভাবলেন এই সুযোগ—তিনি একদল সৈন্য নিয়ে রোমের দিকে যাত্রা করলেন। এই সময় নিরোর বিরুদ্ধে আর একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। গ্রালও স্পেনের সৈন্যেরাও তখন সব রোমের অধীন ছিল তারাও সব সেনাপতি গালবার অধীনে রোমের দিকে অভিযান করলে।

রোমে এসে ওটো পপিয়ার কবরের কাছে গেলেন। সেখায় গিয়ে তিনি কবরটাকে ফুল দিয়ে ঢেকে ফেললেন এবং কবরের উপর পড়ে বালকের মত অজস্র ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগলেন। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস লিখেছেন তখনও তিনি তার পুরোন ভালবাসার কথা একবিন্দু ভুলতে পারেন নি। কিন্তু পপিয়ার কবরে তার প্রতি প্রথম সম্মান দেখাতে যাওয়ায় অল্পই ওটোকে রোমের সিংহাসনের আশা বিসর্জ্জন দিতে চলো কারণ গালবার আগে যদি তিনি রোমে পৌছিতে পারতেন তবে তিনিই সম্রাট হতেন নিঃসন্দেহে।

তাই মরণের পরেও পপিয়া অন্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করলেন। এই নীল নয়না অপূর্ব্ব সুন্দরী একদিন জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে ঘূর্ণি বিভ্রমে তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছিলেন বিশ্ব বিদিতার মত—সৌন্দর্য্য প্রসাদেই অখ্যাত অজ্ঞাত হয়েও ইনি বিশ্ব বিদিতা হয়ে ছিলেন। আজ ও সৌন্দর্য্যের স্মৃতি গাইবার সময় রোমানদের বুকি সেই নীলনয়না—নীলা—পপিয়ার কথা একবার মনে পড়ে যায়।

নাটিকা, গল্প—যা শেষ হ'তে পারল না, আসছে বারে সে-সব ত থাকবেই, আর
থাকবে "প্রেম-অভিযান পর্য্যায়ের" দ্বিতীয় স্তবক
সম্রাট্ সোহাগিনী —জ্ঞান চক্রবর্ত্তী।

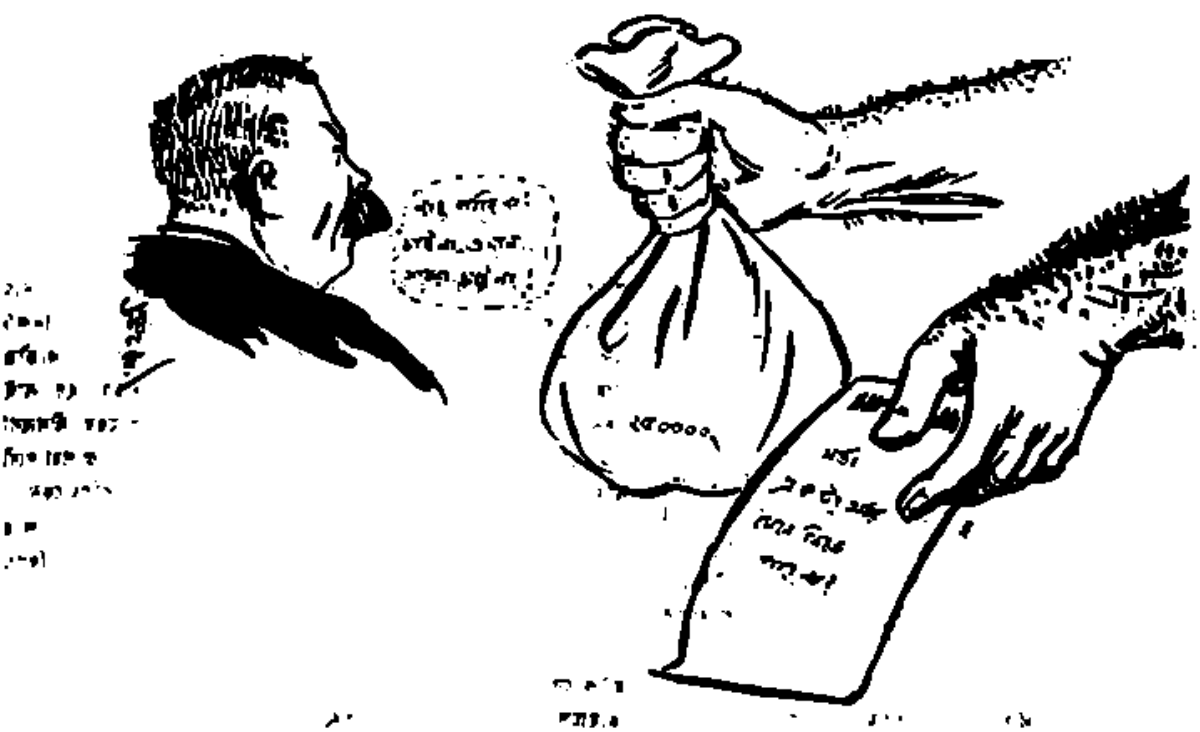

"Slavery in one hand...and money in the other."

দেশ-বিদেশ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্তা বসুমাইমুলতানা বোম্বাই লিটারেচিস্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহারা একটী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, নির্বাচিত হইলে তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা চেষ্টা ইত্যাদির জন্য কার্য করিবেন।

—

মধ্য প্রদেশের সভার অধিবেশনে শিক্ষা সচিব বলিয়াছেন যে প্রদেশের অন্তরে দুইটী প্রাথ সমস্ত সরকারী স্কুলই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও কোথাও অসুবিধা হইয়াছে বটে। যাহারা অসন্তোষী স্কুলে যোগ দিয়াছে।

—

বন্যা সাহায্যে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত হিসাবে ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

—

সোলাপুরী শাড়ী সাহায্য সমিতি ২৬৩৭।০ (তিন হিসেবে বন্যা সাহায্যার্থে অতিরিক্ত আরও টাকা) দান করিয়াছেন। অধিবেশন পাস ৪১২১।০ সমিতি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—

ফ্রান্স, সাইমন ও স্যামুয়েল মামে তিনজন লোক এবং ইটালীর এ বাবে নামে দুইজন সাহেব ইটালির সৈনিক কিংবা গুপ্ত রেজিমেন্টের একটি গোপন বিষয় হইতে অর্থ অপহরণ করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু জামিন দেওয়া হয় নাই।

—

ডাকার "গ্রেফাক" পত্রে প্রকাশ যে, ভাওয়ালের তালুকদার ও রায়ত সভাতে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারকে সাহায্য করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভাওয়ালের বহু তালুকদার ও ভাওয়াল ষ্টেটের ২১০ জন কর্ম্মচারী সভাতে উপস্থিত ছিলেন। এসোসিয়েসন নবাগত সন্ন্যাসীকেই ভাওয়ালের কুমার বলিয়া গণ্য করেন।

—

গ্রীসের যুবরাজ সন্ত্রীক এথেন্স পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিচারে তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

যুবরাজ এডুক ও যুবরাজ পত্নী বৃটীশ ক্রুইজার ক্যালিস্পোতে করিয়া বৃত্তিসিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

—

স্মার্ণা এবং অধুনা তুর্কী অধিকারভুক্ত অন্যান্য প্রদেশে বিদেশীদের এবং বিদেশীয় বাণিজ্যের কড়া ব্যবস্থা করার জন্য মিত্রশক্তির প্রতিনিধিগণ আপত্তি করেন। উত্তরে এঙ্গোরা জাতীয় মহাসভা বলিয়াছেন যে তাঁহারা আত্মসমর্পণ সন্ধিসনদের কোন বিষয়ে বিদেশীদের দাবী আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে বিদেশীদিগকে তুর্কী আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

—

মাদ্রাজ সম্প্রতি এক ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সাহায্য আদিয়াছে। বন্যার জল এখন সরিয়া গিয়াছে। বহু স্থলে লোক পুনরায় বাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু সমস্ত দেশ এখনও বন্যার ধ্বংসাবশেষ বহন করিতেছে। বিভিন্ন ভীষণ প্রকোপে পড়িয়া তাহাদের অবস্থার আর তেমন সীমা নাই। এই, আই রেল কোম্পানী তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে ১ লাখ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

—

পুলিশ অনেক ষ্ট্রীট মার্কেটের 'আবু-পাবলিশিং হাউস' খানাতল্লাসী করিয়া কাগজপত্রাদি ইসলাম প্রণীত 'মুসলমান' ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। আমরা শুনিলাম পুলিশ 'মোসলেম পাবলিশিং হাউসেও' খানাতল্লাসী করিয়া উক্ত পুস্তক ও হিসাবের খাতা লইয়া গিয়াছে।

—

১২৩এ এবং ১৪৩এ ধারানুসারে শ্রীযুক্তা পার্থসারথী নেহরু সাজাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

—

লর্ড রিডিং মন্ত্রীর 'চাদর' স্বরূপ ব্রাবোর্ণে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।

—

ডাবলিনের খবরে প্রকাশ যে, রিপাবলিকান সৈন্যদল ওমরাবাদে সুসজ্জিত প্রভিসনাল গভর্ণমেন্ট সৈন্যের উপর দ্বিপ্রহরাবধি হইতে গোলা বিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিব্রতকর করিয়া রাখিয়াছে। আজ তিন দিবস যাবৎ বিপক্ষদলের গোলাবর্ষণ এই সর্ব্বপ্রথম।

—

আইরিশ সামরিক গভর্ণমেণ্ট শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আইরিশ ফ্রি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট বলিবে।

"ক্রনিকেলের" সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ডাবলিনের অবস্থা সঙ্গীন বলিয়া বোধ হইতেছে। যেদিন ফ্রিষ্টেট গভর্ণমেণ্ট আরম্ভ হইবে, সেইদিন হইতেই বোধ হয় গণতন্ত্রীদল আবার যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিবে। সমস্ত সরকারী অফিসগুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

—

লুসেন বৈঠকের কাজ মৃদু মৃদু গতিতে চলিতেছে। এখন প্রণালী-সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, রুশিয়া তাহাদের দাবী ব্যক্ত করিয়াছে। তুর্কীগণ এখনও কিছু জানায় নাই। রুশিয়ার প্রধান প্রতিনিধি চিচারিন বৈঠকের সভাপতির নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে প্রণালী ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারের আলোচনায় রুশিয়াকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই কেন। কাজেই রুশিয়ার অনুপস্থিতিতে যে সকল ব্যাপারের মীমাংসা করা হইয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোনপ্রকার গণ্ডগোল হইলে রুশিয়া দায়ী নহে। প্রণালীসংক্রান্ত ব্যাপারে রুশিয়া দুইটী কথা বলিয়াছেন—কৃষ্ণসাগর হইতে সকলের যুদ্ধ জাহাজ অপসারিত করিতে হইবে, আর প্রণালীগুলি রক্ষার ভার তুর্কীদলকে দিতে হইবে। তুর্কী প্রতিনিধিরা কি এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

—

মেজরুস স্মাট্স বলিয়াছেন যে, ইসলাম পাশাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, তুরস্ক জাতির তাহাদের দাবী একটুও কমাইতে পারিবে না। তাহাতে যদি তুরস্কের সমস্যাগুলি মিটে, তুরস্ক সে বিষয়কে দায়ী করিয়া রহিবে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইংরেজের আসামীর ও লোক-পাশার জন্যই বৈঠকের কাজ বেশী অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

ভুলের মূল

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে বয়সে মেয়েরা বিবাহ বস্তুটিকে সম্পূর্ণ কল্পনা রাজ্যের সম্পত্তি মনে করিয়া সত্য মিথ্যায় সেটি করিয়া থাকে, ঠিক সেই সময়েই হীরকপ্রভা মেয়েটি তাহার সম পাঠিদের সম্মুখে জিনিষটাকে অত্যন্তই তুচ্ছ এবং পার্থিব প্রতিপন্ন করিয়া কহিয়া দিয়াছিল—আমি কিন্তু সাহেব বিয়ে করব-ই আর নিজে পছন্দ করে' করব, তা বেখিস্। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র আট কি নয়। এখন সে বড় হইয়াছে, সে স্কুল-কলেজও নাই, সে সহপাঠী সখীগণও নাই, এখন সে পুরাণো কথা হীরক ভুলিয়া গিয়াছে। এখন সে পূর্ণাঙ্গী যুবতী, তাহার দেহের মধ্যে কোথাকার কোন্ নদীর কূলপ্লাবী বান ডাকিয়া ফিরিতেছে—কে জানে! পূর্বের কিছুই নাই, সে কথাও মনে নাই। কিন্তু তাহার আজ পরিণয় সংবাদ কাহার মুখে শুনিয়া সেই ছেলেবেলার একটি বন্ধু তাহাকে লিখিয়াছে—হীরক, তোমার ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতেছে জানিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। বোস্ সাহেবের সঙ্গে আমাদের আলাপ নাই বটে তবে তাঁহার অনেক খবর খবরের কাগজে বাহির হয়; ক'বার তাঁহার ছবি-ও বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছি। বোস্ সাহেব—সাহেবই বটেন। আমার এক ননদের দেওর—এখন কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট—বলেন, বোস্ সাহেব বাঙ্গালার না-কি কথাই ক'ন না।" এই খানে কয়েকটা কথা লিখিয়া পরে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, হীরক অতি কষ্টে তাহাও পড়িল। লিখিত ছিল—"কিন্তু ভাই একটা—" তার পর—"যাক্ ভাই, বিধাতা তোমার মনের বাঞ্ছা পুরাইলেন। প্রার্থনা করি সেই বিধাতাই তোমাকে সুখে রাখুন। আমরা আকে-বিলেলে খবরটা পাইলেই হইল। দেখা-শুনা হইবারও কোন আশাই নাই, যে মুল্লুক! তার উপর, চার পাঁচটি ছেলেপুলে লইয়া একবার কলকাতায় গিয়া অসুখে-বিসুখে যে জ্বালাতন হইয়া আসিয়াছি, তাহা আর বলিবার নয়। তোমার মনে আছে বোধহয় সেই বার্জারপে, উটেই যে মেয়েটি ফুল ছেড়ে দেয়, সে-ই আমি, বেলা।"

চিঠিখানা পড়িয়া হীরক মনে মনে খুব একচোট হাসিল। হাসিল, এই ভাবিয়া, যে প্রতিজ্ঞার কথা বেলা লিখিয়াছে, তাহার মনে ছিল না এবং অত অল্প বয়সে-ও সে এমন ভাবিয়ৎ-দর্শী ছিল! তারপর, বেলার বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া একটু হাসিল, একটু দুঃখ-ও হইল। আহা! সেই বেচারী, রোগা, ভালোমানুষ মেয়েটি এরই মধ্যে চার পাঁচটি ছেলের মা হইয়া গিয়াছে। আছে মুল-তানে! অনেক দূর বটে! আর স্বাস্থ্যকর স্থান নিশ্চয়ই, নহিলে কলিকাতার উপর এত বিদ্বেষ কেন? হীরক চিঠিখানা সামনে খুলিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার প্রিয়-তমের সৌরভ বহুদূর পাঞ্জাব পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ভাবি-তেই একটা শিহরণ যেন বসন্তের চকল হাওয়াটির মত তাহাকে কাঁপাইয়া দিয়া গেল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনটা বাজিয়া মাত্র পাঁচ মিনিট হইয়াছে। মিঃ বোস্ পাঁচটার পূর্বে আসিতে পারিবেননা বলিয়া গিয়াছেন, হীরক কিন্তু পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই পত্রখানা একা পড়িয়া সে-যে পুরা আনন্দ পায় না, তাঁহাকে না পড়াইয়া কি সে স্থির হইতে পারে? কিন্তু নিষ্ঠুর আদালত, নিরস আদালত, সর্ব দুঃখের মূল পাষাণ আদালত যে কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে না। এই দুইঘণ্টা কাল তাহার কাটে কেমন করিয়া?

একটা কিছু করিয়া সময় কাটাইবার পথা অনুসন্ধান করিতে অনেকক্ষণ সে কক্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইল, তবুও সময় কাটে না। আলমারী-সজ্জিত পুস্তকরাশির দিকে চাহিতে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, অজের ভাব, অজের ভাষা কি এখন মনে স্থান পায়, না—সে মন দিতে পারে! এখন তাহার আপন চিন্তারাশির ভারেই সে টলমল করিতেছে, তাহার সুখস্রোতে সে আপনিই বিভোর হইয়া রহিয়াছে—এখি বহি পড়িবার সময়। অবশেষে করিবার কিছুই না পাইয়া চিঠিখানাকে হাতে চাপিয়া সে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাতে তাহার কতকটা শান্তি মিলিল বটে। মধ্যে মধ্যে সেখানা পড়ে আর কত কি-ই না ভাবে! বেলা বোস্ সাহেবের কথা অনেক কাগজে পড়িয়াছে, ছবি-ও দেখি-য়াছে। ওঃ!

সুন্দরী তরুণী পাঠিকা! শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন না যে হীরকপ্রভা মেয়েটির এখনও বিবাহই হয় নাই। ঘোষ্ সাহেব এখনও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ঘোষের একমাত্র কন্যার পাণিপীড়ন করিবার সুযোগ পান নাই। আপনারা ভীত হইবেন না, সমস্তই স্থির, তবুও ঘোষের পুত্রটি নভেম্বরের শেষেই "মাণ্টা" জাহাজে আসিয়া পঁহুছিবে এবং সে আসিবার দুই চারিদিন মধ্যেই শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। আমার এ কৈফিয়ৎ দানের পরেও, আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি আমার কোন-কোন একেলে বয়সের সেকেলে পাঠিকা-মেয়ে নাসিকাপ্রভাগ কুঞ্চিত করিয়া স্বগতোক্তি করিতেছেন "ম্যা-গো! আজকাল যত সব এইরকম লেখা! বিয়ে হ'ল না, অথচ বিয়ে! পাঁচটা বাজে না বলে ঘড়িকে শাপ দেওয়া—মরণ নেই! লেখার যেন আর কিছু নেই!" দোহাই মহাশয়া! আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, যাহা ঘটিয়াছিল, তাই মাত্র বিবৃত করিবার অধিকার লেখকের আছে—পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে কেহ দেয় নাই।

ঘোষ সাহেব—অর্থাৎ মিঃ শচীন্দ্র ঘোষ,—স্বর্গীয় রজনীকান্ত বসু বার-এ্যাট-ল মহাশয়ের পুত্রের সহিত হীরকপ্রভার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। হীরকের জননীর সুবন্দোবস্তে আজকাল মধ্যে মধ্যে ইহাদের নিভৃতালাপও হইয়া থাকে। এই সেদিন হীরক শচীনের সহিত দিব্য মোটরে চড়িয়া এম্পায়ার থিয়েটার দেখিয়া আসিল। শচীন সঙ্কুচিত ভাবে অনুমতি চাহিতে যাওয়ায় ডাঃ ঘোষ ও তাঁহাকে একরকম ধমকই দিয়া দিলেন। তোমার সঙ্গে যাবে—তার আবার মত-অমত কি! যাও—এও এনজয় ইয়োরসেল্‌ভস্। আমার বয়সে নবীন এবং অন্তরে প্রবীন পাঠিকা ঠাকুরাণী যাহাই কেন ভাবুন না, ইহাতে কোনই দোষ নাই।

দেখিতে দেখিতে পাঁচটা বাজিল। হীরক আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া, শয্যা ত্যাগ করিল। শয়নকক্ষের বাহিরে আসিতেই আয়া জানাইল, চা-টেবিলে চা দেওয়াছে, সাহেব ও মেম-সাহেব তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া হীরক তাড়াতাড়ি হল ঘরে প্রবেশ করিল।

একখানি চেয়ার খালি রহিয়াছে, অন্য দু'খানিতে, তাহার পিতামাতা সান্ধ্যভ্রমণোপযোগী বেশভূষিত হইয়া বসিয়াছিলেন, জননী মৃদু তিরস্কারের সুরে বলিলেন—"হ্যাঁরে প্রভা, তুই কি এই বিকেল পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিলি না-কি?

হীরক চেয়ারখানায় বসিয়া, বলিল—ঘুমুই নি মা, শুয়ে শুয়ে বই পোড়ছিলাম।

পিতা কন্যার কেশদামের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—কি পড়া হ'চ্ছে এখন?

কন্যা নতমস্তকে কহিল—ইবসেনের বই একখানা পড়ছিলাম, বাবা!

চা-পানান্তে জনক-জননী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—তুই ত এখনো তৈরী হ'লি নে প্রভা। ঘোষ যে এখনি এসে পড়বে। সে যেন আমাদের সঙ্গে দেখা না করে' যায় না যে—বুঝ্‌লি, বলে রাখিস্, ভুলিস্ নে।

কন্যা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভুলিবে না।

ঘোষদম্পতী মোটরে চড়িয়া সহরের মাঠের দিকে ছুটিলেন। মোটর অদৃশ্য হইয়া গেলে হীরকপ্রভা আয়নাকক্ষে ঢুকিল। প্রসাধন শেষে পিঁয়াজী রঙের মুক্তন শাড়ী ও জ্যাকেটটি পরিয়া এমন একটি স্থানে আসিয়া বসিল যেখান হইতে হাতায় ঘোষ সাহেবের গাড়ী থামিলে প্রথমেই সে দেখিতে পায়।

দশমিনিট কাটিতেই ঘোষ সাহেবের মোটরের ভেঁপু বাজিল, সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষ সাহেবকে দেখা গেল। মেঘ দর্শনে শিখীর মতই হীরকের দেহ মন দুলিয়া উঠিল। ঘোষ সাহেব ভাবী প্রিয়তমার করমর্দ্দন করিয়া তাহার সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন—একটা জরুরি খবর আছে, প্রভা! ওঘরে চল, বল্‌ছি।

দুজনায় ঘরে আসিয়া উভয়ে বসিলেন। ঘোষ্ সাহেব বলিলেন—আমার এক বাল্যবন্ধু সস্ত্রীক ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই বিলেত যাত্রা করছেন, আজ হঠাৎ হাইকোর্টে দেখা। কথা-বার্ত্তা হ'তে হ'তে আমিও স্থির করে ফেলেছি যে আমরাও দু'জনে সেই জাহাজেই সেল্ করে' ইওরোপটা যদি বেড়িয়ে আসি মন্দ হয় না। অবশ্য তোমার যদি মত থাকে। কি বল—মত?—বলিয়া প্রেমিকবর প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিলেন—

প্রভা মাথাটি নত করিয়া বলিল—তোমার মত হলে, আমার আর মত নয়?

ঘোষ্ সাহেব প্রভাকে বামপাশে বাঁধিয়া তাহার গণ্ডে গোটা দুই টোকা মারিয়া বলিলেন—তুমি যে একেবারে লক্ষ্মীমণিটি হ'য়ে পড়েছ, প্রভামণি!

অন্যান্য দুই চারিটা কথার পর প্রভা বলিল—আমারও তোমাকে আজ একটা জিনিষ দেখাবার আছে? বলিয়া সে চিঠিখানা ঘোষ্ সাহেবের হাতে দিল।

ঘোষ্ সাহেব বলিলেন—ছেলেবেলা থেকেই তুমি অন্তরে-অন্তরে সাহেব পুজো করেছ বল, তা'হলে! জান ত, মেয়েলি শাস্ত্রে বলে যে যা পুজো করে—সে তাই পায়। অনেক মেয়ে শিবপূজা করে—করে' শিবের মত স্বামী পায়।

শিবের মত পায়, শিব ত পায় না! আর আমি—যা পুজো করেছি—ঠিক তাই পেয়েছি, তার ওপর এবার বিলেত ঘুরে এলে একেবারে খাঁটী সাহেব!

আর তুমিও তখন একেবারে খাঁটী মেম্! আমরাই তখন চিন্তে পারলে হয়!

তা পারবে গো, খুব পারবে। অন্য কেউ পারুক না পারুক, তুমি ঠিক চিন্তে পারবে।—বলিয়া প্রভা প্রেমাবনত মুখটি প্রিয়তমের মুখের পার্শ্বেই বক্ষের উপর রক্ষা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিন তিনেক পরের কথা। ইডেনগার্ডেনে অসংখ্য জনসমাগম হইয়াছে। ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের চারিধার উজ্জ্বল আলোকমালা বিভূষিত হইয়া দিনমান করিয়া ফেলিয়াছে। ষ্টাণ্ডের নিচের লৌহ কেদারা গুলিতে সাহেব মেমেরা বসিয়া আছে, খোলা জমিটুকুর উপর তাহাদেরই ছেলে-মেয়েগুলা বেলুন উড়াইয়া, বাঁশি বাজাইয়া, ছুটা ছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, অদূরের বেঞ্চগুলিতে ভারতীয়-গণের স্থান, বহুসংখ্যক ভারতীয় উপবিষ্ট, বেশীর ভাগ মাড়ওয়ারিবাবু। এধারে ওধারে বাঙ্গালী, সাহেব মেম ও অনেক লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বেড়ার বাহিরে পথে ফিটন-মোটরের ছড়াছড়ি, অশ্বারোহী পুলিশ প্রভৃতির শ্বেত ও রক্ত মুণ্ড দেখা যাইতেছে।

এখনি ব্যাণ্ড বাজিবে, তাই এত ভীড়। ডঃ ও মিসেস ঘোষ পাশাপাশি খোলা স্থান টুকুতে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিলেন। রোজই বেড়ান, ব্যাণ্ড বাজিয়া গেলে বাড়ী ফেরেন! বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প চলে।

ঠিক যে সময়ে তালে তালে পা ফেলিয়া গোরা বাজকর-গণ মঞ্চের উপর উঠিতেছিল, সেই সময়েই অন্তদিক্ হইতে একজন বাঙ্গালী সাহেব ইঁহাদের সম্মুখে আসিয়া মাথার টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। ঘোষ সাহেব আগন্তুকের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—হেল্লো গোপেন কেমন আছ? এযার অনেক দিন দেখিনি তোমাকে।—স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—চিন্তে পারছ না? গোপেন! মেম কাবার——...

চিনেছি। কেমন আছ গোপেন?

আমি ত ভালোই আছি। আপনার শরীর ভালো আছে? প্রভা—প্রভা আসে নি?

না। সে আজ কাল আর বড় বেরায় না। বইয়ের পোকা, দিন রাত বই নিয়ে আছে। এই নভেম্বরের শেষেই তার বিয়ে কি-না।

তেরী গ্লাড টু হিয়ার!···চলিতে চলিতে কথা হইতে-ছিল। একস্থানে কয়েক খানা অনধিকৃত কেদারা দেখিয়া, গোপেন বলিল—একটু বসলে হয় না?

ঘোষ পত্নীর দিকে চাহিতেই, মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—হ্যাঁ কসাই যাক্ বাপু, আর ঘোরা যায় না! আচ্ছা আজ কাগজে ত দেখলাম ব্যাণ্ড ৬টায় আরম্ভ, একটু দেরী করে ফেলেছে, না?

ডঃ ঘোষ তেরী কোটের পকেট হইতে ঘড়ি তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন—নো, যাই ইন্ টাইম্।

তাঁহারা বসিলেন। গোপেন জিজ্ঞাসিল—প্রভার বিয়ে কোথায় ঠিক হ'ল?

ডঃ ঘোষ কহিলেন—ভবানীপুরের রজনী বোসের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই, যারে তাঁর বেশ···

জানি।

তাঁরই ছেলে মিঃ···

গোপেন পূর্ব্বেই কহিল—সচীন?

তুমি চেন না-কি?

গোপেন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি।—কিন্তু কথা কয়টা বেশ সহজে উচ্চারিত হইয়া বাহির হইল না।

ডঃ ঘোষ বলিলেন—সুরেশ "মাণ্টায়" সেল্ করেছে, আজকের কাগজে আউটওয়ার্ড লিষ্টে নাম আছে, দেখো, নভেম্বরের শেষেই সে পৌঁছোবে, সঙ্গে সঙ্গেই···

গোপেন—যদিও অল্পে তাহার হারম্যানের বাড়ীর

পোষাক, জন্মও মনে সে একেবারে বাঙালী। বাঙালীর মতই বলিল—শচীনের সম্বন্ধে সব খোঁজ টোঁজ নিয়েছেন দাদা?

ও—ইয়েস্! বেড়ে ছেলে, এরই মধ্যে ওকালতীতে বেশ নাম করে ফেলেছে। কেন—তুমি কি···

গোপেন পুনশ্চ বাধা দিল, বলিল—আজ্ঞে জানি। তবে আমি বল্‌ছি কি···

ডঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন—বুঝিছি যে গোপেন, বুঝিছি। তুমি বল্‌ছ ঐ দুই-চা আর টুপিটাই ভরসা নয় ত? না হে না, শচীনের বাবা নগদে, সম্পত্তিতে····

ওঁরা নামজাদা বড়লোক। আমি সে কথা বলি নি দাদা।

ডঃ ঘোষ এতক্ষণে বুঝিলেন, গোপেনের বক্তব্যটি কি! মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—না-হে, সে সব দিকেও কোন দোষ নাই।

আজ্ঞে—আমি···

ডঃ ঘোষের বুঝিতে বাকী রহিল না যে গোপেন শচীনের ছবিত্রুমে বলিয়া বন্ধু-বান্ধবের সেন্‌থ একটু আধটু পান করার ইঙ্গিত করিতেছে; একটু বিরক্তিভাব মনের মাঝে উঁকি দিয়া উঠিল। মুখে তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া কহিলেন—সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়!

গোপেন বিস্মিত স্বরে কহিল—ভিসের কথা বল্‌ছেন দাদা?

ইহা দস্তুর মত আইনীতিবিরুদ্ধ। ছোকরা সাহেব সাজিয়া বেড়ায় অথচ ড্যাম নেটিভের চেয়েও অজ্ঞ অশিক্ষিত তার আচরণ, কথাবার্ত্তা। ডঃ ঘোষ অতি কষ্টে রোষ দমন করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তুমি একদিন অবসর মাফিক আমাদের ওখানে এস, কথা কইব। তাই ত, এটা কোন্‌টা হ'য়ে গেল?—ঘড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—প্রোগ্রাম আছে না?

মিসেস্ ঘোষ প্রোগ্রামখানি দিয়া, বলিলেন—গোপেন কি বল্‌ছে—সোনাই-না?

ও কিছু না—ডঃ ঘোষ কাগজখানিকে একবার এধারে একবার ওধারে ফাৎ করিয়াও পাঠে বিফলমনোরথ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—চল, ভিক্টোরিয়ায় যাই।···তাঁহার ইচ্ছা এই অবসরটার মধ্যে যতদীঘ্র সুচিকিৎসা করিতে পারেন, অমল।

মিসেস্ ঘোষ উঠিলেন না, বলিলেন—না আমরা বল্‌ছি। তুমি ঘুরে আস্‌তে পারো।

ডঃ ঘোষ মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। গোপেনের কাছে স্ত্রীকে ছাড়িয়া গেলে, তিনি যে ভয় করিতেছেন তাহাই ঘটিয়া যাইবে। "সেন্‌থ" পানের নাম শুনিলেই তাঁহার পত্নীর যে অবস্থা হইবে তাহা ত তিনি জানেন। তাঁহার যৌবন—যৌবন কি—প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত কি অমনতর শাসনই না চলিয়াছিল! হরিত্র! এক সেকেণ্ড প্রোগ্রাম খানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া—ওঃ এটা বাজে। এর পরেরটা, বুঝলে The Victory···

মিসেস্ ঘোষ Victory সম্বন্ধে এতটুকু আগ্রহও দেখাইলেন না; বলিলেন—গোপেন, শচীনের সম্বন্ধে তুমি কি বল্‌ছিলে যে!

ডঃ ঘোষ তখনি প্রোগ্রামখানি এমনভাবে উচ্চ করিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন যে উভয়ের কেহ কাহারো মুখ দেখিতে পাইল না। ডঃ ঘোষ ভাবিয়াছিলেন, গোপেন এই নিষেধসূচক সঙ্কেতটি বুঝিবে এবং সময়োচিত একটা কিছু বলিয়া কথাটার শেষ করিয়া দিবে, কিন্তু সে ছুঁপিত যে এমন, তা কে জানিত!

গোপেন বলিতে লাগিল—বৌ-দি, আমি তা'কে অর্দ্ধ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘুরতে দেখেছি।

ডঃ ঘোষ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—ইউ লাই—মেয়েমানুষ।

গোপেন বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল—নিজের চোখে দেখিছি দাদা! আর এক আধ দিন নয়, রোজ, নিয়মিত, প্রত্যহ। আজো, এই কতক্ষণ আগে···

আমি বিশ্বাস করি না।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—কি-রকম ভাবে দেখেছ গোপেন?

অন্যভাবে নয়।—বলিয়া গোপেন অপরাধীর মত মুখ নিচু করিল।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—আজো দেখেছ—ঘরে? বাঙালী?

না।

তবে?

বোধ হয় পার্শী।

বোধ হয়! হুঃ—বলিয়া ডক্টর ঘোষ পত্নীর হস্তমর্দ্দনে হস্ত পুরিয়া কহিলেন—চল-চল।

মিসেস্ ঘোষ ক্ষুণ্ণভাবে হাতটি ছাড়াইয়া লইয়া, গোপেনের নিকটে আসিয়া বলিলেন—রোজ দেখ্‌তে পাও ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমাদের দেখাতে পারো ?

পারি। পারব না—কেন ? এই সেদিন নরেশবাবু ঐ জমালীপুরেরই একজন জ্যাকিল, আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন, তিনিও দেখ্‌লেন।

মিসেস্ ঘোষের মুখখানি অন্ধকার করিয়া আসিয়াছিল, কথা কহিতেও তিনি কষ্টবোধ করিতেছিলেন। অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—কোথায়—কোন্ রাস্তায়···

আর বলিতে হইল না। গোপেন বলিল—আমাকে দেখাতে হ'বে না। আপনারা যদি ছ'টা, স'ছটার সময় ঐ গেইটার সামনে দাঁড়ান—আপনারাই দেখ্‌তে পাবেন!

ডাঃ ঘোষ অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, বলিলেন—তুমি কি রোজ এখানে এস ? কৈ—আমরা ত কোনদিনই তোমায় দেখি না।

গোপেন বলিল—আজ্ঞে না, এর ভেতর ঢুকি-নে। তবে ঐ বাইরেই থাকি। ওখানে আমার আফিস কি-না। ঐ সব জাহাজের তদারক করতে হয়।

গোপেন, কাল আমি ছ'টার সময় আসব, তুমি সে সময় থেকো ভাই।—তুঃখক্লিষ্টস্বরে কথা কয়টি বলিয়া মিসেস্ ঘোষ স্বামীর হাত ধরিলেন, বলিলেন—চল, বাড়ী যাই। আমার মাথাটা কেমন করছে।

গোপেন চুপী চুপি। আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে ঘোষ সাহেব তাহার নরক কামনা করিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

স্বর্ণের খেদ

[শ্রীকালী দাস রায়, বি-এ কবিশেখর]

(সংকৃত)

আগুনে পুড়িতে
নাহি মোর খেদ
লোহারো তাড়নে
নীরব থাকি।

কুঁচের সঙ্গে—
তুলনা তোলন
এ বেদনা আমি
কোথায় রাখি ?

মিসর উদ্ধার

(নাটক)

[শ্রীযদুনাথ সরকার]

কুশীলবগণ	
পুরুষ	
আবুল—খেদিব (মিসরের রাজা)	
আমিলা	সামন্ত রাণী
জহির	অধীনস্থ রাজা
আসফ	মন্ত্রী
ইস্রায়েল	সেনাধ্যক্ষ
লৌলভ	কোষাধ্যক্ষ
লির্ড	জমালী সেনাপতি
হুগো	পাদরী
লেডি	বণিক
গোলাম বে	দেশদ্রোহী মন্ত্রী
মেহেদি	স্বদেশ প্রেমিক মহাপুরুষ
আজাদ	মেহেদির সহচর
ফরকৎ	বণিক
দানিয়েল	বিচারক
প্রহরী, খেদ্দালেষকগণ ইত্যাদি—	
স্ত্রী	
	মেহেদির স্ত্রী
	গোলামের কন্যা

ফাতিমা ও বরফতের অন্যান্য বেহ্কাসেবিকাগণ—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কাইরোর দুর্গপ্রাসাদ ; খেদিবের কক্ষ।

কাল—সন্ধ্যা।

পারিষদবর্গ লইয়া সিংহাসনে খেদিব উপবিষ্ট।

আব্দুল। আরব দস্যুদলের অত্যাচার হ'তে দেশকে বাঁচাতে গিয়ে স্বর্গীয় খেদিব রাজকোষটি শূন্য ক'রে গেছেন। বৃষ্টির অভাবে শস্য না হওয়ায় প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না। কাল যে আমার গোলাপবাগের মেলায় জন্য বেগমের নক্ষ মুক্তা চাই। মৌলভ পাশা, তুমি তার কি যোগাড় রেখেছ ?

মৌলভ। না জাঁহাপনা, রাজকোষ যে শূন্য।

আব্দুল। মন্ত্রী, তাহ'লে উপায় কি ?

আসফ। উপায় যাদের হাতে টাকা আছে, তাদের কাছে যাওয়া, না দিলে জোর ক'রে নেওয়া।

আব্দুল। সেনাপতি, তুমি অবিলম্বে নিজে আমিনা বেগম ও অহির বেগ কাছে গিয়ে যে পরিমাণ টাকা দরকার নিয়ে এস।

ইস্রাফেল। না দিতে চাইলে, কি করতে আদেশ করেন জাঁহাপনা ?

আব্দুল। না দিলে আমিনার কন্যা ও অহিরের স্ত্রীর গায়ের হীরা জহরত নিয়ে আসবে।

ইস্রাফেল। যে আজ্ঞে।

(ইস্রাফেলের প্রস্থান)

আব্দুল। মন্ত্রী, আর কোনও রাজকার্য্য আছে ?

আসফ। কয়াসী দেশ হ'তে একজন পাদরী হজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আব্দুল। নিয়ে এস।

(হুসো নামক কয়াসী পাদরীকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ করিয়া হুসোর অবস্থান)

আব্দুল। তোমার কি চাই ?

হুসো। বিনয় দেশে নিরাপদে থেকে ধর্মপ্রচার করতে পারি—হজুরের কাছে এই ভিক্ষা।

আব্দুল। তোমরা কতজন আছ ?

হুসো। আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী পাদরী আছি, আর অবিবাহিত কুমারী বালিকা কয়েকজন আছেন।

আব্দুল। তোমাদের দেশের মেয়েরা রূপের জন্য জগৎ প্রসিদ্ধ বেশ তো, এদেশে এসো, তোমাদের প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম। আসফ যে, এদের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়ার হুকুম নাজিরকে দাও।

আসফ। যে আজ্ঞে। হজুরের কাছে আর একটা নালিশ আছে—

আব্দুল। না—আর পারি না; কাল হবে—এখন যাও, নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দাও, আর কয়াসী পাদরী যে সুরা উপহার দিয়েছে সেটাও পাঠিয়ে দাও।

(সকলের প্রস্থান)

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

আব্দুল। (সুরাপান করিতে করিতে) বাইজান, একটা সুরার কেতন গাও তো।

নর্ত্তকীগণ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

এ জীবনে ভাই এইটুকু যদি বিমল আমোদ পাওরে—
তা'লে মাঝে মাঝে—মাঝে, মন রে আমার,
দুহু দুহু দুহু খাও রে।

আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই একটি চাবি, আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—তা অবশ্যম্ভাবী বেঃ। কোন, থাকিবে না কেহ পাত্রাপাত্র, হিতাহিত বোধ সেটা। আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে কামক্রোধ দুই বেটা রে।

তখন, থাকিবে না কোন চক্ষুলজ্জা, রবে না কারো ওয়াস্তা, আর, হবে পরিষ্কার সুপ্রশস্ত চুলোয় যাবার রাস্তা রে ;
এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি যাও সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
তবে, মাঝে মাঝে মন-কাঁদো-জলমাঝে-সুরা সুধারসে সিঞ্চিত।"

আব্দুল। (নেশায় বিভোর হইয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে) বহুৎ আচ্ছা, এইবার আমি একখান গাই—শোনো তোমরা—

"আমি যুবি সং ?
তোমরা যে সব হাসছো দেখে আমায় বেআবরূমতন ভং,
ভাবছো আমার টলছে পা ?—মিথ্যে কথা, মোটেই না,
(শুধু) বেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ, বাহিরে কল্কি মং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?

ইচ্ছে ক'রে শুভ আশা ভাঙিয়ে বল্‌ছি নি,—
ব'লে রৈলাম হ'য়ে গোঁ, (বজ্রে মাথা ভোম্‌-ম-ভোঁ)
তোমরা যত হাসছো তত হ'চ্ছি আমি রেগে টং।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আমিনার প্রাসাদ, কাল—মধ্যরাত্রি।

জহির। খেদিবের অত্যাচার আর সওয়া যায় না—কাল সেনাপতি আমার স্ত্রীর গায়ের গহনা নিয়ে গেছে—না দিলে জোর ক'রে নিয়ে যেতো।

আমিনা। আমি ছিলাম না, আমার কন্যার কাছে ইব্রাহেম যে প্রস্তাব করে, তাতে একটা কিছু বিহিত না করলে চলে না।

জহির। মন্ত্রী আসফ নাকি এই পরামর্শ দিয়েছিল। রাজকোষের অর্থ সমস্ত দৌলতপাশার ঘরে উঠেছে।—এরা দুজনেই চায় খেদিবের ধ্বংস—তাই চক্রান্ত ক'রে যুবক সম্রাটকে ঐ মতলব দিয়েছিল, শুনেছি। ওদের ডাকিয়ে আনা যাক। তারা বাইরেই অপেক্ষা করছে।

আমিনা। আসুন না।

(পরিক্ষণ পরে আসফ খাঁ ও দৌলতপাশার প্রবেশ)

আসফ। বেগম সাহেবা, আপনার মত আছে শুনে সুখী হলাম।

দৌলত। আমার যারা যেটুকু হক, আমি করতে রাজি আছি। শুনেছেন বোধ হয়, ফরাসী দুষমনদের নিয়ে পাষণ্ড কি করেছে।

আমিনা। রাজ্য গেছে, মুলুকের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। মনপ্রাণ সতীত্ব বাঁচিয়ে চলাই মুস্কিল হয়েছে।

জহির। কি উপায়ে ওকে রাজ্যচ্যুত করা যায়, এখন সেই চিন্তা করুন। সেনাপতি ইব্রাহেমকে হাত করতে না পারলে কিন্তু কোনই কাজ হবে না।

আমিনা। কি উপায়ে তাকে হাত করা যায়?

জহির। সে ওষুধ আপনার হাতেই রয়েছে।

আমিনা। কি ওষুধ?

জহির। ইব্রাহেম যে প্রস্তাব করেছিল তাতেই রাজি হ'লে এখনই কাজ উদ্ধার হয়।

আমিনা। আমার কন্যা তাকে ভালবাসে জানি, কিন্তু কি ক'রে সেই নরাধমের হাতে আমি তাকে দিই, সে যে হীনবংশ-সম্ভূত।

জহির। তা না হ'লে উপায়ই বা কি? আপনি আর অমত করবেন না।

আমিনা। তা কি করবো?

আসফ। আমার মতে আপনার রাজি হওয়াই ভাল।

দৌলত। আমারও মত তাই।

আমিনা। আচ্ছা, আপনারা সকলে যখন বলছেন, তখন ভেবে দেখবো।

জহির। আবার শুনেছেন তো ফরাসী দেশের রাজা তার প্রজার ধর্মনাশের কথা শুনে এক জাহাজ সৈন্য ও কামান পাঠিয়েছে।

আসফ। তা'হলে তো কাজ হ'য়েই গেছে। ফরাসীর সঙ্গে যোগসাজ ক'রে খেদিবকে উচ্ছেদ করা যাক।

দৌলত। কিন্তু রাজা হবে কে?

আমিনা। সেইটেই কথা—খাল কেটে কুমীর আনা কিছু নয়। আপনারা একজন যোগ্য না। ইব্রাহেমকে খেদিব করবো বললে সে রাজি হ'তে পারে, আমারও কন্যার ইজ্জত যায় না।

সকলে। তাই বেশ।

আসফ। ইব্রাহেমকে খবর দেবো?

আমিনা। হাঁ, বেশ।

দৌলত। ফরাসী সেনার আগমন বার্তা শুনে খেদিব ভয় পেয়ে গেছে। সে এখন ইব্রাহেমের সম্পূর্ণ হাতে। ইব্রাহেম কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছে যে তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেই।

(ইব্রাহেমের প্রবেশ)

ইব্রাহেম। এই মধ্যরাত্রে হঠাৎ তলব কেন? বেগম সাহেবের কি মত হয়েছে?

আসফ। সে কথা নয় সেনাপতি, তুমি বিপদের খেদিব হবে, সেই আয়োজন হচ্ছে।

ইব্রাহেম। কি ব্যাপার, খেদিব তো একজন রয়েছে?

দৌলত। ফরাসীরা লড়াই করতে আসছে শুনেছো?

ইব্রাহেম। হাঁ, শুনেছি সেই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য আপনারা বোধ হয় একত্রিত হয়েছেন। আমি তো শ্রীর দিয়ে রাজা রক্ষা করবো শপথ করেছি।

জহির। তা বেশ, কিন্তু রাজ্য যদি তোমার নিজের হয়, তাতে তুমি রাজি আছ?

ইস্রাফেল। না, আমি নেমক হারামি করতে পারবো না।

(জহির আমিনার কানে কানে পরামর্শ করিয়া)

জহির। রাজ্য পাবে, তার সঙ্গে যার জন্য তুমি পাগল, তাকে পাবে।

ইস্রাফেল। ভগবান কি সে সৌভাগ্য আমায় দেবেন!

আসফ। তাহ'লে আপনি রাজি আছেন, সেনাপতি? আপনাকে কোনও পক্ষেই লড়তে হবে না। আপনি সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিবেন, আমরা সব ঠিক ক'রে নেবো।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কীইরোর রাজপ্রাসাদ—কাল সন্ধ্যা

(নেশায় ঘোরে অচৈতন্য ইস্রাফেলকে ধরাধরি করিয়া সিংহাসনে স্থাপন)

ইস্রাফেল। আমিনা বেগম মনে করেছিল আমায় ঠকাবে—মেয়ের ইজ্জত কেমন রাখতে পারলো, আমিনাকে এনে মনে জান করিয়েছি—কে আছিস্ রে?

লিয়ঁ। চোপরাও সুয়ার, এটা দরবার, তাঁবিখানা নয়। খাড়া হয়ে বসো আজ তোমাকে খেদিব করা হচ্ছে। ফরাসী সেনাপতি লিয়ঁ এখানে থাকতে নারীর এ অপমান হ'তে পারবে না।

(পারিষদবর্গ ঘোর হইতে অস্ত্র বাহির করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ফরাসী সেনানায়ক লিয়ঁর অস্ত্র বাহির করাতে সকলে চুপ করিয়া গেলেন)

ইস্রাফেল। আমি খেদিব হ'তে চাই না—সাহেব তুমি আমায় তোমার দেশের সেই মদ আনিয়ে দিতে পারো?

লিয়ঁ। তুমি খেদিব হবে না কি—আমি তোমায় খেদিব বানাবো, আর মদে ডুবিয়ে রাখবো। বল—"লেভিকে আমি ফরাসী রাজ্যের ভার দিলাম, আর লিয়ঁকে সেনাপতি করলাম।" এই ফরমান সই ক'রে দাও।

ইস্রাফেল। হাঁ, বাবা, যা বল তাতেই রাজি, কিন্তু গলা যে শুকিয়ে যাচ্ছে—শিগ্‌গির ভালো আনাও। এই সই ক'রে দিচ্ছি। আব্দুলকে জহির কেটে ফেলেছে নাকি—সে থাকলে আরি জমতো।

লিয়ঁ। যাস্—এখন সৈন্যগণ তোমরা গান কর।

সৈন্যেরা। "আমরা ফরাসী দেশের বাসী—
আমরা এসেছি এখানে নূতন আইন প্রচার কর্ত্তে আজি।
যে-যা বলিবে সবই ফরাসীকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল,
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই "বাহবা, বাহবা বাজি।"
ফরাসী সবাই সত্যপ্রিয়, মিশরী মিথ্যাবাদী,
ফরাসী মিশরী বিবাদ করিলে, মিশরীই অপরাধী।
মিশরী ঠেকিলে ফরাসী গায়, বাঘাটি বাঁচানো হইবে দায়,
মিশরী শির কাটিয়া লইলে, হইতে হইবে রাজি।
আমরা সবাই দেখেছি ফরাসী বিচার করিয়া সুদ্ধ।
ফরাসী সবাই বুদ্ধিমান, আর মিশরী সবাই মুর্খ।
মিশরীর তবে হইল ঘর—বাতীত ফুর্তী ও বেয়াদপি পর;
হাকিম হকিম হইবে সবাই যত আছে ফরাসী।
আসফ যে, দৌলতপানা যেখানে যে আছে বেটা,
আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—সবাই সমান বেটা।
তবে যে বেটা বলিবে, "হাঁ হাঁ তা হোক," সে বেটা কতক অজলোক,
আর যে বেটা বলিবে "না না না না না," সে বেটা বেজায় পাজী।"

"করো আমায় অনন্ত"

[শ্রীলীলা দেবী]

মরের মত মায়া করো মরের মত মরম
গানের মত বিচিত্রতায় ভাষাও এ হীন অধম।
আলোর মত উজল করো আলোর মত মধুর
প্রাণের মত মন্ত করো আমায় এ দু'নয়ন।
হাওয়ার মত উদার করো তরাই নিখিল বিশ্বে
ঘাসের মত ঘুমায় মোরে জাগাই পরাণ নিত্য।
মেঘের মত রঙীন করো নবীন বেদন বলয়
তারার মত মধুর করো, করো আমায় অনন্ত।
সীমা আমায় করো তুমি আনন্দ হে,—অনন্ত,
সবাই আছে বিরাট মেঘে ডুবতে চাঁদ মুখায়।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষ যে কোন বিষয়েই হউক যখন একবার ঠকে, তখন মনে করে, সে আর কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এই অবিশ্বাস লইয়া সে বেশীদিন থাকিতে পারে না; একজনের নিকট প্রতারিত হইয়াছে বলিয়া সকলেই যে তাহাকে প্রতারণা করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? জগতে কি সকলেই সমান, সকলেই অসাধু? সংসারে অসাধুও আছে, সাধুও আছে। রাম আমায় ঠকাইয়াছে বলিয়া শ্যাম কখনও ঠকাইতে পারিবে না। এই ধারণা লইয়া মানুষ রামের কাছে ঠকিয়াও শ্যামকে বিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু শেষে যখন দেখে, শ্যামও তাহাকে ঠকাইতে ছাড়ে না, তখন সে নিজের ধারণাটা ভুল বলিয়া বুঝিতে পারে। বুঝিলেও কিন্তু সে রাম শ্যামকে বাদ দিয়া যদুকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনুপমা ঠিক এমনই একটা ভুল ধারণা লইয়া তারানাথের নিকট নিঃস্বার্থ সমবেদনা পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে জানিত না, স্বার্থের অনেক প্রকারভেদ আছে। অনেক সময়ে স্বার্থটাই এমন আকারে-প্রকারে প্রকাশ পায় যে, তাহাকে নিঃস্বার্থতা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না, এবং সেই নিঃস্বার্থতার মধ্যে কতটুকু স্বার্থ নিহিত আছে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না।

অনুপমাও তারানাথের নিঃস্বার্থ ব্যবহারের মধ্যে কতটুকু স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু অনুপমা কেন, তারানাথ নিজেও সেটুকু বুঝিতে পারিত কি না সন্দেহ, যদি ভূপতি অতিরিক্ত মাত্রায় না দাঁড়াইত। সে চাকরী ছাড়িয়া, মাতুল মাতুলানীর সহিত স্নেহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিবাহিতা স্ত্রীকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া অনুপমার জমীদারীর উন্নতির জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, সেটা সে কর্ত্তব্য বোধে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছিল। এই অসহায়া বালিকার নিকট হইতে যে ভার গ্রহণ করিয়াছে, গুরুতর হইলেও তাহা তাহাকে বহন করিতেই হইবে, নতুবা কর্ত্তব্যে অবহেলা জন্য তাহাকে প্রত্যবায় ভাজন হইতে হইবে। সে গীতা লইয়া কিছুদিন নাড়াচাড়া করিয়াছিল, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদনই যে ভগবদ্-পিষ্ট কর্ম্মযোগের সার মর্ম্ম ইহা প্রণিধান করিয়া লইয়াছিল। মেসকোম্পানীর অধীনে কাজ করিবার সময় এই কর্ম্মযোগের সার কর্ত্তব্যটাকে সর্ব্বোতোভাবে সম্পাদন না করিলেও অনুপমার অধীনে কাজ করিতে গিয়া তাহার এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিটা সম্পূর্ণরূপে সজাগ হইয়া উঠিয়া এবং যাহাতে কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত না হয়, তজ্জন্য নিজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দিল। এমন কি, এই এক বৎসর কালের মধ্যে মাতুল মাতুলানীর সংবাদ লইবার জন্য অনেকবার ইচ্ছা হইয়াছিল, অনুরাগভাগিনী না হইলেও স্ত্রীর কথা দুই একবার মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু সেদিকে মনোনিবেশ করিতে গেলে পাছে অনুপমার কার্য্যের ক্ষতি হয় এই আশঙ্কায় তাহাকে মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল। সেই এখন এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র রক্ষক; তাহার বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্যে, দুই একদিনের অনুপস্থিতে শত্রুপক্ষ কি করিয়া বসিবে, কে বলিতে পারে? সুতরাং তারানাথ আর সকল দিক্ হইতে মনটাকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া শুধু এই নাবালিকার সম্পত্তির উপরেই স্থির-ভাবে নিবদ্ধ রাখিয়া গীতোক্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছিল।

এমন সময়ে হঠাৎ ভূপতি আসিয়া যখন অনুপমার পাণিপ্রার্থী হইল, এবং তাহার এই প্রার্থনা নির্ব্বিবাদে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন গীতোক্ত কর্ম্মযোগ হইতে তারানাথের চিত্তটা যেন একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। একি, এই অলসপ্রকৃতি নির্ব্বোধ লোকটা অনুপমার স্বামী-পদ অধিকার করিবে, এবং সেই পদের মহিমায় এককালে তাহার সমস্ত রক্ষিত এই সম্পত্তির মালিক হইয়া বসিবে? ইহা যেমন অস্বাভা-বিক, তেমনই ন্যায় বিগর্হিত। তারানাথ অনুপমাকে এই অন্যায় ও অস্বাভাবিকতা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু অনুপমা যখন বুঝিয়াও বুঝিত না, এমন গুরুতর অন্যায়টাকে খুব সহজভাবেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল, তখন একটা গভীর বিরক্তিতে তারানাথের চিত্তটা যেন তিক্ত হইয়া উঠিল, গীতোক্ত

সমধিক কর্ম্মযোগ নিতান্ত নিরস, নিতান্ত অসার প্রতিপন্ন হইল। বায়ুতাড়িত ছিন্ন মেঘ খণ্ডের ন্যায় বাঞ্ছিত চিত্তটা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অভিমুখীন করা তারানাথের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

কাহার জন্য সে এই এত বৎসরকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আসিল? এই নির্ব্বোধ লোকটার ভোগবাসনার সম্পূরণ করিতে? সে অনুপমার মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই কাজ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কে জানিত যে, অনুপমার মঙ্গলে এই লোকটার মঙ্গল সাধিতে হইবে। এমন জানিলে সে কি এত পরিশ্রম করিত? বোধ হয় এই গুরুভার স্কন্ধে লইতেই যাইত না।

ভাল, ইহাতে তাহার ক্ষতি কি? অনুপমার মঙ্গলে তাহার যে লাভ, ভূপতির মঙ্গলেও তো তাহাই। সে যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে, প্রাণপণে সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবে, তাহার ফলভাগী কে হইতেছে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবার অধিকার তো তাহার নাই? ইহাই গীতার উপদেশ, কর্ম্মযোগের মূল লক্ষ্য। তবে ভূপতির মঙ্গলে সে এত ক্ষুণ্ণ হয় কেন? স্ত্রীর মঙ্গলে স্বামীর মঙ্গল; সে যখন অনুপমার স্বামী হইবে, তখন অনুপমার মঙ্গলের অংশ তাহার অবশ্য প্রাপ্য না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং ভূপতির সুখে তাহার এই ঈর্ষা নীচতার পরিচায়ক নহে কি?

কিন্তু ভূপতির কি অনুপমার স্বামীপদের যোগ্য? তাহার না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, না আছে সভ্যজনোচিত ব্যবহার। সে কি এই বিদ্যাবুদ্ধি বিভূষিতা রূপগুণ সম্পন্না ঐশ্বর্য্যশালিনী অনুপমার হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত পাত্র? অসম্ভব। অনুপমার কাছে সে কতটুকু? চন্দ্রমার নিকট খদ্যোত, সরিতের নিকট কূপ, হিমালয়ের নিকট বল্মীক স্তূপ। কিন্তু অনুপমা তো ইহা বুঝিয়াও বুঝে না? সে বিনা প্রতিবাদে এমন একটা অকর্ম্মণ্য লোককে স্বামীপদে বরণ করিয়া লইতে চায়। সে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিলে এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার তো কিছুতেই ঘটিতে পারে না। অনুপমা নিতান্ত বালিকা নয়, বালিকাসুলভ যে লজ্জা, তাহাও তাহার নাই। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই তো সে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে। কিন্তু তাহা করে না কেন?

এই 'কেন'র উত্তর তারানাথ অনেক ভাবিয়াও খুঁজিয়া পাইল না; ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল।

অনেক চিন্তার পর অবশেষে তারানাথ মনকে প্রবোধ দিল, দূর হউক, চাকরী করিতেছি, চাকরী করিব, পরের ভাল মন্দ লইয়া এত মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি?

মন কিন্তু প্রবোধ মানিল না। প্রয়োজন কিছু নাই বটে, কিন্তু অনুপমা যে ভূপতিনাথের হইবে ইহা অসহ্য। তবে সে কাহার হইলে ভাল হয়? তাহার নিজের কি? কথাটা মনে উঠিতেই তারানাথ যেন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে শিহরণের মধ্যে সে একটু অব্যক্ত আনন্দ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। ছি ছি, ইহাও কি সম্ভব! অসম্ভবই বা কিসে? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাজে কর্ম্মে, ভূপতিনাথের অপেক্ষা কিসে সে হীন? বরং ভূপতিনাথ অপেক্ষা সে অনেক উচ্চে। সুতরাং ভূপতির পরিবর্ত্তে তাহাকে গ্রহণ করিলে অনুপমার কি এমন মর্য্যাদার হানি হইবে? বরং সে সুখী বই অসুখী হইবে না; একটা মস্ত পশুর কবল হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষের হাতেই আসিয়া পড়িবে। ধরিতে গেলে ভবিষ্যতে এই সম্পত্তি তাহারই তো প্রাপ্য হওয়া উচিত? এই যে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর হইতে এত দিন সে প্রাণপণ পরিশ্রমে বুক দিয়া এই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিল, সে না থাকিলে অপরের হাতে পড়িয়া ইহার এমন উন্নতি হইত কি? উন্নতি দূরের কথা, হয়তো এত দিন পাঁচজনে টুক্‌রা করিয়া সম্পত্তিটা বাঁটিয়া লইত। তাহার এই প্রাণপাত পরিশ্রমের পুরস্কার কি নাই! নাহিনা? তুচ্ছ পঞ্চাশটা টাকা! যদি অনুপমার সুন্দর মুখখানা তাহার চোখে না পড়িত, তাহা হইলে একশত টাকা বেতনেও সে এমন ঝামেলাপূর্ণ হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কাজ গ্রহণ করিত কি না সন্দেহ।

কিন্তু হিঃ, সে যে বিবাহিতা, তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান। কিন্তু সে বিবাহের কথা কে জানে? আর সে স্ত্রীকে তো এক প্রকার ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে। সে রূপগুণ বর্জ্জিতা মূর্খা স্ত্রী লইয়া সে কি করিবে? তাহার পরিবর্ত্তে যদি সে অনুপমাকে পায়—পাইবার আশাতেই তো সে এখানে রহিয়াছে, অতীত জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন ভাবে জীবনের পত্তন করিয়াছে। আর

এক বৎসরের মধ্যে সে স্ত্রী বা মাতুল মাতুলানীর স্মৃতি-টুকুকে পর্য্যন্ত মনের কাছে আসিতে দেয় নাই।

তাহা হইলে সে অনুপমার কাছে কথাটা পাড়িবে কি? তাহাতে দোষ কি? আর মনের কথা খুলিয়া না বলিলে, অনুপমাই বা কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিবে। কিন্তু অনুপমা যদি অসম্মত হয়, যদি ঘৃণার সহিত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে? ছি ছি, সে কি লজ্জা, কি অপমান! কিন্তু সে অপমানের কি প্রতিশোধ নাই? রীতি মত প্রতিশোধের উপায় হাতেই আছে। তখন বহুযত্নে গঠিত এই রাজ্য ধ্বংস করিয়া, সুখের জমীদারীতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইব।

অনুপমার কাছে কথাটা তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া তারা-নাথ কয়দিন তাহার সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই, কোথা হইতে একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। মনের কথা মনে রাখিয়া তারানাথ ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই মানসিক সংগ্রামের ফলে তারানাথের চিত্তটা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিবার অবসর পায় নাই ইহা বলাই বাহুল্য। এই সুযোগে ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া তারকনাথ যে অতিভাবকত্বের দাবী দিয়া মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে তাহাও সে জানিতে পারিল না। যখন সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার জন্য আদালত হইতে নোটিশ আসিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। সে পরামর্শ লইবার জন্য তাড়াতাড়ি অনুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। কিন্তু পরামর্শ কিছুই হইল না, অধিকন্তু তাহার প্রদত্ত নিষ্ঠুর সংবাদের তীব্র আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অনুপমা হতচেতন হইয়া পড়িল। তারানাথকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ফিরিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রাণের প্রবাহ

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

অজানা দেশের বারতা বহিয়া
আকুল পবন ছুটিয়া আসে,
গোপন প্রেমের মধুর পরশে
কাননে কোমল কুসুম হাসে।
গগনের কোলে তারকার আলো,
সাগরের বুকে ঊর্ম্মি রাশি,
সহসা সকল বন্ধন টুটি
উছল প্রেমে আসে গো ভাসি।
কে জানিত ওগো কোকিল-কূজনে
এত সঙ্গীত গোপনে রাজে,—
কি জাগরণ-পরশে নীরব-বীণা
পলকে পুলকে পুলক মাজে।
তেমনি সহসা মানব-হিয়ার
ভাবের প্রবাহে আসে গো ছুটে,
অজানা আলোর চুম্বন লভি
হৃদয়-কমল উঠিল ফুটে।
ভাবের জোয়ারে ভেসে যায় প্রাণ,
সে কি কল্লোল চিত্ত মাঝে।
মরীতে সব বন্ধন টুটি
অন্তরে যেন আপনি বাজে!

শোক সংবাদ

যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, বি-এল

সম্প্রতি আমরা একজন হাস্যরসিক গল্পলেখককে হারাই-য়াছি। যতীন্দ্রমোহন অকালে—৪৮ বৎসর পূর্ণ না হইতেই, গত ১২ই নভেম্বর, রাঁচিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু প্রথমে বঙ্গদর্শনে লেখা আরম্ভ করেন। তাঁহার "বেহায় চিত্র" অতি অল্পদিন মধ্যেই বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আদরলাভ করিয়াছিল। তাঁহার "হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য"ও নারীদের নিকট বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ৮খানি গল্প ও উপন্যাস এখনও অপ্রকাশিত আছে।

যাঁহারা যতীন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন ইনি কিরূপ বীরস্থির উন্নতচরিত্র, শান্তিপ্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সুরসিকতা ও তাঁহার গল্প পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অবিদিত নাই। যতীন্দ্রবাবু মুঙ্গেরে ওকালতী করিতেন। ইঁহার পত্নী পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রবাবু ৩টি পুত্র ও ২টি কন্যা বর্ত্তমান। শ্রীভগবান ইঁহাদের শিরোপরে সান্ত্বনা দিন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আশাহীন, উৎসাহহীন, প্রয়োজনশূন্য অসার জীবনটা বিমানের কাছে বড়ই ভার বোধ হইতেছিল। অথচ একদিন ছিল যখন এই জীবনটিকে পূর্ণ করিতে, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম আহরণ করিয়া একদিন সে নিজেই কত আনন্দ পাইত; এমন এক দিন ছিল যখন তরল মদিরার ন্যায় স্বর্ণপাত্রপূর্ণ এই জীবনমদিরাটুকু পান করিবার আগ্রহ তাহাকে দিশেহারা করিয়া তুলিত। অবশ্য—সেদিনে আর এদিনে পার্থক্য অনেক। তখন আজিকার এই তুচ্ছ হেয় জীবনটিকে বেষ্টন করিয়া কত সুখ-সম্ভিকাই না পত্র-পুষ্প বিস্তারিত করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহার গৃহ ছিল একটি উৎসব-মন্দিরের মত। বিনা যত্নে দিনরাত কে তাহার জীবনের শত কর্ণে শত রাগিনী আলাপ করিত; কে তাহার সুখে সুখী হইয়া দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাহার ভালোবাসার স্রোতে গলিয়া চলিয়া তাহাতেই মিশাইয়া থাকিত! সেদিন—আর এ দিন! অনেক তফাৎ! স্বর্গ নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর নদীর কূল ভাঙিতে আরম্ভ করিল। জোয়ারের ঢেউটুকুও সহে না, কূল কূল করিয়া পাড় ভাঙিয়া তাহার সংসার ভাসাইয়া লইয়া গেল। একমাত্র সে—কিরূপে যে বাঁচিয়া গেল, নিজেই ভাবিয়া পায় না। বুঝি সর্বস্ব হারার দুঃখ বেদনা সহিতেই সে এমন নিষ্ঠুর পরিত্রাণ পাইল।

তারপরও সেই ছন্নছাড়া জীবনটাকে সে একটা সূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছিল। এবং সেই বন্ধনের মধ্যেই সে যে একটা অতি বড় মুক্তিলাভ করিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল—তাই বা না জানে কে। হঠাৎ কোন এক শুভদিনে, মাহেন্দ্রক্ষণে তার বজ্রপ্রায় হৃদয়ে বর্ষাধারার মত এক অনাঘ্রাত কিশোরের স্নেহবৃষ্টি পড়িয়া তাহার অকালশুষ্কিত, অনুর্বর হৃদয়টিকে সরস উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল—তাহাও ত কাহার অজানা নাই। স্থানকালপাত্র—কোন ভেদ না মানিয়াও যে সেই কিশোরের অন্তর-বহির্গত রশ্মিচ্ছটা বিমানের তমসাচ্ছন্ন জীবনপথটিকে আলোকিত করিয়া একটা দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাও ত সকলে দেখিয়াছে। সে-যে কতখানি মুক্তি তাহাকে দিয়াছিল, তাহাকে পাইয়া বিমানের ব্যর্থ জীবন কতখানি পূর্ণ হইয়াছিল, বিমানের মত বিমানের বন্ধু-বান্ধবেরাও তাহা জানিত। আজ যে অভাগার সে-টুকুও নাই! সে'ও যে কোন্ নিশা-শেষে কোন্ তারকার মত অদৃশ্য হইয়া গেছে আর যে কোথাও দেখা যায় না!

হয়ত সে জাহাজে চড়িয়া এতদিন কত—কত দূর—দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে! কত নূতন দৃশ্য দেখিতেছে, কত নূতন কথা শুনিতেছে, কত শত নূতন লোকের সঙ্গে ভাব হইতেছে—আর কি তাহার মনে আছে, না থাকিতে পারে? নব পরিণীত যুবক—সেই একখানি ক্ষুদ্র সুখ, আর তন্মিয়ের ক্ষুদ্র বুকখানির ভালোবাসার স্মৃতি বুকে ধরিয়া দূরদেশে গিয়াছে। সেই মুখখানিই তার চিত্তপটে সদা জাগরূক! সেই এতোটুকু বুকখানির নবীন ভালো-বাসা যুবকের হৃদয়কূলে বেলাশহত সাগর তরঙ্গের মত আপনাইয়া পড়িতেছে—তার মাঝে ইহার স্থান নাই! মন তাহার সেই কিশোরীর স্মৃতিতে ভরা, চিন্তা তাহার কিশোরী, স্বপ্নে কিশোরী, কল্পনায়—কিশোরী! "উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী"—কিন্তু এ চিন্তাও যে বুক ভাঙিয়া দেয়! এত হৃদয়হীন, এত পাষণ্ডও মানুষ হয়!

বিমান ভাবিতেছিল—ভালোবাসা কথাটাই এক পরিহাস! প্রচণ্ড পরিহাস! মানুষের কাছে এ এক মস্ত প্রিয় পরিহাস। জীবনভোর মানুষ এই পরিহাস লইয়া পরিহাস করিয়া বেড়ে। সত্যের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নাই—চিরদিন সে এমনি নিষ্ফল এমনই ব্যর্থ হইয়া থাকে। মানুষের যে এ জ্ঞান নাই তা নয়, সে জানে, জানিয়া-শুনিয়াও ইহারই কবলে কবলিত হইয়া মানবজীবন এই তীব্র তীক্ষ্ণ পরিহাসের পিছনে ঘুরিয়া তাহারই মত হতাশার জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত হইয়া আপনাকে ধিক-কার দেয়। এটা তাহার জীবন দিয়াই সে অনুভব করিয়াছে যাহাদের ভালোবাসা তাহার জীবনে অমূল্য সম্পৎ, মহামূল্য দান জানে সে আত্মহারা হইয়াছিল তাহারাই তাহাকে এমনি-এমনি পরিহাস করিয়া গেছে। প্রথম যৌবনে সে পত্নীকে ভালোবাসিয়াছিল, নিমিষে ভালোবাসা পাইয়া বড় হইয়া গিয়াছিল। বিধাতা এক নিমিষে তাহার অমন ভালোবাসাটিকে মিছক মিথ্যা পরিহাসে পরিণত করিয়া দিলেন। "এ জীবনে ত নয়ই,

মৃত্যুতেও বিচ্ছেদ হ'বে না"—এই সত্য-শপথ ও এক নিষ্ঠুর পরিহাসে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তারপর—তারপর—সে কথা চিন্তা করিতেও বেদনা বাজিয়া উঠে! এতখানি পরিহাস কেহ তাহাকে করে নাই। এমন করিয়া মনে মনে বিদ্ধ করিয়া কেহ তাহাকে ফেলিয়া পালায় নাই।

পটলকে সে ভালো বাসিয়াছিল। পুরুষ যে পুরুষকে এতখানি ভালোবাসিতে পারে—তাহা আগে সে-ই জানিত না। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণশূন্য, লালসার গন্ধলেশহীন পুরুষকে এমন প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিতে কে-ই বা পারে? বিমান পারিয়াছিল—এবং এমনি একদিনে এই বস্তুটি বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বেদিন একের বিরহে বিশ্ব-সংসার তাহার কাছে একেবারেই মূল্য হইয়া গিয়াছিল! সে-দিন বিশ্বলোকা অন্ধকার তাহার চারিধার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবনের সেই ঘন তমসাবৃত গভীর নিশীথে কি স্নিগ্ধ আলোকদীপ্তিই না তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে হইয়াছিল! কি ছলছলতরা স্নেহ, প্রেম লইয়া একাই সে বিমানের দুঃখতপ্ত বুকটাকে উৎসবরঙীন করিয়া রাখিয়াছিল, আবার, আবার একদিন তেমনি তেমনি অন্ধকারে, তেমনি নির্জ্জনে ফেলিয়া চলিয়া গেল!

শুধু কি সে-ই গেল। সে-যে তার সঙ্গে কতখানি লইয়া গেছে তা বিধাতা-ই জানে। এই জীবনের উৎসাহ, আনন্দ উদ্যম—কোন্‌টাই বা রাখিয়া গেছে? কিছু না:, কোন দিকে কিছু নাই। কেবল দুঃখ, অসীম, অনন্ত দুঃখের সমুদ্র। এক একটা ঢেউ উঠিতেছে, স্নেহের প্রাণের অস্থিগুলাকে মুচ্‌ড়াইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আজ তাহার স্নেহের শেষরক্ত শুষিয়া গিয়াছে। বাঁচিয়াছিল যে প্রাণ বান্ধবকে জীবনের পথে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, সে প্রাণও তাহার শুষিয়া চুরিয়া গিয়াছে। কেবল সেই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য তাহাকেই রাখিয়া গিয়াছে। আর সে কি যন্ত্রণা! বুকের হাড় পাঁজরাগুলাও যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে।

ভৃত্য ধীর চৌকিটা এক পেয়ালা চা ও একখানা সিগারেট আনিয়া ক্ষুদ্র টেবিলটার উপর রাখিয়া বিমানের দিকে চাহিতেই স্তব্ধ হইয়া গেল। সে একটা বালিশ কোলে করিয়া বসিয়া আছে আর দুই চক্ষের ধারা অঝর ঝরিয়া বহিয়া বালিশটাকেই সিক্ত করিতেছে। ভৃত্য পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া নিকটে আসিয়া ডাকিল—বাবু।

বিমান তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁটে মুখটা মুছিয়া তাহার দিকে চাহিতে সে ধীর নির্দ্দেশ করিয়া জানাইল—একটি লোক দেখা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

বিমান তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। সমুদ্রের তলদেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে; ঢেউগুলি ফুলিয়া ফাঁপিয়া তাহার কণ্ঠের নিচেই আস্ফালন করিতেছিল, বলিল—কে লোক, বল, দেখা হ'বে না।—বলিয়া ফিরিতেই দেখিল, লোকটা ঠিক চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসিল—কি?

লোকটা কালীচরণ। বলিল—অজিতবাবুর অসুখ, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।

প্রিয় বন্ধু অজিত অসুখ! সেই দর্শন চাহিয়াছে—তবুও বিমানের এতটুকু উৎসাহ হইল না। মনে হইল—আর নয়! আর আত্মীয়তা নয়, আর ভালোবাসাবাসি নয়, আর কিছু নয়! যা হইয়া গেছে-গেছে, নূতন করিয়া—আর নয়। হোক—অসুখ, চাহুক দর্শন! তার কি! সে যাইবে না!

কোন কথা বলিবার আগেই দৃষ্টি পড়িল, পূর্ব্বদিকের সেই খোলা জানালাটির পানে! ঐ জানালাটির ফাঁক দিয়াই অরিন্দম সূর্য্যদেব তাহার ঘরে ঢুকিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতেন। প্রভাত সূর্য্যের রশ্মি যেন ঝরঝর সোণার পত্রে ছড়াইয়া দিত কিন্তু আজিকার সূর্য্যের এ কি পাণ্ডু মূর্ত্তি! বেলা দিনের রশ্মির চেয়েও ম্লান, ধূসরবর্ণ। সে বর্ণাভা কৈ! সূর্য্যের সে তেজই বা কৈ! তবে কি দিনমণিও আজ তাহারই মত কারো ব্যথা বুকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন! তার চোখের জলেই কি সেই বর্ণের এই দশা ঘটিয়াছে! বিমান তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া জানালাটা ধরিয়া বাহিরের রৌদ্রটাকে দেখিতে গেল। নিচের একতলা বাড়ীর ছাদে, একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী সিক্ত বসনে ছাদে বস্ত্র ত্যাগ করিতে আসিয়াছিল, জানালায় মুখিয়ার মত্যুটিকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া নামিয়া যাইতেছে; বিমানের জ্ঞান হইল, ছিঃ কাটিয়া সে স্থানে ফিরিয়া আসিল।

কালীচরণ বলিল—বাবু।

চায়ের বাটী তুলিয়া বিমান বলিল—কি অসুখ?

কালীচরণকে যে পাঠাইয়াছিল, সেই বলিয়া দিয়াছিল—বড় অসুখ।

বিমান একমুহূর্ত্ত কি ভাবিল—অম্বিকাবাবুর বাড়ী ত আমার মনে নেই বাপু।

কালীচরণের প্রতি আদেশ ছিল, মনে করিয়া আনিয়াছে, সে তাহাই বলিল।

বিমান কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিল—আমাকে কেন বাপু। আমি ত ডাক্তারও নই, বদ্যিও নই, যে অসুখের সময় দেখা দিলেই ধন্বন্তরী হ'য়ে যাবে! আচ্ছা—বোসো।

চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল—কতদূর বাপু?

আজ্ঞে, দূর বেশী নয়। আমি একটা গাড়ী আন্‌ছি—বলিয়া কালীচরণ অদৃশ্য হইয়া গেল। ট্যাক্সি আনিবারই আদেশ ছিল তাহার বলিবের।

পাঁচ মিনিট পরেই কালীচরণ ফিরিয়া আসিল।

বিমান তখনও তেমনি ভাবে বসিয়াছিল। কালীচরণকে দেখিবামাত্র বলিল—গাড়ী এনেছ নাকি যে?

আজ্ঞে হ্যাঁ—ট্যাক্সি।

আবার ট্যাক্সি!—বাবা গাড়ে দিয়া উত্তরীয়খানা গুছাইতে গুছাইতে বলিল—চল বাপু—দেখে আসি।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই গাড়ী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বিমান বাড়ীটার দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—এই বাড়ী অম্বিকের? সে কি?

কালীচরণ বলিল—আজ্ঞে।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী]

ইউরোপীয় সঙ্গীতে যেরূপ ঐক্যধ্বনি (Harmony) করার প্রথা প্রচলিত আছে, হিন্দু সঙ্গীতে সে প্রথা না থাকিলেও যে ইহাতে ঐক্যধ্বনি করা যাইতে পারে না, এমন নহে। ঐ ঐক্যধ্বনি সম্বন্ধে ও সংক্ষেপে লিখনপক্ষে ইউরোপীয় স্বরলিপি অনুপযুক্তরূপে উপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য। আধুনিক নূতন নূতন স্বরলিপি সেরূপ কখনই হইবে না। ভারতবর্ষে হার্ম্মোনিয়ম কিম্বা পিয়ানোর ন্যায় কোন যন্ত্রের চলন না থাকাতেই হিন্দু সঙ্গীতে ঐক্যধ্বনির বহু দিন সন্ধানকের সুযোগ হয় নাই।

উহার ভাব, তত্ত্বনিহিত ও পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত, সুতরাং উহা কাহার ব্যক্তীত কোন দেশীয় প্রথার অনুগত নহে। অতএব উহাতে সকলেরই অধিকার রহিয়াছে। এরূপ বিষয়ে বাৎপত্তি লাভ করিতে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক কর্ত্তব্য। সেজন্য যদি কেহ আমাদের এদেশীয় সঙ্গীতের ন্যায় উহা ইউরোপীয় সঙ্গীতের ঐক্যধ্বনি কিম্বা হার্ম্মোনির অনুরূপ, অতএব ইউরোপীয় স্বরলিপিতে যেরূপ সহজে সুস্পষ্ট ও বিশদরূপে লেখা যায়, আমাদের আধুনিক স্বরলিপিতে তাহা কখনই হয় না। ইত্যাদি যে সকল গ্রন্থকার নিজ নিজ প্রণীত স্বরলিপি দ্বারা লেখা লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে বহু আড়ম্বর করিয়াছেন মাত্র, বাস্তবিক তাঁহাদের কৃত স্বরলিপির অসম্পূর্ণতা হেতু, তাঁহাদের মনের ভাব সংক্ষেপে ও বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয় নাই।

ইংলণ্ডে 'টনিক সল্‌ফা' নামক একপ্রকার ইংরাজী বর্ণমালা স্বরলিপি কেহ কেহ ব্যবহার করেন। তাহাও যে আধুনিক স্বরলিপি সমূহ অপেক্ষা কত সংক্ষেপ ও সহজ, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। তাহাও বোধ হয় বিজাতীয় বলিয়া আমাদের কেহ স্পর্শ করেন নাই। কয়েক দিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে একপ্রকার স্বরলিপিতে কয়েকটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ঐ টনিক সল্‌ফার প্রকৃতির বিশেষ অনুরূপ দেখা গিয়াছিল। এই ইংরাজী প্রণালী ইউরোপীয় সঙ্গীতের এক বিশেষ প্রথার অনুগত সুতরাং ইহা হিন্দু সঙ্গীত পক্ষে তত উপযোগী নহে। ইউরোপীয় সঙ্গীতে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাওয়ার রীতি থাকাতে, ইউরোপীয় প্রাচীন সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে রেখা বা ঘরে, সুরের নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত সময়ে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এই হেতু ইংলণ্ডের কেহ কেহ 'টনিক সল্‌ফা' প্রণালীতে লেখা সহজ মনে করেন। ঐ প্রণালী হয়ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের নিকাশে সহজোপযোগী। কিন্তু সঙ্গীতে স্বরাদির যেরূপ পরিবর্ত্তনের রীতি নাই, অতএব আমাদের ব্যবহারের নিমিত্ত 'টনিক সল্‌ফা' প্রণালী অপেক্ষা ইউরোপীয় প্রাচীন সাঙ্কেতিক প্রণালীর উপযোগিতা অধিক।

কোন প্রথার ভাষার বর্ণজাত স্বরলিপি সহজগুণে সহজ হইলেও ভারতবর্ষের ভাবক্ষেত্রে একই প্রকার স্বরলিপি প্রচলিত হওয়ার পক্ষে ইউরোপের সাঙ্কেতিক স্বরলিপি প্রণালী যেরূপ চমৎকার উপযোগী, ভাষার বর্ণজাত স্বরলিপি কখনই তদ্রূপ হইতে পারিবে না। কারণ ভারতবর্ষে প্রায় অসংখ্য প্রকার ভাষা ও তৎ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত সুতরাং একদেশের লিখিত স্বরলিপি অন্য দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা কখনই বুঝিতে পারিবেন না। ইউরোপের ন্যায় একরূপ বর্ণমালা ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিলে তদ্বিষয়ে কতক সুবিধা হইলেও হইতে পারিত। অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরা কখনই আর বঙ্গদেশের বর্ণ লইয়া স্বরলিপি লিখিবেন না। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের কেবল বঙ্গদেশেরই অভাব মোচনের চেষ্টা করিলে চলিবে না। এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা অন্যান্য দেশের পক্ষেও উপযোগী হয়। কারণ ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ স্থানেই হিন্দু সঙ্গীত প্রচলিত। অতএব এদেশের প্রকাশিত গত ও গান যে অন্যান্য দেশীয়দের প্রয়োজন হইবে না, এমন নহে। বিশেষ বঙ্গদেশ সঙ্গীতচর্চ্চা বিষয়ক চিরকালই পণ্ডিতদেশের ওস্তাদদের উপদেশের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব যদি ভাষাকৃত স্বরলিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, তবে কাহাকেও সঙ্গীতশিক্ষা করিতে হইলে ভারতবর্ষের প্রচলিত তাবৎ ভাষার বর্ণমালা অগ্রে অভ্যাস না করিলে কখনই চলিতে পারে না। তাহা হইলে কি সঙ্গীতশিক্ষার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে? ইউরোপীয় সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে কোন ভাষারই সম্বন্ধ নাই। উহা কেবল সাঙ্গীতিক ধ্বনিসমূহের ও তালের স্থায়িকালের পৃথক্ সঙ্কেতাবলী মাত্র। অতএব উহা সর্ব্বদেশীয় লোকেই এক আকারে ব্যবহার করিতে পারেন এবং তাহা হইলে সকলেই সঙ্গীত চর্চ্চার উন্নতি বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য পাইতেন। যেমন পঞ্জাবের কিম্বা দিল্লীর কিম্বা গুজরাটের কিম্বা মান্দ্রাজের সঙ্গীতজ্ঞেরা ইউরোপীয় স্বরলিপিতে গান কিম্বা সেতারের গৎ ছাপাইয়া প্রকাশ করিলে আমরা তাহা দেখিয়া গ্রন্থকারের বিনা সাহায্যে গাইতে বাজাইতে পারিব। এবং আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদিও ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ ইউরোপ পর্য্যন্ত ও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ইহা কি সাধারণ সুখ! সমস্ত পৃথিবীতে একটী বিশ্বব্যাপী ভাষা প্রচলিত থাকিলে, জনসমাজের যে অসীম সুখ সম্পাদিত হইতে পারিত, তাহা যেমন কেহই অস্বীকার করেন না, সেইরূপ সঙ্গীত লিখনের একইরূপ পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে, যে তদ্রূপ অসীম উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা কি আর স্বীকার্য্য নহে? (ক্রমশঃ)

পাঁচপাঁচি

[শ্রীযোগেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা, বি-এ]

অক্ষরের সৃষ্টি—এক রকমের নূতন যন্ত্র বাহির হইয়াছে যাহা দ্বারা অন্ধেরা যে কোন পত্রিকা বা বই ইত্যাদি সব পড়িতে পারিবে। যন্ত্রটির নাম অপ্‌টোফোন (Optophone)। যে কাগজখানা অন্ধকে পড়িতে হইবে তাহার উপর এই যন্ত্রটির দ্বারা খুব জোরালো আলো ফেলিতে হয়। সেই আলো অক্ষরের গায় লাগিয়া ঠিকরাইয়া আসিয়া একখানা রাঙ্গুর উপর পড়িয়া শব্দ উৎপন্ন করে। অন্ধের কাণের সঙ্গে টেলিফোন করিবার যন্ত্রের মত একটী যন্ত্র বাঁধিয়া দিতে হয়। এই যন্ত্রটীর সাহায্যে সে অক্ষরের ছাপগুলি পরিবর্ত্তিত আকারে শুনিতে পায়। সেই শব্দানুসরণ করিয়াই সে পড়িতে পারে।

সিনেমা অভিনেতাদের আয়—"সিনেমা" অভিনেতাদের আয়ের মাত্রা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। ইহাদের কাহারও কাহারও এক সপ্তাহের আয় বড় বড় রাজমন্ত্রীদের বাৎসরিক আয়ের সমান।

চার্লি চ্যাপলিন —১৩,০০০ পাউণ্ড দুই মাসে।

মেরিপকফোর্ড —২০০০ পাউণ্ড প্রতি সপ্তাহে।

হ্যারি লডার —১০০০ পাউণ্ড ।

১৯২০ সনে একটী কম্পানির সঙ্গে নর্ম্মা ট্যালমেজ এক তার যোল বৎসরের করেন ২৪ খানা ফিল্মে তাহারা অভিনয় করিবেন লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে। এর মাহিনাতেও ইহারা সন্তুষ্ট নন। আরো বর চড়িতেছে।

কুপন্যাসের জীবনকাল অল্প—প্রায়ই দেখা

যারা দীর্ঘজীবন লাভ করেন তাঁরা মদ মাংস ইত্যাদি ত্যাগ অথবা অধিক পরিমাণে দুধ ঘি ইত্যাদি ভোজন করেন। সম্প্রতি বিলাতে ৯১ বছরের একজন মারা গিয়াছেন। তিনি জীবনে বেশীর ভাগ সময় উপবাসে কাটাইতেন। মাঝে মাঝে ছাগ খাইতেন আর অতি সামান্য। তাঁর মতে বহুমূত্র প্রভৃতি রোগীর পক্ষে উপবাসই নাকি একমাত্র চিকিৎসা। আজকালকার ডাক্তারেরাও উপবাস করার পক্ষে অনেক যুক্তি দিতেছেন।

ব্যাপ্তেরেন্স, সাঁসজ্যাম্বি—দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানা জাতির লোকেরা যার পর নাই নাকাল হইয়াছে। ইহারা ছেলেপিলে বা বেহেদ্দাহুদ্ধে ত মোটেই ভয় করে না; বন্দুক ছাড়া চলিলে বড় বড় জোয়ান পুরুষকেও ইহারা নাস্তানাবুদ না করিয়া ছাড়ে না। বন্দুক দেখিলেই ইহারা সেখান হইতে চম্পট দেয়। ইহারা সব দলে দলে জোয়ারের ক্ষেতে ঘোরাফেরা করে। ঘরে আগুন হইলে বাঘ ভাল্লুকও ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ক্ষেতের খাদের ভিতর প্রধান খাদাই থাকে সর্ষে বা কলমূল আর দুধ। বড় বড় কেরাগুলিকে ধরিয়া দুধের বাঁট ছিঁড়িয়া দুধ চুষিয়া লয়। যখন এসব খাদ্য জোটেনা তখন ইহারা মাঠে যাইয়া সব পাথর উল্টাইয়া ফেলিয়া পোকা মাকড় খুঁজিয়া বেড়ায়। তার ফলে কেবল সাপকে। পাথর উল্টাইতে উল্টাইতে সাপ দেখিতে পাইলে তাড়াতাড়ি পাথর চাপা দিয়া সরিয়া পড়ে। এদের দৃষ্টিশক্তি এত প্রবল যে বহুদূর হইতে ইহারা শিকার মারিবার চেষ্টা করিলেও ইহারা দেখিতে পায়। ঘ্রাণশক্তিও খুব। কোন খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া মারিবার উপায় নাই। একবার ও মিশাই ইহারা সব টের পায়।

ইহাদের চোখ অবশ্য ইহাদিগকে বড় কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। একটু ধোঁকে পড়িয়া ইহাদের চিকিৎসাবিভ্রাট খুব বেশী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের রক্ত ও মানুষের রক্ত ম্যালির আক্রমণে একই রকম প্রতিক্রিয়া করে।

মুক্তাদানা মুক্তি—বড়লোক মাত্রেরই মণিমুক্তা সংগ্রহ করা ও তাহা গলের গায়ের বাহির করা একটা বেয়াল। ইহাদের রূপগুণের ও রং ঢংয়ের অন্ত নাই। সব সময়েই অন্ত। মানুষ মাত্রে দেখা যাইত যে মুক্তাগুলির স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ক্রমেই যেন কেমন করিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে মুক্তাগুলি সজীব পদার্থ এবং মানুষের মত ইহাদেরও আধি ব্যাধি আছে। তিনি বলেন যে মুক্তার ভিতর এক প্রকার রস আছে যাহা আমাদের দেহ রক্ষার জন্য রক্তের যেমন দরকার তেমনি দরকারী। ম্যালির প্রথম আক্রমণের সময় আমাদের রক্ত কণিকা যেমন মুড় করিয়া দেহ সবল রাখিবার চেষ্টা করে মুক্তার ভিতরকার রসও তেমনি করে। মুড়ে না পারিলে ক্রমে নিস্তেজ ও মলিন হইয়া পড়ে। ইঁহার মতে পারাই মুক্তার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। পারা ব্যবহার করে এমন লোকের গলায় বা দেহের কোন স্থানে যদি মুক্তা থাকে তবে তাহা ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তিনি বলেন মুক্তার রং একটু মলিন হইলেই বুঝিতে হইবে যে কোন রোগ উহাকে আক্রমণ করিতেছে এবং তখনই উহাকে বিশুদ্ধ হাওয়ায় স্নান করাইয়া ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা দরকার। তাহা হইলেই মুক্তার উপরকার বাহিরীবাষ্পগুলি মরিয়া যায় ও তাহার স্বাভাবিক জ্যোতি বাহির হইয়া পড়ে। মুক্তার নানাপ্রকার রোগ তাহার বিভিন্ন লক্ষণের চিকিৎসা প্রণালী বাহির করিয়া ইনি আজকাল মুক্তার চিকিৎসা করিতেছেন।

তেলেশ নিদেদেশোক স্বীক্তি স্বীক্তি—অনেকের ধারণা যে ঘুমাইলে পর মানুষের আত্মা প্রজাপতির রূপ ধরিয়া আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং সেই ঘোরাফেরার সময় সে যাহা দেখিতে পায় তাহাই মানুষ স্বপ্নে দেখে। তার জন্য বলেন কোন দুরন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়া জাগায় না পড়ে তার প্রজাপতি আত্মা তাড়াতাড়ি দেহে প্রবেশ করিতে না পারে।

হাওয়াই দ্বীপবাসীদের একটী রীতি আছে যে ছেলে জন্মিলে পর তাহাকে গাছের পাতে তৈরী একখণ্ড কাপড়ে জড়াইয়া তাহার পিতামাতার নিকট বন্ধুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শিশুটী তাহার পিতার বন্ধুর বাড়ীতেই লালিত পালিত হয়। এইভাবে নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের পুত্রকন্যাদের পালন করিয়া তাহারা বড় করিয়া তোলে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভার নিজেরা নেয় না।

কোরিয়ার মারীদের অবস্থা প্রায় সকলেই জানে। মেয়েরা কোন পুরুষের দিকে একটু কটাক্ষ করিলে অভিভাবকদের হাতে তাহাদের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকে না। পুরুষেরা ইহাদিগকে হত্যা করিতেও দ্বিধা করে না। তবে মেয়েরা পুরুষদের হাতে অপমানকর ব্যবহার পাওয়ার আগেই আত্মহত্যা করিয়া মুক্তি পায়।

গোপাকে সিদ্ধার্থের অঙ্গুরীয় দান।
শিল্পী—শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Lakshmibilas Press. Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ১লা পৌষ শনিবার ১৩২৯, ইং ১৬ই ডিসেম্বর। [২১শ সংখ্যা

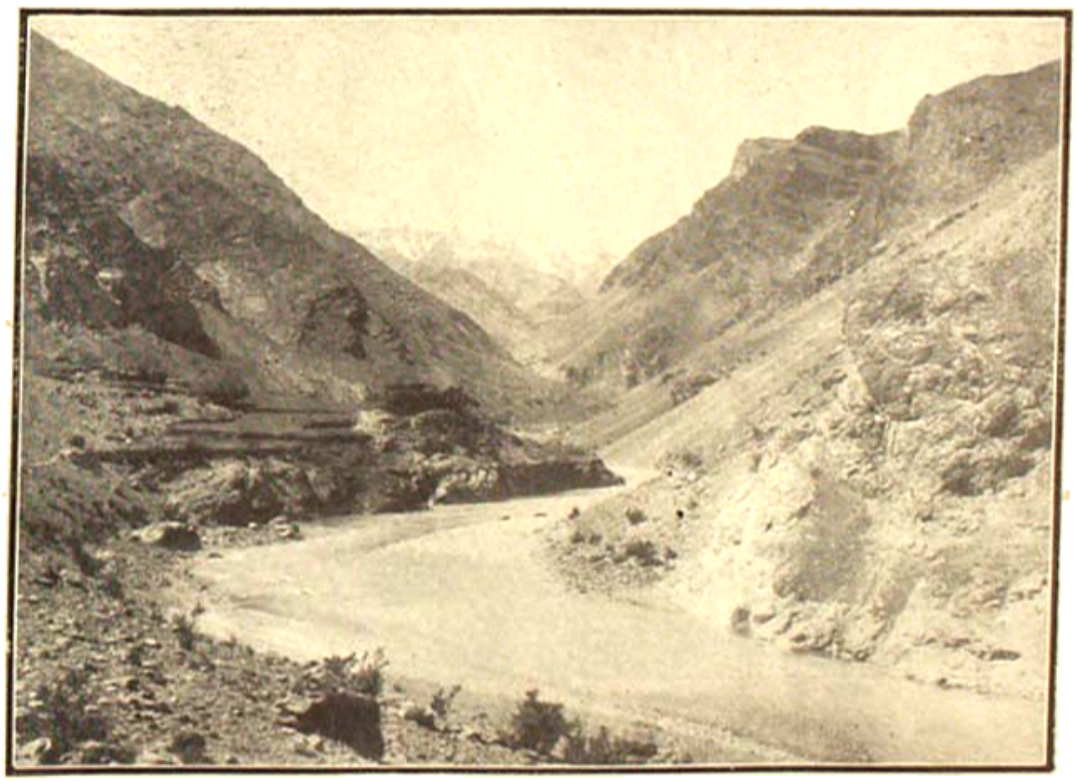

নদীর উৎপত্তি স্থান।

"যশোদা নাচাত তোরে বলো নীলমণি"

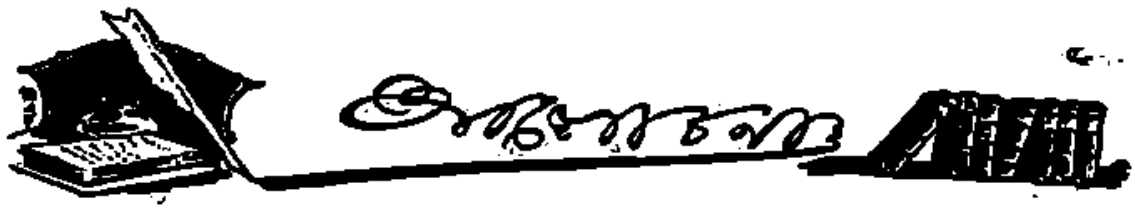

বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, রাধাচরণ পাল অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। এই জাতির জীবনের সহিত রাধাচরণ এমনই ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন যে রাধাচরণের পরিচয় কোন বাঙ্গালীকেই দিতে হয় না। যেসেন্ট্রাল ন্যাশনাল বড় কাযে বড় সভায় রাধাচরণ ত ছিলেন, তা ছাড়া কত ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র অনুষ্ঠান যে তাঁহার যত্নে উৎসাহে জীবন ধারণ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কোথায় একদল ছেলে কয়েকখানি আজ বহি লইয়া, একটি আলমারী সাজাইয়া "লাইব্রেরী" গড়িয়াছে, রাধাচরণ সেখানেই অর্থ সাহায্যে করিয়াছেন, পরিদর্শন করিয়াছেন, যুক্তি পরামর্শ দিয়াছেন।

• • • •

এই সূত্রে একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কেই লেখকের সহিত রাধাচরণের প্রথম পরিচয় হয়। দক্ষিণাড়ার Boys' Own Library'র তখন শৈশবাবস্থা। এই লেখক ও তাঁর সমবয়স্ক কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া একদিন প্রস্তাবে রাধাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আজও মনে আছে, সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণকে তিনি কি স্নেহেই না অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন! তাঁহার ত কর্মের অভাব ছিল না, তবুও এই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠাতাগণকে লইয়া তিনি কতটা সময়ই না কাটাইয়া দিয়াছিলেন। আজ Boys' Own Library'র উন্নতাবস্থা। এই উন্নতির সূচনা করিতে যে সকল মনীষী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শেষ বন্ধু রাধাচরণ ছিলেন, তিনিও গেলেন! আর সেই অমায়িক মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই কয়টি কথা লিখিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার তর্পণ করিলাম।

• • • •

গয়ায় কংগ্রেস অধিবেশন ক্ষেত্রে পুলিশ-কৌজ রাখা হইবে কি না এই লইয়া না-কি পাটনার কৌন্সিলে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। অর্থাৎ পুলিশ কৌজ রাখার মতামতের জন্য কৌন্সিলকে সালিসী মানা হয় নাই। তবে ঐ ক'দিনের কৌজ-রক্ষার খরচে যে কৎসামান্য ব্যয় ২৪০০০৲ টাকা হইবে, সেইটাই মঞ্জুর করাইবার জন্য কৌন্সিলের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। স্বায়ত্তশাসক সভার সভ্যগণ স্বাধীন-চেতা, নেশানবিল্ডিং-এর উত্তরূপ দেশহিতৈষীগণ না-কি সত্য সত্যই বলিয়াছিলেন যে পুলিশ থাকিলেই দুর্ঘটনা ঘটিবে। এমন অসত্য, রাজদ্রোহসূচক কথা তাঁহারা কি করিয়া যে মিছরার উচ্চারণ করিলেন, সেই ত এক পরম বিস্ময়! পুলিশ থাকিলে দুর্ঘটনা? তাও কি সম্ভব? কথাটা বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদের আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা হইয়াছিল, তাই মাননীয় মিঃ-ম্যাকফার্সন সাহেব যখন বলিলেন—পুলিশ লইয়া তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, তখন সভ্যদের আবার ঠোঁটের আগে হাসি দেখা দিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

• • • •

ম্যাকফার্সন, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারল গয়ায় কংগ্রেসমণ্ডপ তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা জানাইয়াছেন যে কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে পুলিশ কৌজ-মণ্ডপ সাড়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত থাকিবে। এবং গোলমাল না দেখিলে পুলিশ গোলমাল করিবে না। তবে গয়া পুলিশ বম্বের মত "প্যাট্রোল" করিবেই। তবে আর দুঃখ কি? প্যাট্রোল করিবে ত! সোদ বাহিতে কতক্ষণ?

• • • •

চাণক্য পণ্ডিত যৌবনাক্রান্তদের সম্বন্ধে ঘৃত ও অগ্নির উপমা দিয়াছিলেন। এই যুগের কোন পণ্ডিত ভারতবাসী ও পুলিশের সম্বন্ধটাকে ইঙ্গিত করিয়া সেদিন বলিতেছিলেন, সাপ আর নেউল। ভারতবাসী যেখানে বাসা বাঁধিবে, পুলিশ সেই সন্ধানটুকু পাইলেই হইল। বেশীর প্রয়োজন নাই।

• • • •

যাই হৌক, গয়ার কংগ্রেস কার্য্য মিটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সকলকেই একটু চিন্তিত থাকিতেই হইবে। দেশবন্ধু দাশ সভাপতি পদে বৃত হইবেন, কি-না, অথবা গয়ার শীত সহ্যের সহিবে, কি-না, সে চিন্তা নয়, চিন্তা ম্যাকফার্সন সাহেবের সান্ত্রি-সেনাদের সঙ্গে স্বভাবের লড়াই।

সিভিল সার্ভিসের কথা লইয়া দেশে এবং বিদেশে বিস্তর আলোচনা হইতেছিল। সম্প্রতি ভারতসচিব এক টেলিগ্রামে বলিয়াছেন, ভারতের তহবিল হইতে আরও ত্রিশলক্ষ টাকা না-কি পেনসন প্রাপ্ত সিভিলিয়ানদের জন্য চাই-ই। বলিবার কিছু না-ই, বলিব-ও না। কারণ তাঁহাদের ইচ্ছা ত তাঁহাদের ইচ্ছার মতই অবশ্য পূরণ হইবে, রদ করিবার কেহ নাই-ও, হইবে-ও না। শুধু এই ভাবি, কথামালার সেই গল্পটার মত ডিম বাহির করিতে করিতে কবে এই ভারতটা সত্যসত্যই মেহ প্রসব করিবে!

• • •

গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তাধীন দান গ্রহণ না করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়কে মেউলিয়াত্ব হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহাঁরই মধ্যে মিঃ যোগেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ধনীবর্গ একটি ফণ্ড খুলিয়া ফেলিয়াছেন। ঠিক মনে নাই, তবে ষোল সতেরো হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়াই স্মরণ হইতেছে। চেষ্টা করিলে আরও ষোল সতেরো হাজার স্বাক্ষরিত হইবে, সন্দেহ নাই। আর ষোল-হয় মাসখানেকের মধ্যেই পরীক্ষার ফি বাবদ অনেক টাকা ইউনিভারসিটির কর্ত্তাদের হস্তগত হইবে, তখন আর টানাটানি ততটা থাকিবে না, কাজেই এখনকার মত হাঙ্গামাটা চুকিয়া গেল। বেশ, এখনকার মতই না-হয় চুকিল, কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা ঘুচিল কি? ভবিষ্যতেও চিরকাল অর্থে ইউনিভারসিটির দুঃখ দূর হইবে, একথা কি ঠিক?

• • • •

গোল মিটিত, দুঃখ দূর হইত যদি স্যার আশুতোষ যে কথা খুব জোর গলায় সেদিনকার সভায় বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই যদি সত্য হইত! স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন, আমার কর্ম্মচারীগণকে অভুক্ত রাখিব, অধ্যাপকগণকে উপবাসে থাকিতে বলিব, তাঁহাদের পরিবারবর্গ সন্তান-সন্ততিগণ অভুক্ত থাকিবে—তবুও আমরা হিসাব দেখাইয়া, ধমক খানিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টের টাকা লইব না। বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের কবলিত না হইয়া জাতির শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকে, সে ইচ্ছা দেশের অন্যান্য লোকের মত আমাদেরও আছে, গবর্ণমেণ্টের টাকা লইতে আমরাও বলি না। তার চেয়ে উপবাস ভাল সহস্র গুণে ভাল। কিন্তু কথা এই হইতেছে, উপবাস কি শুধু অধ্যাপক এবং তাঁদের পরিবারবর্গই করিবে? উপবাসের কষ্ট কি কর্ম্মচারীরাই ভুগিবে, আর কর্ম্মকর্ত্তা জোর পেট খাইয়া পাশ ফিরাইয়া সেই সব লোকদের উপবাসের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিবেন? এই যদি ব্যবস্থা হয়, তবে তাহার ফল কি হইবে, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

• • • •

মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে। দেশবাসী কোন অন্যায় করিয়াছে, পাপ করিয়াছে, মহাত্মা নিজেই উপবাস করিয়াছেন, তখন দেশবাসীও আত্মশুদ্ধির জন্য মহাত্মার আদর্শে উপবাস করিয়াছে। পরকে উপবাসী থাকিবার পরামর্শ দিবার আগে আপনার ভোগবিলাস বর্জ্জন না করিতে পারিলে সে আদর্শ কোনদিনই গ্রহণীয় হয় না। মহাত্মা গান্ধী ভারতে আদর্শ কর্ম্মবীর।

• • • •

স্যার আশুতোষ একজন কর্ম্মবীর। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্দ্দিনে তিনি যদি সকলের আগে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন, আজ যদি তিনি উপবাসের ক্লেশ, বিলাস-ব্যসনের মোহ কাটাইয়া, বাৎসরিক [illegible] এর দ্বারা তুলিয়া আদর্শ কর্ম্মবীরের মত আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দ্দিন গিয়া সুদিনের উদয় হওয়া যে শতিদুষ্কর বিস্ময়কর হইবে না, আমরা এ-কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। স্যার আশুতোষ অভিজাতীয় যারা আটচল্লিশ হাজারের লোভ, পেন্সনের প্রলোভন ফেলিয়া জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে অগ্রসর হও, দেখিবে কর্ম্মীর অভাব তোমার হইবে না। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতে আজ অনেকে বড় বড় হাকিম, উকীল, ডাক্তার হইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই তোমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন। জাতির মুখপাত্র অনেকেই তখন তুমি তোমার সহকর্ম্মীরূপে পাইবে; তাঁহাদের আর্থিক, কায়িক সাহায্য বহুল পরিমাণে তোমার এবং সাধের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদিনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে। তখনই তোমার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত বন্ধুদের পরিচয় তুমি পাইবে। প্রকৃত বন্ধু পরিবেষ্টিত ব্যক্তির কোন অভাবই থাকে না, তোমারও থাকিবে না। তবে ইহা সত্য যে এখন

তোমার "বন্ধু" বলিয়া যে সকল স্বার্থগৃধ্নুর দল তোমাকে ঘেরিয়া ভূতের নৃত্য করিতেছে, তখন অনেকেরই দর্শন মিলিবে না। এখন তোমার দয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ শোষণে পরিপুষ্ট যে সব "বন্ধু" রাশি-রাশি গ্রন্থ-উৎসর্গ করিয়া, তোমার পদস্তব রচিয়া তোমার অবগান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন যে তোমার বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতকামী তুমি নিজেও অনেকটা বুঝিবে, সেই সব রাহু মুক্ত হইয়া দিবাকর-সম প্রভায় তুমি বিরাজ করিতে পারিবে।

* * * *

আলিপুর কারাগারে ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আজ নয় মাস কাল আবদ্ধ আছেন। পৃথিবীর যে কোন জাতির পক্ষে এ এক দুরপনেয় কলঙ্ক যে শান্তিমন্ত্রের উপাসক, মানবহিত-ব্রতধারী মহাত্মাকে দেশবাসীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছে। সভ্যজাতি বলিয়া যাঁহারা বিশ্বমাঝে আপনাদের আত্মগরিমা ছড়াইয়া বেড়ান, এ তাঁহাদের আইন ও শৃঙ্খলার অভ্যুজ্জ্বল কীর্তি। সম্প্রতি কয়েকজন দেশবাসীকে মহাত্মা গান্ধীর সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি সরকার দিয়াছিলেন। এই ১৮ই তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল ও দেশপ্রাণ আজমল খাঁ আরবাদা জেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, সরকার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছেন। জেলে দেশ-নেতাগণ যে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বর্তমান অবস্থারই আলোচনা করিতেন, সরকার ইহা জানিতেন, জানিয়া-শুনিয়াও যে অনুমতিটা কেন দিয়া ফেলিয়াছিলেন বুঝিলাম না। গবর্ণমেণ্ট কি আশা করিয়াছিলেন যে গান্ধী কারাগার-যন্ত্রণা-কাতর-হৃদয়ে দেশনেতাগণকে দেশের কার্য্য ত্যাগ করিতে বলিয়া ভারতকে আসন্ন সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবেন? এই ভাবিয়াই কি তাঁহারা অনুমতি দিয়াছিলেন? তারপর যখন মনে হইল, কারারোধ, অনশনের কষ্ট, দেহত্যাগের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে লোক এ পরামর্শ দিবে না, চাই কি নূতন করিয়া কিছু আগুন নেতাদের দিয়া পাঠাইয়া দিবে, সরকার তাই অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন! সম্ভবতঃ আইন ও শৃঙ্খলার ভিত্তি দৃঢ় রাখিতেই গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভিত্তি কি বালির ভিত্তি, এতই লঘু, এতই ক্ষণভঙ্গুর—যে কিছুরই ভর সহে না?

আমাদের পূজার সংখ্যার কথা মনে আছে ত ?—

সম্রাট্ সোহাগিনী

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।]

—তেমনি ছবি, তেমনি রঙ, তেমনি সব—হায় খুব চায় ভান্না —২৩শে বার হ'বে।

বিশ্বজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ানকে প্রেম পাশে বন্দী করেছিলেন একজন নারী, নাম ছিল তার জোসেফাইন, জোসেফাইন তেমন চতুরা বা সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু সেযুগে তেমন মনোহারিণী নারীও বোধহয় খুব কমই দেখা যেত। ভালবাসা অর্জ্জন করেছিলেন তিনি কিন্তু সেই ভালবাসার উপর আবার জুয়া খেলতে গিয়েছিলেন তাই পরিশেষে অধিকাংশ জুয়াড়ীর মতই তাঁকে হারতে হয়েছিল।

জোসেফাইনের জন্ম হয়েছিল মার্টিনিক দ্বীপে। সে দ্বীপের হাওয়া গরম ও স্যাঁত স্যেতে। তাই সে দ্বীপের মেয়েরা অধিবাসী যারা তাদের বেশ একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বিলাস ব্যসনে বাস করতে হয়। এইভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার ফলে সে দ্বীপের মেয়েদের বাড় জগতের অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের চেয়ে অল্প বয়সেই বেশী পরিমাণে হয়।

স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ চিরপ্রিয়, চিরনূতন, চিরমধুর, তাহার নূতন কথা কি আর বলিবার আছে ? তবু একবার আসচে বারের বাসন্তীতে স্ত্রী-পুরুষ পড়িয়া দেখিবেন।

জোসেফাইনের যখন মাত্র দশ বছর বয়স সেই সময়েই তিনি একবার প্রেমে পড়ে যান। এত অল্প বয়সে প্রেমের কথা শুনে কেউ হাসতে পারেন বটে কিন্তু এই বাল্য প্রণয়ের সুখ স্মৃতি জোসেফাইন জীবনে কখনও বিস্মৃত হতে পারেন নি। বাল্য প্রণয়ীর মধুর মূর্ত্তিখানি তিনি চিরকাল সযত্নে বক্ষমধ্যে সংগোপনে রেখেছিলেন।

জোসেফাইনের এই বাল্য প্রণয়ী ছিলেন একজন ইংরেজ বালক—এই বালকের পিতা রাজ্যবিপ্লবে দেশ-ছাড়া হয়ে এসে সেই দ্বীপবাসী হয়েছিলেন। উইলিয়ামের পুরো নাম পাওয়া যায় না—শুধু জানা যায়, তার নাম ছিল উইলিয়াম ডি-কে। প্রায় তিন বৎসরকাল এঁদের এই প্রণয় ব্যাপার চলেছিল। বালক বালিকা দু'জনেই এ ব্যাপারে মহা খুসী তৃপ্ত। কিন্তু জোসেফাইনের পিতা-মাতা এই ব্যাপারটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন, তাঁদের মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে জোসেফাইনের একটা চালচুলো হীন দরিদ্র বালকের সঙ্গে বিয়ে হয়। এর পরে কি হয় ঠিক জানা যায় না—তবে ভাগ্যহীন বালক উইলিয়াম সে স্থান ছেড়ে চলে যায়—বালক সেই বয়সেই ভাগ্যের সন্ধানে চলেছে, বালিকা জোসেফাইনের সঙ্গে তার দেখা হোল। বিদায়কালে বালক বালিকা দু'জনারই চোখজলা জল—দু'জনাই দু'জনার প্রতি হৃদয়ের অসীম ভালবাসা জানালে। জোসেফাইন উইলিয়ামের কাছে প্রতিজ্ঞা করলে চিরকাল সে উইলিয়ামেরই থাকবে, জীবনে অপর কারো হবে না, বালকও বললে সে অর্থশালী হয়ে ফিরে এসে জোসেফাইনকে গৃহলক্ষ্মী করবে।

বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি বড় মধুর বড় মনোরম। জীবন স্রোতে পড়ে সে প্রণয় অনেক সময় ভেঙে যায় বটে কিন্তু স্মৃতিটি তার হৃদয় থেকে বোধহয় কোনদিনই উপড়ে ফেলা যায় না। উইলিয়ম ও জোসেফাইন দু'জনার হাতে হাত রেখে সযত্ন হৃদয় দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে বটে যে চিরকাল কেউ কাকে ভুলবে না তাদের হৃদয়ভরা ভালবাসার বিনিময় শুধু তাদের দু'জনার মধ্যে সে প্রেম সে ভালবাসার বিষে আর কেউ কণামাত্রও পাবে না—কিন্তু বিধাতার বিধানে সব উল্টে গেল।

উইলিয়ম ফিরে যাবার পর কতদিন কতকাল চলে গেল। জোসেফাইন তার ভালবাসাভরা একখানা চিঠির জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসে থাকে, রোজ সে ভাবে আজ নিশ্চয়ই প্রিয়তমের তার চিঠি আসবে কিন্তু কই, দিন যায় মাস যায়,—বছর যায়—আবার নূতন বছর আসে কিন্তু প্রিয়তমের তার কোন সন্ধান নাই। জোসেফাইন ভাবতে লাগল তবে কি উইলিয়াম তাকে ভুলে গেল—একখানি চিঠিও যে তার সম্বল নাই। কোন্ স্মৃতি নিয়ে সে মনকে ধরে রাখবে! এদিকে ব্যাপার হয়েছিল কি, জোসেফাইনের মাতা উইলিয়ামের কোন চিঠি তার কন্যার নামে এলেই নিজের কাছে রেখে দিতেন জোসেফাইনকে চিঠির কথা কিছু জানাতেন না।

জোসেফাইনের মা মতলব করছিলেন যে মার্টিনিকের গবর্ণর মাননীয় ইস্ ডি বিউহার্ণের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। মাননীয় বিউহার্ণে অর্থশালী বোটেই ছিলেন না, তবে তিনি ফ্রান্সের খুব বনিয়াদি ঘরের লোক, সে

রাণের নাম খ্যাতি ও যশেই ছিল, যোসেফাইনের পিতা মাতা খুব ধনী ছিলেন তাই তারা মেয়ের বয়স মন বয়সের চেয়ে বয়স মর্য্যাদার নিকটই বেশী করে দেখতে লাগলেন। বিয়ে সহজেই হয়ে গেল—বিয়েতে সকলেই বেশ খুসী ও হোল, খুসী হলেন না শুধু বিয়ের যিনি কনে, সেই সুন্দরী ষোড়শী যোসেফাইন।

যোসেফাইনের স্বামী আলেকজান্দার বিউহার্ণ ভাল ঘরের শিক্ষিত ছেলে তবে তার আর যোসেফাইনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আলেকজান্দার বেশ চতুর ছিলেন—প্যারীসহরের নানা ধরণের সহরে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার পর যোসেফাইনের মত পত্নী পেয়ে তিনি আনন্দিতই হলেন।

যোসেফাইন।

যোসেফাইন কিন্তু একবার একজনকে সত্যি ভালবেসে আবার আর একজনকে বিয়ে করতে মোটেই রাজী ছিলেন না। কিন্তু তখন কার কানে বিবাহে পিতামাতার বিরুদ্ধে মেয়েরা যে কিছু করবে এ কল্পনাই তাদের মাথায় ঢুকতো না। প্যারীর মেয়েদের আজ আর সে অবস্থা নাই।

এ দিকে অনেক দিন প্রিয়তমার কোন সন্ধান না পেয়ে উইলিয়াম দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন তার ভালবাসার যোসেফাইন অপর একজনের ধাত্রীরূপা। দুই বালা প্রণয়ীর দেখা হোল—সেই খানে প্রকাশ পেল কি ভাবে উইলিয়মের চিঠি গুলি খোয়া গেছে। উইলিয়াম অনেক করে যোসেফাইনকে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বললেন কিন্তু পিতামাতার অমতে বালিকার কিছুই যে করবার যো নাই। উইলিয়াম নিরাশ চিত্তে ফিরে গেলেন।

উইলিয়াম দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার পর আর যোসেফাইনের সঙ্গে দেখা করেন নাই—কিন্তু জীবনে যোসেফাইনের কথা তিনি কোন দিন ভুলতেও পারেন নি, যোসেফাইন কোন্ সময় কি অবস্থায় থাকেন সে সংবাদও তিনি সব সময়ই রাখতেন। অনেকদিন পরে উইলিয়াম যখন শুনতে পেলেন তার ভালবাসার যোসেফাইন মৃত্যু-শয্যায় তখন তিনি তাড়াতাড়ি করে তাকে দেখবার জন্তে ছুটে গেলেন—কিন্তু জীবনে দেখা আর হোল না। উইলিয়ম বড় বিলম্বে তার বাল্য প্রণয়িনীর মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়েছিলেন।

বিয়ে হয়ে গেলে যোসেফাইন স্বামীর সঙ্গে প্যারীতে গেলেন। প্যারীর চারিদিকেই বিলাস ব্যসনের স্রোত—নির্জ্জন দ্বীপ থেকে প্যারী সহরের সভ্যতার মধ্যে এসে যোসেফাইনের ভালই লাগতে লাগল। খরচের হাত অত্যন্ত বেড়ে গেল। সারাদিন পক্ষিতা প্রজাপতির মত যোসেফাইন আমোদ উৎসব করে বেড়াতেন—যোসেফাইনের স্বামীর সঙ্গীদের মুখেও তার গুণ স্তুতির অন্ত ছিল না—সঙ্গীদের মুখে পত্নীর প্রশংসা শুনে যোসেফাইনের স্বামীও আনন্দে অধীর হতেন। যোসেফাইনের মহাগুণ ছিল সহজেই তিনি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের ভালবাসার পাত্রী হতে পারতেন। তার বৃদ্ধ শ্বশুর তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন—শাশুড়ীও খুব ভাল বাসতেন—স্বামী আলেকজেন্দার ভাবতেন পত্নী যোসেফাইনের কৃপায় তিনি ক্রমেই তার কর্ম্মজীবনে উন্নতি করতে পারবেন।

কিন্তু যোসেফাইন ছিলেন পরম বিলাসিনী ও আরাম অনুরক্তা, নিজে চেষ্টা করে যে অপরের জন্ত কিছু করা সে তার কুষ্ঠিতে লেখে নাই। তাই তার স্বামী আলেকজেন্দার যখন পত্নীর সাহায্যে কি উপায়ে সম্মান অর্জ্জন করবেন ভাবছিলেন যোসেফাইন তখন শুধু বসে বসে

হাসি বেগে তাকে নিরস্ত করেছিলেন! অতি মনোহারিণী নারী ছিলেন বোনেপার্টাইন—কিন্তু তার নিজ ছলা কলার সাহায্যে তিনি অপরের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা তো ছিলই না, তার উপর সহানুভূতির ও কিছু না থাকাতে দু'জনা ক্রমেই দূরে সরে পড়ছিলেন। আলেকজেন্দারের ক্রমে গৃহ ও পত্নীর উপর থেকে মন উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ মাতৃই পুত্রের ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। এর পরে আলেকজেন্দার যখন পত্নীকে বিশ্বাসঘাতিনী বলে অভিযোগ আনলেন তখন বোনেপার্টাইনের শ্বশুর পুত্র বধূর পক্ষ অবলম্বন করলেন। স্বামীর সঙ্গে মনের মিল না থাকে বোনেপার্টাইন সত্যই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কিছু করেন নাই। কিন্তু আলেকজেন্দারের মন তার পত্নীর উপর থেকে উঠে গিয়েছিল, তিনি দু'তিনবার আদালতের সাহায্যও নিতে গিয়েছিলেন, বিরক্ত হয়ে বোনেপার্টাইন মার্টিনিক দ্বীপে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন।

দ্বীপে ফিরে এসে তার আবার সেই বাল্য প্রণয়ের মধুর স্মৃতি স্মরণ হতে লাগল, যদি—যদি এ সময় সে একবার ফিরে আসে! সে তো সম্ভব নয়—বোনেপার্টাইনকে একাকিনীই এই ভাবী প্রাণ নিয়ে দিন কাটাতে হবে।

এই সময় বোনেপার্টাইন সংবাদ পেলেন—সে ভীষণ সংবাদ। ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে,—প্যারী সহর আর পূর্বের মত নেই বিলাস ব্যসনে সজ্জিত ইন্দ্রের অমরাপুরী প্যারী নাই। অমরার নন্দনকাননে রক্তের ঢেউ খেলছে। গিলোটিনে রাজ্যের যত বনিয়াদী ঘর যত বংশমর্য্যাদা—ক্ষমতার প্রাধান্যসব নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভি বিউহার্ণে বংশও বনেদী ঘরের—খবর শুনে বোনেপার্টাইনের মনও চঞ্চল হয়ে উঠল—হাজার দুর্ব্যবহার করে থাকুক তবু তো—স্বামী।

এই দুঃসময়ে আলেকজেন্দারও অতীতের কথা, কি ভাবে পত্নীর উপর তিনি দুর্ব্যবহার করেছিলেন তাই ভেবে ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবছিলেন যে কোন মুহূর্ত্তে তার মরণের ডাক আসতে পারে। এই সময়ে বোনেপার্টাইনের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি পুনর্মিলনের জন্য একখানি চিঠি লেখেন। বোনেপার্টাইনেরও পত্নীত্বের সর্ব্ব তখন জেগে উঠেছিল তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়াবার জন্য প্যারী যাত্রা করলেন। কিন্তু নারীর কি ক্ষমতা আছে স্বামীকে রক্ষা করবার—১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আলেকজেন্দার গিলোটিনে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

ফ্রান্সের পক্ষে সে বড় দুর্দিন, খুন হুগাছ হাজার হাজার অত্যাচার সয়ে নির্য্যাতিত ব্যথিত দলের মধ্যে রক্তের পিপাসা ভীষণ ভাবে জেগে উঠেছিল। অত্যাচার মুক্ত হয়ে নির্য্যাতিতের দল ক্ষুব্ধ দানবের মত হয়ে উঠেছিল। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সন্দেহভাজন হয়ে কারাগারে প্রেরিত হচ্ছিল—তারপর কল্পিত অপরাধের জন্য তাদের প্রাণদণ্ড—গিলোটিনের অনুগ্রহে জীবন পূর্ণের শেষ।

ভাগ্যগুণে বোনেপার্টাইন প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। বোনেপার্টাইন একে নারী তার উপর মনোহারিণী ক্ষমতায় কি ভাবে পুরুষদের বশীভূত করতে হয় সে বিদ্যায় তিনি খুব পটু ছিলেন তাই তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেন—এবং এই সময় থেকেই তার বিচিত্র জীবন নূতন পথে চলতে আরম্ভ হোল।

চারিদিকে একটা ভীষণ ভীতি আশঙ্কার ভাব বিরাজিত। যে নিজেকে কালবশে একটু দেশহিতৈষী বলে পরিচিত করে নিতে পেরেছে তারই হাতে যেন সহস্র সহস্র লোকের জীবন মরণ নির্ভর করছে। ক্রমে ফ্রান্সের এমন ভীতির দিনেও অবসান হোল—আবার ফ্রান্স শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করল।

ছোটখাট মানুষটি—সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বেশ চালকের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। নেপোলিয়ান আদেশ করলেন সব নাগরিকদের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে—অমনি নাগরিকদের যার কাছে যা অস্ত্র শস্ত্র ছিল তা তারা ত্যাগ করতে বাধ্য হোল। সকলের শেষে এক দলের মধ্যে বোনেপার্টাইনের শিশু পুত্র ইউজিনীতি বিউহার্ণে পিতার তরবারী খানি হাতে নিয়ে এলেন—এ তরবারী খানি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কর্সিকান সেনাপতির হৃদয়ের একটা দিক ছিল বড় কোমল কল্পনা প্রবণ—পিতার তরবারী খানা রাখবার সময় তিনি বালকের চোখে অশ্রু দেখলেন এবং তার কারণও বুঝলেন। তিনি বালককে তরবারী ফিরে দিলেন। সেনাপতির বিশেষ আদেশে বালক তরবারী রাখবার অনুমতি পেল।

পর দিন বোনেপার্টাইন স্বয়ং নেপোলিয়ানকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ দিতে এলেন। বিশ্বজয়ী সেনাপতি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। বোনেপার্টাইন কিন্তু প্রেম ব্যাপারে এতদিনে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন—পুরুষের অযাচিত চুম্বন আর আলিঙ্গনে তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল না। বোনেপার্টাইন দেখলেন ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকটির ভালবাসা তাঁর উপরে পড়েছে—বোনেপার্টাইনও দেখলেন তিনি এ ভালবাসার প্রতিদান দিতে উৎসুক। এইভাবে বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ান একজন নারীর ছলনায় প্রতারিত হলেন, তিনি ভাবলেন বোনেপার্টাইন সত্যই তাঁকে ভালবাসেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ প্যারীর একজন রেজিষ্ট্রারের কাছে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। বোনেপার্টাইন দেখলেন, তিনি ফ্রান্সের একজন শ্রেষ্ঠ লোকের পত্নীর আসন গ্রহণ করেছেন।

বোনেপার্টাইনকে নেপোলিয়ান মনে করতেন—সকল সৌন্দর্য্যের আধার, কমনীয়তার প্রতিমূর্ত্তি নারী রত্ন। নেপোলিয়ান গভীর ভাবে তাঁর প্রেমে পড়ে যান—স্বামী

স্ত্রীর কাছে যে পত্র গুলি লিখেছিলেন তার ছত্রে ছত্রে এ প্রেমের গভীরতা জ্ঞাপন করে। যুদ্ধক্ষেত্র তাঁবুর আগুনের পাশে বসে প্রবাসী সৈনিক স্বামী যে চিঠি গুলি লিখেছেন তারও ছত্রে ছত্রে যেন সৈনিকের উজ্জ্বল উগ্র ভালবাসার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ছে। কত উজ্জ্বল সে ভালবাসা—অথচ কত কোমল মধুর! নেপোলিয়ান জগতের একজন মহা ক্ষমতাশালী পুরুষ প্রধান ছিলেন—যদি পাশে তিনি সঙ্গিনী ও সহায়রূপে একজন ভাল রমণী পেতেন তবে কে জানে তিনি আরও কত অসাধ্য সাধন করে যেতে পারতেন।

দুঃখের বিষয় যোসেফাইন কিন্তু তখন তার সব কোমল ও সুন্দর মনোবৃত্তি ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি শুধু নিজ স্বচ্ছন্দতার জন্য আরামে বিলাসেই নিমজ্জিত থাকতেন। নেপোলিয়ান পুরুষ—তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন না, নেপোলিয়ান ক্ষমতাবান প্রতিপত্তিশালী তাই তিনি নেপোলিয়ানকে ভালবাসতেন। নেপোলিয়ানও এতে মাঝে মাঝে হৃদয়ে বড় আঘাত পেতেন, ব্যথা অনুভব করতেন। স্বপনের মোহ সময়ে সময়ে তাঁর মনে আশা হোত—না তাঁর এ প্রাণ ঢালা ভালবাসা ব্যর্থ হবে না, এত ভালবাসেন তিনি এর প্রতিদান নিশ্চয়ই পাবেন। তিনি যখন যোসেফাইনকে ভালবাসেন যোসেফাইনও নিশ্চয়ই তাঁকে তেমন ভালবাসবে।

নেপোলিয়ান যখন ইজিপ্ট বিজয়ে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর প্রিয়তমার বিশ্বাসহীনতার অনেক কাহিনী শুনতে পেলেন এবং ফিরে এসে দেখলেন সেগুলো মিথ্যা কথা নয়। যোসেফাইনের মাথায় এ সময় কতকগুলো মতলব খেলছিল—যোসেফাইন দেখছিলেন যে দেশের শাসক সম্প্রদায় নেপোলিয়ানের উপর তেমন সন্তুষ্ট নন—হয়তো নেপোলিয়ান তাঁর পূর্ব্বাকল্প বিজয়যাত্রা হতে আর নাও ফিরতে পারেন তাই তিনি স্বামীর শত্রুদের হাতের পুতুল হয়ে থেকে তাঁর অবস্থাটা ঠিক রাখবারই চেষ্টা করছিলেন।

নেপোলিয়ান ফিরে এসে দেখলেন প্রিয়তমা পত্নী তাঁর শত্রুদের সঙ্গে মেশে লিপ্ত। স্বামীর আগমনবার্ত্তা শুনে তিনি তাড়াতাড়ি স্বামীর আগেই গৃহে ফিরতে ব্যস্ত হলেন, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে তখন—গৃহে ফিরে এসে দেখেন স্বামী তাঁর পাঠাগারে, তিনি আর পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক নন। নেপোলিয়ানের চোখ খুলে গেছে তখন।

এর পরেও নেপোলিয়ান পত্নীর সব অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন সত্য—তিনি যেমন ফ্রান্সের সাম্রাজ্ঞী তেমনি ছিলেন কিন্তু তাঁর স্বপ্নের ঘোর যেন কেটে গিয়েছিল। তখন যোসেফাইন বুঝতে পারলেন কি মহানুভব স্বামী তাঁর—কত উদার চরিত্র—মহৎ হৃদয় আর কি গভীর ভালবাসা স্বামীর তাঁর উপর! এতকাল যে বিষময়ী স্বামীকে নিয়ে তিনি খেলিয়ে এসেছেন আজ সেই স্বামীকে সত্য ভালবাসার জন্য তাঁর হৃদয় অধীর আকুল হয়ে উঠল। নেপোলিয়ানের মনে তখন দুটো আকাঙ্ক্ষা কি চান, তিনি, কি ভালবাসেন বিশাল সাম্রাজ্য না—তাঁর বড় ভালবাসার ধন নারীর প্রেম! কিন্তু সে ভালবাসা সে প্রেমের মোহ যে তাঁর অনেকটা কেটে গেছে।

নেপোলিয়ানের উরসে যোসেফাইনের কোন সন্তান হয় নাই। নেপোলিয়ানের স্বপনের ধ্যান ছিল একটা বিশাল সাম্রাজ্য ও একটা মহৎ বংশের প্রতিষ্ঠা করে যাবেন। যোসেফাইনের পুত্র নাই—তাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তাই ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের হিতের জন্য যোসেফাইনকে ত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

নেপোলিয়ান লিখলেন যিনি দীর্ঘ তের বৎসর আমার পত্নীরূপে ছিলেন তার উপর আমার দয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই।' সেনেট বিবাহচ্ছেদ মঞ্জুর করলেন। যোসেফাইন ফ্রান্স ত্যাগ করে গেলেন। এইখানে তাঁর বাল্য প্রণয়ী আসেন কিন্তু সে তাঁর মৃত্যুর পরে। নেপোলিয়ান তাঁকে ত্যাগ করেছেন জেনে অভিমানিনী নারীর হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছিল। বিলাসিনী, আপন সুখমত্তা নারী এ আঘাতের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

দেশ বিদেশ

আমেরিকা জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে যে, কেলেডোনিয়াতে অবস্থান স্ত্রীর সহিত আমেরিকা জেলে সাক্ষাৎ করিবার যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

গত ১১ই ডিসেম্বর প্রাতে পাঞ্জাব কেশরী শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতৃদেব লালা রাধাকিষণ মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই ডিসেম্বর লাহোর জেল হইতে প্রায় ৩০০ কয়েদীকে একযোগে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

জাপানের সংবাদে প্রকাশ, ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য জাপান সরকার হইতে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহার সভ্যগণ সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ভূমিকম্পের ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার লোক মারা গিয়াছে। ৩ লক্ষ ৪ হাজার লোক আহত হইয়াছে। ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে।

৪৮ বিভাগে প্রতি বৎসর পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকারও বেশী আয় হইত। কিন্তু গত ১৯২১—২২ সনে এবার লক্ষ আশী হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে।

মৃত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহার কবরের উপর যেন মাটার বাধান হয়।

বৃহত্তর বিলাতী কাপড়ের দোকানে সিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক মার্কিন ব্যাবসাদারের বেশে সজ্জিত হইয়া দোকানে অতি মূল্যবান সহিত সিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন। আমেদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত পেটেল আসিয়া সিকেটিংএর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ১লা ডিসেম্বর হইতে আমেদাবাদে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে আবার সিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। মহিলাগণও এই সিকেটিং কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রেণবন্ধু চিত্তরঞ্জন "বাঙলার কথা" (বৈমাসিক) পত্রের একটী কপি-হেন, শ্রীযুক্ত সুরাজের বন্ধ কথা সম্পাদন করিতেছেন।

গত বুধবার প্রাতে ৯টার সময় বড়লাট লর্ড রেডীং মহীশূর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত হারেন্দ্র বিশ্বাস পরলোকগত রায় যাদবেন্দ্র পাল বাহাদুরের স্মরণে বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সহমরণের বন্ধ নিবারণের প্রতিষেধবিধায় উত্থাপন করিবেন।

চারুচন্দ্রবাবু আলিপুরের পাঃ প্রসিডিউটর স্বর্গীয় আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল রত্ন। কাউন্সিলে এরূপ যোগ্য লোকের আসন্ন মিলিলে আমরা আনন্দিতই হইব।

স্বর্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সদস্যগণ একবাক্যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে স্বামী যোগানন্দ আশ্রম পাশাকে প্রণয়ন ও কন্যাসম্প্রদান উপাধি (অর্থাৎ বরণে প্রেরিত) প্রদান করা হউক, এবং স্বর্গী সহরে বিরাট স্মৃতী সৌধের জন্য একটী স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হউক। অতঃপর ইহারা ও স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দাসাল পাশার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া এই কথা জানান এবং তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি সহাস্যবদনে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। কাগাল ভাইজী কয়ে (আনন্দেরা)

মুলীরা অন্তর্রাষ্ট্রিয়োপনিবেশের শ্রীক অধিবাসিদিগকে অন্তর্রাষ্ট্রিয়োপনিবেশে থাকিতে দিতে রাজি হইয়াছে, তবে বলিয়াছে যে, শ্রীকদিগকে অন্তর্রাষ্ট্রিয়োপনিবেশের কর্তৃপক্ষের একেবারে মধ্যে তথাকথিত কতকগুলি নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হইবে।

অন্তর্রাষ্ট্রিয়োপনিবেশের মিনিষ্টারী সভার প্রধান পাশার মুখে শোনাযে বিবাহিত মিলুক হইয়াছেন। তিনি একদিন হকম বিভাগের অস্থায় সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিরুদ্ধপক্ষের উপর সন্তুষ্ট থাকাই হাকের পাশাকে সরাইবার প্রধান কারণ।

মিসরের মুসলমানেরা পক্ষপাতশূন্য রৌপ্যিক পাশার নেতৃত্বে মিসরের নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই মন্ত্রী সভার সহিত ব্রাউনিয়নের কতকটা মিলামিলভাব আছে। মুসলমানের মধ্যে উপাসনার ব্যাঘাত হইতে হইলে প্রতিনিধিকে বাকি নিয়োগ করা হইয়াছিল। এদিকে অন্তর্রাষ্ট্রিয়োপনিবেশের পলাতিক উজীর এবং খেত-উজীরগণ বাকি মিসর পরিত্যাগ করিয়া সরা বাজা করিয়াছেন।

এইরূপ প্রকাশ যে, জর্মান ও রুশিয়া নিজই কয়াসীকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। রুশিয়া জর্মানীকে অনেক সৈন্য সভার বিষ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জর্মান অধিনায়কগণ রুশিয়ার সৈন্যগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। জর্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে রেলওয়ে যাতায়াতের চেষ্টা হইতেছে। এদিকে জর্মান কারখানায় যুদ্ধ সাজের আয়োজন, গুলি, বারুদ তৈয়ারি করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

ডরটমুণ্ডের মাইনেজার ও এসোসিয়েটের রেলের ডিরেক্টার মিঃ ফিলিপ বিদ্রী হইতে ব্রেসলাউ নিকট গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মিঃ ফিলিপ সুবক ও সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে অনেক ক্ষতি হইল। —•—

ফিলিপাইনের আমেরিকান পুলস ও শ্রী মজুরেরা ধর্মঘটের ফিরে নৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে • • শুধু ইহাই নয়, সেখানে অরাজকতা আমেরিকার শ্রী মজুরেরা দীনতায় সর্বোচ্চ মূল্যে পুরুষদের নিকট বিক্রিত হইয়া থাকে। বিধাতারা রমণীদিগকে বন্ধ পুরুষ সংসর্গ করিতে বাধ্য করা হয়। • • • (বরাজ)

"বরাজ" কথা কি নতা? মিঃ গান্ধী কি বলেন? এরূপ কোনো কথা তাঁহার কানে গিয়াছিল কি? না আমেরিকার মুখের হুকুমে পরাধীন ভোরে থাকিয়া, তদ্রূপ শুনিয়াও এ সব বেহায়া কথা শুনিবার অবসর পান নাই!

—•—

শ্রীমতী পাঙ্খাস্ট রেখীর আমেরিকার আগমনের কথা আমরাই বলিয়াছি। সম্প্রতি রেখীকে মেয়রের কমেটীর পোষাক পরাইয়া মিছিল মোকে বাহির লইয়া বাওয়া হইয়াছে। সেদিন বহু লোক ষ্ট্রাইকরদের টিকিট কিনিয়া রেখীদর্শনের আশায় সময়ের ঢের আগে মিটে যায়। শিল্পী-বন্ধু নিম্নে দেখিয়া পাশে পুথকের দলও উৎপাত বাধাইয়া বসে, তা দেখিতে বিরাম কি সেই কারণ? বা Law and order এর আদেশ? অথবা মেয়রাণী মেয়রাণীকে মোকের সেবা দেখিবে—ভাণ্ড In JUSTICE?

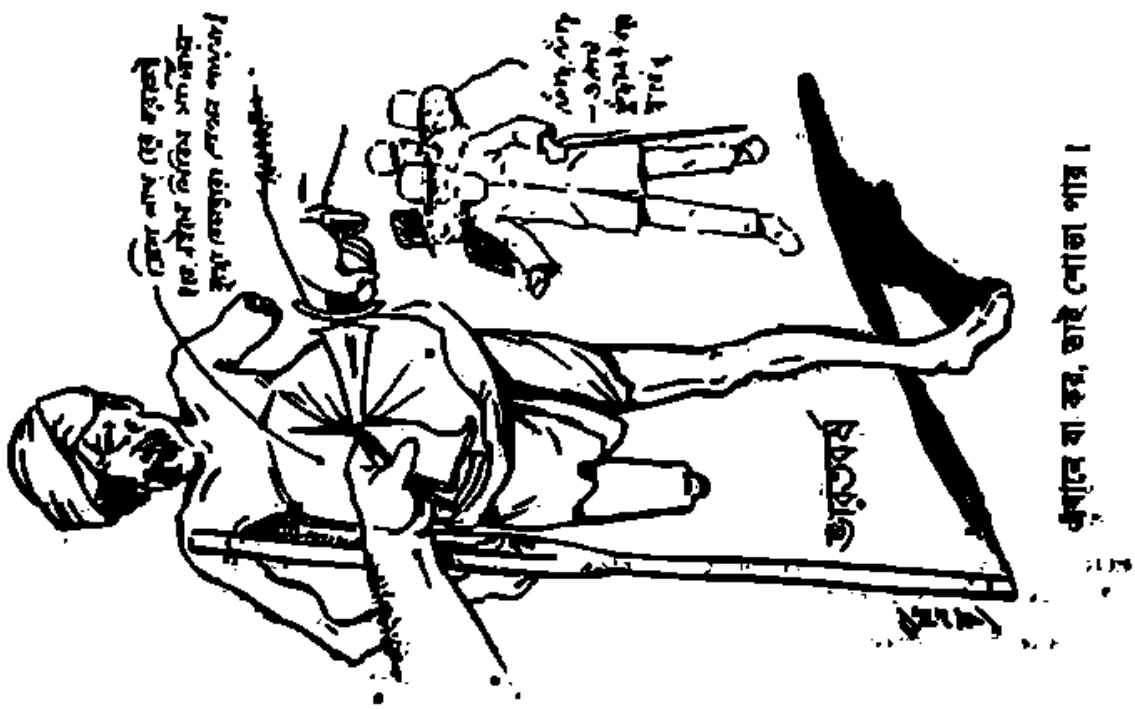

ভুলের মূল

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

চতুর্থপরিচ্ছেদ

পাড়াতে এই দুই প্রৌঢ় দম্পতীর মধ্যে একটিও বাক্য-বিনিময় হইল না। ডঃ ঘোষ পত্নীর বিষাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কি-একটা-দুইটা কথা বলিয়াছিলেন, মিসেস্ ঘোষ সেদিকে কাণই দিতে পারেন নাই। তিনি পথের এক দিকের ফুটপাথের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন। ডঃ ঘোষ স্ত্রীর ক্রন্দনের ব্যথা যে বুঝিতে-ছিলেন না, এমন নয় কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবেন ভাবিয়াই পাইতেছিলেন না। কথাটা যে তিনি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন নাই তাহা সত্য কিন্তু যে একেবারে ধ্রুব ও অকাট্য সত্য বলিয়া সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, বিরুদ্ধ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার মনোভাব পরিবর্তিত করাও ত সহজ নয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ডঃ ঘোষ বলিলেন—এই গোপেনের বাবা—অর্থাৎ আমার মেজ-কাকার কাণ্ড তোমায় বলি নি বেম?

মিসেস্ ঘোষ এদিকে মুখ ফিরাইতেই বলিলেন—অবশ্য তখন আমরা খুব ছোট, তবে মনে ঠিক আছে। বাবার নামে এক ফৌজদারী বাধিয়ে দিয়েছিলেন, তার থেকে উদ্ধার পেতে বাবার যেমন তেমন করে একটি লাখ্ টাকা গলে গিয়েছিল। সেই থেকেই ত ওদের সঙ্গে আমাদের খুব দেখাসোনাই ছিল না। তারপর মেজকাকার মৃত্যুর পর আমিই ওদের ডেকে-ডুকে দেখা-সোনা করতে লাগলুম।—তিনি চুপ করিলেন। বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিতে তাঁহারই জিহ্বায় বাধিয়া গেল, পাছে মিসেস্ ঘোষ এখনই গোপেনের ঘাড়ে এই সব অভিযোগ চাপানোয়, অধিকতর সন্দেহাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। তবে তবে কোন কথাই আর করিতে পারিলেন না। মিসেস্ ঘোষ আবার ও-দিকে ফিরিলেন।

বাড়ীর হাতায় মোটর থামিতেই মিসেস্ ঘোষ বলি-লেন—প্রভাকে এখনই খবরটা দিতে হয় ত।

ডঃ ঘোষের চক্ষু কপালে উঠিল! প্রভাকে বলিবে, কি! তাড়াতাড়ি বলিলেন—না, না, তা'কে এখন বলে কাজ নেই। কোথাকার যে একটা কি বলেছে, তাই নিয়ে হৈ-চৈ করবার কোন দরকার দেখি-নে।

মিসেস্ ঘোষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—দরকার দেখ্‌ছ না? তুমি কি এখনও ভাবছ গোপেন মিথ্যা বলেছে?

হাঁ—মিথ্যা—মিথ্যা—না'ও হ'তে পারে মিথ্যা—ভুল করেছে।

কি ভুল?

কা'কে দেখ্‌তে কা'কে দেখেছে তার ঠিক কি?

একদিন দেখ্‌লে ভুল হ'তে পারত কিন্তু···

ডঃ ঘোষ স্ত্রীর বামহস্তখানি নিজ বামহস্তের তালুর উপরে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের তুইটি আঙুলের টোকা মারিতে মারিতে বলিলেন—দেখ, ওরা সব বড় পল্লী কাস্তর। ওর বাবা—অর্থাৎ আমার মেজকাকা···

আমি শুনেছি। তা'তে এ'তে কোন সম্পর্ক নেই। আর এতে তার পল্লী কাস্তরতার কোন কারণই থাকতে পারে না। তুমি যাই কেন বল-না, আমি ঠিক জানি, গোপেন মিথ্যাও বলে নি, ভুল-ও বলে নি। যা প্রত্যক্ষ করেছে, তাই সে প্রভার, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হিতের জন্যই বলেছে।

ডঃ ঘোষ প্রমাদ গণিলেন। হয়ত কোন কথা তাঁহার মুখে যোগাইল না, বলিলেন—ঘরে চল, পরামর্শ করা যাবে'খন।

মিসেস্ ঘোষ আর আপত্তি করিলেন না। উভয়ে হলে প্রবেশ করিয়াছেন, প্রভা একখানি বহি হাতে করিয়া দর্শন দিল। জননী কন্যার মুখের দিকে চাহিতেও পারিলেন না, নিঃশব্দে হল অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ডঃ ঘোষ অপ্রস্তুতভাবে প্রভার নিকটবর্তী হইয়া চেয়ারটা খানিকটা স্নেহহাস্যে মুখটি রঞ্জিত করিয়া বলিলেন—প্রভা বই পড়তে কি তোর আলস্য হয় না?

প্রভা নতমস্তকে কহিল—না বাবা, যখন আর কিছু ভাল লাগে না, তখনও আমি একখানা বই পেলে সব ভুলে যাই।

ডঃ ঘোষ হাসিয়া বলিলেন—আমার কিন্তু ঠিক তার উল্টো, প্রভা! বই হাতে নিলেই রাজ্যের ঘুম এসে চোখ

হু'টোকে অন্ধকার করে মেরে! ছেলেবেলা থেকেই ঐ রোগ—তাই ত কিছু হ'ল না!—বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

প্রভাও হাসিল। হাসিয়া বলিল—তা বৈ-কি বাবা! ছেলেবেলা থেকে ঐ রোগ হ'লে আর এতগুলো পাশ করতে হ'ত না!

সে জানিস্ নে বুঝি প্রভা? তোকে বলি নি বুঝি! শোন্ তবে তোর বাবার পাশ করার রহস্যটা! এফ-এ পরীক্ষার ঠিক পাঁচ ছ'দিন আগে নোটকোই মুখস্থ করে খুব বড় বড় কথা আর লম্বাচওড়া বক্তৃতা লিখে নিয়ে আসতুম। এক্জামিনর তাই ত উঃ এত বড় বড় কথা যে জানে, এমন বক্তৃতা দিতে পারে—সে নিশ্চয়ই ভাল ছেলে! এই ইম্প্রেশন একবার যেই মনের মধ্যে ওঠা অমনি টকাটক নম্বর দিয়ে যাওয়া, আর তোর বাবাও অমনি পাশ! বুঝলিরে?

হ্যাঁ—যাও—বলিয়া প্রভা হাসিল।

ডঃ ঘোষ আর কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। বেশ পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেও সাহস হইতেছে না। যদি সেই অবসরে প্রভা তাহার মাতার কক্ষে ঢুকিয়া পড়ে, তাহার জননী আবার যে পেট-আলগা লোক, এখনি এক কাণ্ড ঘটিয়া বসিবে।

ডঃ ঘোষ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, প্রভা জিজ্ঞাসিল—বাবা! মা'র কি হ'য়েছে বাবা?

কৈ—এমন কিছু···হ্যাঁ হ্যাঁ, মাথাটা একটু ধরেছে বল্লেন বটে! আমি আলো নিবিয়ে অন্ধকারে একটু বিশ্রাম করতে বলেছি ওঁকে!

প্রভা জননীর কক্ষদ্বারের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—না, ঐ ত আলো জ্বলছে। আমি একবার যেয়ে আসি।

না না, তুমি গেলেই আবার বকর বকর আরম্ভ করবেন, আর মাথাটি যেন পাকাপাকি করে ধরবে। জান ত তোমার মা'কে, সন্ধ্য পেলে আর রক্ষা নেই। বোধহয় কাপড় বদলালেন তারপরই বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়বেন।—বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত থামিলেন, পরে বলিলেন—আমি বলি কি, তুমিও ততক্ষণ বইটা পড়গে, উনিও বিশ্রাম করে নিন্—রাত্রে খাওয়ার সময় দেখা হ'বেখন। কি-বল মা?

প্রভা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিল—তুমি কি করবে বাবা?

আমি? আমি আর কি করব মা? ঐ অক্টোবরের রয়াল মেডিক্যাল জার্ণাল খানা এসেছে, একটু পড়ে ফেলি গে! বিলেত থেকে যে ক'খানা ডাক্তারি কাগজ যেয়োয় ঐটিরই সব চেয়ে সংগ্রহ বেশী। সব গুলোই ত পড়ি, ওর মত একটাও দেখি না।

প্রভা দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তবে যে বল্‌ছিলে বই হাতে করলেই ঘুম পায়! নিজেই বইয়ের পোকা, আবার আমায় বলা হয়।

ডঃ ঘোষ বলিলেন—নারে পাগলী তা নয়! এই ত বই নিয়ে বস্‌তে যাচ্ছি, জেগে থাকতে দেখিস্ যদি তখন বলিস্। আচ্ছা মা···

প্রভা নিজ পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিতে ডঃ ঘোষ পত্নীর কক্ষদ্বারের পর্দা ঠেলিয়া বলিলেন—কি করছ গো?

এলো।—মিসেস ঘোষ প্রসাধন টেবিলের পাশে চেয়ার টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।

ডঃ ঘোষ টুপিটি ও ছড়িটি টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে আর একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন। বলিলেন—মাথাটা কি বড্ড ধরেছে? একটু অডিকলোন দাও না!

না, মাথা ধরে নি।—বলিয়া দুই করতলে মস্তক রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ডঃ ঘোষ নীরবে পত্নীর পিঠের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন—এক কাজ কর। আলোটা বন্ধ করে দিয়ে একটু শুয়ে পড়···

প্রভা কোথা?

বই পড়ছে—ও ঘরে।

তা'কে বলছ?

পাগল!

মিসেস ঘোষ বাষ্পপূর্ণ দুইটি নয়ন তুলিয়া স্বামীর মুখের পরে নিবদ্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—পাগলামীর কথা কিছু নেই। তা'কে এখন থেকেই সাবধান ক'রে দিতে হ'বে। তুমি তা'কে সব কথা বলে এস।—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি!

মিসেস ঘোষ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—তুমি না পারো, তা'কে ডেকে দাও, আমি বল্‌ছি।

হেম···

মিসেস ঘোষ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—তুমি কি, বল ত?

ডঃ ঘোষ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—দেখ, কাকে কাণ নিয়ে নিয়ে গেছে শুনেই যে কাকের পেছন পেছন ছুটতে হবে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেই কাউণ্ড্রেলটা যা বলেছে, খুব সম্ভব তা মিথ্যা। যতক্ষণ না তার প্রত্যক্ষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়—ততক্ষণ ও কথা একদম ভুলে যাও।

মিসেস ঘোষ অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—ভুলে যাব? কিছুতেই নয়। বরং কাল যতক্ষণ না হ'টা বাজে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'বে। উঃ—বলিয়া তিনি দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন।

ডঃ ঘোষ সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন—দেখ হেম, যে দিন কাল পড়েছে মনের মত পাত্র পাওয়া এক বিশেষ কঠিন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তবুতে ত পাচ্ছ, বেশীর ভাগই ঐ টুপি আর সোয়াক দয়ল চালওয়ালা ব্রিফ্‌লেস্ ব্যারিষ্টারের দল। হিন্দুর ঘরে কাজ করবার পথ বন্ধ, আমাদের সমাজে পয়সাওলা পাত্র ত নেই বল্লেই চলে, কাজেই—

মিসেস্ ঘোষ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—থাক্ যথেষ্ট হ'য়েছে। পয়সা আছে বলেই যে একটা মাতাল দুশ্চরিত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে সেই বা কি কথা! তার চেয়ে যদি একটি সচ্চরিত্র স্কুলমাষ্টারও আমি পাই, তারই সঙ্গে প্রভারআমার বিয়ে দেব। না-ই বা থাকল পয়সা! দু'জনে খেতে পরতে পারলেই যথেষ্ট! তাই বলে একটা মাতাল রাত দুপুরে মুখোর হ'য়ে বিছানায় এসে পড়বে, দম্‌পট—

ছিঃ হেম! শচীন মাতালও নয়···

তুমি ত সাফাই গাইবেই। শচীন যদি মদ খেয়ে রাস্তার গ্রেণেও মাথা গুঁজড়ে পড়ে থাকে, তুমি কি তার দোষ দেখবে?

ডঃ ঘোষ নীরব। এই প্রসঙ্গে বাধা দিতে গেলে প্রসঙ্গটা যে বহুদূর গড়াইবে, তাহা তিনি বেশ ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—প্রভাকে আজ সমস্ত কথা বলে রাখা যাক্, আর কাল তাকেও আমরা বিকেলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরুব। সেও স্বচক্ষে···

কি বলছ?

দোষ কি? স্বচক্ষে দেখ্‌লে যে কাজ হ'বে আমরা যতই কেন বলি না তার মন ঠিকমত মেনে নাও নিতে পারে।

ডঃ ঘোষ এক মিনিট পরে বলিলেন—সেটা কি প্রভার পক্ষে খুব স্বাভাবিক হবে না?

স্বাভাবিক ত হ'বেই। হতভাগী যে বোস্‌কে সত্যিই ভালোবাসে।—এবার মিসেস্ ঘোষ একেবারে ছোট একটি মেয়ের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ডঃ ঘোষ আর কি বলিবেন! বিষণ্ণমনে শুধু এই কথা কয়টিই ভাবিতে লাগিলেন যে কি মুহূর্ত্তেই আজ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম! কি প্রবৃত্তিতাড়নায় না ইডেন-গার্ডেনে ঢুকিয়াছিলাম। কি মহাপাপেই না গোপেনকে আত্মীয়জ্ঞানে চিনিতে পারিয়াছিলাম! ভাবেন আর গোপেনের উপর চিত্ত দুর্বার হইয়া উঠে! কি শত্রুতাই না সাধিল! সেই পিতার পুত্র ত, কত ভাল আর হইবে? ছেলেবেলায় যে তিনি উহাদের এত উপকার করিয়াছিলেন, অর্থ দিয়া, উপদেশ দিয়া, কত রকমে সাহায্য করিয়াছিলেন সব ভস্মে ঘৃত ঢালা হইয়া গেল! খল কি তাহার খলতা ত্যাগ করিতে পারে? তাঁহারই ভুল, তাঁহারই ভুল! দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলেন—সময় পাইয়া সে আপন কাজ সাধিয়াছে।

আবার ভাবেন, কাল নিশ্চয়ই তাঁহাদের সকল কষ্টের অবসান হইয়া যাইবে। নিশ্চয়ই দেখিবেন সেই ষ্টুপিটা যাহাকে শচীন বলিয়া মনে করিয়া কুৎসা রটনা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই শচীন নহে! শচীনের মত চেহারার অন্য কেউ! কিন্তু এ চিন্তা অধিকক্ষণ মনে ঠাঁই পায় না! এক দিন নহে, সে বলিয়াছে, বহুবার দেখিয়াছে, এক পাড়ার ছেলে, ভুল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। এবং ঈশ্বর না করুন, সত্যই যদি দেখা যায়... তবে ত সব আশার অবসান হইয়া গেল। মিসেস্ ঘোষ প্রাণ থাকিতে আর শচীনের মুখদর্শন করিবেন না, কন্যাদান ত দূরের কথা।

অবশ্য যদি ডঃ ঘোষের মত করিতে হয়, তাঁহার বিশেষ আপত্তি নাই। বিবাহের পূর্ব্বের দিনগুলাকে তিনি "বাল্য খেলা" বলিয়াই গ্রহণ করিতে রাজী আছেন; বিবাহের পূর্ব্বে কে কি করিয়াছে না করিয়াছে দেখিতে গেলে চলে কি?· হ্যাঁ, বিবাহের পর দোষটোষগুলা না থাকিলেই

হইল। আর একটু আধটু ছিঃ, সেত কিছুই নহে। ওগুলি ছুঁ দিয়ে এ ম্যানেজ্ করা যায়।

মিসেস্ ঘোষ অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া বলিলেন—আজ শচীন এসেছিল?

ডঃ ঘোষ বলিলেন—কি জানি!

প্রভাকে জিজ্ঞাসা কর-নি?

না—ওটা···

আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করছি···প্রভা···

এখন আর তা'কে ডেকে কাজ নেই। এখনই ত খাবার ঘরে দেখা হ'বে, জিজ্ঞাসা করলেই হ'বে। আর দেখ ছেব···

কি!

আমার একটি কথা রাখ্‌বে?

কি—বল!

ডঃ ঘোষ সস্নেহে পত্নীর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—খাবার ঘরে আমিই জিজ্ঞাসা করব'খন, তুমি কোন কথা বল না। তুমি বরং চুপ-চাপই থেক। আমি প্রভাকে বলেইছি, তোমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, কথা কইতে কষ্ট হ'চ্ছে, তুমি চুপ-চাপই থেক—বুঝলে?

কেন?

দেখ—আমি বলি কি, কাল যদি দেখা যায়, গোপেনের কথাই সত্যি তখন ত প্রভাকে বল্‌তেই হ'বে, তার আগে ও'কে বলে কাজ নেই—ছেলেমানুষ, কষ্ট পাবে! অন্য রকম হ'তেও ত পারে! না, না—তর্কের কথা বল্‌ছি আমি! তুমি কথা কইতে গেলে, মায়ের প্রাণ তোমার, পাছে কোন কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তাই বল্‌ছি। আমরা ত পুড়ছিই, মেয়েটাকে কেন আর আগে খাবৃতে···

আচ্ছা—বলিয়া মিসেস্ ঘোষ মুখ ঢাকিলেন।

ডঃ ঘোষ পত্নীর হাত দুইটি টানিতে টানিতে বলিলেন—না, আর কেঁদ না, ছিঃ ওঠ! উঠে মুখটা চোখটা ধুয়ে মুছে ফেল, নইলে প্রভার···

মিসেস্ ঘোষ স্বামীর অত্যোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া বলিলেন—না, না, আমি প্রভার সামনে বেরুতে পারব না, তার মুখ দেখলেই আমি কেঁদে ফেল্‌ব।

তবে এক কাজ কর—তোমার খাবারটা ঘরেই দিতে বলে দিচ্ছি। প্রভাকে বলব'খন, আলো সহ্য হ'চ্ছে না, ঘরেই খেয়ে তুমি শুয়ে পড়েছ। কিন্তু···

কি?

সে যদি তোমার বিছানার যাবার আগে একবার দেখ্‌তে আসে?

মিসেস্ ঘোষ এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিলেন—অন্ধকারে সে আমি ম্যানেজ্ করে নেব'খন।

সেই ভালো।—ডঃ ঘোষ উঠিতেছিলেন, মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—খাবার পাঠাতে হ'বে না, কিধে আমার নেই, একটু কোল শুধু দিতে বলো।

না, না—যা পারো—কিছু খেতে হ'বে বৈ কি!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে ক্রমাগতই যেমন বৃষ্টি-ধারা পড়িতে থাকে, আজ সারাদিন মিসেস্ ঘোষের দুইটি চক্ষু হইতে তেমনই অশ্রুধারা প্রবাহিত। যতই অপরাহ্ণ হইয়া আসিতেছিল, ততই বৃষ্টির বেগও বাড়িতেছিল। কি দৃশ্য দেখিবেন? দেখিয়া গৃহে আসিয়া হৃদয়-পুত্তলী প্রভাকে কি বলিবেন? আর তাহা শুনিয়া প্রভার মুখখানি কি রকম হইয়া যাইবে? তাহার হৃদয়টি কি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে না? তাহার সেই অশ্রুসিক্ত ব্যথাক্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া তিনিই কি স্থির থাকিতে পারিবেন—এই সব ভাবেন আর অশ্রুরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে!

আজ সারাদিন তিনি প্রভাকে একবার কাছে ডাকেন নাই, সারাদিন অসুখের ছুতা করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়াছেন। শুধু কি তাই? কন্যা কতবার সেই বন্ধদ্বারে তার সেই চম্পক সদৃশ অঙ্গুলির আঘাত করিয়া কতবার স্নেহাকুল কণ্ঠে মাতৃসম্বোধন করিয়া ফিরিয়া গেছে, একবার চোখের দেখাও দিতে পারেন নাই, মুখের একটি কথাও বলিতে পারেন নাই। সে কি কম ব্যথা! কি করিয়া দেখা দিবেন? কি কথা বলিবেন? তাহার সম্বরণ হইলে এই জড় কি প্রলয়গর্জ্জনে গর্জ্জাইয়া উঠিবে না! হৃদয় নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি কি উদ্বেল হইয়া দেখা দিবে না? কন্যা যদি তাহার কারণ জানিতে চায়, তখন তাহাকে কি বলিবেন?

শুধু যে স্বামীর আদেশ, কাতর অনুরোধ উপেক্ষা

করা হইবে তা ত নয়—পূর্ব হইতেই কন্যার কষ্ট চক্ষে দেখিতে হইবে—মাতার পক্ষে তার চেয়ে কষ্টকর আর কি হইতে পারে?

আজ সারাদিন, কাল সারারাত্রি তিনি আকুলস্বরে তাঁহাকেই ডাকিয়াছেন যাঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়; যাহার ইঙ্গিতে অসাধ্যও সাধ্য হইয়া পড়ে, যিনি ইচ্ছা করিলে আজ তাঁহাদের সর্বদুঃখের অবসানও করিয়া দিতে পারেন; গোপেনের নির্ভুল সত্যও মিথ্যায় পরিণত হইয়া যায়! কিন্তু তাহা কি হইবে? এমন কি পুণ্যের জোর তাঁহার আছে, ঈশ্বরের কাছে তাঁহার এমন কি দাবী আছে যে তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণ ত সবাই লয়, তিনিও লইয়াছেন, তবে এমন কি বেশী দাবী আছে যে তিনি তাহার বাসনা পূর্ণ করিবেন!

তবু আশা হয়, তবু মনে হয়—হয় ত বা তিনি তাঁহার ডাক শুনিবেন, তাঁহার ক্রন্দনে, তাঁহার করুণ হৃদয় গলিবে! সেই যে ছেলেবেলায় তাঁহার জনক-জননী শিখাইয়াছিলেন, তিনি বিপদবারণ, বিপদ কালে তাঁহার আশ্রয় লইলে অতি বড় পাপীকেও তিনি আশ্রয় দিয়া থাকেন—আজ কেন—এতকাল পরে সেই কথা তাঁহার মনে পড়িয়া যাইতেছে! আজ কেন মনে হইতেছে, তিনি অনাথ-শরণ, অগতির গতি, বাঞ্ছাকল্পতরু! তবে কি তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?

দুই চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে মিসেস্ ঘোষ বহির্গমনোপযোগী বেশ বিন্যাস করিয়া লইলেন। পাঁচটা বাজিতে এখনও দেরী আছে। আজ তিনি পাঁচটার আগেই বাহির হইবেন—বলিয়াছেন—ঘরেই এক পেয়ালা চা আনাইয়া পান করিয়াছেন! মধ্যাহ্নে একবার প্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, অতি অল্প সময়ের জন্য! প্রভা মা'র কাছে থাকিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া, সেবা করিতে চাহিয়াছিল, মিসেস্ ঘোষ অতি কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—মাথার ভেতরে অসুখ, মা, হাত বুলিয়ে ত কিছু হ'বে না, একলা শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে ভালো হ'তে পারে—তোমার বাবা বলেছেন।

শুনিয়া প্রভা আর কিছুই বলে নাই। তখনই ঘরে ঢুকিয়া মিসেস্ ঘোষ কাঁদিয়াছেন—আর ভাবিয়াছেন, প্রভাকে যদিই এই দুঃসংবাদ দিতে হয়, লিখিয়া জানাইবেন, মুখে বলিতে পারিবেন না: তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিবেন না!

ডঃ ঘোষ দ্বারে টোকা মারিয়া জিজ্ঞাসিলেন—মোটর আন্তে বলি?

বল।

উত্তরে ইডেনগার্ডেনের ফটকের পার্শ্বে যখন মোটর দাঁড়াইলেন, তখন পাঁচ বাজিয়া মাত্র পাঁচমিনিট হইয়াছে। ডঃ ঘোষ বলিলেন ট্রাও ঘরে একটু ঘুরে এলে হ'ত না?

না—থাক্!

আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। এই প্রৌঢ়-দম্পতীর হৃদয় মধ্যে যে ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতেই ইঁহাদের বাক্‌রোধ করিয়া দিয়াছিল। দু'জনেই স্থিরদৃষ্টিতে ধাবমান গাড়ী, মোটর, কিটনগুলির আরোহীদের দেখিয়া লইতেছিলেন।

নভেম্বরের প্রারম্ভে। বেলা ৬টা বাজিতেই রাত্রি হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। জাহাজের বক্ষে গোতসমূহ হইতেও আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল: নদীর ওপারের কলগুলা হইতেও আলোকবিন্দুগুলি চিক্‌মিক্ করিতেছে দেখা গেল।

মিসেস্ ঘোষের দৃষ্টি সেদিকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ একখানা ছাত-খোলা মোটরের দিকে চাহিয়া, উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—দেখ, দেখ—ঐ না?

মুহূর্ত্তে ডঃ ঘোষের মুখ কালো হইয়া উঠিল। শচীনই ত! নিজেই ড্রাইভ্ করিয়া চলিয়াছে, তাহার ওদিকে দক্ষিণ পার্শ্বে—রমণী! রমণী পাপীই বটে! গোপেনের কথা মিথ্যা নয়!

মোটর চলিয়া গেল। মিসেস্ ঘোষ স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—ওকি! চলে গেল! কিছু বল্লে না?

কি বল্‌বে?

কি বল্‌বে? জান-না কি বল্‌বে যে আমাদের বাড়ীর চৌকাঠ···

কিন্তু···

আবার কিন্তু, সাল্ সিং···হাঁকো, যত্নং জোর চালাও···

ডঃ ঘোষ বলিলেন—দেখ, প্রথমে আজ হ'বে যে

রমণীর শচীনের সঙ্গে···

শচীনের সঙ্গে কি আবার! ঐ ঐ—লাল সিং—জোর চালাও। ঐ গাড়ীকো পাকড়ানে হোগা। উঃ ডেঞ্জ চালাও, পুরা দমসে! ও বড়া গাড়ী হ্যায়, তুমকো সাথ নেই দেকেগা।

তখন উভয় গাড়ীর মধ্যে দূরত্ব অতি অল্পই ছিল। লাল সিং পুরাদমে গাড়ী চালাইতেই, শচীনের গাড়ী ক্রমশঃ আরো নিকটস্থ হইয়া পড়িল। আশে পাশে আরো গাড়ী যাতায়াত করিতেছে, বেশীরভাগই সাহেব-মেমকে লইয়া ছুটিতেছে, এরকম সময়ে রাস্তায় আর এক-খানা গাড়ীকে অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার—লাল সিং শচীনের গাড়ীর ঠিক পিছনে আসিয়া পড়িলেও তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিতেছে না দেখিয়া ডঃ ঘোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—শচীন! শচীন।

শচীন একবার মাত্র, একবার মাত্র এদিকে ফিরিয়া দেখিল, কেহ যে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে বুঝিয়াও সে গাড়ী থামাইতে বা উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

মিসেস ঘোষ বলিলেন—ও বুঝতে পেরেছে যে তুমি ডাকছ, গাড়ী থামাবে না—লাল সিংকে বল, পাশ কাটিয়ে যেতে হ'বে।

ডঃ ঘোষ সেই পরামর্শই দিতেছেন, শচীনের গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। অপর দিকে কোন গাড়ী নাই দেখিয়া লালসিং গাড়ী খানাকে পাশ দিয়া চালাইয়া দিল। ডঃ ঘোষকে দেখিয়া শচীন টুপী উত্তোলন করিল।

ডঃ ঘোষ গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, আমরা এইটে দেখতেই তোমার গাড়ীর অনুসরণ করেছিলুম। ক্ষমা করো, আর আজ থেকে আমাদের বাড়ী যাবার চেষ্টা না করলেই আমরা সুখী হ'ব।

এই সময়ে অপরদিক হইতে একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া ডঃ ঘোষ মোটর হইতে নামিয়া পড়িয়া লালসিংকে বলিলেন—খোড়া বাড়ায়কে রাখো।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—আমিও নামব!

লালসিংহ গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

ডঃ ঘোষ বলিলেন—গোপেনের মুখে শুনে আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি। তুমি যে গোপনে এমন করে...

শচীন বলিল—গোপনে বলবেন না। আপনার মত পেয়েছিলুম বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার মত! মাই গড্!

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি স্মরণ করে দেখুন, প্রভা আমার সঙ্গে বেড়াবে—তা'তে আপনি সম্পূর্ণই মত দিয়ে-ছিলেন। সেই প্রথম যেদিন আমরা বায়স্কোপে যাই,···

ও কে?

উত্তরের দৃষ্টি পড়িল, লজ্জানতা রমণীর দিকে। প্রভাই ত!

প্রভা বলিল—কেন বাবা···

ডঃ ঘোষ বুঝি করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—তোরা বুঝি রোজই আসিস্?

প্রভা নতমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল।

বা—বা! বা প্রভা, তো'কে ত বেশ পাকী মেয়েদের মত দেখাচ্ছে!

• • • •

গোপেন একখানা ট্যাক্সি চড়িয়া ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। ব্যাপার জানিতে পারিয়া টুপিটাকে মাথা হইতে খুলিয়া নাকের উপর বসাইয়া ভোঁ করিয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

তারপর সাত আটদিন মিসেস্ ঘোষ লজ্জায় ঘরের বা শচীনের সামনে বাহির হইতে পারেন নাই। এই সাতদিনে তারিখে তাঁহার পুত্র পৌঁছিলে, শচীনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই প্রথম দেখা দিলেন।

মৃগীর মিনতি

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

(সংস্কৃত)

ওগো ব্যাধ লও
যা-খুসী কাটিয়া
দেহের মাংস
কাতর নই,

শুধু দুটী শুধু
বাকী রেখ, নেই
বাছার উপায়
ও দুটী বই।

মিশর উদ্ধার।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরে)

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ময়দান—নীলনদীর তীর, কাল—বিকাল

(শিষ্যগণের প্রতি মেহেদির উপদেশ)

মেহেদি। আজ দেশের বড় দুর্দিন। সোণার মিশর আজ বিদেশীর পদতলে। আমাদেরই দেশের লোকের পাপের ফলে আজ এই পরাধীনতা এসেছে। অশনে বসনে, শয়নে স্বপনে আমরা বিদেশীর অধীন হ'য়ে পড়েছি। বিদেশীর হোটেল থেকে আমাদের ভাত আসে, বিদেশীর কলে আমাদের কাপড় তৈরী হয়, বিদেশীর ভাষা আমাদের মাতৃভাষাকে উচ্ছেদ করতে বসেছে। দুর্বলতা, দুফলা মা আমাদের শৃঙ্খলিতা, অবমানিতা—এমন সোণার দেশের সন্তান হ'য়ে আমরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই না—যে মিশরের সুখ স্বপ্ন হাজার হাজার বৎসর আগে পৃথিবীর বিলাস দ্রব্য ছিল আজ সেই মিশরে বস্ত্রাভাবে লোকে আত্মহত্যা করে, যে মিশরের জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সর্বপ্রথম জগতের অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেছিল—আজ সেই মিশর ভাবদাসত্বে মজ্জমান। এই ভীষণ অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে অনেক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে—তোমরা তা পারবে কি?

শিষ্যগণ। নিশ্চয়ই পারবো। স্বদেশের উদ্ধারকল্পে এ তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নই।

মেহেদি। একটা উত্তেজনার মুখে প্রাণ দেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু আজ আমি যে সাধনার কথা তোমাদিগকে বলছি—তাতে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ ক'রতে হবে এবং লোককে অমৃতের পথে নিতে হবে। হিংসা দ্বেষ-দগ্ধতে পৃথিবী ভ'রে উঠেছে—অশান্তির আগুনে দগ্ধ হ'য়ে মানুষের অন্তরাত্মা ছট্‌ফট্ করছে, তাকে শান্তিবারি সেচনে শীতল করতে হবে। মেরে নয়, মার খেয়ে জগতকে অমৃত এনে দিতে হবে। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে হবে, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে বশীভূত করতে হবে, আত্মিক শক্তি দিয়ে পশুশক্তিকে মঙ্গলময় পথে চালিত করতে হবে। আজ এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মিশরের সাধনার প্রয়োজন হয়েছে।

শিষ্যগণ। সে সাধনা কি ভাবে করতে হবে, উপদেশ দিন। আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় তা সফল করবো।

মেহেদি। প্রথমে তোমাদিগকে রাজভয়, লোকভয়, প্রাণভয় সমস্ত দূর ক'রে দ্বারে দ্বারে মুক্তির বাণী শোনাতে হবে। দেশ থেকে যাতে শস্যাদি চালান না হ'য়ে যায় তাই করতে হবে, ঘরে ঘরে বস্ত্রশিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বিদেশীর ইস্কুল কলেজ আদালত সমস্ত ছাড়তে হবে, নিজেদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে যুগোপযোগী ক'রে নিতে হবে, একরকম ভিতরে বাইরে জাতিটাকে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে হবে। এতে যাদের স্বার্থে আঘাত পড়বে তারা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমাদের উপর অত্যাচার করবে। কিন্তু বীরের মত সব সইতে হবে, দরকার হ'লে হাসতে হাসতে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। যে জাতি মরতে জানে না, জগতে বেঁচে থাকার দাবী তার নেই।

শিষ্যগণ। আজ আমরা সেই ব্রতই গ্রহণ করলাম।

আজাদ। গুরুদেব, আমরা একটা গান লিখেছি—আপনি শুনবেন—এই গানটা গেয়ে গেয়ে সর্বত্র প্রচার-কার্য্যে বেরোবো।

মেহেদি। বেশ তো গাও না—

শিষ্যগণ।

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে এদেশ তোদের নয়।
এই যে বিশাল নীল নদী তোমার ইহা হতো যদি,
পরের পণ্যে পরের সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার নয় তো একটি ছড়া,
তোমার হ'লে পরের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি কেবল চাষের মালিক প্রাণের মালিক নয়।
হাকিম হুকিম তারাই সবে, জজম্যাজিষ্ট্রর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়।
বাবুটি খানসামা আরা, বেহর মহাশয়
তাদের বলে তোমাই কুলি, তারা নিজে টাকা গুলি
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি, সুধায় মৃত্যু হয়।
তাদের যাকে তোদের টাকা, তাদের দেশে তোদের খাকা
তাদের দেশে মিশর জোড়া বিশাল বিজ্ঞানয়।
অপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, নয় অঙ্গ কাপা খোঁড়া
ডিক্রিওয়ালা পাখাকুলি পীলে ফাটার ভয়।

কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়।
লোহার চেয়ে বেশী শক্ত, ভক্ত বীরের মাংস রক্ত
তাদের বুকে অস্থি দিয়ে বজ্র তৈয়ার হয়।
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি
ঈশ্বরের চিপি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়।
যাহার লাঠি তাহার মাটি, চিরদিনের কথা খাঁটি
কুকুর বিড়াল ছাগল ভেড়া কবে দেশের মালিক হয়?"

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—লিবারেল ক্লাব, কাল—বিকাল

(সভাপতি গোলাম যে ও সভ্যগণ, ফরাসী সেনাপতির অভ্যর্থনায় রত আসীন)

বাহিরে স্বেচ্ছাসেবকগণের গান—

"ঘরের বাহির হ'য়ো না আর,
ছেড়ে ফেল হীন ঘোরার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখ চাকুক লজ্জা অন্ধকার!
পরিহাস ভাই পরিহাস সে যে,
পরাজিতে দিতে মনোব্যথা যদি আসী আসে
ভগবান সেজে।
পরিহাস এ যে নির্মম পরিহাস
ওরে কোথা যাস্, বল্ কোথা যাস্ ছি ছি
পরিয়া ভীরুর হীনবাস?
অপমান এত সহিবার আগে
হে ভীরু, হে জড় মরিয়া যাও!
দীপ জ্বালি' কেন আপনারি হীন কালো অন্তর
কালো মুখ যেন হেসে দেখাও!
নির্লজ্জের ফিরিয়া চাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও!
অন্ধকার! অন্ধকার!
নিশ্বাস আজি বন্ধ যা'র
অপমানে নির্মম লাজে,
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে,—
দীপ নেবাও। দীপ নেবাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও।"

গোলাম। আজ ফরাসীরাজ্য প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব—সেনাপতি লিয়ঁ সদলবলে রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে বেরুবেন—আদেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত বাড়ী-ঘর সাজাতে—কিন্তু এরা সব করছে কি?

সভ্য। এ সমস্ত মেহেদির দলের দুষ্টুমি। তার প্রধান চেলা আজাদ সহরে প্রচার ক'রে দিয়েছে, হরতাল করতে। তাই সমস্ত দোকান পাট বন্ধ, ইস্কুল কলেজে ছেলেরা যায় নি, আদালতে উকীল, ব্যারিষ্টার কেউ উপস্থিত হয় নি, রেল, মোটর, ট্রাম, গাড়ী চলছে না—আজ সমস্ত সহর যেন পরিত্যক্ত।

গোলাম। তাই হবে, আস্ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা দলে দলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমার গাড়ী ফেলে রেখেছিল—আমি তো রাজী হ'লাম না—শেষকালে আমার ষোচমান বেটা নেমে গেল—সারাপথটা আমাকে হাঁটিয়েছে। এ অত্যাচার তো আর সওয়া যায় না। আজ সেনাপতির নিকট সব কথা ব'লে প্রতীকার প্রার্থনা করতে হবে।

(সেনাপতির সসৈন্যে আগমন ও গোলাম যের সঙ্গে করমর্দন)

লিয়ঁ। কি সংবাদ গোলাম যে, আজ কাইরোর এমন অবস্থা কেন?

গোলাম। আর মসিয়ঁ, এদেশে বাস করা কঠিন হ'য়ে উঠল—রাজ আজ্ঞা যেখানে প্রতিপালিত হয় না, রাজভক্তের সেখানে লাঞ্ছনার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই—সে দেশ ছেড়ে যাওয়াই ভাল।

লিয়ঁ। কি ব্যাপারখানা বল দেখি?

গোলাম। ঐ যে একটা মেহেদি দল বেঁধে প্রচার করছে মিশরকে স্বাধীন করতে হবে—তারই চেলা গুলো লোককে ভয় দেখিয়ে জোর জুলুম ক'রে এই কাণ্ড করেছে, বেশী কথা কি, আমারেই মেয়ে গাড়ী থেকে নামিয়ে কাণ ধ'রে হাঁটিয়ে এনেছে। এ বৃদ্ধ বয়সে রাজভক্তির এই পুরস্কার আশা করি নাই। (গোলাম যের ক্রন্দন)

লিয়ঁ। আচ্ছা, আজকের এই উৎসব যাক—আগে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করবো, পরে অন্য কাজ।

(লিয়ঁ সভা ত্যাগ করিলেন, গোলাম বেগ শিবিরে ছুটিলেন)

(অন্তরাল হইতে সভ্যগণের সঙ্গীত)

সভ্যগণ। "আজি, এই শুভদিনে শুভক্ষণে উড়ায়ে দিই জয় পতাকায়—

উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তাও হবে বজায়।—
আমাদের ভক্তি যা এ—এ এ যে গো মানের দায়ে।
এখন ও উচিত কার্য্য এদিক ওদিক বুঝে চলাই—
সাধে কি বাবা বলি; গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
আর,এই শুভ রাত্রি,জাল্‌বো বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে,
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।—
আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো পেটের দায়ে,
নিয়ে আয় ঢেরাক বাতি, নিয়ে আয় বিলেতলাই।
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
"জয় জয় ফরাসী ম্যায়," ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই।
পাছারা দিচ্ছে যারে, সেটা যেন ভুলে না যাই;—
আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো প্রাণের দায়ে;
কি আমি লিখন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায়;—
সাধে কি বাবা বলি; গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" বলে চেঁচাই উচ্চরবে;
কারণ সেটায় যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে;—
আমাদের ভক্তি যা এ,—মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে;
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায়;—
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাইরোর বিচারালয়, কাল—মিপ্রহর।

(আসামীর কাঠগড়ায় মেহেদি ও আজাদ, হাতকড়ি বদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান—বিচার গৃহে অনেক লোক উপস্থিত)

দানিয়েল পাশা। আসামী, তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তোমরা আইনত প্রতিষ্ঠিত ফরাসী রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের আয়োজন করেছ—এবং সব স্বেচ্ছাসেবকগণকে বলবদ্ধ ক'রে লোকের উপর জোর জুলুম চালিয়েছ এবং ফরাসী সেনাপতির অভ্যর্থনা দিনে হরতাল ক'রে তাঁকে অপমান করেছ। আর দ্বিতীয় আসামীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আছে।

মেহেদি। দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টাকে যদি যুদ্ধোদ্যম বলা হয়, আমি তা করেছি—তবে জোর জুলুম করার কথা মিথ্যা—আমি যা করেছি তার জন্য যে কোনও শাস্তি নিতে কুণ্ঠিত নই।

আজাদ। আর দেশকে ভালবাসার নাম যদি রাজদ্রোহ হয়, আমি এগুলো যার অপরাধী, তার জন্য যে কোনও শাস্তি নিতে আমি প্রস্তুত।

মিসরী সি-আই-ডি সাক্ষী। মেহেদি অনেকবার যুদ্ধের কথা বলেছেন যদিও তিনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন নি। ওঁর কথায় উত্তেজিত হ'য়ে দেশ লোকের পুলিশের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ প্রাণ হানির জন্য ইনিই দায়ী।

দ্বিতীয় সাক্ষী। আজাদ পাশা সভায় বলেছেন—মিসর দেশ আমার, বিদেশীর এর ওপর কোনও অধিকার নেই।

বিচারক। এই সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে তোমরা উভয়েই অপরাধী—আমি ১নং আসামীর যাবজ্জীবন নির্বাসন এবং ২নং আসামীর ১০ বৎসর নির্বাসন আজ্ঞা দিলাম।

(আসামীদ্বয়কে লইয়া প্রহরীদের প্রস্থান)

অযথা গর্ব্ব

(শ্রীকালিদাস রায়, বি,এ)

রসালের রস
পান করে পিক
গর্ব্ব করেনা—
ফুলেও মধু।

কাদা জল পিয়ে
ডেক ঘটা করে'
ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ রবে
জানায় তনু।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

ইহার পর আর কয়দিন অনুপমার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হইল না। এদিকে তারানাথ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, শত্রুপক্ষ নিতান্ত দুর্জ্জন নহে, অধিকাংশ লোক এমন কি অনেক কর্ম্মচারী তারানাথের কর্তৃত্বে যাহাদের স্বেচ্ছাচারে বাধা পড়িয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত যোগ দিয়া বিপক্ষ পক্ষের চক্রান্তকে এরূপ প্রবল করিয়া তুলিয়াছে যে, এক্ষণে বাধা দিয়া ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন ভিন্ন করা দুরূহ, এমন কি দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিলেই মনে হয়। নিজের অসাবধানতাতেই যে শত্রুপক্ষ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ইহা বুঝিতে তারানাথের বিলম্ব হইল না; সুতরাং নিজের এই ত্রুটীতে তারানাথ লজ্জিত অনুতপ্ত হইয়া পড়িল, এবং কোন উপায়ে এই চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া এই ত্রুটীর সংশোধন করা যায় কি না তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টার সফলতার কোন উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অনুপমাকে পাইবার আশাও বিলুপ্ত হইল। এই কর্ত্তব্য-ত্রুটী জনিত লজ্জারডালি মাথায় লইয়া সে আর কোন্ মুখে অনুপমার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইবে।

তারানাথ স্থির করিল, চাকরীতে ইস্তফা দিয়া এখান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ, তাহা ছাড়া লজ্জার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের আর কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ তারকনাথ ও ভূপতি বাবু কর্ত্তৃপক্ষের লাভে করিলে চাকরী ছাড়িতেই হইবে। সুতরাং দিন থাকিতে চাকরী ছাড়িয়া নিজের মান নিজে বাঁচাইয়া চলাই ভাল। যত শীঘ্র হয় হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া সে এখান ত্যাগ করিবে।

এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তারানাথ তাড়াতাড়ি হিসাবের কাগজপত্র প্রস্তুত করিতেছিল, এমন সময় সহসা অনুপমার চিঠিখানা আসিয়া তাহাকে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিল।

আত্মবিশ্লেষণ প্রণালীর ভূল

রাত্রিতে তারানাথ আলোকের সম্মুখে বসিয়া অনুপমার চিঠিখানা এবারই মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেছিল যে, আর কেহ দেখিলে মনে করিত, সে যেন পত্রের প্রত্যেক অক্ষরটী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে এক একবার চিঠিখানার কিয়দংশ পড়িতেছিল; পড়িয়া, চিঠির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। আবার পড়িতেছিল, আবার ভাবিতেছিল। যত কথা, চিঠিখানা তাহার কাছে যেন একটা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতেছিল; অনেক ভাবিয়াও তারানাথ সে প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারিতেছিল না। অনুপমার মনের গতি কোন্ দিকে? এই ক্ষুদ্র তরীখানি কোন্ সাগরে গিয়া মিলিতে উৎসুক? সে ইঙ্গিত সাগরের উদ্দেশ না পাইয়া পরিশেষে মধ্য পথেই মৃত্যুরূপ মহাসমুদ্রে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহার জীবনে কেন এত নৈরাশ্য, এত বিফল অতৃপ্তি? এই নবীন সরল জীবন—ইহার মধ্যে কে তাহাকে নিষ্ফলতার বহ্নিস্তূপে টানিয়া ফেলিল, যাহাতে দুদ্দমার সংসারোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সে মৃত্যুকেই এমন বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিল।

তবে কি অনুপমা ভূপতিকে চায় না? ভূপতির সহিত ভাবী মিলনের আশঙ্কাতেই সে কি মহাকালের সহিত মহামিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে? নিশ্চয়ই তাই,—এই ভূপতিই তাহার জীবনাকাশে ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়া তাহার সুখ, শান্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। এই হতভাগাই তাহার শান্ত মনোরম জীবনপথে তীক্ষ্ণ কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই কণ্টককে কি উন্মূলিত করা যায় না? অনুপমা ইচ্ছা করিলেই তো মুহূর্ত্ত অঙ্গুলিহেলনে এই কণ্টককে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় জীবনপথকে পরিষ্কৃত করিতে পারিত? তারানাথও তো তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিল। কিন্তু অনুপমা তাহা করিল না কেন? এমন নীরব নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিতে উদ্যত হইল, তথাপি ভূপতিনাথের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিল না কেন? কে জানে তাহার এই নীরবতার মধ্যে কোন্ গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

রহস্য যাহাই থাক্, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কি এমন ভয়ানক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, যাহাতে মৃত্যু তাহার আশ্রয়বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেহ কতকটা শীর্ণ হইয়াছে বটে, তাহা ছাড়া তো ব্যাধির আর কোন লক্ষণই দেখা যায় না। আর রোগ হইলেই যে

বাঁচিবে না এখনই বা কি ক্ষতি? রোগের চিকিৎসা আছে, চিকিৎসক আছে, ঔষধ আছে, প্রতিকারেরও সহস্র উপায় রহিয়াছে। সে সকল উপায় থাকিতে অনুপমা একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল কেন? সে হাল ছাড়িলেও আত্মীয় বন্ধুরা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? আর সকলে চুপ করিয়া থাকিলেও তারানাথ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। অনুপমাকে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুর সহিত যতটুকু সংগ্রাম করিতে হয় তাহা সে করিবে।

কিন্তু তারপর? ধরিলাম, সে সংগ্রামে জয়লাভ হইল। কিন্তু সে জয়ের পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? মোকদ্দমার যখন কোনই তদ্বির হইল না, তখন তারকনাথ ও ভূপতি নিশ্চয়ই অভিযোগকারী বা প্রত্যাক্রমণের বিষয়ের মালিক হইয়া দাঁড়াইবে, এবং অনুপমাকে তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং তখন সন্নিজ্ঞা-সত্ত্বেও অনুপমাকে ভূপতির সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। যে আলেয়ার অনুপমা আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, সে আলেয়াই তখন মূর্তিমান্ সত্যরূপে যাতনার আগুনে তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকিবে, উপস্থিত মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভের ফলে তাহাকে জীবনে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তার সে যন্ত্রণাভোগের জন্য প্রধানতঃ দায়ী হইবে তারানাথ। তখন সেই যাতনানিপীড়িতা অবলার এই একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস কি তারানাথের বুকে অনুতাপের হুতাশন জ্বালাইয়া দিবে না? না না, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অনুপমা মরুক, মরিয়া সে শান্তিলাভ করুক। তারানাথ তাহার সে শান্তির প্রতিবন্ধক হইবে না।

কিন্তু শুধু শুধু একটা হাসিকা বিনা চিকিৎসায়, বিনা ঔষধে এমন করিয়া চোখের উপর মারা যাইবে? মৃত্যুরোগের এমন একটী প্রচুর-সুষমা—সৌরভ বিস্তারে যাহা নিজের আমোদিত করিতে পারে, মৃত্যু আসিয়া সংসারের সেরা সেই ফুলটীকে বিনা আয়াসে তুলিয়া লইয়া যাইবে, আর সংসারের অকর্ম্মণ্য লোকগুলা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া তাহাই দেখিবে, মৃত্যুর এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কাহারও একটী মাত্র অঙ্গুলি উত্তত হইবে না? এত সহায় সম্পদ, এমন লোকবল অর্থবল—এ সকলের কি কোনই মূল্য নাই!

তারানাথ দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর্ত্তব্য কি তাহাই ভাবিতে লাগিল। দেওয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, তারানাথ ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। দুই নৌকায় পা দেওয়া আরোহীর মত তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিটা সংসার-দোলায় দোল খাইতে আসিল।

এমন সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে মেঘ-গম্ভীরকণ্ঠে আহ্বান আসিল, "তারানাথবাবু!"

তারানাথ চমকিতভাবে মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দরজায় উপর ভূপতিকে দেখিতে পাইল। তাহাকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ একখানা চিঠি পেয়েছেন?"

তারানাথ তাহার মুখের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর দিল, "কার চিঠি?"

দুখানাকে বিদ্রূপ করিয়া কর্কশকণ্ঠে ভূপতি বলিল, "কার চিঠি, কখন্ এলো, কে দিয়েছে, এসব ফল-ফলাট এখন রেখে দিন। অনুপমার চিঠি একখানা আজ পেয়েছেন কি না বলুন।"

একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া তারানাথ বলিল, "যদি বলি পাই নাই?"

ক্রোধবিজড়িতকণ্ঠে ভূপতি বলিল, "তা হ'লে বুঝবো যে, আপনি মিথ্যাবাদী। কেন না আমি নিজে লোক দিয়ে আপনার কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

সংশয় তীব্রকণ্ঠে তারানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পাঠিয়েছেন কি? তাহ'লে চিঠিখানা খুলে পড়েছেন নিশ্চয়?"

সগর্ব্বকণ্ঠে ভূপতি উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই পড়েছি, আর সেজন্যে পরের চিঠি খুলে পড়ার জন্য আমি একটুও অনুতপ্ত নাই, বরং আনন্দিত।"

বিদ্রূপের স্বরে তারানাথ বলিল, "তাল কাজে জড়লে আনন্দ হয় বৈ কি।"

ক্রুদ্ধভাবে সহকারে ভূপতি বলিল, "আমার কাজের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য আপনার কাছে আসি নাই তারানাথ বাবু।"

"তবে কি জন্য এসেছেন?"

"চিঠিখানা পেয়ে আপনি কি ক'রবেন স্থির করেছেন, তাই জানতে এসেছি।"

ঔদাস্যসূচক স্বরে তারানাথ বলিল, "আমি আর কি ক'রবো!"

ঘরের ভিতর এক পা আগাইয়া আসিয়া কৃপতি তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কেন, ক'বারার কি কিছুই নাই?"

তারা। কি আছে বলুন।

কৃপ। একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরে যাচ্ছে, অথচ তার সম্বন্ধে কি করা উচিত তাও আপনাকে ব'লে দিতে হবে?

তারা। চিকিৎসা করাতে হয়, আপনারা আত্মীয় স্বজন আছেন, আপনারা করাবেন।

কৃপ। আর আপনি ব'সে ব'সে মাইনে খাবেন?

তারা। কারো রোগের চিকিৎসা করাবার জন্য আমি যাইনা খাই না।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কৃপতি বলিল, "এবার আমাকে হারিয়েছেন আপনি।"

তারানাথ ঈষৎ হাসিল। বলিল, "ও'র অসুখটা কি বলতে পারেন?"

কৃপতি বলিল, "তা জান্‌লে আপনার কাছে ছুটে আস্‌তাম না।"

তারানাথ বলিল, "ভুল করেছেন কৃপতিবাবু, আমার কাছে ছুটে না এসে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলে কাজ হ'তো।"

কৃপতি এবার অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে বলিল, "কথাটা ঠিক, কিন্তু কোন্ ডাক্তারের কাছে গেলে ভাল হয় সেই পরামর্শের জন্যে আপনার কাছে এসি।"

কৃপতির দিকে একটা বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তারানাথ বলিল, "আপনাকে এ পরামর্শ দেবার লোক অনেক আছে কৃপতিবাবু।"

দীর্ঘশ্বাস কৃপতি বলিল, "কিন্তু আপনার মত সুপরামর্শ দেবার লোক আর একজনও নাই তারানাথবাবু। আমার কাছে লুকোচুরী করবেন না, আমি সেদিন, আমি দেখেছি অনুপমার প্রেমের দায়ে একজন ভিখারী, আপনিও ঠিক তাই।"

তারানাথের চোখে মুখে একটা শিহরণের বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া গেল। পাছে তাহা কৃপতির দৃষ্টিগোচর হয় এই আশঙ্কায় তারানাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। কৃপতি তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "এখন কিন্তু সে সব প্রেম প্রণয় ভালবাসার কথা ভুলে যান তারানাথবাবু। এখন আমার মিনতি, আপনি যদি অনুকে একটু ভালবেসে থাকেন, তবে আসুন তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তারানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু বাঁচিয়া কি হবে কৃপতিবাবু? আপনি যখন তার চিঠি খুলে পড়েছেন, যখন তাঁর এই আত্মহত্যার কারণও বোধহয় বুঝেছেন?"

ভাবের আধিক্যভরে কৃপতি বলিল, "বোধহয় কতকটা বুঝেছি। যদি তাই হয়—"

"তাহ'লে কি হবে?"

উত্তেজিতকণ্ঠে কৃপতি বলিল, "তাহ'লে আপনি জানুন,—আপনাকে স্পর্শ ক'রে শপথ করি, তার বাধীর ইচ্ছার উপর আমি একটুও জবর দেখাব না। সে যদি আপনাকে ভালবেসেই সুখী হয়, তবে তাই আমার সুখ। তা'তে বিসুদাদা বাধা বোধ করলে আমি বাসুদেবের ছেলেই নই।"

উত্তেজনায়—উচ্ছ্বাসে কৃপতির কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। সমস্তের মূঢ়তার ললাটের শিরা স্ফীত—মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তারানাথ বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্ষণকালে তাহার সেই প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্বাশুড়ী ও বধূ

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।]

শাশুড়ী কয়, "বৌমা,
তুমি কি এ লেখা!
লেখা পড়া কর তুমি নাকি?
দেখ্‌ছি তুমি ওরে,
যা খুসী তাই লেখে—
রাখ্‌লেনা কিছু বাছা বাকী!

শুনিল তার বৌমা—
মনে মনেই, "ও—মা,
বুঝিবে গো তুমি কিছু তাকি?
রাগে তোমার ছেলে,
পত্তর না পেলে,
তাই তারে চিঠি লিখে থাকি।"

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরে)

নারী শঙ্কিত হৃদয়ে অজিতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিল, মোটর থামার শব্দে সচকিত হইয়া বলিল—বোধ হয় এসেছেন !

অজিত ও বিমানের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল, সোৎসাহে কহিল—মোটরখানা থামল না ?

হাঁ—অজিতবাবু !—বলিয়াই সে উঠিতে যাইতেছিল, অজিত তাহার বাঁ হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি কোথা যাচ্ছ পারুল ?

না, না ! আমি এখানে থাকব কি, অজিতবাবু !—বলিয়া সে পাংশুমুখে শঙ্কাহীন হাতে বাঁ হাতখানি অজিতের বজ্রমুষ্টির মধ্য হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল, পারুল হঠাৎ অন্যহাতে অজিতের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আপনার পায়ে পড়ি অজিতবাবু, আমাকে ছেড়ে দিন ! আপনার বন্ধু...

বন্ধু বলেইত তোমাকে ছাড়ব না, পারুল !

না, না, অজিতবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না ..

খুব পারছি—তুমি বস। শুধু বিমান বা'র কাছে নয়, তোমার পরিচয় আমার মা'র কাছে পর্যন্ত আমি দিতে পারি।—বলিয়া অজিত একবার সস্নেহে, প্রীতিপূর্ণ নয়নে নারীকে দেখিয়া লইতে মুখ ফিরাইতেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঐ কি পাংশু বিবর্ণ মুখ ! এযে মিনতিপূর্ণ কাতর নয়নদ্বয় ! কিন্তু আর ভাবিবার সময় হইল না, তখনই—

কোন্ ঘর রে ? বলিয়া বিমান ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল।

—অজিত বন্ধুবরকে অভ্যর্থনা করিতে শয্যায় উঠিয়া বসিতেই নারী তাহার হস্তমুক্ত হইয়া শয্যার কাপড় চানিয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে চলিয়া গেল।

অজিত ডাকিল—যেও না পারুল—কিন্তু নারী তাহা শুনিতে পায় নাই। সে তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। বহুদূরে নির্জন এক অন্ধকার কক্ষে ঢুকিয়া অশান্ত চিত্তবেগ দমন করিতেছিল। এই সেই অহঙ্কার বৃত্ত পুরুষ যে একদিন নারীর নারীত্ব, তাহার রমণীত্ব সব পদদলিত করিয়া আপনার ভোগে এই ঘর ঘার ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যে অপমানের তীব্র জ্বালা আজও রমণীর মর্মে মর্মে জ্বলিতেছে ; যে লাঞ্ছনার গ্লানি এখনও ভিলে ভিলে নারীকে দগ্ধ করিতেছে—সেই পুরুষ !

যে ঘার ঠেলিয়া অসঙ্কুচিত চরণে নারী ব্যাঘ্র-তরক্ষীর মত পলাইয়া গেল, বিমান বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। কোন্ একটা কথা যেন তাহার বিস্মৃতির দ্বার ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চিত্তমধ্যে উঁকি মারিতেছিল অথচ এতই ক্ষীণ স্মৃতি তাহার আলোকটুকু যে কিছুতেই মনে আসিতেছে না। অনেকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া যখন আর কাহাকেও দেখা গেল না, বিমান অজিতের দিকে ফিরিয়া বলিল—এটা কার বাড়ী রে অজিত ? তোর মামার বাড়ী ত নয় !

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। বস, বিমান দা !

বিমান বসিল না, জিজ্ঞাসিল—কার বাড়ী বল্ ?

বল্‌ছি—তুমি বস-না ! আমার লোক তোমার বাসা খুঁজে পেয়েছিল তা হলে, আমি ভেবেছিলুম, যে গলির মধ্যে বাসাটি করেছ, পেলে হয় !

তা ঠিক পেয়েছে। সন্ধ্যাবেলা, তখনো চা খাই নি, হাজির হ'য়েছে।

বিমান শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিল,তোর কি হ'য়েছে রে ? বড্ড দুর্বল হ'য়ে পড়েছি, দাদা !

বিমান বলিল—কি হ'য়েছিল ?

জ্বর আর কি, ম্যালেরিয়া ! আজ আর জ্বর নেই, দেখ-না—বলিয়া সে বিমানের হাতটি ধরিয়া স্বীয় ললাটোপরি রক্ষা করিল।

আজ ভালোই আছিস্ দে ! তা এ ব্যাধিটি কি শ্রীরামপুর থেকেই আমদানী করা হ'য়েছে ?

যা-বলা—বলিয়া অজিত মৃদু হাস্য করিল। এক মুহূর্ত্ত পরে পুনশ্চ কহিল—তাই বলে ভেবো না যে তোমাদের সহরেও ও-টির বিশেষ অসদ্ভাব আছে !

বিমান বলিল—তোদের শ্রীরামপুরের চাইতে ভাল ত ?

কিসের ভাল, বিমান দা ? আমি ত ডাক্তার—এই সহরেই ত ডাক্তারী করে বেড়াই—ম্যালেরিয়া রোগী কোন পাড়াগাঁর চেয়েই এখানে কম নেই। এমন অনেক রোগী দেখেছি আমি, যারা কস্মিনকালে পাড়াগাঁর চেহারাও

যেখে নি, বিবি ম্যালেরিয়ার পেটে চুকে বসে আছে। তারপর এখানকার ম্যালেরিয়ার এমনি গুণ, দিনকতক ভোগবার পরই—ডাক্তারের মুখে শুনলে—কালাজ্বর! ইন্দিকেল ডিজিজ হাসপাতালে গমন, গোটাকতক খুব বিশ্ব করল এবং অনেক পুণ্যার্জিত স্বর্গলোকে প্রস্থান, অথঃ ভবলীলা সম্বরণ!

বিমান হাসিয়া বলিল—তা যা বলেছিস্।

অজিত বলিল—এ-যে দেখ্‌ছি দাদা! আজ ডাক্তার হয়েছি বলে নয়, পাঁচ বছর ত এই নিয়েই ঘাঁটাঘাটি করেছি, জানতে ত আর বাকী নেই! কিন্তু তোমাকে এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন—বিমান দা?

শুক্‌নো! কি-জানি!

বিমান পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ খানি মুছিয়া ফেলিল। বার বার চক্ষু দুটি রগড়াইয়া মুছিয়া সে যখন রুমাল খুলিল, অজিত সাশ্চর্য্যে দেখিল, চক্ষু দুটি লাল জবাফুলের বর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং যেন সে দু'টির উপরে খানিকটা জল ছল ছল করিতেছে!

বিমান দা! চা খাবে?

বিমান আবার রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, অজিতের ক্ষুদ্র এক প্রশ্নে তাহার দুঃখের সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছিল! সেই নিষ্ঠুর ত্যাগ, অমানুষিক হৃদয়হীনতা সব এক সঙ্গে চিত্তপটে জাগরূক হইয়া বিমানের পুরুষ-হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে এই-টাকেই গোপন করিতে চায়। এত বড় দুর্ব্বিষহ, এতখানি অবিমৃষ্যকারীতা যে সে করিয়াছিল, করিতে পারিয়াছিল, ইহা মনে করিতেও ক্ষোভে ও লজ্জায় চিত্ত আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ করিয়া, বিশ্বসংসারের নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে অপরাধ সে করিয়াছিল, কি ভীষণ আঘাতই না সে তাহাকে দিয়া গেছে! অস্থিতে মজ্জাতে, স্নায়ুতে, স্নেহের স্নায়ু-তন্তুযন্ত্রে পর্য্যন্ত আঘাতের বেদনা মিশিয়া রহিয়াছে। ভাবিতেও ব্যথা বাজে, চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। অথচ এ দোষ আর কার নয়! তারই, একা তারই; একাকে তারই। এ বোঝা তারই উচিৎ ছিল, যে হৃদয় একদিন না একদিন অন্যের দ্বারা অধিকৃত হইয়া, অন্যের আসন হইতে, সে হৃদয়ে আবার আপন করাই তাহার উচিৎ হয় নাই। প্রকৃতি যে তাহাকে ভিন্নরূপে গড়িয়াছেন, সে যে ভিন্ন ধাতুতে প্রস্তুত, তাহার কাছে অন্যরূপ আশা করাই যে দুর্ব্বুদ্ধি! সে-যে অতি বড় অবিবেচনা!

অজিত একদৃষ্টে বন্ধুর পানে চাহিয়াছিল। কি-যে বলিবে, কি করা করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। ভাবিল জিজ্ঞাসা করে, চোখে কোনরূপ পীড়া অন্মিয়াছে কি-না, সে সাহসও হইতেছিল না। কারণ এটুকু কেমন করিয়া তাহার ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে চোখের পীড়া সে নয়। এমন কোন কোমলাতি কোমল স্থানের পীড়া ও, যাহাতে চক্ষুও অতি সহজে আক্রান্ত হইয়া পড়ে! কিন্তু সে-যে কি হইতে পারে, যেচারার তাহা জানেরও অগোচর ছিল!

বিমানের দুঃখের অনেক হেতু বর্ত্তমান ছিল। যৌবনে বিপত্নীক ব্যক্তির দুঃখের অন্তের সীমা-পরিসীমা থাকে না, কিন্তু বিমানকে দেখিলে, তাহার সহিত মিশিলে সত্যই মনে হইত তাহার চেয়ে সুখী জগতে বুঝি আর কেহ নাই! তাহার অলৌকিক তেজস্বিতার স্বভাব, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, অকলঙ্ক চরিত্র, হাস্যদীপ্ত আনন, স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহার মানুষ যাহা কিছু কামনা করে—বিমানের সব ছিল! দুঃখ কোনদিন তাহার দ্বারেরও স্পর্শ করিতে পারে নাই। বজ্রবলে চিরদিনই সে ছিল অপরাজিত! আজ হঠাৎ তাহাকে এমন বিহ্বল দেখিয়া অজিতের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

জানালা দুটো বন্ধ করে যে ও অজিত?—বিমান পূর্ব্ব দিকের উন্মুক্ত জানালার দিকে চাহিয়াই অজিতের উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অজিত সলজ্জে বলিল—ঐ জানালা! বলছি বন্ধ করতে।

আচ্ছা আমিই দিচ্ছি—বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

জানালা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে, অজিত বলিল—চা খাবে বিমান দা?

চা। তা খেতে পারি।

অজিত ডাকিল—পাচন! পাচন!

কোন সাড়া নাই।

অজিত অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—পাচন!

বিমান বলিল—থাক্‌-গে। আর হাঁকাহাঁকি করতে হ'বে না। হ্যাঁ, এটা তোর কার বাড়ী বলি?

পাকল ধার পার্শ্ব হইতে অতি নিম্নকণ্ঠে কহিল—আমাকে ডাকছেন ?

এদিকে এস না পাকল। এখানে তোমার লজ্জা কি ! ও আমার বিমান-দা'। এস।

তবুও রমণী এক পা'ও নড়িতে পারিল না। এমন বিপদে জীবনে সে কোনদিন পড়ে নাই। হৃদয় যাকে সে এমন ভুফানও আস্ফালন করিতে পারে, রমণী তাহা জানিত না। তাহার পা দুইটি তাহাকে ক্রমাগতই ঘরের দিকে টানিতেছিল, আর সে সর্ব দেহের শক্তি একত্রিত করিয়া সবলে পা দু'টাকে দমন করিতেছিল।

অজিত আবার ডাকিল—কৈ এলে না !

আপনি বলুন, আমি ত শুনতে পাচ্ছি।

না, তুমি এসো। নইলে আমি বলব না।

পাকল আর পারিল না। এতক্ষণ যে শক্তিবলে তাহার সমস্ত ইচ্ছাবেগ সে আয়ত্ত করিতেছিল, অজিতের হতাশা পূর্ণ কণ্ঠস্বরে আর তাহার সে শক্তি রহিল না। এক মুহূর্তে পূর্ব আসবাব, লাহনা—সব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল—পাকল ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কি বলছেন ?

অজিত অভিমানভরে বলিল—এদিকে এস, নইলে বলব না।

আপনি বলুন অজিতবাবু !—বলিতকণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া পাকল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অজিত যদি সে সময়ে সেদিকে চাহিত, দেখিত, নারীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

অজিত সে-দিকে না চাহিয়াই বলিল—বিমানদা, এরই বাড়ী ?

বিমানও এতক্ষণ সেদিকে ফিরিয়াও দেখে নাই। অজিতের কথা শেষ হইতেই যার সন্নিধানে দণ্ডায়মানা নারীর দিকে চাহিতেই সুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিবার কালেই যে সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে তাহা বদ্ধমূল হইয়া গেল।

পাকল কাঁদিতেছিল। তাহার ভয় হইতেছিল, আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে হইলে সে পায়ের শক্তি হারাইয়া বসিবে ! কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কি বলছেন—অজিতবাবু ?

অজিত বলিল—একটু চা খাওয়াতে পারো বিমানদা'কে ?

বিমান তাড়াতাড়ি বলিল—থাক্—অজিত ! আর চা'য়ে দরকার নেই।

অজিত বাধা দিয়া বলিল—না, না পাকল, তুমি জান না, বিমান দা' আমায় না না করতে করতেও চার পাঁচ বাটী উদ্যোগ করে থাকেন। তুমি যাও, বেশ করে একটু চা করে···আর কিছু, তোমাকে ত আর বলতে হ'বে না।

অজিত এদিকে ফিরিয়া দেখিল, পাকল তখনও তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বলিল, আমি খাব না, এক কাপ করলেই হ'বে। ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন পাকল ?

উনি কি আমার হাতে চা খাবেন অজিতবাবু ?

কেন খাবেন না পাকল ?

ঠিক সেই সময়েই বিমান দাঁড়াইয়া উঠিল। তীব্র নেত্রে একবার অর্দ্ধাবৃত রমণীর পাংশু মুখের দিকে, একবার অজিতের ব্যগ্রদৃষ্টির দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ইট্ইজ্, এখানে ঘুটেই !

অজিত কাতরকণ্ঠে কহিল—বস বিমান দা'।

বিমান অধিকতর উষ্মার সহিত কহিল—ম্যালেরিয়া হ'য়েছে। মিথ্যাবাদী ! ম্যালেরিয়া।

অজিত বলিল—সত্যি বিমান দা !

বিমান বলিল—ম্যালেরিয়া ত এখানে পড়ে আছিস কেন, বাড়ীঘর ছেড়ে ? কি মুখ নিচু করছিস যে ! বুঝেছি—সেই রোগ, যে রোগে বাড়ীতে আপনার লোককে মুখ দেখানো চলে না।

অজিত ক্রুদ্ধস্বর বিমানের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—না বিমান দা', তোমার পায়ে পড়ি, না।

তবে এখানে কেন ? চ—বাড়ী চ—এই মুহূর্তে। চুপ করে কেন ? ওঠ্—ডাক্ চাকর-বাকর কে আছে, ডাক্—একখানা গাড়ী আন্তে বল্ !

অজিত তথাপি নীরব।

বিমান অগ্নি দৃষ্টিতে আর একবার নতাননা যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—বুঝেছি। থাক্ !

ও বড় ঘর জানে, বিমান দা। আমার আপনার লোকেও ওর মতন সেবা করতে পারবে না।

বিমান ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বলিল—তা ত পারবেই না।—বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল, রমণী অজিতের সন্নিধান-সন্নিধানে আসিয়া বলিল—ওঁকে দাঁড়াতে বলুন, অজিতবাবু, আমি গাড়ী আনিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমি ত যেতে পারব না পারুল। আমি যে তোমার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হ'য়ে আছি···

না, না, কিছু বদ্ধ ন'ন-অজিতবাবু! ও-কি! উনি যে চলে গেলেন, দাঁড়াতে বলুন! দাঁড়াতে বলুন!···

অজিত উত্তেজনায় বসে উঠিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল বোধে সে শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—যান—আমি যাব না।

যাবেন না?—সে একমুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া অজিতের পানে চাহিয়া যে-পথে বিমান কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল, সেই পথে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

(আমেরিকায় ভারত-স্বাধীনতা-বন্ধু সভার পরিচালক)

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শৈলেন খুলনা জেলায় মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নিজ বাড়ী যশোরের অন্তর্গত নড়াইলে। শৈলেনের মা খুব বুদ্ধিমতী ও লেখাপড়া জানা মানুষ ছিলেন—কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। পিতা যদুনাথের বয়স এখন ৬৭ বছর—তিনি আপাততঃ কৃষ্ণনগরে থাকেন।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

স্কুলে হাজারের সময় শৈলেন কটকে পড়তেন। সংস্কৃত পাশ না হওয়ায় তিনি প্রথমবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারেন নি। এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাঁর ৫০ টাকা জরিমানা হয়। পরবৎসর শৈলেন ১৫৲ টাকা বৃত্তি পেয়ে অষ্ট এক স্কুল থেকে পাশ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর সম্মানের সহিত শৈলেন বি, এস, সি; পাশ করেন। দু'বছর পরে এম, এস, সি, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'ন এবং "রিসার্চ স্কলারে" অনেক নম্বর পান। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে তাঁকে ৩ বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য মাসিক ২৫০৲ টাকা বৃত্তি দিয়ে আমেরিকায় বিজ্ঞান চর্চা করতে পাঠানোর বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু জাহাজে তাঁহার কয়েকদিন পূর্বে পুলিশ এসে পাসপোর্ট কেড়ে নেয়। পরে সোনা গিয়েছিল শৈলেনের অপরাধ সে নাকি এক রাত্রের জন্য কয়েকগুলি স্বদেশী ডাকাতকে আশ্রয় দিয়েছিল। শৈলেনের নামে বাড়ীতে অন্তরীণ থাকার এক পরোয়ানা বা'র হয়। শৈলেনও গতিক সুবে গা ঢাকা দেন। বাস ছুরেক লুকিয়ে থেকে টাকা যোগাড় ক'রে নাবিকের ছদ্মবেশে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের—মে মাসে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আমেরিকা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হ'ন। বিচারে মুক্তি পেয়ে শৈলেন ভারত স্বাধীনতা বন্ধু সভা গঠন করেন। এই সভায় অনেক প্রভাব-শালী আমেরিকান যোগ দিয়েছেন এবং এর কার্যক্ষেত্র ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে—এ পর্যন্ত আমেরিকার ৫টি প্রধান সহরে শাখা স্থাপন করা হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যে সকল রাজনৈতিক "অপরাধী" আমেরিকায় তাঁদের আশ্রয় দেওয়া ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকানদের সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার সাহায্যে আমেরিকায় গান্ধী পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভারতের জাতীয়তা যজ্ঞে সেবকগণের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অর্থ সাহায্যেরও চেষ্টা চলছে।

শৈলেনের বিষয় বিস্তারিত জানতে নিম্নলিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য :—

"The Revolutionaries of Bengal"—by SJ. Hemanta K. Sarkar, Published by the Indian Book Club, College St. Market, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৮ই পৌষ শনিবার ১৩২৯, ইং ২৩শে ডিসেম্বর। [২২শ সংখ্যা

পাহাড়ী মেয়ে।

Plate I

শিরোমণি পীঠ

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

রাজসভা বসিয়াছে।

মোটা-মোটা থামের পাশে মোটা-মাহিনার মন্ত্রীবর্গ বসিয়া। সিংহাসনে রাজার মৃতদেহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। রাজদেহের উপর একখানি প্রকাণ্ড পায়জামার শাল বিস্তৃত। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, তাই এই সাবধানতা।

জনৈক মন্ত্রী, ইনি স্বাস্থ্য বিভাগের ভার-প্রাপ্ত, এক বোতল ডিংগুণ লইয়া অধিষ্ঠিত, পূর্ববিভাগের মন্ত্রীবরের দুই পদ-নিম্নে এক ব্যারেল পোর্টলণ্ড সিমেন্ট, রাজস্ব-মন্ত্রীমহাশয় একখানি খাতা বগলে লইয়া উপবিষ্ট—এখনি রাজকার্য্য আরম্ভ হইবে। রাজ্যের ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্টগণ ধরণা দিয়া পড়িবে, মন্ত্রীমহাশয় 'ডিংগুণ' দেখাইয়া দিবেন, স্নান মঞ্জুর করাইতে গৃহস্থগণ আসিবে, মন্ত্রীমহাশয় স্নান মঞ্জুর করিয়া সিমেন্টের ব্যারেল দেখাইয়া দিবেন; প্রজারা অবশ্যই বুঝিবে, পোর্টলণ্ডের প্রতি মন্ত্রীবরের অসীম অনুকম্পা। সহর-কোতোয়াল বাকী খাজনার আসামীগণকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া হাজির করিবে; মন্ত্রীমহাশয় বাকী খাজনার পরিমাণ বলিয়া দিবেন। সভা আরম্ভ হয়-হয়; হঠাৎ বাহিরে বিষম গণ্ডগোল উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই একব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া করযোড়ে কহিল—মহারাজ। সর্বনাশ হইয়াছে, রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থ সকলের বদনমণ্ডলি বিবর্ণ হইয়া গেল; স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তচ্যুত হইয়া 'ডিংগুণ' পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল; সিমেন্টের ব্যারেলের উপর পা ফসকাইয়া পূর্ত্ত-মন্ত্রী তিন হাত গড়াইয়া গেলেন; আর রাজস্ব সচিবের খাতাখানি আগন্তুকের পায়ের উপর পড়িয়া একখানি পা চিরতরে ভাঙিয়া দিল। আগন্তুক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। শাসন ও শান্তি-মন্ত্রী চক্ষু পাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার ভয় ভয় নাই, গাঁট্টা-গোট্টা অষ্টাবক্র লোক, আগন্তুককে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া এক ধমক দিলেন, আর বলিলেন—কোথায় বিদ্রোহ হইয়াছে? কাহারা বিদ্রোহ করিল?

ছেলের দল, মন্ত্রীমহাশয়, শিরোমণির সব পড়িয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা—বলিতেছে এ পৃথিবীতে রাজা নাই, মন্ত্রী নাই, উচ্চ নাই, নীচ নাই—আছে শুধু বিদ্যা। যাহারা বিদ্যালাভ করিয়াছে তাহারাই মানুষ, আর সব পশু।

বটে? আর কি বলে?

বলে—রাজা, কিসের রাজা? রাজা ত শুধু এইটুকু মাটীর পরে, আর বিদ্যান, যত—জল, যত স্থল—সর্ব্বত্র পূজিত।

শাসন-মন্ত্রী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিলেন, ভাবিয়াছিলেন, এখনি বুঝি ফৌজ-টৌজ লইয়া ছুটিতে হয়। আজ শরীরটা ভাল নাই, কাল রাত্রে গুরুভোজনে ও অনিদ্রা ঘটিয়াছিল। বলিলেন—গোলমাল করে নাই ত?

আজ্ঞে, এখনও করে নাই বটে, তবে যে রকম দেখিলাম, করিতেও অধিক বিলম্ব নাই। কপালে সব শিরোমণি ছাপ, হাতে তাতা···

শাসন-মন্ত্রীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল—তাতা? সে কিরূপ পদার্থ? রোমান্‌জাতীয়?

না মহাশয়; বঙ্গজাতীয়! যাহাকে লোকে বঙ্গদণ্ড বলে। সেই তাতা···

মন্ত্রীমহাশয় সংশোধন করিয়া দিলেন—বওয়ল।

লোক যত বুঝাইতেছে আর বলিতেছে···

বিদ্বত্ব চ নৃপত্ব চ নৈবতুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

বিদ্যান্ রাজা কেহই নাই; বিদ্যান্ নিকটে রাজা তুচ্ছ, রাজার তুচ্ছ অন্য তুচ্ছ।—মন্ত্রী মহাশয়, দেশের চাষীভূষা লোক ও তাই শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছে। বিদ্রোহ হইতে আর দেরী নাই।

সকলের দৃষ্টি সিংহাসনের উপর গিয়া পড়িল; শালের আটন ছিন্ন পথে রাজার মৃতদেহের তর্জ্জনী দেখা দিল। অর্থ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তব্য।

শাসন মন্ত্রীর গেটব্যথা করিতেছিল, ছুটিতে অনিচ্ছা, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—মহারাজ, অনুমতি লইয়াই বলিতেছি, মাপ করিবেন। গোলা-গুলি চালাইয়া এখনই জীবহত্যা করা উচিত হইবে না, দেখেছ···হঠাৎ বুঝা হইল, মহারাজের তর্জ্জনী শাসমধ্যে আস্ফালন করিয়াছে,

শাসন মন্ত্রী ঘড়ী ধরিয়া এক মিনিট পরে বলিলেন—মহৎ বলি মহারাজ, শিরোমণিকে বন্ধনদশায় আনা হৌক, সে পাষণ্ড আসিয়া কৈফিয়ৎ দিক্।

শালের কুটীর ছিদ্র দিয়া রাজার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি প্রকাশ পাইল। সহর কোতোয়াল মাল-কৌচা বাঁধিয়া ছুটিলেন। শাসন মন্ত্রী উঠিয়া গেলেন, দশমিনিট মধ্যেই হাতে মুদ্রিতে মুদ্রিতে আপন আসনে আসিয়া বসিলেন।

২

শিরোমণি হাসিল, বিশাল বুক, চন্দনচর্চিত; শুভ্র যজ্ঞোপবীত ঝোলায়মান। বৃহৎ ভুঁড়ির উপরে করগাছি শুভ্র রোম, মধ্যে দূর্বা-গুচ্ছ।

বলিল—আমিই শিখাইয়াছি

রাজার আদর শুধু দেশে, পণ্ডিত সর্বত্র পূজ্য।

এবার শিক্ষা-মন্ত্রীর পালা। বলিলেন—বেশ ত বাপু, রাজার যখন এদেশে আদর তখন পণ্ডিতের এদেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই, অন্যত্র গমন করুন।

শিরোমণি বলিল—পণ্ডিত অন্যত্র যাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে দেশ হইতে কেহ তাড়াইতে পারে না যেহেতু বিদ্যাপীঠ চিরদিন স্বাধীন।

শিক্ষা-মন্ত্রী প্রশ্ন করিলেন—কি হিসাবে স্বাধীন বাপু?

শিরোমণি বলিলেন—বিদ্যাকে কেহ শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই এই হিসাবে, বৎস।

পণ্ডিত যদি পয়সালুব্ধ হয়, তবু সে স্বাধীন কি?

পণ্ডিত বিদ্যা দান করেন, অন্নে তাঁহার অধিকার আছে।

কাহাকে বিদ্যা দান করেন তিনি?

মূর্খকে, অজ্ঞানকে?

শিক্ষা-মন্ত্রী কক্ষমুখে জিজ্ঞাসিলেন—রাজাকে দান করেন কি?

শিরোমণি হাসিল, বলিল—রাজা মূর্খ হইলে করেন বৈ-কি।

আপাততঃ রাজা মূর্খ কি? পণ্ডিত তাহাকে বিদ্যা দান করেন কি?

শিরোমণি বলিল—রাজা রাজকার্য্যে ব্যস্ত, বিদ্যা-শিক্ষার অবসর পান না।

কাজেই রাজা তোমাকে মুক্তিও দান করিতে পারেন না।—মন্ত্রীর আদেশ শুনিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাঁহার হাতে জিঞ্জিরের যোড়লাংশ তখনও বিরাজ করিতেছিল, তিনি হইতে আরম্ভ করিয়া টিকটিকিটা পর্য্যন্ত টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল। শিরোমণি নির্বাক!

মন্ত্রী পুনশ্চ কহিলেন—এক পয়সা বৃত্তি পাইবে না, দেখা যাক্ সর্বত্র যাইয়া পণ্ডিত কেমন বাঁচেন?

শিরোমণির প্রবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বেগে উদরটা একবার ঢুকিতেছিল, একবার বাহিরে আসিতেছিল, মন্ত্রী উপবিষ্ট হইলে বলিল—তথাস্তু। শুধু রাজার কৃপাদত্ত অর্থে বিদ্যাপীঠ চলে না, দেশবাসীর অর্থ বিদ্যামন্দিরকে রক্ষা করিবে। তোমার ষড়যন্ত্র বিফল হইবে, বৎস, তখন তুমিই মনস্তাপ পাইবে।

আমি মনস্তাপ পাইলে, তুমি যেখানেই থাক, সান্ত্বনা দিতে ডাকিয়া আনিব, উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়া 'বিদায়' করিব। আপাততঃ আনিয়া যাও, সাধারণের অর্থ হইতেও তোমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে যেহেতু তুমি রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়া পর্বসাধারণের ন্যায় ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টা করিতেছ, সাধারণেও সিকি পয়সা দিবে না।

শিরোমণি হাস্যমুখ, বলিল—সিকি পয়সায় অনেক রেশী দিবে। তাহারা বিদ্যালাভ করিতে আসে। বিদ্যা-লাভ করিতে না পারিলে তাহাদের জীবিকানির্বাহের পথ সুগম হয় না।

মন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন—দিগ্বিদিকে আমরা প্রচার করিয়া দিব, মূর্খ নিরক্ষরই রাজকার্য্যে—বিদ্যাগীর কর্ম-সমূহে প্রবেশলাভ করিবে, শিরোমণির ছাপ-প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোন কর্মাধিকার পাইবে না।

শিরোমণি বলিল—তাহাতে তোমাদেরই রাজকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইবে।

রাজকার্য্য চলে চলুক, মুণ্ডী মিছরির এক অবস্থা।

তবে তাহাই চলুক—আমার কোন ক্ষতি হইবে না।

তবু তুমি তোমার বাক্য প্রত্যাহার করিবে না?

কোন্ বাক্য প্রত্যাহার করিব বৎস? জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিব? জ্ঞান দিয়া কি আমি তাহা করিতে পারি?

তবে—বর।

৩

শিরোমণির ভুল ভাঙ্গিল। কিন্তু এমন সময়ে ভাঙ্গিল যে তখন গোহালে গাভীগণ মৃত, উঠানে শাক-সব্জী তৃণাবৃত। বিদ্যাপীঠ ছাত্র-সম্পর্কশূন্য, তণ্ডুলাধারে বালু-কণা সম্বল। তখন শিরোমণি বুঝিলেন, 'সাধারণ' যেদিন শুনিয়াছে, রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিতে অন্নগত বিদ্যাই যথেষ্ট, অন্ত বিদ্যার প্রয়োজনাভাব সেইদিনই শিরোমণির পশ্চাতে দুইটি বৃত্তাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিল। ছেলেরা বাপ-মা'কে বহু বহু আশীর্বচন কহিয়া ছিপ ছকে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিয়া গেল।

শিরোমণির বিদ্যাপীঠ খালি। সেই শিরোমণি লোক-টার কথাও আর বড় কাহারো মনে রহিল না। তবে 'বদিস্মাৎ' কেহ কোনদিন শিরোমণি পীঠের বেড়ার ধারের পথ দিয়া চলিত, সেই লোকটারই যা দু'একবার মনে পড়িয়া যাইত, তা'ও শিরোমণির শুষ্কঠোচ্চারিত আর্ত্ত-ধ্বনির সঙ্গে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং জীবা! বিহার কাকনম্।
কাচবাদায় মুঞ্চান্তি শঙ্কে জেনিব্যতে পরম্।

ওরে অজ্ঞানান্ধকারে জীবগণ! তোমরা কাঞ্চনকে ফেলিয়া কাচের জন্তে কেন্দে মরো, তোমরা যে বড় কষ্ট পাবি, তাই আমার ভয় হয়।

শুনিতে শুনিতে লোকেরও বুঝি আবার চৈতন্যোদয় হইতেছিল। বুঝি বা তাহারা ভাবিতেছিল, তাই ত লোকটা এত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, তবুও আপনার চিন্তা না করিয়া আমাদেরই মঙ্গল চিন্তায়, তবে কি ঐ ঠিক, আমাদেরই ভুল!

এই লোকগুলাই আবার শীঘ্রই বিপনন্থীদের মুখে প্রভুর আহ্বান শুনিয়াছিল, তোমরা আমাকে হত্যা করি-তেছ বলিয়া আমার দুঃখ নহে, দুঃখ এই বলিয়া যে তোমরা এই মহাপাপ হইতে কিরূপে ত্রাণ লাভ করিবে।

জিনিষটা ভোরাক্ত! দেখিতে দেখিতে রাজ্যের অর্দ্ধেক লোকের হৃদয় কল্পনায় কচ্ কচ্ করিয়া উঠিল। বলিল—শিরোমণি-পীঠ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একটা উপায় চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রনে হইল।

শিক্ষামন্ত্রী রাজদরবারে বলিয়াই শুনিলেন। ফেডি এ্যাজিটেশন ও সাউণ্ড আর্গুমেণ্ট করিতেই রাজার বদন অঙ্গুলি পালের ফাঁকে বাহির হইল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও প্রাণদণ্ড!

শিক্ষামন্ত্রী শাসনমন্ত্রীকে সঙ্গে লইলেন। শাসনমন্ত্রীর পেটের গোলমাল আর ছিল না, তিনি বাছা বাছা হিন্দু ফৌজ সঙ্গে লইলেন; আর লইলেন ঘটিতে করিয়া খানিক গঙ্গাজল!

তালপাতার পুঁথী খুলিয়া শিরোমণি শূন্য বিদ্যামন্দিরে বিদ্যা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। দুইটা শব্দ বাহির হইতেছে, দুইটা বা পথেই চাপা পড়িয়া যাইতেছে, চক্ষু দৃষ্টিহীন, জিহ্বা আড়ষ্টপ্রায়। ফৌজের পায়ের ঘটাঘট শব্দে চক্ষু চাহিতেই যাহার জোড়া কটমটে চক্ষু দেখিতে পাইলেন। অধরে হাস্য দেখা দিল, বলিলেন—

অধিকর্ত্তুমিয়ান্ প্রাণান্ ধনগর্ব্বিত মানব।
যাতয়ামোদ্বিগন্নতো মুধা প্রয়াস এষ তে।

হে ধনগর্ব্বিত মানব। তুমি আমার প্রাণ লইবে? ঐ তরবারীর জোরে যে মুহূর্ত্তে এই দেহ বিশ্বশক্তিতে রুধিরের বিদ্যুৎসঞ্চিত প্রাণ আমার অন্তর্দ্ধান করিবে, তুমি তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

মন্ত্রী মহাশয়ের অবশেষ দয়া—রাজাদেশ না করিয়াই ফৌজ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ফুলফুল ও অলকা

[শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী]

ফুলফুল কহিল "ওরে—
কি কর-কমল তোরে,
নিয়ে যাস্ চুরী ক'রে—আমার সুবাস।
তাই আমি মাথা খুঁড়ি,
মরমে গুমরি উঠি,
শুকায়ে ধরায় লুটি, নিরাশ! হতাশ!"

মলয় কহিল, "ফুল,
এটা যে তোমার ভুল,
গুণে তব সমতুল—কে আছে সে আর;
তাই আমি তব বাস—
ছড়াইয়া যায় পাশ,
বাঁধি তব গুণ পাশ—পরাণ সবার।"

দেশ বিদেশ

দেশবন্ধুর কার্য্যপ্রণালী

("বাঙ্গালার কথা" হইতে উদ্ধৃত)

গঠনের দিক—

(১) স্বরাজদলের পরিচালিত স্কুল ও কলেজ বর্জ্জন। (২) আইন আদালত বর্জ্জন। (৩) কাউন্সিল বর্জ্জন। (৪) মাসকয়েকের জন্যে চরকায় পিকেটিং চালান। (৫) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, বিশেষতঃ ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জন এবং প্রয়োজন হইলে এই উদ্দেশ্যে পিকেটিং চালান।

—০—

গঠনের দিক

(১) জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। (২) জাতীয় সালিশী আদালত স্থাপন। (৩) কংগ্রেস কমিটিগুলির ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া কংগ্রেসকে জাতীয় মহাসমিতিরূপে গড়িয়া তোলা। (৪) দেশের সৈন্যিক উন্নতি বিধান এবং সামরিক বিদ্যায়ী সমিতির বিস্তৃতি সাধন। (৫) খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহারের উন্নতি সাধন।

—০—

সমগ্র জাতির শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য

১। জাতিক সংঘ গঠন। ২। মুসলমান সমিতি গঠন। ৩। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির সহিত মৈত্রী স্থাপন। (Asiatic Federation) ৪। সকল স্বাধীন দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের নিমিত্ত যে সকল দেশে কংগ্রেসের শাখা সংস্থাপন। দেশ সংঘর্ষ (The Final blow)

—০—

পূর্ণ স্বরাজের গ্রহণ—

(ক) সমস্ত বেসরকারী সম্পূর্ণ ও বস্তুতঃ স্বাধীন হওয়া। (খ) দেশের সকল স্থানে সকলের এক সঙ্গে (বিশেষতঃ পুলিস ও সৈন্যিক বিভাগের) সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ। (গ) রাজস্ব বন্ধ করা।

—০—

গ্রহণ—

(ক) স্বরাজের মোটামুটি খসড়া (Constution) স্থির করা চাই। (খ) স্বরাজ হাসিলে প্রত্যেক লোকের ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্থান কি হইবে তাহা স্থির করা চাই।

—০—

দেশবন্ধু ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেদিন হইতেই কংগ্রেস সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। কলিকাতার বৈঠক ঐদিনই বিসবে বসিবে। পরের দিন দিন সাবজেক্ট কমিটীর অধিবেশন হইবে। ইহাতে কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমভাবে আলোচনা চলিবে। কংগ্রেসওয়ালাদের ভিতর যতই মত বিরোধ উপস্থিত হউক না কেন এক বিষয়ে সকলেই এক মত যে আদালতগুলিকে অচল পুরাতনে দাঁড়াইয়া তুলিতে হইবে।

২৩শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হইবে। সেই দিনই সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন। ৩০শে ডিসেম্বর বিকাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতে থাকিবে।

এই কংগ্রেস সপ্তাহেই বিলাতের মুক্তা সোসাইটির লিবারাল সভা ও অন্যান্য অনেক সভার অধিবেশন হইবে।

—০—

এসোসিয়েটেড প্রেস খবর দিতেছেন যে, "ট্রাইবিউন" পত্রে নিম্নলিখিত খবরটী বাহির হইয়াছে—লাল লাজপৎ-রায়ের স্বরাজদল সভায় প্রবেশের মত আছে।

—

মুরবার হইতে কলিকাতায় ইয়ার-বিভাগে অর্থাৎ জাহাজের, টংপুর ও খেলনাবিহার ট্রাইবাহক জাহাজের একজন সহকর্মীকে কোম্পানী পদচ্যুত করিয়াছে বলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। জাহাজের মাঝী, ঐ পদচ্যুত ব্যক্তিকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত হউক, কোম্পানী যতদিন জাহাজের অনুরোধে কর্ণপাত না করিবেন, ততদিন মাঝি ইয়ারা ধর্ম্মঘট চালাইবে। আমাদের প্রতিনিধি ট্রাম ডিপোমের বিষয় অনুসন্ধানে জানিলেন, ট্রাইবাহকের ইউনিয়নের সহিত পরামর্শ না করিয়াই ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বৃহস্পতিবারে সকল লাইনের গাড়ী বন্ধ হয়।

—

গত ৯ই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে বাঙ্গালায় মোট ৯টী ডাকাতি হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে বাঙ্গালায় মোট ১৩টী ডাকাতি হইয়াছিল। উহার পূর্ব্ব মাসে ৭টী এবং গত বৎসর নবেম্বর মাসে ৭১টী ডাকাতি হয়।

—

কলিকাতার জলাধিক্যের একমাত্র উপায় বিদ্যাধরী নদীর সংস্কার করা। তাহা লইয়া অনেক দিন হইতে আন্দোলনের চলিতেছে। এখন বিদ্যাধরী নদী এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে এই বৎসরের মধ্যেই উহার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ না করিলে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে। এ বিষয় আমরা বহুবারই আলোচনা করিয়াছি। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা ও গবর্ণমেণ্ট কি স্থির করিলেন জানিবার জন্য কলিকাতাবাসী উৎসুক হইয়া আছে। আশা করি, শীঘ্রই এই বিষয়ে উক্ত কর্ত্তারাই অভিমত প্রকাশিত হইবে।

—০—

ডিমকড়ি ঘোষ ও তাহার বন্ধু বিপ্লবীর দেখিয়া সেই যে এডিসিটি বিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। এখন সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাহারা আক্রমণ করিয়া তাহাদের আলো, পাখা, ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে।

—

মিঃ রাইট একজন আমেরিকান খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তিনি গত ২৫শে ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর হইতে যাত্রা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডনে যাওয়া। গত ৭ই জিসেম্বর প্রাতঃকালে তিনি মর্ত্তমানের অন্তর্গত সিঙ্গাপুর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার অসুখ বোধ হয়। সিঙ্গাপুর বন্দরের কয়েকজন ডাক্তারকে ডেকে করিয়া তাঁহাকে মর্ত্তমানের রোগীর হাসপাতালে লইয়া আসেন। হাসপাতালের গত ৫টা সপ্তাহ ঐ দিন রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—০—

আসাম বৈঠকে গার্হস্থ্যসেলিস এবং স্বরাজদল প্রণালী সম্বন্ধে যোগ-দেখিয়ারা যে নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে বাইশটী সর্ত্ত আছে। এই সব সর্ত্তে আছে যে, যে গার্হস্থ্যসেলিস এবং স্বরাজদল প্রণালীতে কোন বৈধানিক ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবে না, তবে বিশেষ কোন ছোট খুচ আদালতগুলি প্রণালীতে গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ অধিকার দান করিবার ক্ষমতা মুসলমান হাতে থাকিবে। তবে আদালতগুলি ঐ সব ছোট আদালতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, সেগুলি প্রণালীতে গ্রহণ করিতে পারিবে না। মুসলমান অধিকার যাহাতে বজায় থাকিতে পারে, এজন্য তুর্কীয়া সর্ব্বাধিকার সামরিক এবং নৌসম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে, এজন্য তাহারা প্রণালীতে যাইতে পারিবে।

আলোচনা

আমরা পরের দোষের সমালোচনা করিতে যেমন ব্যস্ত ও পটু আত্মদোষ অপসারণের জন্য আদৌ তেমন ব্যস্ত নহি। আমরা আজ সর্ববিষয়ে আত্মকর্মতা প্রতিষ্ঠা হইতে চাহিতেছি। আত্মকর্মতা ও আত্মসম্মানবোধ আমাদের অন্তরে ও জাগিলে স্বরাজ যে আপনা হইতেই আমাদের করায়ত্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ জাতীয় জীবন সমস্যায় সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যে কি ভাবে কি উপায়ে আমরা এই আত্মকর্মতা ও আত্মসম্মানবোধকে জাগাইয়া লইতে পারিব।

• • • •

সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালী আজি যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার উৎসাহ ও একত্ববোধ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দশজনে মিলিয়া মিশিয়া একটা কার্য্য করিলে তাহাতে আমাদেরই দশজনের অশেষ সুবিধা হইবে তাহা জানিয়াও আমরা সেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হই না। এ উহার স্কন্ধে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া আপনাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখাকেই বাহাদুরী বলিয়া জ্ঞান করে। এই চালাকী বুদ্ধি ও বাহাদুরী জ্ঞান হইতেই সংঘবদ্ধ কার্য্যপ্রণালীর উপকারিতা আমরা লাভ করিতে পারি না।

• • •

গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশের কার্য্য আরম্ভ করিতে চাহি। অধুনা অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিরই মত পল্লীর প্রাণ পুনরায় সঞ্জীবিত করিতে হইবে। পল্লী হইতেই দেশের কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা কথাটি যতই কবিত্বপূর্ণ ও মাধুর্য্যময় হউক না কেন কথাটিকে বাস্তবে পরিণত করা অত্যন্ত সুকঠিন। পল্লী-গঠনকার্য্যে যাঁহারাই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছেন।

• • • •

সহরবাস হইতে পল্লীবাস যেন আরও কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ পল্লীর শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা, তাঁহারা অধিকাংশই এখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়া পড়িতেছেন। পল্লীতে যাহারা থাকেন হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া তাঁহারা এমনভাবে বিজড়িত যে দেশহিতকর বা পল্লীহিতকর কোন কার্য্য করিবার উৎসাহ বা শক্তি তাহাদের আর নাই। নীচতা বা হীনতাতেই তাহারা তৃপ্ত, কোনরূপ উচ্চ প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ভিতর হইতে ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে।

• • • •

ম্যালেরিয়া, মহামারী, অনশন, অর্দ্ধশন এগুলি যেন পল্লীবাসীর অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরে আমরা ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠি কিন্তু বাংলার পল্লীগুলি ঘুরিলে তথায় কত লোকে যে দিনান্তে দু' মুঠো অন্নের অভাবে শুকাইয়া মরিতেছে তাহা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাংলার সোণার পল্লীগুলির লোকেরাও যেন কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়া নির্জ্জীব নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্ম করিবার শক্তি ও ক্ষমতা দিনের দিন তাহাদের লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

• • • •

অনেক পল্লীই এখন পরিত্যক্ত শ্মশানের মত পড়িয়া রহিয়াছে। বড় বড় বাড়ীগুলির গৃহগুলি ভূমিসাৎ প্রায়—চারিদিকে জঙ্গল খানা ডোবায় ছেয়া। গ্রামগুলির উপর দিনে শৃগালের রাজত্ব চলিতেছে—তাহারা নির্ভয়ে যথেচ্ছ বিহার বিচরণ করিতেছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোক যাহারা তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া দূর সহরের বাসীন্দা হইয়া গিয়াছে। দুখে দুঃখে তথায় বাস করিতেছেন—তাহাদের গৃহগুলিরই ঐ ভগ্ন দশা।

• • • •

গ্রামে গ্রামে জলাভাব। পুষ্করিণী অনেক গ্রামে নাই, অনেক গ্রামে আছেও। যে গ্রামে পুকুর আছে তাহাও সংস্কারাভাবে অর্দ্ধশুষ্ক, শৈবাল আবর্জ্জনায় ছেয়া। পল্লীর লোক সকলেই সেই ময়লা অপরিষ্কার জল পান করিয়া ব্যাধি পীড়া সঞ্চয় করিতেছে—ম্যালেরিয়া ও পেটরোগা রোগী লইয়া ঘরে বসিয়া ধুঁকিতেছে। সমবেত চেষ্টায় ঐ পুকুর গুলির সংস্কার হইতে পারে, গ্রামবাসীদিগের জলাভাব দূর হইতে পারে, কিন্তু সে সমবেত চেষ্টার শক্তি বা উদ্যম গ্রামবাসীর নাই। কে কষ্ট করিয়া যাহার পানের জলের জন্য পুকুরের সংস্কার সাধন করিবে। কাহার অত মাথা ব্যথা! মাথা ব্যথা বেথায় কাহারও নাই—সেথায় একে একে সকলকেই ভুগিতে হইতেছে—ভুগিয়া ভুগিয়া সকলেই জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছে।

• • • •

যেখা বসিত পল্লী সংস্কারক দু'একজন কোন গ্রামে গিয়া পড়িলেও স্থানীয় লোকের উৎসাহের অভাবে তাহাদের কর্মশক্তি দু'দিনেই নিভিয়া যায়। তাঁহারাও ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ানোর দায় হইতে দূরে সরিয়া পড়েন।

• • • •

এক কোন প্রচুর অর্থশালী লোকে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পল্লী সংস্কারে নামেন্ তবে চলিতে পারে। গ্রামের লোকে তাঁহার দান ছাইচিত্তে গ্রহণও করিতে পারে কিন্তু তাহাতেও নানা বাধা বিঘ্ন আছে। কোন একটি রাস্তা বাহির করিতে কাহারও জমির যদি একহাত যায়—তবেই সে চলাচলের সে রাস্তা প্রত্যেকের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইবে। দশের সুবিধার জন্য গ্রামের উন্নতি বিধানের জন্য সে কেন তাহার একহাত জমিটা রাস্তার জন্য দিতে যাইবে—কি স্বার্থ ইহাতে তাহার!

• • • •

দশের সুবিধার জন্য দশের উৎসাহের কিরূপ প্রাচুর্য্য তাহা সব কার্য্যে হইতেই বোঝা যায়। কোন মফস্বল সহরে তখানক জলকষ্ট। সহরে মাত্র দু' তিনটি পুকুর। তাহার একটি সরকারী, অপর দু' তিনটি কোন কোন ভদ্রপরিবারের। ভদ্রলোকদের এই পুকুরের ঘাট কয়টি বাঁধান, কয়টি সানবাঁধা ঘাটই এরূপ পিচ্ছিল যে প্রায় প্রত্যহই জল নিতে যাহারা আসে তাহাদের মধ্যে দু' তিন জন সানের উপর পড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় পড়িয়া কাহারও কাহারও হাত পাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হাতপা এই সব পল্লীবাসীর এমনি কত বছর হইল ভাঙ্গিতেছে—কত কাল হইতে ঘাট এমনি পিচ্ছিল অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু যাহারা জল লইতে নিত্য আসিতেছে তাহাদের কেহ যে উদ্যোগী হইয়া সানের শেওলাগুলি পরিষ্কার করিয়া দিবে সে উৎসাহ তাহাদের নাই। তাই আবাহমান কাল হইতে এমনি অসুবিধাই তাহারা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

• • • •

অধুনা ভারতে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি যে সর্ব্বোত্তম তদ্বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। এবং এ সন্দেহও কাহারো থাকিতে পারে না যে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়কে যিনি বা যাঁহারা সর্ব্বোত্তম করিয়া তুলিয়াছেন, তার আশুতোষ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তার আশুতোষ এই বিদ্যাকেন্দ্রটির জন্য কি করিয়াছেন না করিয়াছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। এই গঠনমূলক কার্য্যে তার আশুতোষের ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটীর উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু আজ দেখিতেছি এই ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটী ধরিয়াই অনেকে বিদ্যামন্দিরের সমালোচনা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দোষগুণ বিচারের বিষয়ীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেসম্বন্ধীয় সে বিচার করিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে ক্ষমতাশালী লোকই গঠন তার পায় এবং সে তার যা দায়িত্ব সে নর্ষিত করে। অক্ষম ব্যক্তি তার পায়ও না দায়িত্বও তাহার থাকে না। তার আশুতোষ ক্ষমতাশালী পুরুষ, তাঁহার হাতে অসীম ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া আজ ভারতের গর্ব্ব-স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। যদি তাঁহার হাতে সে ক্ষমতা না থাকিত, আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইত, আমাদের রাজশক্তির মত একটা বিরাট ব্যুরোক্রেসিতে পরিণত করা হইত—তাহা হইলে যে কি কাজ হইত না হইত, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ব্যুরোক্রেসির রথচক্র যে কোন দিকে চালিত হইত তাহাও সুদূরবুদ্ধিতে বুঝা যায়। এই সেল একটা দিক। আর একটা দিকের কথা হইতেছে, একজনের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকিলে ক্ষমতার অপব্যবহারই হইয়া থাকে। সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে ঘিরিয়া স্বার্থান্বেষীর দল আপন আপন স্বার্থের লক্ষ্যভেদ করিতে থাকে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও এই সব তালুক-নাচওয়ালার কসরত দেখিয়া বিমোহিত না হইয়া পারেন না, দু'হাতে ক্ষমতা বিলান। কিন্তু কথাটা এই যে বিলিয়ে কাজ পাওয়া যায় কি না? এর উত্তর, নিশ্চয় পাওয়া যায়—যাদের দিয়ে কাজ পাওয়া যায়, তাদের নাচ—যারা দেখে নি, বা দেখবার সুযোগ পায় নি, তাদের ভাল লাগতে না পারে কিন্তু যে কাজ চালায় তার ভালই লাগে, যে হেতু সে কাজ পায়।

• • • •

আজ তিনদিন সহরের ট্রাম চলাচল বন্ধ। ট্রামওয়ে কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছে সত্য, সহরবাসীর কষ্টও কিছু কম হইতেছে না। দেশবাসী ইহার প্রতিকার করিতে অক্ষম, পুনঃ পুনঃ ট্রাম ধর্ম্মঘটের প্রতিকার করিতে পারক যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন—ইহারা ত বেশ উদাসীনই আছেন, কতদিন থাকিবেন তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান ট্রামওয়ে কোম্পানীর রাজত্বকাল আর কতদিন আছে জানিলেও বুঝা যায় যে সে মেয়াদান্তে একটা হুযোহা হইতে পারে।

মিশর উদ্ধার।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরে)

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কারাগার, কাল—সন্ধ্যা

জেলর। কে চীৎকার ক'রে জেলের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে?

ওয়ার্ডার। মেহেদি আর আজাদ পাশা আজান দিচ্ছে, হুজুর।

জেলর। ধ'রে নিয়ে আয় বেটাদের—

ওয়ার্ডার। ভগবানের নাম করছে—কি ক'রে ধ'রে আনবো হুজুর?

জেলর। ভগবান! জেলের ভেতর ভগবান! এই পাচীর-ঘেরা জায়গার মধ্যে ভগবানের প্রবেশ নিষেধ!—
—এখানকার ভগবান আমি—যা ধ'রে নিয়ে আয়।

(সভয়ে ওয়ার্ডারের গমন)

ওয়ার্ডার। পাহন শাহ, জেলরের হুকুম আপনাদের ধ'রে নিয়ে যেতে হবে, আপনারা যদি ধরা ক'রে যান,—আমি আপনাদের মত মহাত্মার গা ছুঁতে পারবো না—নিমকহারামি করতে পারি না—তাই এ পাপ কাজ করতে হ'ল—কালই এ চাকরী ছেড়ে ফকির হয়ে মক্কা যাবো।

(মেহেদি ও আজাদ জেলরের সম্মুখে আসিলেন—
কয়েদীর বেশে)

জেলর। চীৎকার করবার জায়গা পাওনি—এটা কি মসজিদ? আমি নিজে জেলের ভিতর চীৎকার করতে পারি না—আর তোমরা কয়েদী হ'য়ে চ্যাচাও?—বল, আর চেঁচাবে না।

কয়েদীরা। ভগবানের নাম নিতে গিয়ে যে শাস্তি হয় হোক—আমরা রাজি আছি।

জেলর। দাঁড়াও তোমাদের ভগবান কেমন ঠেকায় দেখি—এই ওয়ার্ডার—তোমকে টিকটিকি খাড়া করতে বলতো। দেখ কয়েদী, এখনো বলছি, চ্যাচাবে না বলো।

(টিকটিকি লইয়া তোমের প্রবেশ)

তোম। হুজুর, আমার হাতে ব্যথা, আমি বেত মারতে পারবো না।

জেলর। পারবে না—মোষ পারো, আর আর পারবে না—ওয়ার্ডার, একে ৬ মাসের জন্য সেল্ বন্ধ করো। পায়ে ধাওয়েড়ি হাতে হাতকড়ি লাগাবে, চট পরাবে, আর মাড়-ভাত খাওয়াবে।

(তোমকে লইয়া ওয়ার্ডারের প্রস্থান)

(টিকটিকিতে বাঁধিয়া জেলর নিজেই মেহেদি ও আজাদকে
একে একে ১৫।১৬ বেত লাগাইলেন)

(অজ্ঞান অবস্থায় উহাদের দুইজনকে হাসপাতালে লইয়া
যাওয়া হইল)

বন্দী-বন্দনা

—•—

আজি রক্ত নিশি ভোরে
একি এ ধ্বনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-মুখতলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে?
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।
ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে শৃঙ্খলিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতি-শিখা
স্বাধীন বেশ বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে।
সে ধ্বনি ওঠে রণি' ত্রিংশকোটী ঐ
মানব-কল্লোলে।
দুপায়ে দ'লে সেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে,
বাজিল নভতলে স্বাধীন ভেরী রে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে রঙ্গা পদ্মেছে রে,
উতল কলরোলে।
আজি কারার মায়া দেহে মুক্তি-ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল স্নেহ ব্যথা বন্দী কারা, দেখা

কেন রে কারাগারে মরিবে বীর বন্ধে।
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভতলে॥
ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা'রা যেন চাহিছে অনিমিখে,
ধূ ধূ ধূ হোম-শিখা জ্বলিল তারতে রে,
ললাটে আহুতি, প্রফুল্ল-হার-গলে
চলে রে বীর চলে,
সে নহে নহে কারা যেখানে ভগবান
জ্ঞান-শিখা যেন্নে॥

কোরাস্

জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কারীগর!
স্বাধীন চিত্ত জয়! জয় হে!!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নীল নদীর তীরে রণস্থান—কাল, সকাল

নারীসৈন্য (সকলে খদ্দর পরিয়া)

মমতাজ। আমার স্বামী আজ দেশদ্রোহের অপরাধে বিনাবিচারে মিশর হ'তে যাবজ্জীবন নির্বাসিত। ফরাসী সেনাপতি চেয়েছিল আমি তাঁর সঙ্গে যাই, কিন্তু যে কাজের জন্য তিনি এই লাঞ্ছনা ভোগ করছেন, আজ সেই কাজ আমি হাতে নেবো, স্বামীসঙ্গ সুখ ত্যাগ ক'রে আপনাদের নিকট এসেছি। আমার স্বামীকে যদি ফিরিয়ে আনতে হয়, স্বাধীন মিশরে ফিরিয়ে আনবো, তা না পারি তো মিশরের বাইরেই তাঁর জীবনের অবসান ভাল, আর আমাদের শরীর গুলিতে মরণই শ্রেয়।

আসমানী। আমার দেশদ্রোহী পিতা ফরাসীর সঙ্গে যোগ দিয়ে কি সর্বনাশই করছেন—কন্যার কর্তব্য পিতাকে ভক্তি করা, কিন্তু পিতারও যিনি জননী আমাদের সকলের জননী সেই স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির সম্মান যখন অপহৃত তখন বৃহত্তর কর্তব্যের জন্য আজ আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদপাশার দেশভক্তির আমার হৃদয়ের ভেতর থেকে টেনে এনে পথে দাঁড় করিয়েছে। আমার প্রতিজ্ঞা আমাদকে আমার স্বাধীন মিশরে ফিরিয়ে আনবো।

কাতিমা। আমার বাবা বয়কট আলি সাহেব পণ্যদ্রব্যে মিশর ছেয়ে দিলেন—এক ফরাসীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন—আমি তাই আজ ক্ষোভে লজ্জায় এবং ঘৃণায় ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। মিশরের পুরুষ সিংহ যারা তাঁরা আজ সবাই নির্বাসিত, কিম্বা কারারুদ্ধ। আজ যদি মিশরে পুরুষ নাই থাকে, আমাদিগকেই মিশরের স্বাধীনতার জন্য লড়তে হবে। দেশের জন্য দলে দলে প্রাণ দিতে আজ তাই আপনাদিগকে আমি আহ্বান করছি। শ্রমজীবী এবং কৃষকেরা প্রস্তুত—আজ ফেলাইনের চৈতন্য এসেছে শত বছরের অলস পরাণ আবার জেগেছে। ফেলাইন খাজনা বন্ধ করতে প্রস্তুত, মজুর কল-কারখানার কাজ বন্ধ করতে প্রস্তুত, উকিল ব্যারিষ্টার আদালত ত্যাগ করব প্রতিজ্ঞা করেছে, ছাত্রেরা বিদ্রোহের নিশান উড়াতে রাজী, মিশরী পুলিস এবং সৈন্যগণ আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না প্রতিজ্ঞা করেছে এখন এসো মিশরী নারী আমরা যোগ দিয়ে এই সোণার দেশের স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে আনি।

স্বেচ্ছাসেবিকাগণের গান।

"আর অপমান সইতে নারি
মিশর দেশের মেয়ে মোরা
আমরা তো মিশরী নারী—
মোদের স্বামী পুত্র দেবর সোদর,
দিচ্ছে তাদের জেলে ধরি,
মোরা অবলা বলিয়ে কি গো
এর প্রতিশোধ লইতে নারি।
অপমানের ভয় কি দেখাও,
আমরা কি মরণে ডরি,
আপন হাতে জ্বালিয়া চিতা
হাসতে হাসতে মরতে পারি।
বিলাসিতায় মোহে ভুলে
আর কি মোরা থাকতে পারি?
তাদের পাশে দাঁড়াই মোরা
ত্বরা এসো গো মিশরী নারী।
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মোদ মোরা মাথায় করি,
মায়ের হাতে সিঁদুর পরে
সব বাসনা সইতে পারি।"

তৃতীয় দৃশ্য

স্বাধীন মিশরের প্রজাসভা

(কন্সালের উপর)

(মধ্যস্থলে আব্বাদপাশা ও আসমানী সমাসীনা—মেহেদি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন)

মেহেদি। আজ স্বাধীন মিসরের প্রজাসভায় তোমাদের দুইজনকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি—যে সকল মহাত্মা দেশের জন্য প্রাণদান করিয়াছেন তাঁদের নিকট হ'তে তোমাদের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। আজ আমার মনস্কাম বিধাতা পূর্ণ করেছেন, তোমাদের দুজনকে দেশের নেতা ও নেত্রীপদে সকলে বরণ করেছেন—আশীর্বাদ করি তোমাদের মিলন মিসরের নরনারীর আদর্শ হোক—তোমাদের পরিচালনায় খৃষ্টান মুসলমান সকলে ভাই ভাই হ'য়ে দেশের উন্নতিসাধন করুক।

(মেহেদির আশীর্বাদ করণ)

(আব্বাদ ও আসমানীর নতমস্তকে গ্রহণ)

আব্বাদ। আজকের এই শুভদিনে আমাদের অধিনায়ক শান্তিলাভের জন্য নিভৃত আশ্রমে চলে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর মঙ্গল আশীর্বাদ আমাদের সব সময়ে ঘিরে রাখবে—এবং বিপদে আপদে আমাদিগকে সুপথে পরিচালনা করবে আশা করি। শ্রমিক এবং কৃষক প্রতিনিধিগণ, আজ যে রাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল—জগতে এই সম্পূর্ণ নূতন। আমাদের তন্ত্রে সকলের সমান অধিকার—আমাদের প্রাণতন্ত্র আজ অভাব পূরণে সক্ষম। আমাদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অটুট, আবার স্বেচ্ছায় আমরা জাতীয় সাধনা সিদ্ধির জন্য এখানে সম্মিলিত। এই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও তার সফলতার গুরুভার আপনাদের হাতে—এই দায়িত্ব স্মরণ ক'রে আজ আমরা আমাদের মন্ত্রগুরুর নিকট সিদ্ধির জন্য বল লাভ প্রার্থনা করি। এখন আসুন সকলে আমরা জন্মভূমির বন্দনা গীত শ্রবণ করি—

সেবিকাগণ।

"বন্দি তোমায় মিসর জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
যার পুত্রের তপ-অর্জিত-গৌরব-মণি-মালিনি!
কোটি সন্তান আঁখি-তর্পণহরি-আনন্দ-কারিণি—
বন্দি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
ঘুম ঘুমাতে তিমির অঙ্কে হাস, মা, কমল বরণি।
আশার আলোকে মুক্ত-হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নবজীবনে পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী,
হাস, মা, কমল-বরণি!
এসেছে বিদ্যা, আদিবে ধর্ম্ম শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী
আবার তোমায় হেরিব জননি, সুখে দশদিক্ পালিনী
অপমান-কত জুড়াইবি মাতঃ—
স্বর্গ-কর-বালিনি!
শৌর্য্য-বীর্য্য-শালিনি!"

সমাপ্ত

শুকের খেদ

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

(সংস্কৃত)

যদুনন্দন!
তব গুণগান
একবার ভুলে
যে উচ্চারে,
তব বন্ধনে
মায়ার পীড়নে
দুঃখ সহিতে
হয় না তারে।

তব নাম আমি
করি অবিরামই
কখন না থামি
দিবসে রাতে
বন্ধন মম
দৃঢ় হতে দৃঢ়
হইতেছে আরো
খাঁচার মাঝে।

স্ত্রী পুরুষ

[শ্রীআলতাফ চৌধুরী]

কিছুদিন আগে একখানা মাসিক পত্রিকায় একটি সুন্দর মিলন-কাহিনীর লেখিকা গল্পশেষে লিখিয়াছিলেন আজকালকার ছেলেদের সবই রোমান্টিক্। বিজ্ঞরা বলিয়া থাকেন, রোম্যান্সই হোক্, আর বৈচিত্র অথবা নূতনত্বই হোক্ আজকাল ও সবের আদর করিতে আমরা পাশ্চাত্যের কাছে শিখিয়াছি। কিন্তু, সে যাহাই হউক একটা এমন বয়স আছে, যাহার সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে স্বভাবতঃই মানুষ বৈচিত্র চাহে। আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা জীবনে বৈচিত্রের আস্বাদ কতটা পাইয়া থাকেন জানিনা, তবে, বৈচিত্রের কামনা করেন তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যেখানে বিশেষ করিয়া বিবাহ ব্যাপারে যথেচ্ছা মিলনের সীমারেখাটি কিঞ্চিৎ সুবিস্তৃতই বলিতে হইবে সেখানকার মিলনবৈচিত্র্য কাহিনী হইতে তাঁহারা নিজের জীবনে নূতনত্বের স্বাদ মিটাইবার যথেষ্ট মালমসলা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোল্মের একটি প্রসিদ্ধ দেশলাইয়ের কারখানা হইতে পৃথিবীর সর্ব্ব এই দেশলাই রপ্তানী হয়। সেই কারখানায় কাজ করিত এক তরুণী রূপসী। একদিন সে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া একটি দেশলাইয়ের বাক্সে লিখিল, এই বিস্তৃত জগতে, ভবিতব্য ও সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমার ভাবী পতির উদ্দেশে ইহা প্রেরণ করিলাম "(To my prospective husband, care of fate and fortune, wide world)," এবং সেই সঙ্গে নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া দিল। কয়েক মাস পরে আমেরিকার এক যুবক এঞ্জিনীয়ার ষ্টকহোল্মের সুন্দরীটিকে লিখিলেন, কারখানার কৃপায় আপনার প্রেরিত দেশলাইয়ের বাক্সটি আমাকেই তাহার অধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছে.....আমার ফোটো পাঠাইলাম.....এখন আপনি...ইত্যাদি।" বর্ত্তমানে ইহাঁরা বিবাহিত হইয়া সুখে ঘর করা করিতেছেন।

বেশীদিন হয় নাই ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে এক তরুণী বল পছন্দ করিতে গিয়া বাঁশবনে ডোমকানা হইয়া এক লটারীর আয়োজন করিয়া ফেলিল। টিকেটে ছাপাইল প্রত্যেক টিকেট ...টাকা। প্রাইজ—একজন নীল নয়না, কমনীয়দেহা, ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্কা, মোহিনী রূপসী।" ভাগ্যবান স্বামী ত তাহার জুটিলই, অধিকন্তু লটারীর টিকেট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইল তাহাতে তাহার শীতবাসে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার খরচের জোগাড়ও হইয়া গেল।

একই যুবতীর একাধিক পানিপ্রার্থী জুটিলে, তাহাকে বাজী রাখিয়া বিবাহার্থীরা অনেক সময় দৌড়ের প্রতিযোগীতার বন্দোবস্তও করে, যে সকলকে দৌড়াইয়া পরাজিত করে পাত্রী তাহাকেই বরণ করে। বছর দুই আগে একখানি বিদেশী সংবাদপত্রে পড়িয়া ছিলাম, এক সার্কাসে বনিটা নামক একটি মেয়ে খুব ভাল বন্দুকের খেলা দেখাইতে পারিত তাহাকে লাভ করিবার জন্য সেই দলেরই দুজন ক্রীড়ক বাজি রাখিয়া দৌড়াইয়াছিল। কিন্তু পরাজিত হতাশপ্রণয়ীটি মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়াছিল কি না সে খবর লেখক দেন নাই।

এ'ত গেল পুরুষদিগের দৌড়ের কথা! সে দিন জার্ম্মানীতে দুই রূপসীতে স্বামীবরণ লইয়া গোলমাল বাধাইয়া ছিল। অবশেষে তাহারা স্থির করিল, তাহারা দুইজনে একই সময়ে দুটি মোটর-সাইকল লইয়া পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে, যে আগে যাইতে পারিবে সেই বিবাহাধিকারিণী হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের কথা এই যে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে তাহাদের অনুপস্থিতির ফাঁকে তাহাদের কামনার ধন প্রণয়প্রতিযোগীতার পুরুষ দুজটি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

একবার আমেরিকায় দুইজন রমণী এই রকমের অবস্থা সঙ্কটে পড়িয়া বাজী রাখিয়া তাহাদের কাম্য পুরুষটির প্রতিকৃতি আঁকিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে, একজন তাহার প্রতিযোগীনীর অপেক্ষা ভাল ছবি আঁকিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়া স্বামী লাভ করিল। ইহা বৎসর দুইএর কথা।

বিবাহের বর বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথাটা আমাদের দেশে খুব প্রসারতা লাভ করিলেও উল্লেখযোগ্য কিছু লেখকের চোখে পড়ে নাই। একজন জাপানী মেয়ে কিছু-

দিন আগে একটা জাপানী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল "আমি একজন সুন্দরী রমণী। আমার মেঘের মতন চুল, ফুলের মতন মুখ, কোমল তনু কোমর আর প্রতিপদের চাঁদের মতন নখ। যদি একজন সুশ্রী সুরুচিসম্পন্ন চালাক চতুর বিদ্বান ভদ্রলোকের সন্ধান পাই তবে সারা জীবন জীবন-সঙ্গিনী রূপে থাকিয়া জীবনশেষে তাঁহার সহিত একই সমাধিতে দেহ রক্ষা করিবার আনন্দ লাভ করিব। বিশেষ দ্রষ্টব্য তাঁহার যথেষ্ট সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।"

বিলাতের একটি বিবাহ সমিতি একবার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, "একজন সুন্দরী বিধবা যুবতী স্বামী অন্বেষণ করিতেছেন। সুরুচি ও ভদ্রব্যবহার সম্পন্ন হওয়া চাই, সুশ্রী হওয়া চাই, স্বার্থপর হইলে কিম্বা খাটুনির ভয় থাকিলে চলিবে না। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে এবং সাধারণতঃ নিজেকে কর্ম্মশীল প্রতিপন্ন করিতে গররাজী থাকিলে চলিবেনা। আর্থিক সঙ্গতি ও থাকা চাই। ধূমপানের অভ্যাস থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।" কোনও হতভাগ্য এই বিজ্ঞাপন দাত্রীটির স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল কিনা জানিনা; কিন্তু, বিবাহেচ্ছু নারীর এই অশোভন ভাব প্রবণতার অভাব একান্ত আবশ্যকীয় নহে। কারণ, বিগত মহা-যুদ্ধের সময় পুরুষজাতীয় একজন ইংরাজ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিল "একজন সুন্দরী রমণী চাই। উদ্দেশ্য বিবাহ। সমর ক্ষেত্রে আমার ভাই পড়িলে সে যাহাতে আমার কারখানার ভার লইতে পারে সেজন্য তাহার রীতিমত ব্যবসাবুদ্ধি ও প্রভা চাইই অধিকন্তু একজন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার হওয়াও প্রয়োজন।"

একজন ইটালীয়ান ভদ্রলোক "ম্যাকারনি" (খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ) খাইতে খুব ভালবাসিতেন কিন্তু এমন একটি রাঁধুনী পাইলেন না যে তাঁহার মনের মতন করিয়া খাবারটি প্রস্তুত করিতে পারে। অবশেষে একটি বিবাহ-সমিতির পরিচালক তাঁহাকে বলিলেন, "মশাই, আপনার মনের মত করিয়া "ম্যাকারনী" রাঁধিয়া দিতে পারে এমন মেয়ে যদি পান তবে তাকে বিবাহ করিতে কিছু আপত্তি....."

ভদ্রলোকটি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "আরে রাম! ওকথা বলিবেন না। তাকে আমি মাথায় করিয়া, কি-বলে—ওর-নাম, সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া রাখিব।" অবিলম্বে একটি রন্ধন-প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হইল তিনি সেই গুণবতীকে বিবাহের পাটছড়ায় বাঁধিয়া অজীবন তাঁহার প্রিয় খাদ্য আস্বাদ করিতে পাইবার সম্ভাবনাটা কায়েমী করিয়া ফেলিলেন।

পুরুষের অন্তর জয় করিতে হইলে আগে তাহার উদর জয় করা দরকার,—কথাটা নেহাত মিথ্যা নয় তাহা হইলে! আমাদের দেশের তরুণীরা এবং প্রয়োজন বুঝিলে বয়স্কারাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন!

মশা-গুলি।

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

ভাতা ভালে
লাল ফুল,
মুক্তা গালে
ঘুন্ ঘুন্
খায় চুন্
খায় রে।
জান্ করে
চুন্ চুন্,
গান করে
আর মুখ
আয় রে—
গায় নদী
কুল্ কুল্
প্রায় যদি
ছুই কুল্
কেবা তারে
ধায় রে?
চুন্ তরে
বিন্ ফুল্
ঘুম্ ঘোরে
চুন্ চুন্
তুমি শুধু
কাম্ রে।

সাচ্চা কথা।

(গ্রন্থীবর্গের হৃদয়-বাণী)

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যত্র বর্ত্তন্তে তত্র দেব সহায়কৃৎ।

উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি এবং পরাক্রম, এই ছয়টি যেখানে থাকে, সেই স্থানেই দেবতা সহায় হন।

• • • •

যোজনানাং সহস্রন্তু শনৈর্গচ্ছেৎ পিপীলিকা।
অগচ্ছন্নৈব তে যোঽপি পদমেকং ন গচ্ছতি॥

ধীরে ধীরে চলিয়াও পিপীলিকা সহস্র যোজন যাইতে পারে। যে চলে না, সে এক পদও যায় না।

• • • •

অনায়কে ন বস্তব্যং ন বলেৎ বহুনায়কে।
স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং ন বসেদ্বালনায়কে॥

যেখানে নায়ক নাই, বহুনায়ক, স্ত্রীনায়ক, বালকনায়ক, সেখানে বাস করিবে না।

• • • •

বণিক্‌ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসেৎ॥

বণিক, বেদজ্ঞব্রাহ্মণ (শ্রোত্রিয়), রাজা, নদী, বৈদ্য, এই পাঁচটি যেখানে নাই, সেখানে এক দিবসও বাস করিবে না।

• • • •

দ্যূতোদ্যানে দিনং নষ্টং সুরাধারা নিশা নষ্টা।
ঘুণপুষ্পেন কুলং নষ্টং তদ্ভষ্টং বহ্নীযত্নে॥

দ্যূতোদ্যানে দিন নষ্ট, সুরাধারা রাত্রি নষ্ট, ঘুণপুষ্পে কুল নষ্ট এবং অযত্নে ধন নষ্ট হয়।

• • • •

উত্তমা স্বাশুরা খ্যাতাঃ পিতুঃ খ্যাতাশ্চ মধ্যমাঃ।
অধমা মাতুলাৎ খ্যাতাঃ শ্বশ্রাশ্চাধমাধমা॥

নিজ নামে খ্যাত উত্তম, পিতার নামে খ্যাত মধ্যম, মাতুলের নামে খ্যাত অধম, আর শ্বশুরের নামে খ্যাত অধমেরও অধম।

•

চুট্‌কী

[শ্রীমনোরমচন্দ্র গুহঠাকুরতা]

একটী ছেলে পড়িতেছিল সম্মুখে বসিয়া তাহার পিতা তাঁত বুনাইতেছিল। ছেলেটীর বয়স ১২।১৩ বছর হইবে সে ঢাকা আরমনিটোলা গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ক্লাস VII এ পড়ে।

সে পড়িতেছিল—"চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী।" সে বার বার পড়িতেছিল কিন্তু অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল —বাবা চন্দন অর্থ কি?"

পিতা বলিলেন—"চন্দন অর্থ জানচ না, চন্দন ঐযে সাদুরা কপালে লেপটায়।"

পুত্র—চর্চ্চিত অর্থ কি?

পিতা—চন্দন কপালে লেপ্‌টানের পর শুকাইয়া গেলে চড়চড় করিয়া ওঠে না? ঐ-আরে কয় চর্চ্চিত। বুঝলি?

পুত্র—নীল অর্থ কি?

পিতা—নীল অর্থ জান না? ধোপা বাড়ী কাপড় দেছ নাই কোনদিন?

পুত্র—হ হ দিছি না, ঐ যে ধোপারা কাপড়ে লাগায়। আইচ্ছা বাবা কলেবর অর্থ কি?

পিতা—কলায় বড়া খাচ্‌ নাই কোন দিন?

পুত্র—আইগা হ খাইচি না! পীত অর্থ কি?

পিতা—পীত চিন্চ না? যেমন রামের পীত বসন।

পুত্র—বসন অর্থ কি?

পিতা—বসন অর্থ হইল কাপড়।

পুত্র বলিল—বনমালী অর্থ কি বাবা?

পিতা—বনমালী আবার অর্থ কি? আমাগো বনমালী ঠাকুরদারে চিন্চ না?

পুত্র—আইগা হ, আইগা হ খুব চিনি। আইচ্ছা সবটার অর্থ কি হইল বাবা?

পিতা—সবটার অর্থ হইল এই। "আমাগো বনমালী—ঠাকুরদা আর তার বাপ (পীত) দুই জনে কপালে চন্দন লাগাইয়া ধোপা বাড়ীর নীল রং দিয়া ধোপা কাপড় পইরা কলার বড়া খাইতে আছিল এমন সময়ে ঐ কপালে যে লাগাইছিল তা চড় চড় কইরা উঠল্‌।"

•

দৃশ্যপট

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য নাট্য-জগতে দৃশ্যপটের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে The Morning Post কাগজে Victor Macclure যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নাট্যামোদীগণের অবগতির জন্য এখানে দেওয়া গেল।

সাধারণ চিত্রপটের অপেক্ষা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট চিত্রকরা অধিক কষ্ট-সাধ্য। সকল চিত্রকরের পক্ষে এ বিভাগে কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভবপরও নয়। এজন্য ইহা মনে করিতে হইবে না যে, দৃশ্যপটচিত্রকারী কলানৈপুণ্যে অন্যান্য চিত্রকর অপেক্ষা খুব উচ্চদরের।

চিত্রকর, কোন একটা বিশিষ্ট ভাব বা মূর্ত্তি পরিস্ফুট করিতে এবং কলা-কুশলতা দেখাইতে সচেষ্ট। উহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে কলা বা Art সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট যাহারা চিত্র করেন, তাঁহারা শুধু কলা-কৌশলী হইলেই চলিবে না, তাঁহাদিগের কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া দৃশ্যপট চিত্র করিতে হইবে। রঙ্গালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিলে চিত্রকরের পক্ষে রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট চিত্র করা দুরূহ ব্যাপার। অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রকর, এ অভিজ্ঞতার অভাবেই এ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। যিনি দৃশ্যপট চিত্র করিবেন, তাঁহার আলো, ছায়া ও রঙের বৈচিত্র্য বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা চাই। তাঁহার দেখিতে হইবে যে, 'পিট্', 'গ্যালারী' হইতেও চিত্রখানি যেন সমান পরিদৃষ্ট হয়। রঙ্গমঞ্চের পাদদেশের আলো (foot light) জ্বালাইলেও যেন চিত্রের আলো, ছায়া ও রঙের মধ্যে কোন বৈষম্য উপস্থিত না হয়। এতদ্ব্যতীত রঙ্গালয়ের সুবিধার্থ তাঁহার কতকগুলি বাধ্য-বাধকতার মধ্যে কাজ করিতে হয়; এজন্য অনেক সময়ে তাঁহার নিজস্ব কল্পনা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। এত অসুবিধার মধ্যেও কলা-নৈপুণ্যের দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকা চাই।

আজকাল রেখাচিত্রের খুব আদর। দৃশ্যপটগুলি যেন রেখাচিত্রের হয়, কেহ কেহ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, রেখাচিত্রের সৌন্দর্য্য Box হইতে বুঝা গেলেও পিট্ বা গ্যালারী হইতে উহা আবছায়ার মত দেখাইবে। কারণ রেখাচিত্র অতি সূক্ষ্ম কার্য্য।

তবে ইহাও ঠিক, রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটের পরিকল্পনারও পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরদের নিকট হইতে Design বা পরিকল্পনা লইয়া যদি রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটচিত্রকারী তাঁহার স্বীয় অভিজ্ঞতার সহিত পটগুলি চিত্র করেন তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে তিনি হয় ত অধিকতর কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন এবং রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে।

অর্দ্ধশতাব্দ উৎসব।

শ্রীযুক্ত "বাসন্তী" সম্পাদক মহাশয়—

শ্রীকরকমলেষু—

বলি সম্পাদক মহাশয়, এ'টা কি হোল, বলতে পারেন? বঙ্গ-নাট্যশালার পঞ্চাশ বৎসরের জুবিলি উৎসব হ'বে হ'বে করে আপনি আর আপনার মতন আরও ক'খানা ইংরিজী বাংলা কাগজওয়ালা খুব চুড়িলাফ্ মারলেন, ছাপ করেদা, ত্যাপ করেদা করে' আসর জমকালেন, ঐ লক্ষাদ্দেই বুঝি সব শেষ হ'ল! ধন্য ম'শাই, ধন্য আপনারা? কোথায় কি তার ঠিক নেই, একেবারে পার্ট সেলেই, অ্যাকেটা দুপোত্ত অবধি করিয়ে দেল্‌ছিলেন ত। এখন হো'ল কি তা বলুন? অমৃত বোস্ রূপোর মুলধান পেলেন, পান্, বহৎ খুব—কিন্তু উৎসবটা কি হো'ল? সেদিন ষ্টার থিয়েটার ফক্কর করে' মুড়োবেরে কিছু টাকা সিন্দুকজাত করলে, তার হোল কি? উৎসব হ'য়ে গেল?

সত্যি কথা বলতে কি সম্পাদক ম'শাই, আপনার বিচার-বুদ্ধির তারিফ্ না করে' পারছি নে। আপনি যে আপনার কাগজে লিখ্‌লেন, অমৃত বোস বুড়ো হ'য়ে-

ছেন, তাঁকে আর খাটিয়ে কাজ নেই, তিনি গঠন ও শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত—এখন বুঝতে পারছেন এর চেয়ে মিথ্যে দ্বিতীয় ভাগের সোপানও বলত না। বরং কলকাতার সব ক'টা থিয়েটারের সব অ্যাক্টর—অ্যাকট্রেস, প্রোপ্রাইটার, প্রোপ্রাইট্রেস—সব বুড়ো হ'য়ে গেছে দেখলুম, সব নিঃসাড়, নিষ্পন্দ, কেবল অমৃত বোস, অপরেশচন্দ্র, এঁরা দুজনই দেখলুম নব যৌবন পেয়ে সেদিন খুব লুপঝাপ করলেন। অর্দ্ধশতাব্দ উৎসব তাঁরা দু'জনেই করলেন, তাঁদের জয় হোক্। দেখুন সম্পাদক ম'শাই, আপনার সঙ্গে সেদিন সাক্ষাৎসূত্রে পরিচিত হ'য়ে আমি বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেছি, আপনাকে আর ঘাঁটাতে মোটেই আমার ইচ্ছা নেই। সম্পাদকের যা যা গুণ থাকা দরকার আপনার তা আদৌ নাই, কাজেই আপনার কথারও কিছুমাত্র weight নাই। ধরুন, আপনার বয়সটা নেহাৎ অ-সম্পাদকীয়, চেহারাটা প্রিয়দর্শন না হ'য়ে কাঠখোট্টা হওয়া উচিত ছিল, নয়া অন্ততঃ কপচানো দাড়ী থাকা আরও উচিত ছিল এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি এসব থাকলে আপনি থিয়েটারওয়ালাদের জুবিলি উৎসবে বেশ সুপরামর্শও দিতে পারতেন। তা'হলে হয়ত বলতেন সব থিয়েটার একদিন খুব বড় বড় দু-দুটো রজনীব্যাপী চিত্তচমৎকার, মস্তকঘূর্ণক প্রোগ্রামের আয়োজন করে, তখন মূল্যে টিকিট বেচে, পেটকোঁচড়ে করে' ঘরে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়ার শ্রীবৃদ্ধির মনোরঞ্জন করতে পারেন—একথা বললে দেখতেন—চারটি থিয়েটার বাড়ীর সামনে গ্র্যাকার্ডের হড়াহড়ি, আলোর ফেরীওয়ালী লেগে যেত। আর মশাই, আপনি বলেন কি-না অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা ঐ সংক্রান্ত লোকদের সাহায্য কল্প করতে হ'বে! উঃ কি আপনার পরদুঃখকাতরতা! আবার বছরে বছরে অমনি সব থিয়েটার মিলে অভিনয় হ'বে—আর টাকা জমবে! বাহবা কি বাহবা! একেই বলে মাথা! বেঙ্গোরেশন কল্প প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের মশলের ধার উঠেছিলো, আপনার মাথায়ও কেউ ডাক দিয়ে বললেও আমি চমকাব না।

মশাই, মাসিক কাগজের সম্পাদক হ'য়েও আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা মাসিক দেশ। এখানে নিজের দিকে ঝোল না টানলে উপায় নেই। পরের জন্যে মাথা কেউ ঘামায় না, ঘামাতেও পারে না, আপনার মত যে-সব বেকারারা ঘামায় তারা নাস্তানাবুদই হ'য়ে থাকে। এই রকম গালাগালিই তাদের অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ—আপনার দোষ কি? আচ্ছা মশাই, তাদের জন্যে ত আপনার ভারি মাথা ব্যথা, বলুনত—অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা বাইনে নেয় না? ঘোটা ঘোটা বোনাস্ নেয় না? তাদের আবার পেন্সন কিসের মশাই? এটা কি Government Service পেয়েছেন না-কি? থিয়েটারওয়ালারা কি দানছত্র করতে বসেছেন যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে থিয়েটার করিয়ে আপনার মত সহৃদয় বন্ধুর সু-পরামর্শে কর্ণ করতে যাবেন? আর কত একটা করতে হয়, তাঁরা নিজেরাই একটা একটা করবেন। আপনাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? জুবিলির সঙ্গেই বা কিসের সম্বন্ধ! Actor Actress তাঁদের, অতএব যার ছাগল সে লেজের দিকে কাটে আর নিজের দিকে কাটে আপনার কি মশাই? আপনি বুঝি দেবার কে—বলুন ত? তার Actor বুড়ো বয়সে বিড়ির দোকান করুক, তার Actress পানওয়ালী হ'য়ে বসে—বলুক—আপনার কি? আপনারা সম্পাদকের দল, এক ত বিনা পয়সাতেই থিয়েটার দেখে বেড়ান আপনাদের অভ্যাস, তার উপর এত বুকফাটানা কেন আর?

আমার পত্র যে আপনার কাগজে ছাপা হবে না তা আমি বেশ জানি। আপনি অতি মহাশয়, আপনার মত লোক নাই—এসব লিখলে ছাপা হ'তে পারত, তা যখন পারলুম না, ছাপা হ'বে না ঠিক জানি। এক সপ্তাহ দেখে তারপর অন্য কাগজে আপনার উদারতার উল্লেখ করে এই নিবন্ধই ছাপাই। ইতি

বশম্বদ
শ্রীচ্যবনপ্রাস।

[লেখক শ্রীযুক্ত চ্যবনপ্রাস মহাশয় ভুল করিয়াছেন, কোন পত্রিকা-ই তাহার স্বত্বাধিকারী বা সম্পাদকের নিজের সম্পত্তি নহে। আর্থিক উন্নতি অবনতির, লাভ-লোকসানের দায়ী তাঁহারা হইতে পারেন, সকল পত্র বা পত্রিকাই সাধারণ সম্পত্তি,—সাধারণের মতামত, স্বপক্ষ বা বিপক্ষ হইলেও প্রকাশিত হইতে পারে। নাট্যশালার অর্দ্ধ শতাব্দ উৎসব সংক্রান্ত আমরা আরও কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থান অল্প, সকলগুলি ছাপা সম্ভবপর নহে, লেখকগণ ত্রুটী মার্জনা করিবেন, আশা করা যায়।—সম্পাদক, বাসন্তী]

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান।

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

রক্তের মত রং তৈরী করিলাম, কিন্তু প্রকৃত রক্ত তৈরী করিতে পারিলাম কই?—ধাতুবিদ্ ভাবিতেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক ভাবিতেছিলেন,—অনেক কিছু করিলাম, জলে আগুনে প্রাণের স্পন্দন দেখাইলাম, হাতের মুঠায় বিদ্যুৎ নাচাইলাম, আরও কত কি করিলাম, কিন্তু মূল 'কেন'র উত্তর দিতে পারিলাম না।

চিকিৎসক বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, মানবকে দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত করিলাম, বহুবিধ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিলাম, কিন্তু যে হাত ছাড়া হইয়া গেল, তাহাকে তো ফিরাইতে পারিলাম না! মরা মানুষকে বাঁচাইতে পারিলাম কই?

চিত্রকর নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থিরদৃষ্টিতে বহুত অঙ্কিত চিত্রের পানে তাকাইয়া উন্মাদের ন্যায় বিশ্বপতির করুণা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছিল,—এই যে আমার হারাপ্রিয়া মানসীর প্রতিকৃতি খানি চল-চল যৌবনের চমকচাকল্য দিয়া তুলি ও রঙের আঁচড়ে ফুটাইয়া তুলিলাম, তাহাতে জীবনের সাড়া জাগাইতে পারিলাম না কেন প্রভু!

ভাস্করের চিন্তা,—কঠিন প্রস্তরের উপর অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে, কত প্রলোভনের কত ভোগের কত মুক্তির কত ত্যাগের মূর্ত্তি টানিয়া বাহির করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও তো প্রাণের অভাব!

কবি নির্ব্বাক্!—সর্ব্ব ত্যাগী ভোলানাথের ধ্যান মগ্ন মূর্ত্তি তখন তাহার চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে,—পিনাকপাণির উল্লসিত তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল, গলে নর মুণ্ডমালা, সর্ব্বাঙ্গে চিতা-ভস্ম। চরণাঘাতে ত্রিলোক কাঁপাইয়া শ্মশানচারী ভৈরব অট্টহাস্যে উত্তর দিল,—সেই অনন্তের তরেই তো আজ আমার সর্ব্বনাশা ভিখারীর বেশ।'

প্রজ্ঞানের রহস্য যবনিকার অন্তরাল হইতে কোন্ অলক্ষ্য শক্তির ইঙ্গিত দিকে দিকে ভাসিয়া উঠিল।

…ওঁ-ম্, শান্তি।…

দৃষ্টি

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর]

কারুক যতই উচ্চে দৃঢ় বিচরণ
নিবদ্ধ তাহার দৃষ্টি গোষ্পদ পানে
নীচাশা যতই বিষা করুক অর্জ্জন
ঘৃণিত লালসা তারে নীচেতেই টানে।

ভূমিতলে যত মিছে করুক নিবাস
তরুশাখার দৃষ্টি উচ্চ পানে ধায়
মহাপ্রাণ, হোক্ কেন মূর্খ অপ্রকাশ
চিত্ততার উচ্চমুখী পুণ্যপরিমায়।

বিংশ শতাব্দীর ন্যংটা গোরা।

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ)

সভ্য জগতে এমন স্থান খুব কমই আছে যেখানে ইংরাজী ভাষা আদৌ স্থান লাভ করে নাই। ইংরাজী সাহিত্য আজ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার অন্যতম কারণও বোধ হয় এই, যে এই শ্বেত জাতী সাহসে অধ্যবসায়ে ও কর্ম্ম পটুতায় সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া নানা রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার উপহার দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরাজের দুই কোলে অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্রতটে এবং হিব্রিডিস দ্বীপে (Hebrides Isles.) যাহারা বাস করে তাহারা আদৌ ইংরাজী ভাষার কোন প্রকার ব্যবহার করে না বা জানে না। সভ্যজাতি বলিয়া ইংরাজ বড়াই করেন, অন্য দেশবাসী বিশেষতঃ ভারতবাসীকে অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন আখ্যা দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না অনেক সময়ে অতি সাধারণ ঘোরতর হইয়া আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া

যাইবার জন্য পাদ্রী সাহেবের শুভাগমনও হইয়া থাকে কিন্তু নিজের জাতি কুটুম্বের বিষয়ে একটা উদাসীন কেন বুঝা কঠিন। যাহাহউক সম্প্রতি মেটন গর্ডন নামীয় জনৈক ইংরাজ বেশ মোটা কলম লেখা কথা "ডেলী মেল" নামক সংবাদ পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

কবি গাহিয়াছেন—

Rule Britania, rule the waves,

Briton never shall be slaves.

বিজয়গর্ব্বীজাতি এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু সেই ইংরাজের অর্থাৎ Briton এর বংশধর এই বিংশ শতাব্দীতেও আদিম অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই বর্ত্তমানে আমরা তাহাই দেখাইব। বলা বাহুল্য ইংরেজের সামাজিক জীবনের ও ভাষার সহিত তুলনা করিলে ইহারা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে কিন্তু ইহারাও Briton. অনেক ইংরাজ ও বোধ হয় জানেন না যে হিব্রিডিস্ দ্বীপবাসীগণ জাতিতে ইংরাজ কিন্তু আমাদের নিকট যেমন সাধারণতঃ জার্ম্মান বা ফরাসী ভাষা সম্পূর্ণ অপরিচিত পূর্ব্বোক্ত দ্বীপবাসীগণের নিকটে ও ইংরাজী ভাষাটা একেবারে অজ্ঞাত। বৃদ্ধের দল বাদ দিলেও বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা যাহারা পাইতে বসিয়াছে তাহাদেরও চিন্তা ধারা সম্পূর্ণ উত্তর ফটলণ্ডের মত, যদিও তাহারা দক্ষিণাংশের ভাষা একটু আধটু কথা বর্ত্তা চালায় কিন্তু ইংরাজীর সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। ইহারা গেলিক (Gaelic) ভাষায় কথা বলে; কাজেই আমরা ইহাদিগকে মাতৃ ভাষার দিক্ দিয়া ভাংটা গোরা বলিব। এদেশে গোরা পল্টনের মধ্যে এক শ্রেণীকে ঐ খেতাব দেওয়া আছে; বোধহয় হিব্রিডিস্ দ্বীপবাসীকে এই নাম দিলে বেশীর গোরা সৈন্যগণ আমাদিগকে কলের গুতো না'ও মারিতে পারে; তবে কথা এই যে—তাহাদের রাজার জাতীয় একটু সম্বন্ধও পরাধীন জাতি বাহির করিবার চেষ্টা করে কেন?

যাহারা হিব্রিডিস্ দ্বীপে ভ্রমণকারী রূপে উপস্থিত হন অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাঁহারা গলিক্ ভাষা জানেন না কাজেই অধিবাসীগণ তাঁহাদের সহিত ভাব বিনিময় করিতে অসক্ত হয় কিন্তু যদি কাহারও গলিক সম্বন্ধে যৎসামান্য জ্ঞানও থাকে তাহা হইলেও ইহারা তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করে এবং সন্তুষ্ট হয়।

গেলিক ভাষা আয়ত্ব করা বড় কঠিন ব্যাপার। সামান্য অসাবধান হইলেই ঢোরা গর্ত্ত থাকিয়া যায়। ইহার বর্ণ-মালা অত্যন্ত কম। ইংরাজীর মত ইহার কোন স্থানে জে, কে, ডি, ভাবলিউ, এক্স, ওয়াই কিম্বা জেড্ (J, K, V, W, X, Y, & Z)

প্রভৃতি বর্ণের নাম গন্ধও নাই।

কিন্তু অনেক কথায় ভি (V) বর্ণের উচ্চারণ শুনা যায়। লিখিবার সময় V স্থানে mh (এম-এচ) বা bh (বি-এচ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন mhor শব্দ উচ্চারণ কালে vor হইয়া যায়; অর্থাৎ বর্ণের সহিত শব্দের পার্থক্য হয়। mhor অর্থে Great বা মহৎ। গেলিক ভাষায় J (জে) শব্দ নাই। John বলিতে Iain (ইয়েন) বলা হয়। কাজেই ভাষাটি শিক্ষা করা বড় সহজ নহে।

গেলিক ভাষায় সুন্দর করুণ রসের গীত আছে। ভাষাটী সঙ্গীতময় এবং দুঃখের গীতিই অধিকাংশ। গানের সঙ্গে কোন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

এইবার বাসস্থানের কথা। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে এই দ্বীপবাসীগণ প্রাচীনকালের ভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে।

একটী গৃহস্থের ২খানির অধিক বাসগৃহ নাই। তাতী বাড়ীর ব্যাপার আরও চমৎকার ৮।১০টী লোক লইয়া হয়তো পরিবারটী; কিন্তু মাত্র ২টী বাসগৃহ, পরিমাণে ১২ফিট চৌরাসের বেশী নহে। আবার এই গৃহাভ্যন্তরের ভাল স্থানটীতে তাঁতের জন্য পাকা বন্দোবস্ত আছে। বিখ্যাত সুগন্ধময় "হারিস টুইড্" (Harris twud) এই দেশের তাঁতী রমণীরা প্রস্তুত করে। টুইড্ এক প্রকার মোটা বুনন পশমী কাপড়। সুতের বেন্ডে গুলি মাটীর কখন কখনও সমুদ্র তীর হইতে বস্তা (Sack) বোঝাই করিয়া বালী আনিয়া মেজের লেপন করা হয়।

ইহারা কোন প্রকার চিমনী ব্যবহার করেনা। জল পচা শিকড়, পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরের কোণে সর্ব্বদা আগুন জ্বালিয়া রাখে এবং চালের নিম্নস্থিত ছিদ্র দিয়া ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়। রাত্রের চুল্লী সর্ব্বদা জ্বলিয়াই থাকে সুতরাং ধোঁয়ার চোটে নিকটের জন্য চোখে দেখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আমাদের পল্লীগ্রামে শীতকালে বালক বালিকারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাতা খড় প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আগুন পোহায় এবং বস্ত্রহীন দরিদ্র নারীও অনেক সময়ে শীতের অত্যাচারে রক্ষার শরণাপন্ন হয়। কিন্তু বিলাতে শীত কত বেশী তাহা অনুধাবন করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে ইহারা কত কষ্ট সহিষ্ণু।

খাদ্যাদি প্রায়ই ইংরাজের মত। ইহারা অনেকটা সবল এবং পরিশ্রমী। বিলাসীতা একেবারেই নাই বলিলে চলে তবে গ্রাম্যযুবকদল দুই একদিন সহর ঘুরিয়া গেলে অনেক সময়ে সভ্যতার আলোকে চমকিত হইয়া সব দেশের 'পাড়াগেঁয়ে' মাতব্বরের মত "হে, হে, হে" বুলি কপচাইতে থাকে।

৮

তোড়া

[শ্রীউমাপ্রসন্ন দে বি-এ]

মিশরের রাজপুরী। মিশর দেশের মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক মস্ত আবিষ্কার হ'য়ে গেছে, মিশরি রাজাদের বাড়ী ঘর জিনিষ পত্তর সব, তিন হাজার বছরের কম পুরানো তো কিছুতেই নয়। কিন্তু জিনিষগুলি এখনও কিট্‌কাট সাজানো, সোনার খাটের ওপর মখমলের বিছানা ফুলের টব, সোনার গ্লাস—হাল ফ্যাসনের সাজানো ঘর খানি, ফুলঝি পাউডার, চুল কোঁকড়ান যন্ত্র, আরো—কত কি—ঠিক যেন মিশরের রাণী এই মাত্র চয়লেট করে' বেরিয়ে গেলেন, আমাদের দেশেও তো অনেক ঘরের ধন লুকানো আছে, শুনেছি, একবার খুঁজে দেখলে হতনা?

• • • •

দূরত্বের হিসাব—সবার চেয়ে চল্‌তি ট্রেণও মিনিটে এক মাইলের বেশী যেতে পারে না। এমনি একটা গাড়িতে চড়ে পৃথিবীটা ঘুরে আসতে লাগ্‌বে প্রায় আঠার দিন, মঙ্গল গ্রহে যেতে লাগ্‌বে ৭৮ বছর, আর সূর্য্যের বাড়ী পৌঁছিতে ১১৭ বছর, কেউ এত বয়সে সেখানে যেতে পার্বে না। কিন্তু পৃথিবীর খুব সাম্‌লে যে তারা সেখানে যেতে ক'দিন লাগ্‌বে জানো?—চারকোটী বছর—খুব সাম্‌লে হ'ল।

• • • •

নেপচুনের যৌতু—আমাদের পৃথিবীটা বছরে একবার সূর্য্যের চারিদিক ঘুরে আসে, কিন্তু নেপচুন বেচারী অত অত সহজে পারেনা; ১০০০ বছরে মাত্র ছয়টীবার ঘুরে আস্‌বে সে।

• ছোঁয়াচে রোগ—বড় ছোটর তফাৎ শুধু মানুষের ভিতরেই নেই, প্রাণী জগতেও কেউ কাহাকে দেখ্‌তে পারে না। জীবাণুগুলিকে পর্য্যন্ত এ ছোঁয়াচে রোগে ধরেছে জানো?—জলের জীবাণু (molecules) নেহাৎ ছোট' তৈলের জীবাণু গুলি একটু বড় বড়, মেলামেশা করে জাত যাবে যে!

• • • •

হাঁসের পাখা—ঠিক এই জন্যে হাঁস শত ডুবদিয়ে উঠ্‌লে ও তার গা ভিজে না, পাখা ঝাড়া দিলেই ঝিলি শুক্‌নো—জলের চিহ্নটীও থাক্‌বে না, হাঁসের পালকগুলি তৈলাক্ত গোড়া থেকে এক রকম তৈল এসে সর্ব্বদাই সে গুলিকে ভিজিয়ে রাখে আমারও যদি এর একটা শিশি যোগাড় কত্তে পার্তুম তো জামা কাপড়ে মেখে নিতুম।

• • • •

মৌমাছিদের ষ্টকালী—বাপ কণে দেখাবার সময় তাকে বেশ করে সাজিয়ে গুজিয়ে তবে বের করে, একটু এসেন্স দিয়ে, একখানা রঙীন সাড়ি পরিয়ে—তারপর। নইলে হয়তো ষটক মশায়ের পছন্দ হবে না! ফুলের গাছগুলিও ঠিক তেমনি, ফুলের এত গন্ধ কেন জানো?—মৌমাছিদের মন ভোলাবার জন্যে, এত রং বেরংয়ের পাপ্‌ড়িতেও ব্যবসাদারি মাথা খেটেছে, যে ফুলটা রঙীন, যার গন্ধ বেশ্‌ মিঠে, সেই ভোমরা পড়ে আগে। ষটক মশায় আনন্দে সেখানে বসেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুলের পরাগ তার পাখাগুলিতে জড়িয়ে যায়। মধু খেয়ে যেই সে আরেক ফুলের ওপর বস্‌ল অমনি দুই ফুলের পরাগে মিশে গেল। মৌমাছিদের এ বড্ড চমৎকার ঘটকালি!

•

চোখের ক্লান্তি—সূর্য্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে-থেকে দেখো তোমার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে—খানি অন্ধকার দেখ্‌বে। একটু পরেই চোখ দুটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। এর কারণ হ'ল চোখের ক্লান্তি। বেশী খাটুনিতে সব জিনিষই দুর্লভ হ'য়ে পড়ে। কল-কব্জাগুলো পর্য্যন্ত হয়রাণ কাজ করলে অচল হয়ে যায়। চোখ দুটাই বা যাবে কেন? সূর্য্যের কড়া আলোর দিকে চাইতেই তার এত পরিশ্রম হয় যে সে বহুক্ষণই কাবু হ'য়ে পড়ে। দেখার শক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যায়। একটুখানি জিরিয়ে আবার ঠিক হয়।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার আসিয়া যখন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দুরারোগ্য কঠরোগ, তখন আশঙ্কায় হাহায় সকলের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। ক্ষেমঙ্করী দেবী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো, বহেশ্বরও যে এই রোগে কাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে গো, বাছার আমার কি হবে গো!" তৃপ্তি বহুকষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিল।

রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইলেও ডাক্তার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তাঁহার ব্যবস্থামত ঔষধ চলিতে লাগিল। ক্ষেমঙ্করী দেবী রাতুপুত্রীর আরোগ্য কামনায় জপের সংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। রসোয়ার উপর সেবার ভার পড়িল। তৃপ্তি সময় সময় আসিয়া ঔষধ পথ্য যথারীতি প্রদত্ত হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

এক সপ্তাহ ঔষধ সেবনেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না, বরং জ্বরের বেগ বাড়িতে লাগিল। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং কলিকাতা হইতে কোন্ নামজাদা ডাক্তারকে লইয়া আসা উচিত, তাহার পরামর্শ চলিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে তারকনাথ বর্দ্ধমান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। সে আসিয়া অনুপমার অসুখের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল এবং ডাক্তার সাহেব ডাক্তার আনা হয় নাই বলিয়া তারানাথ হইতে রসোয়া দাসীর উপর পর্য্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইয়া তৃপ্তি কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে ছুটিল।

এক মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে অনেক ডাক্তার-কেই লইয়া আসা হইল, এবং প্রত্যেক ডাক্তারই স্ব স্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ঔষধ খাইয়া রোগী হয় তো দুইদিন একটু সুস্থ থাকে। তদ্দর্শনে সকলেই আশান্বিত হয়। কিন্তু দুই দিন পরেই আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া সকলকে হতাশ করিয়া দেয়। তখন আবার নূতন ডাক্তারের অনুসন্ধান চলিতে থাকে।

দেখিয়া শুনিয়া সকলেই হাল ছাড়িয়া দিল; হাল ছাড়িল না কেবল তৃপ্তি। সে যেন উন্মাদের মত নানা আদা ডাক্তার ও বৈদ্য ঔষধের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার আহার নিদ্রা, শান্তি বিরাম কিছুই রহিল না, অনুপমার আরোগ্যই যেন তাহার একমাত্র সাধনা হইয়া উঠিল। তাহার কাতরতা দর্শনে ক্ষেমঙ্করী দেবী একদিন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে তৃপি, মেয়েটা তো যেতেই বসেছে, তার সঙ্গে তুইও কি নিজের প্রাণটা হারাবি।"

জেঠাইমার কথায় তৃপ্তি একটু হাসিয়া উত্তর করিল, আমার প্রাণের কি মূল্য আছে জেঠাইমা? এটা দিয়েও যদি অনুর প্রাণটা এযাত্রা বাঁচাতে পারি, তবে তার চাইতে সুখ আমার আর কিছুই নাই।"

ভাবী পত্নীর উপর এতটা অস্বাভাবিক অনুরাগ দর্শনে জেঠাইমা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি মুখ ভারী করিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "ঢের ঢের বিয়ে পাগল মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তোর মত বিয়ে পাগল হুকনো দেখি নাই তৃপি।"

তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে পাগলা আবার কোন্ খানটায় দেখ্‌লে জেঠাইমা? আমি কি বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপে বেড়াচ্ছি।"

ক্ষুব্ধস্বরে জেঠাইমা বলিলেন, "ক্ষেপে বেড়াবার আর

বাকী কি বল্। কি না বিয়ের কথা হ'য়েছে, তা তার ভয়ে তোর নাওয়া খাওয়া, ঘুম নিদ্রা কিছুই নাই, ছুটোছুটী হুটোপাটি, কি কাণ্ডটাই না কচ্ছিস্। তবে বিয়ে হবে, আর তুই তার জন্যে, প্রাণটাকে পর্য্যন্ত খোওয়াতে বসেছিস্।"

ভূপতি এমন অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল যে, তদর্শনে ভূপতি সত্যই পাগল হইয়াছে কি না এই সন্দেহে ক্ষেমঙ্করী দেবীও একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভূপতি খানিকটা হাসিয়া জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমরা দেখছি কিছুই বুঝতে পার নি, জেঠাই মা। বিয়ে হবে ব'লে কি আমি এত কচ্ছি?"

গম্ভীরভাবে ক্ষেমঙ্করী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কিসের জন্যে কচ্ছিস্ বল্ তো?"

ভূপতি বলিল, "বিয়ের কথা তুলে তোমরা যে পাপ করেছ, এই ছুটোছুটি ক'রে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি, বুঝেছ?"

জেঠাইমা কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, বিবাহের কথা তুলিয়া তিনি কি এমন মহাপাপ করিয়াছেন যে, ভূপিকে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। ভূপিও জেঠাইমাকে পাপের কথাটা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে অনুপমার ঔষধ খাওয়া হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সত্বর প্রস্থান করিল। ক্ষেমঙ্করী দেবী অনেক ভাবিয়াও যখন আপনার বিশুদ্ধ আচার ব্যবহারের মধ্যে পাপের লেশমাত্র আছে বলিয়া সম্ভাবনা করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে অগত্যা স্থির করিতে হইল, ভূপতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তখন অনুপমার আশার জলাঞ্জলি দিয়া ভূপতির মস্তিষ্ক কিসে প্রকৃতিস্থ হয়, তজ্জন্য দেবতার নিকট রাখা খুঁড়িতে লাগিলেন।

অনুপমার ঘরে গিয়ে ভূপতি যখন দেখিল যে, শিশির ঔষধ সমভাবে মজুত রহিয়াছে, এক বাসও খাওয়ান হয় নাই, তখন সে যশোদাকে ডাকিয়া তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার তর্জ্জন গর্জ্জনের উত্তরে যশোদা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমাকে ধমক দিলে কি হবে দাদাবাবু, দিদিমণি যে ওষুধ খেতে চায় না তার কি? বলে, ওষুধ খাওয়াতে এলে ঝাঁটা মেরে তোকে বাড়ী হ'তে তাড়াব, আর ওষুধটা ফেলে দিয়ে যদি বলতে পারিস্ ওষুধ খাইয়েছি, তা হ'লে এক এক শিশি ওষুধে তোকে একটাকা ক'রে দেব।"

শুনিয়া ভূপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে অনুপমার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ অনু, সত্যিই তুমি যশোদাকে এই সব কথা বলেছ?"

অনুপমা কোন উত্তর না দিয়া যেমন মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিল, সেইভাবেই শুইয়া রহিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভূপতির বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যশোদার উক্তি সত্য। তখন সে অনুযোগের স্বরে বলিল, "ছিঃ, এমন ছেলেমানুষিও করে। রোগ হ'লে ওষুধ খেতে হয়, একথা ছেলেমানুষ যে সেও জানে।"

অনুপমা নিরুত্তর। ভূপতি শান্ত কোমল স্বরে তাহাকে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিল, "ওষুধ তুমি খাবে নাই বা কেন? তোমার ভয় কি? রোগ হ'য়েছে, ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। দেখছো তো, তোমার অসুখে বাড়ীশুদ্ধ লোক কি রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।"

অনুপমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং উত্তেজনায় রোগপাণ্ডুর মুখখানাকে লাল করিয়া তর্জ্জন সহকারে বলিল, "বাড়ীশুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত হ'তে কে বলছে বলুন তো? আর আপনাকেই বা এত বক্তৃতা দিতে কে ব'লে দিয়েছে? আমার রোগ হ'য়েছে, ইচ্ছা হয় ওষুধ খাব, ইচ্ছা না হয় খাব না, সেজন্য আপনার এত মাথা ব্যথা কেন? এমনভাবে আমাকে আপ্যায়িত করতে কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে বলুন তো আগে?"

ভূপতির মুখখানা ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। সে হতবুদ্ধির ন্যায় নিষ্প্রভ দৃষ্টিটা একবার অনুপমার রোষ কঠিন মুখের দিকে উত্তোলন করিয়াই মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। অনুপমা তখন কঠিন স্বরটাকে আরও কঠিন করিয়া যেন কঠোর আদেশের স্বরে বলিল, "আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি ভূপতিবাবু, যদি ভাল চান, তবে এরূপ অনধিকার চর্চ্চা ক'রে অপমানিত হ'তে আসবেন না।"

অনুপমা আর বসিতে পারিল না, কথা শেষ করিয়াই অবসন্নভাবে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। যশোদা ছুটিয়া আসিয়া, তাহার চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া মাথায় পাখার বাতাস দিতে লাগিল। ভূপতি যেন যন্ত্রাহতের ন্যায় আড়ষ্টভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পা ফেলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া, ঠিক দরজার উপর তারকনাথকে সহাস্যমুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে এমনই একটা আতঙ্কে শিহরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল যে, তারকনাথের পরিবর্ত্তে সেখানে একটা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলকে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেও ক্ষুপতি বোধহয় এমনভাবে দাঁড়াইয়া পড়িত না। তাহার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, কে যেন ঘাড়টাকে জোরে টিপিয়া মাথাটাকে মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিবার উপক্রম করিল। সে চলিয়া যাইবে কি দাঁড়াইয়া থাকিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, অথচ দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল—মুহূর্ত্তকাল পরেই সে তারকনাথকে ঠেলিয়া দিয়া যেন পাগলের মত ছুটিয়া পলাইল। তারকনাথ মৃদু হাসিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

(ক্রমশঃ)

সংগ্রহ

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

এবার ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনে নব্বই লক্ষ নারী ভোটের অধিকার পেয়েছেন। ইংলণ্ডে নারীর এই প্রথম ভোটের অধিকার।

• • • •

কয়েক মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার হবার জন্য যিনি নিয়োগ পত্র পেয়েছিলেন, তিনি কেবল আইনের অধ্যাপনাই করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আদালতে কোনও মোকদ্দমা করেন নাই। এবার আঠারজন মহিলা ব্যারিষ্টার হবার জন্য নিয়োগ পত্র পেয়েছেন।

• • • •

এতদিন ইংলণ্ডে কোনও মহিলাই এটর্ণী হবার সুযোগ লাভ করেন নাই। সম্প্রতি একজন মহিলা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইংলণ্ডেও নারী প্রগতিতে বেশ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

• • •

চন্দ্রকে এতদিন অত্যধিক ঠাণ্ডার শীতল বলেই বৈজ্ঞানিকেরা জানতেন। সম্প্রতি এক বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে স্থির করেছেন, যে, চন্দ্রেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। শীত গ্রীষ্মের প্রভাব থাকায়, জীবজন্তুর কথা যায় দিলেও, সেখানে উদ্ভিদের থাকা অসম্ভব নয়। আরও বিচিত্র খবর এই যে এ সমস্ত অনুমান নিছক সত্য বলেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, দেখা গেছে, যে চন্দ্রের উপরি ভাগের তাপ কখনও কখন ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রিটার হয়, আর কখনও বা ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রিটারের নৈত্য অপেক্ষাও শীতল হয়।

• • • •

এরূপ প্রকাশ যে জার্ম্মেনীর স্বর্গতপূর্ব্ব কাইজার তাঁর সম্প্রতি বিবাহের পর পুনর্যৌবন লাভের জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা Glands পরিবর্ত্তিত করেছিলেন। এই Glands এর চিকিৎসায় বৃদ্ধ ও যুবকের মত শক্তিলাভ করতে পারেন।

• • • •

মিশরের প্রাচীন সভ্যতা জানবার জন্য অনেকদিন হতেই চেষ্টা হচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সম্প্রতি খনন করতে করতে, এমন এক প্রাচীন প্রাসাদ আবিষ্কার করেছেন, যার একটি গৃহের বিশেষ মূল্যবান আসবাবপত্র আর ঐশ্বর্য্য দেখেই তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্য্য একরকম কল্পনাতীত ছিল বলেই চলে। প্রাচীন পুঁথিও অনেক পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ইতিহাসের একটী নূতন অধ্যায়, সকলের জ্ঞানগোচরে আসবে বলে আশা করা যায়।

• • •

শান্তি বিষয়ে যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁর নাম হচ্ছে Dr. Nansen.

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরে)

বিমান বারান্দাটুকু অতিক্রম করিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াছে মাত্র পারুল ক্ষিপ্রপদে আসিয়া, ঠিক তাহার পিছনটিতে দাঁড়াইয়া কহিল—একটু দাঁড়ান—আমার চাকরকে দিয়ে গাড়ী আনিয়ে দিচ্ছি—ওঁকে নিয়ে যান।

বিমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নারীর আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু ও যে যেতে চায় না সুন্দরী ?

হঠাৎ এই 'সুন্দরী' শব্দটা ঠিক একগাছা লম্বকের চাবুকের মত পারুলের সুকোমলনাবৃত পৃষ্ঠের উপরে পড়িতেই পারুল বিদ্যুতের মত একবার কাঁপিয়া উঠিল, তখনই স্থির হইয়া গেল, বলিল—আপনি নিয়ে যান।—বলিয়াই সে মুখখানা দেওয়ালের পাশে রুক্ষ করিল। মুহূর্তে তাহার মুখের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, পাছে তাহা অন্যের দৃষ্টি গোচর হয়, নারী কথা বলিয়া আর সে-মুখ দেখাইতে পারিল না।

বিমান আপন-মনেই বলিল—ও ত ছেলে মানুষটি নয়, সুন্দরী···

আমাকে আপনি বেজা বলে ডাকুন।—সে আহত অধের মত কথা কয়টি বলিয়াই, কাঁদিয়া ফেলিল। অবগুণ্ঠনের দুইদিক টানিয়া মুখে চাপা দিতে দিতে বলিল—গরীব অভাগিনী বলে ব্যঙ্গ করা আপনার শোভা পায় না।...পারুল উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ রোধ করিতে লাগিল।

বিমানের মনে পড়িল, এই মাত্র অজিত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, সে নাম তার মনেই ছিল—বলিল, বাদ করব কেন পারুল।

পারুল তেমনি আবৃতমুখে অশ্রুপূর্ণ স্বরে কহিল—তা'ও না, রাজার মেয়েমানুষ,—বাজারের বেজা যে, তাকে তাই বলেই ডাকুন—আপনি।

বিমান স্তম্ভিত হইয়া গেল, একমুহূর্ত রমণীর সেই রোরুদ্যমানা মূর্তির দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—পারুল...

পারুল হঠাৎ সেইখানে বসিয়া পড়িয়া সিঁড়ির দিকে দুই হাত বাড়াইয়া, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আমার নাম ধরে আপনি ডাকবেন না। অন্য যা খুসী আমায় তাই বলুন···

বিমান সাশ্চর্যে কহিল—কেন পারুল ?

এবার রমণী মুখফেরান দাঁড়াইয়া উঠিয়া অনন্ত স্বরে বলিল—আপনি কি মানুষ ন'ন ? শুনেছি আপনি কবি, চিত্রকর, হৃদয় বলে কি কোন জিনিস আপনার নাই—বলিতে বলিতে নারী আপনিই বিব্রত হইয়া পড়িল।

বিমান নির্বাক বিস্ময়ে রমণীর পানে চাহিয়া রহিল। এই ছলনাময়ীর সহিত সে নাকি আগেও একদিন বিরোধ করিয়া গিয়াছিল, সহসাই তাই তাহার মনে হইতেছিল, এও কি সেই ধরণের এক অভিনয়। পুরুষধরা ফাঁদ ! নারী জানে, নারীর চোখের জলে গলিয়া না যায়, এমন পুরুষ ত বিধাতা সৃজন করেন নাই, তাই সেই শেষ সম্বল প্রয়োগে নারী আপনার অধিকার সাব্যস্ত করিতে চায়। কিন্তু এ তার বুদ্ধির এ কথারেই অতীত যে তাহার নাম ধরিতেও কিসের এত আপত্তি ? ইহার ভিতরেও কলাকুশলা রমণীর কোন গোপন অভিসন্ধি নাই ত ?

রমণী হঠাৎ মুখ তুলিয়া বারান্দায় ঝুঁকিয়া ডাকিল—কালীচরণ। একখানা গাড়ী আন ত—ডাক্তার বাবুর যাবেন।

ঠিক সেই সময়ে অজিত শালখানি গায়ে জড়াইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল—না কালীচরণ, গাড়ীর দরকার নেই।—বিমানের সম্মুখীন হইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—বিমান দা ! তোমাকে আমি দেবতা বলেই জানতুম। তোমার মত ভালোবাসা কাউ-কেই আমি বাসতে পারি নি, তোমার চেয়ে ভক্তিও কাউকে কোনও দিন করি নি কিন্তু আজ এ-কি করলে বিমান দা, আজ যে তোমাকে বন্ধু বলে ডাকতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যাচ্ছে। বিমান দা ! ওর নারীত্বই তুমি দেখলে কিন্তু সেটা ঐ রমণীর দেবীত্ব ওর হৃদয়ের মহত্ব—যা ওর সুন্দর মুখের ওপর দেবতার আশীর্বের মত মাখান রয়েছে, সে'টা তুমি দেখেও দেখলে না—অপরাধ...

পারুল আকুল স্বরে বলিল-না, না, ওরকম আপনি কি ওঁকে বলছেন অজিত বাবু···

তুমি চুপ কর পারুল, তোমাকে আমি বলি নি। বিমান দা ! তুমি যাচ্ছ, যাও, বাধা দেব না, দেবার ইচ্ছা, অধিকার আমার কিছুই নেই কিন্তু যাবার আগে এই

কথাটা আমায় শুনে যাও যে এই পারুল, হোক সে—যেমন এর যা মহত্ব আমি দেখেছি, যা দেখবার আগেই তুমি চোখ ফিরিয়ে নিলে, যদি দেখতে—তোমার কাব্য, তোমার চিত্র—সব তোমার কাছে নিষ্ফল, ব্যর্থ মনে হো'ত। সারা জীবন কল্পনার পেছনে ছুটেছ, সত্য ত দেখ নি, সাহস পাবে কোথায়?—অজিত থামিল।

বিমানের মুখে কথা নাই। এ-যেন এক ভৌতিক ব্যাপার। সিঁড়ির সেই ধাপটিতে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, কোন্‌দিকে চাহিয়া, কে জানে! রমণী স্তিমিতনয়ন নেত্রে সম্মুখে দণ্ডায়মান আর দীর্ঘ দীর্ঘ কায় রুক্ষকেশ মলিন মুখ অজিত একহাতে রেওয়াল ধরিয়া বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—বিমান দা' এই নারীর ভেতর আমি মাতৃমূর্ত্তি দেখেছি,—স্নেহে অচেতন, চাইতে পারি না, কথা কইতে পারি না, মনে হ'য়েছে যেন সেই বাল্যকালে ফিরে গিয়ে আমি আমার মার কোলে শুয়ে আছি। কি দিন কি রাত্রি, মার আর ঘুমে আয়েস নেই, তাঁর অসুস্থ সন্তানকে কোলে করে বসে আছেন। যখন চোখ খুলতে পেরেছি, দেখেছি, ঠিক তাই। ঘর আলো-করা, রূপ নিয়ে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী আমার শিয়রে উপবিষ্ট। বিমান দা, পত্নীর সেবা লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে নি, যদি কখন ঘটে, দেখবার ইচ্ছে আছে, সেও এমনি সেবা করতে পারে কি-না। ভাগ্যবলে যদি কোন দিন কন্যা পাই, দেখব সে'ও এমন প্রাণ-ঢালা সেবা করতে পারে কি-না! আর এ-সব যদি কোনদিনই না পাই, এই এক পাওয়ার আনন্দই আমার সব না-পাওয়াকে পূর্ণ করে রাখবে। মা'র, স্ত্রীর, কন্যার সেবা সব একই সঙ্গে ঐ দু'টি হাত দিয়ে আমি পেয়েছি। অথচ ও আমার কে বিমান দা? কিসের সম্পর্ক? দু'দিনেরই বা সম্পর্ক! আর কিসের লোভেই বা সে এতটা করেছিল বিমান দা? অর্থ? এই বাড়ী দেখছো, ঐ সুসজ্জিত ঘর দেখলে? অর্থে সে আমার মত অনেককে কিনতে পারে। তবু...অজিত এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পারুলের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল—অসুখ হ'য়েছিল, দেখতে এসেছিলুম, তাও খুব বেশী দিন নয়, বিমান দা, চারদিন, তা'ও বিনি পয়সায় নয়। চারদিন স্নেহের ঋণ নিয়েই অন্যায়ে এসে পড়ি, এখানে এসেই...

বিমান কম্পিতপদে বারান্দায় উঠিয়া পারুলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—পারুল, আমারই অন্যায়। আমি বুঝতে পেরেছি, আমারই অন্যায়। আমায় মাপ কর পারুল।

পারুল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু এই স্নেহের সম্ভাষণ তাহার সহিল না, সর্ব্বদেহ তাহার কাঁপিয়া উঠিল, পদদ্বয়ের শক্তি হারাইয়া ফুতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল—না, না, ওকথা বলবেন না। সবাই ত আমাদের ঘৃণা করে—আপনিও করেছেন, তা'তে কিছু অন্যায় হয় নি আপনার।

বিমান নত হইয়া পারুলের একখানা হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল—পারুল তোমার এই পরিচয়ই আমি চেয়েছিলাম। সেদিন পাই নি, বড় হতাশ হ'য়ে ফিরে গেছলাম। তারপর জানিনা কার দয়ায় আজ আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ল। পারুল তোমায় চেয়ে আমি বয়সে বড়ই হব, তোমাকে পারুল বলেই আমি ডাকব, তুমি আমায় দাদা বলো! আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন। ওঠ দিদি, ওখানে বসে কেন ছিঃ ওঠ! আর ত তোমার লজ্জার কারণ নেই বোন্—যে পরিচয় আজ তুমি দিয়েছ তা যে দিতে পারে সে কি তুচ্ছ। ওঠ।

ও-কি বোন্ উঠছ না কেন, অমন মানুষের মত পরিচয় দিয়ে এই দৌর্ব্বল্য কি তোমার সাজে দিদি? ওঠ।

পারুল উঠিল না। বাষ্পপূর্ণনেত্রে বলিল—আমাকে আপনিই যে প্রথম মানুষ চিনিয়ে দিয়েছিলেন বিমানবাবু। তার আগে কি আমি মানুষ চিনতাম। মানুষের আদর কর্ব্বার, মানুষকে সেবা কর্ব্বার, মানুষকে মানুষ বলে নেবার শিক্ষা যে আমি আপনার কাছেই শিখেছি। আপনি যদি সেদিন অমন করে' না যেতেন, কোনদিনই ত আমি মানুষ চিনতে পারতাম না বিমানবাবু। মানুষকে পশুর মতই পেয়েছি, পশুর আদরই তাকে দিয়েছি, তাই পেয়ে সে সন্তুষ্ট হ'য়ে গেছে—মানুষ সেই ত প্রথম দেখলাম যেদিন আপনি এই সিঁড়ির সামনেই আমার সকল দর্প চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেলেন।

অজিত সবিস্ময়ে কহিল—তুমি চেনো পারুল?

চিনি, চিনি অজিতবাবু। সেকথা আপনাকেও বলতে পারি নি। আর কোন্ মুখে বলব বলুন। সেদিন

শ্রীরামপুরে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনে সে কি আঘাতই না!

শ্রীরামপুরে? সে-কি? বাদশগোপালের মেলায়—সে কি তুমিই পারুল?

পারুল নতমুখে বলিল—অজিতবাবু, আমিই সেই অভাগিনী! কিন্তু সেই আঘাতেই আমার কাজ হ'য়েছে। যা কোনদিন হ'ত না, হবার কোন আশা ছিল না, তাই হ'য়েছে। আসল মানুষ চিনে পেয়েছি—আর···

আর কি পারুল?

অজিতবাবু! সবাইয়ের ইচ্ছে মানুষ হয়, কেউ পারে, কেউ পারে না। জানি-না এই ঘৃণিত পথের নারীর মনে আজ···না থাক্। আপনারা আছেন—বলিয়া সে ভূতলে মাথা রক্ষা করিল।

বিমান সস্নেহে বলিল—আমরা মাঝে মাঝে এসে তোমায় দেখে যাব পারুল! তুমি আমাদের আত্মীয়বৎ আচরণ করেছ···

পারুল নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল—আমার মা আছেন, তিনিই দেখ্‌বেন!

মা? তোমার মা? কৈ পারুল? তাঁকে ত কোন দিন আমি দেখিনি, পারুল?

আছেন। খবর দিলেই আসবেন। আমি এখনই খবর দিচ্ছি, তিনিই দেখবেন।

অজিত অন্ততঃ বিস্মিত হইয়া গেল। পারুলের এ কি আচরণ? এ কি সেই পারুল যে অনাহারে অনিদ্রায় তাহার শিয়রে বসিয়া দিনরাত এক করিয়াছিল! একি সেই! সবিস্ময়ে বলিল—আমাদের আসতে দিতে তোমার আপত্তি কি পারুল?

আপত্তি! আপত্তি নয় অজিতবাবু! এত সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে সইবে না! বড় দুঃখিনী আমি!—আবার সে মুখ ঢাকিল।

বিমান বলিল—কিন্তু তা ত হ'বে না বোন্!

বোন্?—পারুল যেন স্বপ্নভঙ্গে শিহরিয়া উঠিল।

বিমান বলিল—তা ত হ'তে দিতে পারব না পারুল। আমার এই ভাইটার দুঃসময়ে তুমি যা করেছ, আমরা যদি তোমাকে অবহেলা করি তাতে-যে ভগবানের কাছে অপরাধী হব। তুমি কুণ্ঠিত হ'চ্ছো কেন পারুল? কুণ্ঠিত হবার তোমার ত কোন কারণই থাকতে পারে না, দিদি! আজ তবে আসি পারুল, আর একদিন আসব। আয় রে অজিত, রাস্তায় একখানা গাড়ী ধরে নিলেই হ'বে।

অজিত পারুলের দিকে ফিরিয়া বলিল—আমার কাপড় চোপড়গুলো থাক আর একদিন নিয়ে যাব তখন। চলুন, পারুল!

পারুল নিঃশব্দে মাথাটি ভূতলে রক্ষা করিল, কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না। যখন এই দুজনের পদশব্দ দূরে লীন হইয়া গেল, তখন সে সেইখানেই আলুলায়িত বসনে লুটাইয়া পড়িয়া সেই অন্ধকারের তিন মাসের কথা স্মরণ করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায়! আজ যদি সে সেইখানেই থাকিত, যেখানে, যে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিল, সেইখানে যদি তাহার কাছে থাকিত!

কালীচরণ কান্না শুনিয়া উপরে আসিতেই পারুল বলিল—মা'কে এখুনি ডেকে আন কালীচরণ! পায়ে ধরে বল সে কালীচরণ! যেমন করে পারো, মার রাগ মিটিয়ে তাঁকে এনে দাও কালীচরণ। আর এই হার ছড়া তোমার।—বলিয়া সে বৃদ্ধ নটবর প্রদত্ত বহুমূল্য হারগাছি কালীচরণের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া অজিত বস্ত্রখানা বুকের উপর চাপিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

* * * *

তিনদিনের দিন বিমান অজিতকে সঙ্গে লইয়া পারুলের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাইয়া নামিতেই কালীচরণ অশ্রুসজল মুখে বলিল—ডাক্তারবাবু, দিদির ঘরে আপনার কাপড়-চোপড় আছে, দাঁড়ান এনে দিই।

পারুল কোথায়?

কালীচরণ বলিল—কি জানি কোথায়, কাহাকেও বলিয়া যায় নাই। গয়না-গাঁটি, বাড়ীর দলিলপত্র সব ফেলিয়া পরশু রাত্রি হইতে কোথায় গিয়াছে, কাহাকেও বলিয়া যায় নাই।—চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে ভিতরে কাপড় আনিতে গেল।

পারুলের মা হাউ-মাউ করিতে করিতে আসিয়া বিমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—হ্যাঁ, বাবা, ডাক্তার বাবা, এই কি কলির ধর্ম বাবা! মেয়েটার মাথায় কি করে দিয়ে গেলে বাবা! শেষে কি-না এক বস্ত্রে পালিয়ে গেল!

বিমান অজিতের হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দিল। ভিতরে বসিয়া অকস্মাৎ দুই হাতে অজিতকে জড়াইয়া ধরিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল— ভুল করেছি, অজিত ভুল করেছি, গোড়া থেকে আমিই ভুল করে এমন রত্ন হেলায় হারিয়েছি।

কালীচরণ কাগজ আনিয়া আর তাহাদের দেখিতে পাইল না।

পাত্রদের এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কোন কারণই কেহ অদ্যাবধি আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

সমাপ্ত

আক্ষেপ

(বর্ত্তমান সংখ্যার বাদল গোপাল পাঠে—)

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

(ইংরেজী থেকে)

Lander.

আজি কেন পড়ে তারে মনে,
তারে কভু, বাসিনি ত ভালো,—
সাধ যায়, দিদি' তার সনে,
হৃদয়েতে আজি প্রেম ঢালো।
কথা তার নাহি শুনি' কাণে,
চলি' আসি, গিয়াছি হেলায়—
টলি নিজ', তার প্রেমদানে,
সন্ধ্যা, কিবা প্রভাত বেলায়।
আজ, শুধু, মনে হয় মোর,—
যদি তার একটিও বাণী
শুনি, তবে হইবে বিভোর,—
আপনারে যাব বলে জানি'।
চলে গেলে, অবজ্ঞার ভরে,
চোখে তার ভরি' নেত্র জল;
শুধু, তার, হিয়া, মোর তরে;
শুধু কাঁদ করেছে কেবল।

আমি, যারে নাহি পাই ফের,
হিয়া, মোর, না ভরে বাথায়,—
এই, তার ছিল, সাধ শেষ,
কি ভাল সে বাসিত আমায়।
বেসেছি যে ভাল আমি তারে
—বহুদিন পরে হায় আজ।
আর সে কি মোর গৃহ দ্বারে,
আসিবে না সাধ করি কাজ?
এতদিন, তার ভালবাসা,
ঘৃণাভরে, ফেলেছি ঘুলায়;—
আজি, মোর, সব সাধ আশা,
তাই, সে কি ত্যজিল হেলায়?
সে, যখন গেল চির তরে,
আমি তারে, চিনেছি তখন,—
তার, হিয়া, যে ব্যথার ভরে
দিছি, আজি, বুঝি সে বেদন।

গ্রন্থ সমালোচনা

লুপ্তস্মৃতি। শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, মূল্য ১৷৷০ মনোরঞ্জনবাবু একজন উকীল এবং প্রৌঢ়ত্বের সীমার মধ্যে পা দিয়াছেন অতএব জনসমাজে তাঁহার বহিটির ভূমিকা দেওয়া বলিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার বেশ সহজ ভাবেই তাঁহার মনের কথা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেও বাগাড়ম্বর নাই ভাবের বিদ্যুৎচমক নাই, সহজ কথা ও সহজ ভাবে উপন্যাস খানি পাঠকের নিকট এগ্রন্থের আদর হওয়াই স্বাভাবিক। বহিটির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই-প্রথম শ্রেণীর। মনোরঞ্জন বাবু সহজ প্রতিভা উকীল, ছুটি হইলে নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়া অবসর সময়ে অতিরিক্ত করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান গ্রন্থকার বাণীর সাধনায় একবার সেই অবসর সময় যাপন করেন, তাহারই ফল এই 'লুপ্তস্মৃতি'। বঙ্গবাণীর মন্দিরে এইরূপ সাধকের আগমন প্রার্থনীয়। বহিটির ভাষার মধ্যে মধ্যে একটা দোষ দেখাযায়। কথ্য এবং পাঠ্য ভাষার সংমিশ্রণে-অনেকসময় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে, আশা করি গ্রন্থকার পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণের সময়ে এদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শুচি ও অশুচি বিচার।
শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২২শে পৌষ শনিবার ১৩২৯, ইং ৬ই জানুয়ারি। [২৩শ সংখ্যা

ঘরে বাইরে।

বড় দিনের বাজার
ঘরে ও বাইরে
"বোতল কিন্তু ভর্ত্তি"

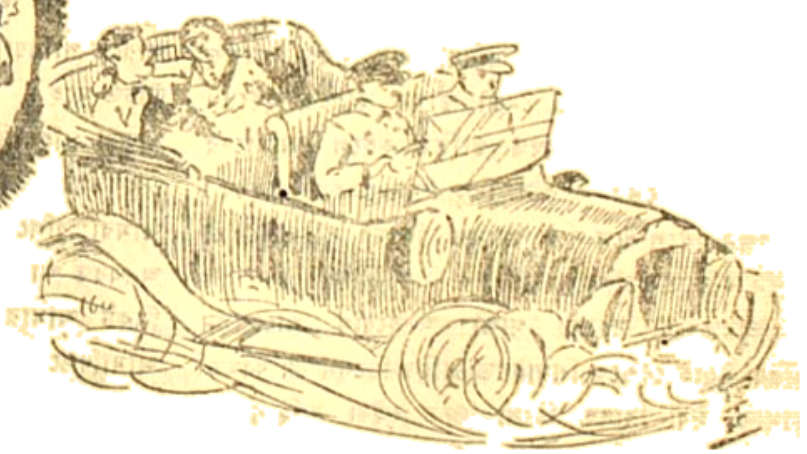

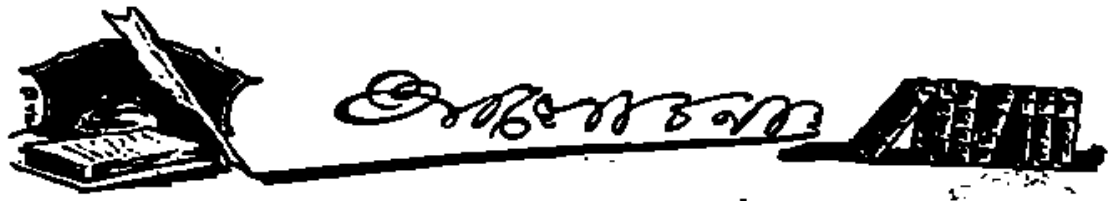

ভারত রাষ্ট্র মহাসভার ৩৭ বার্ষিক অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশবাসী বর্ত্তমান যুগের মহাসভার সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহে উদগ্রীব হইয়াছিল, আজ সে অভিভাষণে চিত্তরঞ্জনের বাণী শুনিতে পাইয়াছে। দেশবন্ধু বলিয়াছেন আমাদের গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকেন্দ্র স্থাপিত করিতে হইবে, আমার সেইগুলির সমষ্টি মিলাইয়া বড় কেন্দ্র গড়িতে হইবে, সকলের উপর প্রধান কর্ত্তারূপে সেই কেন্দ্র থাকিবে।

ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই এই পল্লী শাসনপ্রণালী। আজ বিলাতের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা সহর চিনিয়াছি. সহরের ইট পাথর আমাদের আপন হইয়া গিয়াছে আর আমাদের সত্য শ্যামলা পল্লীগুলি সংস্কারাভাবে, লোকাভাবে এক একটী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, হইতেছে। এতদিন আমরা এই ইস্পাৎ পাথরে গড়া সহরের চাকচিক্যে আপনা-হারা হইয়া কাটাইয়াছি, আজ ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা যদি আমাদের পল্লীবাসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন, তবে স্বরাজ উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার দিকে দিকে পল্লীকেন্দ্রও গঠিত হইবে, আমাদের কার্য্যস্থানের পরিসরও বাড়িয়া যাইবে।

• • • •

চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, এসিয়াখণ্ডের সমস্ত দেশও জাতির মধ্যে আমাদের মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে। এসিয়ার সহিত প্রণয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আমাদের স্বাধীনতা লাভের একটা দিক মুক্ত হইয়া যাইবে। প্রয়োজন হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশ্বের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিব।

ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন করিয়া ইহাই দেশকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন যে কামড়া কামড়ি, ঈর্ষা বিদ্বেষ, হিংসাবর্জ্জিত হইয়া অহিংসভাবে ভারতকে পৃথিবীর সমক্ষে স্থাপিত করিতে। বর্ত্তমান আন্দোলন যে অহিংসা মন্ত্র প্রচারেরই আয়োজন তা অন্য কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, আমরা ভারতবাসী সে কথা বিশ্বাস করি। আমাদেরই বুদ্ধদেব এই মন্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, আমাদের চৈতন্যদেবই ভারতে প্রেম বিতরণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, অধুনা আমাদের মহাত্মা গান্ধী এই অহিংসা মন্ত্রই শিক্ষা দিতেছিলেন। স্বাধীনতা, স্বরাজ আমাদের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপথে পৌঁছিতে আমাদের এই অহিংসা মন্ত্র সাধন করিতে হইবে। দেশবন্ধু দেশবাসীকে মহাত্মার অহিংস অসহযোগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

যাহারা দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশের প্রকৃত হিত চিন্তা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলাদলি ও ব্যক্তিবিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছেন, সভাপতির অধিবেশনে দেশবন্ধু তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন:—

আমাদের বিরুদ্ধে এ কথা বলা হইয়াছে যে, আমরা মুখে প্রেমের বুলি আওড়াইয়া—বিদ্বেষের বাণীই প্রচার করিতেছি। এমন ঘৃণিত অভিযোগ আর কখনও দেওয়া হয় নাই। হইতে পারে আমরা প্রেমের আদর্শ পালন করিতে সফল হই নাই, হইতে পারে আমাদের পক্ষের কাহারও কাহারও মধ্যে বিদ্বেষের ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ত আমাদের দুর্ব্বলতা অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের আদর্শের উৎকর্ষ দেখিয়া আমাদের বিচার করা উচিত, আমরা কি করিতে পারিয়াছি তাহা দেখিয়া আমাদের বিচার করা উচিত নহে। যেখানেই আমরা সেই আদর্শের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি, সেখানেই তাহার কারণ আমাদিগের দুর্ব্বলতা। ভারতীয় জাতির মহাসমিতির পক্ষ হইতে আমরা বলিতেছি যে, আমরা কপটাচারী নহি। যাহারা অনবরত আমাদিগের ত্রুটী দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই—"যদি আপনারা আমাদিগকে দুর্ব্বল মনে করেন, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত যোগ দিয়া আমাদিগের শক্তি বর্দ্ধিত করুন।" যদি নেতাদিগকে অপরাধ মনে করেন, তাহা হইলে আসিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করুন, নেতারা সরিয়া দাঁড়াইবে। যদি আপনারা আমাদের আদর্শই বিশ্বাস না করেন, তাহা

•

"অধিকন্তু সেই আদর্শের মাপকাঠিতে আমাদিগের কার্য্যের ফলাফল বাহির করায় লাভ কি ?"

লাভ যে কিছুই নাই বরং সমূহ ক্ষতিরই সম্ভাবনা তাহাতে তাঁহারও না বুঝেন, তাহা নহে। তবে আমাদের যে গোড়ায় গলদ রহিয়া গেছে। আমরা যে একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। সে আগ্রহ নাই, সে প্রাণ নাই, প্রাণে সে ঐকান্তিকতা নাই। এখন আমরা সব চেয়ে সহজ ও অল্প শ্রমের কাজটুকু করিতে পারি। তাহাতে আমাদের উদাসীন্য ত নাই-ই বরং প্রচণ্ড ঐকান্তিকতা বর্ত্তমান। আমরা কর্ম্মী নহি, তবে কর্ম্মের সমালোচনা করিতে না পারি এমন অপবাদ পরম শত্রুতেও আমাদের দিতে পারিবে না।

• • •

ব্যবস্থাপক সভা প্রবেশ ও বর্জ্জন সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলিয়াছেন—ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটা বৈদেশিক পদ্ধতি ভারতীয় জনসাধারণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। এই বৈদেশিক পদ্ধতিকে স্বরাজলাভের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিতে ভারত কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমি বহুবার বলিয়াছি যে আমি পার্থক্য কতি কখনই হিসাব করি না, স্বরাজের প্রকৃত ভিত্তির জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বার্থত্যাগ করিতে রাজি আছি এবং সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ৭ বৎসরে না হউক ১০ বৎসরে এমন কি ২০ বৎসরে লাভ হইলেও তজ্জন্য আমি কোন বাধা দিবাই না। একটা জাতির ইতিহাসের পক্ষে কয়েকটা বৎসর কিছুই নহে। আমি এই কথা বলি, ভারতবর্ষ এই প্রকার শাসন প্রণালীকে কখনই স্বরাজের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই এই ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমরা বাহির হইতে ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে বর্জ্জন করিয়া আসিতেছি। আমরা এই বিষয়ে অনেকটা সফলকামও হইয়াছি। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রতিপত্তি দূর হইয়াছে। দেশের লোক সবাই জানে যে যাঁহারা উহার সদস্য আছেন, তাঁহারা জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন। কিন্তু আমরা অনেকদূর কৃতকার্য্য হইলেও এখনও ব্যবস্থাপক সভাগুলির অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। উহার ভিতরে ঢুকিয়া আরও কার্য্যকরী উপায়ে উহাকে বর্জ্জন করাই সম্প্রতি কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। এই কাউন্সিলগুলি আমলাতন্ত্রের মুখোস মাত্র। আমলাতন্ত্রের মুখ হইতে উহা ছিন্ন করিয়া ফেলাই বর্ত্তমানে আমাদের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য। আমার মতে বর্জ্জন বলিতে অসহযোগ অপেক্ষা আরও অধিক বুঝায়। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের অর্থ এই যে, আমাদিগকে এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে বাজারে বিলাতী জিনিষ না থাকে। আমার মতে সংস্কার আইনের ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্জ্জনের অর্থও এই যে, আমাদিগকে এমন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে এই কাউন্সিলগুলি আমাদের স্বরাজলাভের পক্ষে পরিপন্থী হইয়া থাকিতে না পারে। কাউন্সিল বর্জ্জনের একমাত্র সার্থকতা এই যে, ঐ গুলিকে আমাদের স্বরাজের উপযুক্ত উপায় স্বরূপ করিয়া তুলিতে হইবে, অথবা ঐ গুলির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। এই ভাবে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতেই আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি।

• • •

অবশ্য চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব কংগ্রেসে গ্রহণ্য হয় নাই। কংগ্রেসে প্রস্তাব বাতিল হওয়ায় কেহ দুঃখিত নন। তবে কথা এই হইতেছে যে এই বর্ষের কংগ্রেসে যে দুইটী দলের সৃষ্টি হইল তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা শঙ্কান্বিত হইয়াছি। এই দলাদলিই জাতির সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ভারতের অতীতেতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যে আবার সেই দলাদলির সৃষ্টি হইল সেইটাই আক্ষেপের কথা।

• • • •

ভারতের কারাগার দিনদিন পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হইতেছে। ভারতের সকল মহাপুরুষই একে একে কারাবাস করিতেছেন। জগতের মানবজাতির মহাত্মা আজও ভারতের কারাগারে, আমার জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যও কারাগারে প্রেরিত হইলেন। যে কারাগারে মহাত্মার পদরেণু পড়িয়াছে, জগৎগুরুর পদধূলি স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছে, সে আর কারাগার নয়—ভারতের, ভারতের মানবের মহাতীর্থ।

•

সহরের ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘট এখনও মিটে নাই; তবে যে মিটিবে তাহাও বলা যায় না। কোম্পানী যেরূপ গোঁ ধরিয়া বসিয়াছে তাহাতে তাহারা যে হতভাগা ধর্ম্মঘটকারীদের কোনি কথাতেই কাণ দিবে না তাহা যেন বুঝা যাইতেছে। তার গতিক যেরূপ, তাহাতে ঐ হতভাগাদেরই আবার নতজানু হইয়া কর্ম্মপ্রবেশ করিতে হইবে। যেহেতু তাহারা দরিদ্র, তাহারা ভারতের অধিবাসী, তাঁহাদের ধর্ম্মঘট করিয়া বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না, থাকা অ-ভায়! আর কোম্পানী Incorporated in England ভারতের শাসনকর্ত্তার জাতির দ্বারা সু-গঠিত ও সু পরিচালিত। ধর্ম্মঘটকারীদের প্রকৃত অভিযোগ কি এবং তাহা সত্য কি-না দেখিতে খোঁজ লওয়া এই কোম্পানী অপমানকর মনে করেন। তাঁহাদের অধীনস্থ লোকগুলির দুঃখ দুর্দ্দশায় কর্ণপাত করিতে তাঁহাদের কর্ণরোধ হয়, তাঁহাদের কাছে যে ধর্ম্মঘটকারীরা ন্যায় বিচার পাইবে তাহারও আশা নাই। আবার দেশবাসীর কাছেও ইহারা সহানুভূতি পায় না। আজ যদি কোম্পানী টাম্স ঝিরিঝির-পদপাল আসিয়া ট্রামগাড়ী চালায়—এ হতভাগা দেশের আত্মসর্ব্বস্ব বাবুভায়ারা আজই যদি ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া গন্তব্যস্থানে না যান ত কি বলিয়াছি। এমন যেহারা নির্লজ্জ দেশবাসীর কাছে সহানুভূতিরও আশা নাই। কাজেই বলিতে হয় ধর্ম্মঘটকারীরা মস্ত ভুল করিয়াছে। ধর্ম্মঘট করিয়া দুঃখ নিবারণের কাল এখনও আসে নাই। একতা ও সহানুভূতি না হইলে দেশের 'সে কাল' কখনও হইবে কি-না, তাই সন্দেহ।

বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ব

আগামী সংখ্যায় (২৪শ) বাষ্পাসিক গ্রাহকগণের মূল্য ফুরাইল। ২৪শ সংখ্যক কাগজ আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে বাকী ছয় মাসের মূল্য অগ্রিম অথবা নিষেধ পত্র না পাইব—তাঁহাদেরই ভিপিতে প্রেরণ করিব। যাঁহারা বাকী অর্দ্ধ ছমাসের গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একখানা কার্ডে সে কথা জানাইলে আমাদের আর অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। ভিপি অপেক্ষা মনি-অর্ডার সুবিধাজনক। গ্রাহকগণ যদি মনি-অর্ডারে টাকা পাঠান, সুবিধা ও সুবিধা হয়, বিলম্বও হয় না। যাঁহারা মনি-অর্ডার করিবেন না অথবা নিষেধ পত্র পাঠাইবেন না—আমরা ২৪শ সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র—৯ই মাঘ ১৩২৯ তারিখে ভিপি প্রেরণ করিব।

ইংরেজী নববর্ষ হিসাবে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজীর ছাপ এমন পরতে পরতে পড়িয়া গিয়াছে যে আমরা ১লা বৈশাখ অপেক্ষা ১লা জানুয়ারীটাকেই বেশী মনে করিয়া থাকি। বোধ করি বড়দিনের বাজারের হৈ হৈ রৈ রৈ—মহা চংয়ের জৌলুষে।

কলিকাতা—ভবানীপুর পোড়াবাজারে একটী নিখিল ভারত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রদর্শনী সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার ছিল, সে সুযোগ আর মিলিল না। গত মঙ্গলবার দিন অপরাহ্নে প্রদর্শনীটিতে আগুন লাগিয়া অধিকাংশ এবং মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারের বিপণিগুলি ভস্মে হইয়া গিয়াছে। আবার প্রদর্শনী খোলা হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। দেখা যাক কি হয়।

কিছু মিছু

ইরাবতী মন্ত্র বর্ষে সিমলায় মিঃ কে, সি, রায় ও আমাদের "ভারতবন্ধু" ষ্টেইসম্যান পত্রের সম্পাদক মিঃ জোন্স—সি-আই-ই খেতাব পাইয়াছেন। জোন্সসাহেবের জন্য হেতু! বেয়ার ষ্টেটের মানিনীর কি হইল?

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, স্বদেশসাহিত্যের স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠিত্রী "ভারতী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ মহাশয় 'রায় বাহাদুর' হইয়াছেন। অতঃপর রায়বাহাদুর স্বরচিতে সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও দেশপ্রীতির গৌরব রক্ষা করুন ইহাই কামনা।

আমাদের ছেলেবেলার "স্যার" অটিশচার্চ্চিল্ স্কুলের সহঃ প্রধান শিক্ষক ব্রজমাধব বসু রায়সাহেব হইয়াছেন। রায়সাহেবি তোষটায় আমরা যেন বাদ না যাই।

ঐ স্কুল আর একজন সাহেবকে একটা মস্ত খেতাব দেওয়া হইয়াছে। চায়ের দাম চার হিস্যেতে চলিয়া যাইবার আশঙ্কায় ছিপাড়ী যেমন হুলস্থুল করে, তেমন বাবাদের সাম্রাজ্য পদ ত্যাগের সময় গবর্ণমেণ্ট ছিপাড়ী কি সেই রকম কিছু করিলেন না কি?

আমাদের আরও কয়েকজন বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী সুধী নববর্ষে খেতাব পাইয়াছেন। তাঁহাদের আমলে আমরাও সহানুভূতি জানাইতেছি।

বড়দিন

সহরের আবহাওয়া বেশ ধার্ম্মিক গরম হইয়া উঠিয়াছে। পৌষের এই দ্বিতীয়ার্দ্ধ দিনেও সহরের গরম পড়িয়া গেল, বড়দিন—আসিয়াছে, বড়দিন আসিয়াছে। এই দুঃখ ভীষণ বর্ত্তমানের আশাহীন, উদ্যমবিহীন আনন্দহীন জাতির প্রাণেও যেন একটু চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে—বড়দিন আসিয়াছে। কেন বলা যায়, এই বড়দিন কথাটার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যেন একটা আনন্দ সংযোগ আছে, বড়দিন বলিতে মনোচীপায় কোন না-কোন একটী তারে ঝঙ্কার উঠে, আনন্দ-রাগিনীর একটী রেশ জাগিয়া উঠে।

অমন কেন যে এমন হয় তাহার কোন কারণই আমরা জানি না, খুঁজিয়া পাই না। অর্জ্জন, অনর্জ্জন-সত্ত্বেও, অর্থ-যোগ্য ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব-সত্ত্বে-প্রাণে-প্রাণে যে কিসের উল্লাস তাহা ত কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। তবে এটা বুঝিতে পারি যে এ আনন্দ আমাদের জাতির অন্তরের আনন্দ নয়, বিদেশীর সংস্পর্শে জাতির দুর্ব্বলতাই কবির আমোদের মত এই ক্ষীণ প্রাণ জাতির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আসল জাতি যেখানে, যেখানে প্রকৃত অধিবাসীর বাস যেখানে, সেখানে ইহার কোন সম্ভব নাই। সেখানের মাঠে ঘাটে তাহাদের বড় বড় পটবাস পড়ে না, সেখানের পথে ঘাটে এমন রঙ্গার রসকুলানো পণ্য, পাজাইয়া রোসনী বলে না, সেখানে চিরদিনের জীবনযাত্রার প্রাত্ত সরল ধারাটি অবিচলিত অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া যায়। জাতির সন্ধান করিতে হইলে, পাঞ্জাবের মাটীর, মর্ম্ম পুঁজিতে হইলে, যেসের প্রকৃত অধিবাসীদের দেখিতে হইলে এ বড়দিন ছোটদিনের কথা ভুলিয়া, এই আলোকবাসাসজ্জিতা মহানগরী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এখানে যেস নাই, যেসবাসীও নাই—এ বাঙ্গালীর পরবাস। এই পরবাসে পরের আনন্দে আমোদ করিয়া আমরা জাতীর জীবনের কতটা কাল কাটাইয়াছি, আরও কত কাল আমাদের কাটাইতে হইবে, কে বলিতে পারে! কিন্তু এই আমোদ প্রমোদ ময়ী পরবাসের বাহিরে যে জাতিটা পড়িয়া আছে আজ তাহাদের অধিকাংশই অন্নাগ্রস্ত, মৃতপ্রায়; এই সহরের বাহিরে যে সীমাহীন অন্তহীন ভূখণ্ড পড়িয়া আছে তাহাদের চিত্ত এখনও সহরের শিক্ষিত অধিবাসীদের মত অসার ও আপনা-হারা হইয়া পড়ে নাই। আজ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে, যাহারা এই যেসের উন্নতি করে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে যুঝি সেই অভাগাদের উপর সেই সম্পর্কশূন্য ভূখণ্ডের উপরই গিয়া পড়িয়াছে। যাহাদের উন্নতির বলিতে কিছু নাই, অবনতি কাহাকে বলে সে জ্ঞান যাহাদের নাই, যে যেসের কোন অংশে মরুবলে আলোক জ্বলে না, পাখাই চলে না, সেওয়াল ঠেলিয়া তোমরজীর উৎস উৎসারিত হয় না—আজ যাঁহারা যেসের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সহরের বাহিরের সেই মনস্তত্ত্বি আর সেই মাটী ছাড়া কাজ করিবার তাঁহাদের সুযোগ নাই। সহরের পথ ঘাট যেমন প্রাণহীন, মানুষের প্রাণগুলিও তেমনি আপনা-হারা। যাহারা আপনার ভাল চিনে না, তাহাদের দ্বারা অন্যের ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

যাহা সহর খুঁজিলে অর্থবানের সংখ্যা বলা কঠিন হইবে না, কিন্তু দুঃখী যে সংখ্যাতীত, তাহার যে ইয়ত্তা নাই এ কথা বলিতেই হইবে। যে কয়জন ধনী বা সম্পত্তিশালী আছেন, তাঁহাদের ধরিয়া কোন কাজ হয় না। কোন তালুকদার ওয়ালা সেই সুবিধের ধনীর প্রত্যুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করিয়া সহরে হানা দেয় না; কোন বিলিতি বাদুকর বাঙ্গালার রাজধানীর অনুকরণে পয়সাওয়ালাদের পয়সার আশায় লম্বা ডিগাইয়া আসিতে পা বেয় না। এই অর্থভুক্ত নরকুল জাতির প্রত্যেকের উপরই তাহাদের ভেলকি পড়িয়া থাকে আর এ জাতিও এমনি হইয়া গিয়াছে যে এ প্রয়োজন বহন করিবার সামর্থ্য সে একেবারে হারাইয়া বসিয়াছে। এত কষ্টের পয়সা, উদরকে বঞ্চনা করিয়া, দেহকে কষ্ট দিয়া সে কবিদের আমোদের তরে কাহার দ্বারে পয়সা ঢালিয়া আসিতেছে! মা-লক্ষ্মীরাও তাবেন, আহা, বর্ষাধিকার দিন, বড়দিন, যাঁহারা একটু আমোদ করিতেছে না, হায় মা-লক্ষ্মী, আমোদ করা কি তোমার সন্তানদের একচেটে পাওনা? তোমার ত অভাব নাই যে তোমার সন্তান হইয়েলা কি আহারে জীবনধারণ করে, তুমি ত তাহার অন্নের দীন মলিনবাস দেখিতেছ, তোমার মুখে ও-কথা কেন মা? মোহাই জননী! এ অহেতুক করুণা সম্বরণ কর, জাতিকে আর অধঃপতিত করিও না। তাহাদের বলিয়া দিয়ো,

আনন্দ করিতে নাই, দুঃখীর ছেলে, দুঃখই যার জীবনের সম্বল, আমোদ করা তাহার সাজে না।

এক এক সময় এই দেশটাকে দরিদ্র বলিতে কেমন ভয় হয়। চোখে নিত্য দুর্দশা দেখিলেও কেমন সাহস হইয়া জোর করিয়া বলিতে যে আমাদের ঘরে পয়সা নাই, আমাদের স্ত্রী পুত্র ভগ্নী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকে, অন্নের অভাবে তাহাদের লজ্জা নিবারিত হয় না। যখন দেখি সহরের অলি-গলির ঘোরাকে বসিয়া মুদকের দল গ্যাসিটন সাহেবের বাবুদের মুলুকি আওড়াইয়া গাওয়াইতেছেন—কি হাকসলে আমির সেজ্ কি বলিয়া স্বামীকে না কিন্তু সেও গেল নিতান্ত কালের কথা। এখন এই অধীর আনার তাহারই অকর্ণে ঘোরা কাহিনী বিবৃত করিয়া ঘোড়দৌড়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে হাবুডুবু খাওয়াইতেছেন কিম্বা অরেঞ্জ উইলিয়াম নামক খিচিনীর কত ঘর যাহাদের কালে শিঙ্গ-বাদ্য বিরোল হইয়াছিল, তাহারাই নাম, ধাম ও স্থানের পরিচয় দিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, কিম্বা যখন দেখা যায় ঘোড়দৌড়ের না, কেবল এই কথাই যায় যার জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালী মাঠের অভিমুখে ট্রামগাড়ীগুলি নরমুণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া, স্ত্রী পুত্রের হত্যার কারণ হইয়া ছুটিতেছে তখন মনে হয় আমাদের কোন দুঃখই বুঝি অজিও ফেলা যেলিতে যায়? কি আমোদ পাও? কিন্তু নাই, আমাদের চেয়ে উন্নতাবস্থা বুঝি ঐ ইউরোপের সেতাঙ্গ-এ প্রশ্নের উত্তর এ মৃতপ্রায় জাতির মুখে মিলিবে কি-না সিন্দেহও নাই! কিন্তু এই কি আমাদের জাতির প্রকৃত স্বরূপ? যখন দেখি, বায়স্কোপ বন্ধির গলির সম্মুখে টিকিট আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা বৎসরের মধ্যে এই ঘরের দরজার টিকিট প্রত্যাশী বাঙ্গালীর ভিড়ে তিল বড় দিনের সময়ই বায়স্কোপও স্পর্শ করিয়া ধারণের স্থান নাই, তখন কি এই মনে হয় না যে এ পবিত্রতা লঙ্ঘন করিয়া আসেন। বলিলে বলেন, বড়দিন। জাতির মত আনন্দ অধিকার বুঝি আর কাহারও নাই, যার বাঙ্গালী বড়দিন তোমার? তোমার যে গরু দিন, কিন্তু আমরা কি সত্যই আনন্দ করিবার অধিকারী? তোমার দিন যোলবারে ছেয়ে ছোট, তোমার দিন যে আজো সহরের মাঠগুলি বায়স্কোপ-সার্কাসের তাঁবুতে রাতের চেয়ে অন্ধকার। তুমি বড় দিনের দোহাই দেও— হাঁহারা নিরাহে, আজও তাহারা বিজ্ঞাপনের টাকটিকে দীন কোন মুখে? কোন সাহসে—কিন্তু

"বাসন্তী" মুদ্রাযন্ত্র বিভাগের কর্ম্মচারীগণ বড়দিনের ছুটী লওয়া গত ৩০শে ডিসেম্বর ১৯ই পৌষের— ২৩শ সংখ্যক "বাসন্তী" প্রকাশিত হয় নাই। "বড়দিনের ছুটীর বিজ্ঞাপন ২২শ সংখ্যক বাসন্তীতে ছাপা হইবার কথা ছিল তাহাও হয় নাই। এজন্য আমরা দুঃখী স্বীকার করিতেছি।

সম্পাদক—

নারী মঙ্গল

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

সহস্র অমঙ্গল, অত্যাচার, উপদ্রবের মধ্যেও দেশবাসীগণ দেশসেবা করিয়া আজ নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। দেশের নরনারী সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে আজ দেশপ্রেমের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারী ও পুরুষ পাশাপাশি হইয়া আজ দেশসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশ জাগরণের এই আন্দোলনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন।

ভারত তাহার রাজনৈতিক জীবনে ও সমাজ-জীবনে অবসাদগ্রস্ত ও চারিদিক হইতে হীন হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যেক কার্য্য হইতে ভারতীয় মহিলাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আসিতেছিল। জীবনের অর্দ্ধাংশকে এভাবে দূরে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য ভারতীয়গণ তাহাদের পূর্ব জীবনে যে কত ক্ষতি ও অপমান সহ্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

যে মাতৃজাতি সন্তানের কল্যাণকামনায় যুগে যুগে সহস্র কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্তানকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন আজ সন্তানের জীবন হইতে সেই মাতৃশক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই ভারতের এই নীচ অধঃপতিত অবস্থা ঘটিয়াছে। আজ বন্দী স্বামীর জায়ারূপে ও বন্দী সন্তানের মাতারূপে ভারত রমণীগণ মাতৃজাতির গৌরব মহিমায় যে অপূর্ব্ব চিত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহা জগতের যে কোন বীর জাতির পক্ষেই অশেষ গৌরব ও সম্মানসূচক হইত, সন্দেহ নাই।

একদিন এই গৌরব মহিমামণ্ডিত অপূর্ব্ব স্নেহ করুণা ভূষিত ভারত মহিলাগণ নিজহস্তে স্বামী পুত্রকে রণ সাজে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, স্বামী ও পুত্রের সুখের জন্য নিজের সকল সুখ-বিলাস হাসিমুখে স্বচ্ছন্দ মনে বর্জ্জন করিয়াই সুখ উপভোগ করিয়াছেন, স্বামী ও পুত্রের সুখ সম্মানই নিজেদের পরম সৌভাগ্য মনে করিয়াছেন,—আজও ভারত মহিলা যে তেমনি আদর্শ স্থানীয় রহিয়াছেন নানা কার্য্যে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

দেশ জাগরণের এই শুভ মুহূর্ত্তে দেশের এই সঙ্কট সময়ে আজ দেশের পুরুষদিগকে পূর্ণভাবে নারীদিগকে তাহাদের সহায় করিয়া লইতে হইবে। সমাজ-জীবনে ও জাতীয়-জীবনে দেশের নারী ও পুরুষকে এক যোগে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। তবে দেশের সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবন আবার সুখ-সৌন্দর্য্যপূর্ণ, বল হইয়া উঠিবে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে দেশের পুরুষ-সমাজ যদি নারীকে তেমনভাবে সঙ্গিনী করিয়া লইতে না পারে তাহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী ও কন্যার লাঞ্ছনা ও অপমান দেখিয়াই যদি তৃপ্তি বোধ করে তবে এ জাতি সমাজ-জীবনে ও দেশ-জীবনে কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হইবে না।

দেশবাসীগণ আজ অত্যাচার ও বন্ধনের হাত হইতে মুক্তিলাভের আশাতেই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলনে সাগ্রহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জগৎপূজ্য মহাত্মা একাকী এ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নাই সঙ্গে তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী রহিয়াছেন, ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের যোগ্যা সহধর্ম্মিণীরাও স্বামীর কার্য্যে তাঁহাদের সহায়রূপে দাঁড়াইয়াছেন। মৌলানা সৌকৎ-আলি মহম্মদআলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা ও পত্নী তাঁহাদের পার্শ্বে হাসিমুখে দণ্ডায়মান। দেশের কার্য্যে নারী শক্তির সহায়তা কতখানি প্রয়োজন দেশ নেতৃগণের মাতা ও পত্নীরা তাহা পদে পদে দেশবাসীকে দেখাইতেছেন।

দেশের রাজনৈতিক জীবনের স্বার্থতার ও ত্রুটীতে দেশের সমাজ জীবনও পূর্ণ ভাবে গঠিত হইতে পারে না। সমাজ জীবন পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার অবকাশ না পাইলে দেশবাসীগণ দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধন হওয়া সম্ভবপর নহে। দেশের সমাজ জীবন হইতে সুপুত্র, সুকন্যা গঠিত হইয়া উঠে, এই সব পুত্র কন্যাদের দ্বারাই পরে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। নারীকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে সমাজ-জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমানের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া আমরা দেশের পুরুষগণ সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবনের যে দুর্দ্দশা আনিয়ন করিয়াছি আজ তাহা বুঝিয়া এখনও যদি আমরা আমাদের সে দোষ সংশোধনের চেষ্টা করি, তবে আবার দেশের সমাজ-জীবন আবার তেমনি সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিব।

নারী যে সমাজ-জীবনে প্রাণহীন কোন একটা বস্তু নহে—তাহারও যে হৃদয় আছে, তাহারও যে কার্য্য করিবার শক্তি আছে—দেশ ও জাতিকে গড়িয়া তুলিবার

কার্য্যে তাহারও যে বিশেষ অধিকার আছে তাহা [illegible] নারীসমাজ গান আজ ভাতি ভুলিয়া গিয়াছে, দেশের নারীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই অধিকার লাভের জন্য তাহাদের যোগ্যতা অর্জ্জনের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে, সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে নারীকে দেশহিতৈষীর যোগ্য সঙ্গিনীর আসন দিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন দেশে আজ ভ্রাতৃজাতি প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, এই প্রচার কার্য্যে তাঁহাদিগকে সকলের আগে দেশের নারীদিগের প্রাণ শক্তিকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে, সে প্রাণে আশা ও ভাষা দিতে হইবে। অত্যাচার সহনের ও বহনের ক্ষমতা নারীদের আর অর্জ্জন না করিলেও চলিবে, অত্যাচার সহিতে সহিতে এদেশের নারীরা পাষাণ প্রস্তরের মত হইয়া গেছেন। সমাজ-জীবনে নারীদিগের প্রাণ-স্পন্দনের সাড়া আমরা যেন আর পাই না, নারীদিগের মধ্যে আজ সেই প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তবে নারীর নারীত্ব গৌরবমণ্ডিত হইবে, তবে ভারতের সমাজ-জীবন, রাজনৈতিকজীবন আবার নরনারীর মিলনে পূর্ণ শ্রী সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

নারীরাও আজ তাঁহাদের গৌরব মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই দেশের সমাজ-জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের আজ এই দুর্দ্দশা। তাই দেশের নারীরা আজ হাসি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহাদের প্রাণস্পন্দনের পরিচয় আর আমরা পাই না। নারীও যে জীবন্ত প্রাণী তাঁহাদেরও যে সত্য প্রাণ আছে—সে প্রাণেরও যে যথেষ্ট কার্য্যকরী শক্তি আছে আজ নারীদিগের নিকট আমরা সেই পরিচয় পাইতে চাহি। ততটুকু আত্মবোধ নারীদিগের মধ্যে আসিলেই আর তেমন নারী নিগ্রহ বা নারীদিগের আত্মহত্যার খবর শুনিয়া দেশের দুর্ভাগ্য পুরুষদের কপালের শিরাগুলিকে হইবে না। প্রতিকারের ভার মাতৃজাতিকে বস্তুতঃ গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাদের আত্মবোধ ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের হতভাগ্য সন্তানদেরও আত্মবোধ ফিরিয়া আসিবে, তাহারা আবার মাতৃজাতির আদর ও সম্মান করিতে শিখিবে।

বিদায়

(L. G. Moberly.)

[শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বিদায়ের আগে দুইটি নিমেষ
জানাই তোমারে হে প্রিয় মোর,—
প্রতি দিবসের সুখ-সঙ্গম
মোদের মাঝে ফেলো একটু ভোর।
তব ও বিদায় সুধাময় পটে
মোর মুক্তি যেন পায় গো ঠাঁই,—
বরষের কোলে ও তব চুমিতে
আজি আর মোর দুখ নাই।

তোমার বারতা বন পরীরা
বহিয়া আনিবে আবার মেনে,
মোর হৃদয়ের গোপন কথাটি
পবন তোমারে জানাবে এসে।
ভরতের মেঘে মিলিব আবার,
এ যে ওগো চির সত্যবাণী।—
প্রণয় আমার চুমক সম
মোর পানে তোমা আনিবে টানি।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ভূপতিকে পাশে বসাইয়া শান্ত কোমল স্বরে তারকনাথ বলিল, "পায়ের চেঁকিকে গায়ের চাপ দিয়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ ভূপতিবাবু! হাতের চাপ দিয়ে তুলতে গেলে চেঁকিও ওঠে না, লাভের মধ্যে নিজের হাতেই আঘাত লাগে।"

ভূপতি নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারকনাথ বলিল, "আমি তখনই বলেছিলাম, এই ভাল মানুষির ফল একদিন ভুগতে হবে।"

ভগ্নকণ্ঠে ভূপতি বলিল, "কিন্তু আমি তখন জানতাম না যে, ঐ একরত্তি মেয়ে—ওর ভিতর এত ভেজ—"

তারকনাথ বলিল, "সাপের ছোট বড় নাই ভূপতি বাবু! সাপুড়েরা কি করে জান, সাপ ধরেই ছোট হোক বড় হোক, আগে তার বিষদাঁত ভেঙে দেয়, তারপর তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলিয়ে বেড়ায়। মেয়েমানুষ ঠিক সেই সাপের জাত। বিষদাঁত থাকতে হায় সাধ্য ওদের বশে আনে।"

ভূপতি নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তারকনাথ বলিল, "সেদিন যদি একবার সিয়ে আদালতে দাঁড়াতে, তাহ'লে সেই দিনেই কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যেতো। তাহ'লে আজ তোমাকে পায় কে। আজ যদি তুমি ওর গলাটা টিপে ধ'রে মুখের ভিতর ওষুধ ঢেলে দিতে, তাহ'লেও ওর মাথাটী নাড়বার সাধ্য থাকতো না। কিন্তু তুমি তো আমার কথা শুনলে না।"

আহতকণ্ঠে ভূপতি বলিল, "যত ভুল হ'য়ে গিয়েছে তারকবাবু।"

তারকনাথ তাহার একখানা হাত টানিয়া নিজের হাতের উপর রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "তা হোক, এখন আমার কথা শুনবে?"

ভূপ। শুনবো।

তার। তাহ'লে সোমবারে দিন আছে, সেদিন আমার সঙ্গে চল। আমার তো যেতে অমত করবে না?

ভূপ। তা ক'রবো না। কিন্তু—

তার। আবার একটা কিন্তু টানলে কেন?

ভূপ। টানছি এই কারণে যে, আর গিয়ে কি হবে?

তার। এই সম্পত্তিটা হাতে আসবে।

ভূপ। সম্পত্তিতে তো আমার তত দরকার নাই তারকবাবু।

তার। বেশ তো, তোমার দরকার বিবাহ। সম্পত্তিটা হাতে এলেই বিবাহে আর কোন বাধা থাকবে না।

মাথা নাড়িয়া ভূপতি বলিল, বিবাহে আর আমার রুচি নাই, তারকবাবু।"

তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া রোষ তীব্রকণ্ঠে তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

ভূপ। সত্যি। আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি।

তার। পরের মাথায় হাত দিয়ে এত বড় দিব্যি কত্তে হবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিবাহেই যদি রুচি নাই, তবে এত ছুটাছুটি কচ্চো কেন?

স্থিরস্বরে ভূপতি বলিল, "রুচি শুধু মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য।"

তারকনাথ একটু হাসিল; বলিল, "মনে করেছিলাম তুমি খুব সাদাসিধে লোক, কিন্তু এখন দেখছি, আমার চাইতেও তুমি চালবাজ।"

পরিষ্কার কণ্ঠে ভূপতি বলিল, "আমি জানি, আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বলছি তারকবাবু, মেয়েটাকে বাঁচান ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

তারকনাথের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। সে কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু বাঁচাতে পারবে কি?"

নৈরাশ্য ক্ষুব্ধকণ্ঠে ভূপতি বলিল, "বোধহয় পারলাম না। যে নিজে বাঁচতে চায় না, কার সাধ্য তাকে বাঁচায়।"

একটু ভাবিয়া তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু বাঁচাতে চাও কি?"

সোৎসাহে ভূপতি বলিল, "নিশ্চয়ই চাই।"

তার। কিন্তু সে কাজ এমন সহজে সিদ্ধ হবে না, একটু কৌশল অবলম্বন কত্তে হবে।

ভূপ। কি কত্তে হবে বলুন, আমি সেজন্য খুন খারাবি পর্য্যন্ত কত্তে রাজি!

তার। খুন-খারাবি কত্তে হবে না, কর্ত্তৃত্বটা আইন সিদ্ধ ক'রে নিলেই কাজটা খুব সহজ হ'য়ে আসবে। তখন আর কথায় কথায় তোমাকে এরকম কত্তে পারবে না, জোর ক'রে ওষুধ খাইয়ে বাঁচাতে পারবে।"

একটু ভাবিয়া ভূপতি বলিল, "জোর বেঁধিয়ে বাঁচাতে পারি না পারি, আজকার এই অপমানের প্রতিশোধটা বেশ নওয়া হবে তারকবাবু। আমি আপনার কথায় রাজি।"

হর্ষোৎফুল্লভাবে তারকনাথ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "এই তো 'গুড্ বয়ে'র কথা! তাহ'লে মনে থাকে যেন, পরশু সোমবার, কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে যেতে হবে।"

ভূপতি ইহাতে সম্মতি দিয়া বলিল, "কিন্তু পরশু সাহেব ডাক্তার আসবার কথা আছে।"

মুখে খানিকটা ক্লেশের কঠোরতা আনিয়া ক্ষুব্ধস্বরে সহকারে তারকনাথ বলিল, "কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে শুধু ধনক্ খেয়েছ, সাহেব ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুকলে মলাখাতা যাবে না তো?"

মস্তক সুইখানা নাড়া করিয়া ভূপতি মাথা নীচু করিল। তারকনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "সোমবার আদালত থেকে ফিরে এসে সাহেব ডাক্তারী, যদ কিরিজি যে কোন ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুকলে যদি কেউ তোমাকে একটা কথা বলতে পারে ভূপতিবাবু, তার জন্য আমি দায়ী রইলাম।"

ডাক্তার আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া ভূপতি পরদিন বর্দ্ধমান যাত্রা করিল। কিন্তু সে কথাটা গোপন করিয়া সে তারানাথকে বলিয়া গেল, "কাল সাহেব ডাক্তার আসবার কথা আছে। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চললাম।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

তারানাথ ঘরে ঢুকিয়া অনুপমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন?"

মুখের আচ্ছাদনটা একটু সরাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে অনুপমা উত্তর দিল, "ভাল।"

ঈষৎ হাসিয়া তারানাথ বলিল, "আপনি তো বরাবরই ব'লে আসছেন—ভাল আছি। একবারও তো বলেন নি যে, মন্দ আছি।"

অনুপমা বলিল, "আমি জানতাম যে, ঐ কথাটা শুনবার জন্যে আপনাদের বেশী আগ্রহ।"

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে তারানাথ বলিল, "ও কথাটা শুনতে সকলে আগ্রহ থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটাকে ঢেকে রেখে, মুখে 'ভাল আছি' ব'লে যদি আমাদের নিষ্ফল সান্ত্বনা দিতে চান, তবে সেটা আমাদের কাছে আদৌ সন্তোষজনক হ'তে পারে না।"

মুখ মচ্‌কাইয়া অনুপমা বলিল, "আপনাদের সন্তোষ তো কতকগুলো বিশ্রী ওষুধের [illegible]

সহাস্যে তারানাথ বলিল, "ওষুধগুলো খুব বিশ্রী—খুব বিস্বাদ বটে, কিন্তু সেই বিশ্রী বিস্বাদ ওষুধগুলোর ভিতর এমন মধুরতর ফল আছে যে, তার জন্যে ঐ বিস্বাদ জিনিষটাকেও লোকে আদর ক'রে খেতে বাধ্য হয়।"

অনুপমা বলিল, "বিশেষ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যাঁরা, তাঁরা আবার জোর ক'রে খাওয়াতে চান।"

তারা। আর খাওয়াতে চান ব'লেই যোলহয় তাঁরা প্রকৃত বন্ধুপদবাচ্য হ'ন।

অনুপমা কণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপনাদের সাহেব ডাক্তার আবার কি নূতন ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন?

তারানাথ বলিল, "তিনি ওষুধের এমন বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করেন নি, তবে তিনি চেঞ্জে যেতে বলেন।"

অনু। কোথায়?

তারা। রাঁচী, মধুপুর, গিরিডি, পুরী—যেখানে হয়।

অনু। বেশ, মধুপুরেই চলুন।

তারা। কিন্তু পশ্চিমে এখন ভয়ানক গরম। তার চাইতে পুরী ভাল। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক উপকার হ'তে পারে।

অনু। অন্য উপকার কিছু হোক না হোক, খানিকটা ফাঁকা হাওয়া খেয়ে বাঁচবো। ডাক্তারসাহেব দীর্ঘজীবী হোন, ওঁর ভিজিটের মূল্য দিন দিন বেড়ে উঠুক, এখানকার রুদ্ধ বাতাসে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি, সাগরের মুক্ত বাতাসে অন্ততঃ শেষ নিশ্বাস ফেলবার অবসর দিয়েও তিনি আমার ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন, আপনাদেরও ভিজিট দেওয়া সার্থক হ'য়েছে তারানাথবাবু।"

অনুপমার কোটরপ্রবিষ্ট নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটা প্রীতি হাস্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে তারানাথের দিকে চাহিয়া অনুপমা মৃদু হাস্য করিল। সেই ক্ষীণ হাসিটুকু তারানাথের সম্মুখে যেন শারদ-কৌমুদীর মাধুর্য্য ছড়াইয়া দিল। সে আশাপ্রফুল্লনেত্রে অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কণকাল নীরব থাকিয়া অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কবে যাওয়া হচ্ছে?"

তারানাথ বলিল, "যত শীঘ্রীর হয়, একটা শুভ দিন দেখে—"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "দিক্‌শূল, চন্দ্রশূল এসব বাদ দিয়ে,—না? বেশ, শুভদিনই দেখুন। কে কে যাচ্চে তা হ'লে? আপনাকে তো যেতেই হবে। আর—"

তারা। আর একজন কি, একটা চাকর, একজন রাধুনী বামুন।

অনু। ভূপতিবাবু যোধহয় আগে আগে যাবেন?

তারা। বোধহয় তিনি যাবেন না। তাঁর খবর শোনেন নি কিছু?

অনু। কি রকম খবর?

তারা। খবরটা একটু আশ্চর্য্য রকমের। আমার তো বিশ্বাসই হয় না।

সাগ্রহে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কি খবর তারানাথবাবু, যা আপনি বিশ্বাস কর্‌তেই পারেন না? তিনি কি দাদাবাবুর মতই সন্ন্যাসী হ'লেন নাকি?"

তারানাথ বলিল, "সন্ন্যাসী হ'য়েছেন কি না সে খবর কিছু পাই নাই। তবে আজ মোকদ্দমার দিন ছিল, তাকার আনবার অছিলা ক'রে তিনি তারকবাবুর সঙ্গে বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন। সেখানে আদালতে হাজির হ'য়ে জজের সামনে যে জবানবন্দী দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অদ্ভুত।"

প্রবল ঔৎসুক্য সহকারে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি জবানবন্দী দিয়েছেন?"

তারানাথ বলিল, "বলেছেন যে, তিনি অনুপমা দেবীর ভাবী স্বামী নহেন, অনুপমা দেবীর সহিত তাঁর কোন সম্বন্ধই নাই, কেবল সামান্য একটু আত্মীয়তা সূত্রে অনুপমা দেবীর অভিভাবক হ'য়ে আছেন মাত্র, তাঁর অভিভাবক হ'বার যোগ্যতা আদৌ নাই, আর তেমন অসদ্ভব দাবীও তিনি করেন না। তবে তারকবাবু অভিভাবক হ'বার উপযুক্ত কি না, সেটা জজসাহেবের বিবেচনাধীন। এবং তাঁর মতে তারকবাবুও সে তার গ্রহণের যোগ্য নয়।"

অনুপমা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তারানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারানাথ বলিতে লাগিল, "এই জবানবন্দী শুনেই জজসাহেব মোকদ্দমা খারিজ ক'রে দেন। তারকবাবু অনেক মোহাবীলস্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু জজ তাঁর কোন কথাই আর শুন্‌লেন না। এদিকে ভূপতিবাবু আদালত থেকে বেরিয়ে এসে কলকাতার গাড়ীতে ওঠেন। আমাদের গোমস্তা নীলু সরকার তাঁকে এখানে আস্‌বার জন্য অনুরোধ উপরোধ করেছিল। ভূপতিবাবু কিন্তু তার অনুরোধে কাণ দেন নি। নীলুকে নাকি বলেছেন, কলকাতায় গিয়ে বাজার ধরে তামাক সাজতে হয় সেও ভাল, তবু তিনি আর কখন জমিদারের ঘরে জামাইবাবু সাজতে যাবেন না।"

অনুপমা কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে ভূপতিবাবু আর এদিকে আস্‌বেন না?"

তারানাথ বলিল, "না আসাই সম্ভব। নীলু যে রকম বললে, তাতে বোধ হয় ভূপতিবাবুর মনের ভিতর কোন একটা গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে, খুব শক্ত একটা আঘাত পেয়েই তিনি এতটা ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন।"

মুখটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অনুপমা বলিল, "এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমাদের যাবার বন্দোবস্তটা যত শীঘ্রীর হয় ঠিক করে ফেলুন।"

তারানাথ বলিল, "সে বন্দোবস্ত কালই ঠিক ক'রে ফেলব, কিন্তু একটা কথা, আমি গেলে—'

তারানাথ বক্তব্যটা শেষ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া অনুপমা ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল, "আপনি গেলে এখানকার দেখা শোনা কে করবে এই তো? কিন্তু আপনি না অবসর নিতে চেয়েছিলেন? তখন কে দেখা শোনা করতো তারানাথবাবু?"

তারানাথ লজ্জায় মৃদু হাসি হাসিল। অনুপমা বলিল, "সে সব ওজর আপত্তি আমি শুন্‌বো না তারানাথবাবু, আপনাকে সঙ্গে যেতেই হবে। নয় তো আমি কক্ষণো যাব না।"

এই অভিমান অনুরোধের মধ্যে তারানাথ যে একটু স্নেহ বা প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করিল, তাহাতে তাহার মুখখানা আশার আনন্দে এমনই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে সে আনন্দটুকু গোপন করিবার জন্য তাহাকে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইল, এবং অনুপমার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, মনের ভিতর একটা নবীন আশার উল্লাস লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশ
প্রতিবেশিনীর প্রতি = প্রতিবেশিনীর প্রতি
.....ইলাকাঁটাদের বরাত।
গলগণ্ডরোগ+বেদনা বেশী
পঃ ৬ (বহুদিন)

খেয়ালের বশে

[শ্রীলীলা দেবী]

রমেশ যে তাহার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে একথা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিত। শুধু ভালোবাসে নয় স্ত্রীর কথা সে ভালো ছেলেটীর মত মান্য করিয়া চলিত। স্ত্রীর পরামর্শে সকল কাজের আয়োজন না করিলে তাহার চলিত না কারণ সে জানিত তাহার স্ত্রী মণিমালা বিশেষ বুদ্ধিমতী। রমেশের চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি সমস্তই ছেলেদের আদর্শ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলেজে তাহার মান যেমন ছিল, গৃহেও ঠিক তেমনি। রূপ, গুণ, ও সৎস্বভাবের গুণে তাহার মত ছেলে আজকালকার দিনে যথার্থই দুষ্প্রাপ্য!

কিন্তু স্ত্রীকে এতখানি ভালবাসাটা নাকি একটা দোষের সামিল, এমনি একটা ধারণা তার মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছিল। বন্ধুবান্ধবদের উপহাস দিনরাত শুনিতে শুনিতে তাহার এমনি একটা ভয় ও লজ্জা আসিত যে এখনই সে কোন-মত প্রকারে স্ত্রীকে ভালোবাসে না এইটাই প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণিমালার মত পত্নী লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না এটাও স্বীকার করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া তরুণী রূপসী মণিমালা হিন্দুর আদর্শ স্ত্রীর মত নিজে হাতে রাঁধিয়া স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খাওয়াইতে সংসারের কাজ নিজে হাতে করিতে কোনো দিন দ্বিধা করে নাই। স্বামীর সন্তোষ সাধনই তার একাগ্র চিন্তা ছিল, আর স্বামী প্রেমই তার একমাত্র আনন্দ ছিল এ সংসারে!

সাধ্বী মণিমালা নিজের বুদ্ধিমত্তা কখনও এমন ভাবে প্রকাশ করিত না যাহাতে অহঙ্কারের লেশ মাত্রও উঁকি চাহিয়া ওঠে অথচ বীর বুদ্ধি মিনতির ছলে সে স্বামীকে সুপরামর্শ ও সাহায্য দান করিত। মণিমালাকে ভালবাসিত না এমন লোক তাহার শ্বশুর গৃহে অতি অল্পই ছিল; সে নিজের গুণে সকলকে ভালবাসিয়া সকলের ভালবাসার পাত্র হইয়াছিল। স্বামীকে তুষ্ট করিতে মণিমালার সাজসজ্জা সর্বদাই সুন্দর ও মনোরম, মুখে তাহার এতটুকু বিরক্তি বা অসন্তোষের চিহ্ন কখনও থাকিত না। রমেশ এই চার বৎসর তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে এর মধ্যে এমন এক দিনও যায় নাই যেদিন সে মনে মনে ভাবে নাই "এমন সুশিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী যদি ঘরে ঘরে থাকিত!"

জ্ঞানী মেয়ে মণিমালা সাধ করিয়া ছেলেমেয়ের নাম রাখিয়াছিল "স্বাধীনা" ও "স্বরাজ" আর স্বামীকে সে হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলিত "দেখো এবের যুগে দেশ স্বাধীন হবে, আমরা স্বরাজ পাবো।"

২

এমন পবিত্র সুখ ও আনন্দের মধ্যেও হঠাৎ দুঃখের মেঘ ঘনাইয়া উঠিল, না—হইলে সংসারের চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া যাইত। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, সংসার নেমিচক্রের আবর্তনে ইহাই চিরদিন ঘটিতেছে। ঠাট্টা বিদ্রূপে ও চিট্‌কারীতে রমেশের মন দিন দিন এমন হইতেছিল—যে সে জোর করিয়া স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমাইবার জন্য যত রকম উপায় আছে সব রকমই অভ্যাস করিতে লাগিল। কিন্তু তার অন্তঃকরণ এতই মহৎ ছিল যে নীচ প্রবৃত্তি গুলাকে প্রশ্রয় দিতে রীতিমত তাহার কান্না আসিত, চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। সে ভাবিত যাহাকে পরম সুখ ভাবিয়া লোকে এত লালায়িত হয় তাহাই আমার কাছে কেন এমন কটুকর জ্বালাপ্রদ বোধ হয়? এত রকম ভোগ বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াও কেন তাহার মন সেই মণিমালার ঘরখানির দিকে পড়িয়া থাকে? কিছুতেই কি তৈরু নাম ঘুচিবে না তার? মণিমালা ছাড়া পৃথিবীতে তার কি এমন স্থান একটিও নাই যেখানে সে মণিমালার চির শান্তিময় ক্রোড়ের মত আরাম পাইতে পারে? স্বামীর ফিরিতে রোজই রাত হয়, দিনের বেলাও সব সময় থাকেন না, থাকিলেও যে ঘরে থাকেন সেখানে মণিমালার যাওয়া নিষেধ। যখনি মণিমালা কাছে যায় বা কথা বলিতে উদ্যত হয় তখনি নিষ্ঠুর আঘাতে রমেশ তাহাকে নিজের ঘরে পাঠাইয়া দেয়। সারাদিনের মধ্যে একটি মিষ্টি কথার আদান প্রদানও স্বামী স্ত্রীতে হয় না, আদর যত্ন ত দূরের কথা। মণিমালার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিতে সুরু করিয়াছিল। সে ভাবিয়া দেখিল এত বড় একটা মনুষ্য জীবন ব্যর্থ হইতে সে কখনই দিবে না।

স্বামীর প্রতি সে অন্যায় করে নাই তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া কুপথ গামী হ'ন তাহা সহ্য করিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া হা হুতাশ করিয়া অন্যায় নির্য্যাতন মাথা পাতিয়া লইবে না। আজ কাল কথায় কথায় তাঁহার প্রহারের জন্য হাত উঠে, মুখে অশ্রাব্য ইতর ভাষা লাগিয়াই আছে। এমন স্বামীকে সে আর ভাল বাসিতেও পারিবে না, ভক্তি করাও চলে না। মণিমালা তাহার জীবনটা কোনো সৎকার্য্যে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইল। তথাপি সে অপেক্ষা করিতেছিল যদি মতি ফেরে। সে দিন ভোরে লাল চক্ষু ঘুরাইয়া ঘরে ঢুকিতে রমেশ বলিল—তোমার গায়ের গহনা গুলো শিগ্গির দাও। বাড়ী বাঁধা দিয়েছি এবার গুলোও বাঁধা দিতে হবে নইলে উপায় নেই।" মণিমালা টলিবার মেয়ে নয়, সে বলিল "গহনা আমি কিছুতেই দেবোনা কারণ তোমাকে উচ্ছন্ন দেবার পথে আমি যদি তোমার সাহায্য করি—সেটা আমার পাপ!

রাগে রমেশের আপাদ মস্তক তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীর কণ্ঠ—যে কোমল কণ্ঠে সে কতদিন সোহাগ চুম্বন দিয়াছে—সেই গলা সে এমন ভাবে টিপিয়া ধরিল যে মণিমালার চক্ষু কপালে উঠিল। আর একটু হইলে তাহার সকল জ্বালার অবসান হইত।

৩

এতদিন রমেশ কুপ্রবৃত্তিকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে আবরণের প্রয়োজন নাই এখন কুপ্রবৃত্তি গুলোই জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের কবল হইতে মুক্তির আশা আর ইহ জীবনে আছে কি না সন্দেহ। এখন সকলেই তাহাকে মেশা খোর, অসৎ চরিত্র, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারী এই সকল আখ্যায় ভূষিত করে এবং তাহার স্ত্রীর সুখ্যাতিতে দিগন্ত ভরাইয়া তোলে। রমেশের পক্ষে ইহা অসহ্য হইল—যে স্ত্রীকে ভালবাসার জন্যই আজ তাহার এই পরিণাম সেই স্ত্রীর সুনামেই যেন ছাইয়া গেল আর সেই হইল নিষ্ঠুর অত্যাচারী রমনাথের ভার্য্যা! স্ত্রীকে ভাল বাসিয়া সে কি লজ্জাই না পাইয়াছিল আবার না ভালবাসিয়াও এই দুর্নাম—তাহা হইলে কোন্‌টা ঠিক? আচ্ছা আর একবার তেমনি করিয়া ঘরবাসী হইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে হয় না? রমেশের স্থূল বুদ্ধির অগম্যতা তাহাকে বুঝিতে দিল না যে মেশ ও পাশ সমান থাকিলেও কাল বলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে যাহা একবার অতীত হইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। আজ তাহার মণিমালাকে পূর্ব্ববৎ ভালবাসিয়া আদর করিবার ইচ্ছা যে কালের গতিতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইতে পারে এ কথা তাহার একবারও মনে হইল না। নিজের বাড়ীর দরজায় পঁহুছিয়া রমেশ দেখিল তাহার নীচের বসিবার ঘরে কতকগুলি ছোকরা বসিয়া একখানা খাবারের সদ্ব্যবহার করিতেছে তাহাদের মধ্যে পরিচিতও যে দু'একজন না ছিল তাও নয়। রমেশের সর্ব্বশরীর রাগে দুঃখে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাড়ীতে নাই আর তাহার স্ত্রী এতগুলি পুরুষকে অনায়াসে বাড়ীতে আনিয়া খাওয়াইতেছে! এতবড় আস্পর্দ্ধা! তবে কি সে তাহার স্ত্রীকে এতদিন চেনে নাই—মণিমালা কি তবে—রমেশ আর ভাবিতে পারিল না।

নিজের বাড়ীতে চোরের মত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে সেখান হইতে উপরে উঠিল। স্ত্রীর শয়ন কক্ষের সাম্‌নে যাইয়াই আর একটা অভিনব ধাক্কায় সে পিছু হটিয়া পাশের বারাণ্ডার একটা থাম ধরিয়া পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া পড়িল। যে ধাক্কাটা সে খাইল সেটা তাহার স্ত্রী মণিমালাকে অপর পুরুষের সহিত লোহার সিন্দুক উদ্ঘাড় করিয়া গহনা বাছাই করিতে দেখিয়া। এই গহনাই সে একদিন মণিমালার কাছে চাহিয়াছিল কিন্তু পায় নাই। মণিমালা আজ তাহাই স্বচ্ছন্দচিত্তে অপর পুরুষের পায়ে ঢালিয়া দিতে ব্যস্ত। স্বামীর আগমনে এতটুকু মালিন্য উদ্বেগও তো তাহার মুখে বিষাদ-ছায়া ফেলে নাই—সে তো হাসিমুখেই এ কাজ করিতেছে! রাগে ক্ষোভে লজ্জায় রমেশের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। মনে মনে মরণ করিয়া সে ভাবিল এখনি যাইয়া লোকটার মুণ্ডচ্ছেদন করে কিন্তু লোকটার মুখ সে তখনো ভালো করিয়া দেখে নাই—এইবার তাহার নজরে পড়িল—এযে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র!! এই জ্ঞান-রবির, সর্ব্বত্যাগীর সুনে মণিমালার যেমের কার্য্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই যে থাকিতে পারে না। এবার সে কথাবার্ত্তাও অল্প অল্প শুনিতে পাইল, বুঝিল এ সব বন্যার দুঃস্থদের জন্য তাহার স্ত্রীর দান। দুশ্চরিত্র স্বামীর কথাও মণিমালা ইহাকে বলিয়াছে বোধহয়! কি লজ্জা! একবার মনে হইল সাম্‌নে বাহির হইয়া তাহার

কাছে কথা চাহিয়া সকল অপরাধের মাফি করিয়া ফেলে কিন্তু এই মাতালের বেশে সে কেমন করিয়া সাম্‌নে যাইবে? তাহার উপর নীচে যে সব ছোক্‌রারা আছে তাহাদের মধ্যে কারো কারো কাছে তাহার টাকা ধার, তারা সব ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া ঘুরিতেছে, তারা যদি পুলিশে ধরাইয়া দেয়? তাছাড়া আরো অনেক কীর্ত্তি সে করিয়াছে যাহা ঐ ছোক্‌রাদের মধ্যে দু'একজন জানে; তাহারা যদি প্রফুল্লচন্দ্রের সাম্‌নে সে সব কথা বলিয়া ফেলে তাহার চেয়ে যে মৃত্যুও শ্রেয়!

ত্রৈণ আখ্যাটা যে কেন তাহাকে এত লজ্জা দিত আজ তাহার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। রূপে গুণে চরিত্রে বিদ্যায় সবেতেই তাহাকে শ্রেষ্ঠতা দিতে বিধাতা তো কৃপণতা করেন নাই—আর সবচেয়ে বড় দান তাঁর মণিমালার মত পত্নী, যা লোকে জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়াই বুঝি পাইয়া থাকে। আজ সে এই সমস্ত হারাইয়া কোন্ অতল অন্ধকূপে পড়িয়া গিয়াছে সেখান হইতে আবার বুঝি ইহজন্মে সূর্য্যরশ্মি-বিকীর্ণ ধরিত্রীর চির-লোভনীয় বক্ষে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না কখনও? তাহার ছেলে মেয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল; তাহারা তো তাহাদের মায়ের কাছে নাই তবে কি তাহারাও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে নাকি? এতদিন সে বাড়ী আসে নাই তাই বলিয়া পুত্র কন্যার মৃত্যু সংবাদ পাইলে সে কি একবার আসিত না? মণিমালা তাহাকে এতই নিষ্ঠুর এমনিই পিশাচ ভাবিয়া ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছে! পাশের ঘরে যাইয়া সে দেখিল স্বরাজ স্বাধীনার আদরের বেদনাগুলি কতক ভাঙ্গিয়া কতক অযত্নে ধূলায় পড়িয়া! তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মণিমালা দু'খণ্ড শ্বেত প্রস্তরের উপর লিখিয়া রাখিয়াছে—

—"স্বরাজ স্বাধীনা চলিয়া গেলো
পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ে গৃহের শান্তি সম্পদ-শ্রীতে
তাহাদের জন্ম; ইহার বিপর্য্যয়েই
তাহাদের মৃত্যু!

এই জন্যই বুঝি আমাদের দেশের স্বরাজ ও স্বাধীনতা আসিয়াও চলিয়া যায়, ধরিয়া রাখা যায় না!" পুষ্প চন্দনে পাথরের চারিধার আবৃত ছিল তাহারই গায়ে স্বরাজ স্বাধীনার প্রতিকৃতি। রমেশ আর দাঁড়াইতে পারিলনা সন্তান শোকে তাহার ধৈর্য্য তখন আর কোনো বাধাই মানিতেছিল না। সমস্ত লজ্জা সমস্ত দর্প তখন স্নেহে প্রেমে দুঃখে অভিমানে চূর্ণ হইয়া মণিমালার পায়ের উপর স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছিল। রমেশ একরকম ছুটিয়াই শয়ন কক্ষে ঢুকিল—হায়! আর একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও যদি সে ঘরে ঢুকিত! ঘর শূন্য! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী কেহই নাই—নীচে সমবেত কণ্ঠে গান হইতেছিল—

"ওঠ্ মা ওঠ্‌মা দেখ্ মা-চাহি
এই তো এসেছি আর চিন্তা নাহি
জননী হীনা কন্যা হীনা—
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রমীলাসী ধর
লঙ্ঘি' বনানী পর্ব্বতরাজি
তোর কাছে এই আমি এইছিতো আজি—"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রমেশ চোরের মতই উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। ভিক্ষা ঝুলি স্কন্ধে দীন-বেশে মণিমালা মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া, লালপেড়ে কাপড় ও সিঁদুরের উজ্জ্বলো তাহার স্বর্গীয় ভাব মণ্ডিত মুখকমল যেন এক দিব্য জ্যোতিতে ঝল্ ঝল্ করিতেছে। তাহাকে ঘিরিয়া পুরুষ কণ্ঠের এই "মা" "মা" ধ্বনিতে পথের লোক জমা হইয়া উঠিতেছিল। এ যে রমেশের ধারণার অতীত! তবে কি মণিমালা আর ঘরে ফিরিবে না? তাহাকে ফেলিয়া এমনি করিয়াই চলিয়া যাইবে? একবার বলিয়া যাইবার, শেষ দেখা করিবারও কি অবসর দিবে না? না—না—এ কিছুতেই সে হইতে দিবে না। রমেশের ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু ক্রমশঃ সে চলৎশক্তি রহিত হইয়া কেমন যেন হইয়া পড়িতেছিল তবুই রুদ্ধ চীৎকারে রমেশের কণ্ঠে মৃদু তান উঠিতেছিল—"আমি ত্রৈণ আমি ত্রৈণ—আমি স্ত্রীকে ভালবাসি—তোমরা তাকে কেড়ে নিয়ে যেও না।" হায়। কিন্তু ঐ অবধি—অস্ফুট শব্দেই তাহা পর্য্যবসিত হইল—। ঐ ঐ ঐ মণিমালা যোড়ের শেষে আর দেখা যায় না—আর সে ফিরিবে না—শেষ চেষ্টা—। প্রাণপণ জোর করিয়া রমেশ সিঁড়ি দিয়ে ছুটিয়া নামিতে গেল; কিন্তু পারিল না তাহার মূর্চ্ছিত দেহ সিঁড়ির ধারে আঘাত খাইয়া পড়িল। তখন মণিমালা শান্ত হাস্য দীপ্ত মহিমান্বিত মুখে ঘোড় ঘুরিয়াছে এবং ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া গাহিতেছে—

"চরণাঘাতে বজ্র নিপাতে
মূর্ছিয়া পড়িল সে অবনী পর।"

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম, এ, বি, এল, সরস্বতী]

ভারতবর্ষীয় লোকের পক্ষে আধুনিক নূতন নূতন স্বরলিপি সমূহ অপেক্ষা, ইউরোপীয় স্বরলিপি যে এক নূতন আপদ, তাহা কখনই নহে। কেননা ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের আগমনাবধি অনেকেই যে মুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি শিক্ষা করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এবং ইংরাজদিগের রাজত্ব সংস্থাপনাবধি সিপাহী পল্টনের ব্যাণ্ড বাদ্যে বহুসংখ্যক ভারতবর্ষীয় লোকে ঐ স্বরলিপি বিশেষ অভ্যাস করিয়াছে। অতএব ভারতবর্ষে ইউরোপীয় স্বরলিপি এক প্রকার প্রচলিতই রহিয়াছে বলিতে হইবে, এবং তাহা যে হিন্দুসঙ্গীতেও চমৎকার ব্যবহার করা যাইতে পারে ইহা দেখাইয়া দিলে অচিরকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকলেই যে উহা ব্যবহার করিবেন তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। কেহ নূতন এক স্বরলিপি পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রচারার্থ বহুল অর্থব্যয় সহকারে দেশে দেশে লোক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে, সেই পদ্ধতি অবশ্যই কিছু কালের নিমিত্ত প্রচারিত হইতে পারিবে, কেননা কোন প্রকার স্বরলিপিই একেবারে প্রচলিত নাই। কিন্তু ইউরোপীয় স্বরলিপির গুণ যখনই লোকে জানিবে, তখনই যে অন্যান্য স্বরলিপি উহার নিকট পরাজিত হইয়া তিরোহিত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ যাঁহারা ইউরোপীয় স্বরলিপি দেখিয়া হার্মোনিয়ম কি পিয়ানো কি বংশী কিম্বা সেতারের গত বাজাইতে পারেন, তাঁহারা আর কখনই অন্য স্বরলিপি সহজ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। অতএব এরূপ অবস্থায় আমাদের ইউরোপের প্রাচীন স্বরলিপি অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি স্বীয় কোন মত কিম্বা নিজকৃত কোন পদ্ধতি প্রচারের প্রত্যাশী নহি। যাহাতে লোকে সহজে সঙ্গীতশিক্ষা করিতে পারে, তাহাই আমার আন্তরিক চেষ্টা। যদি কেহ ইউরোপীয় স্বরলিপি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও সহজ নূতন স্বর লিপি পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিতে পারেন তবে তাহা অবশ্যই অবলম্বন করিব, নতুবা ইউরোপীয় স্বরলিপি বিজাতীয় বলিয়া তাহা ত্যাগ করতঃ তদপেক্ষা নূতন কুৎসিৎ প্রণালী কখনই অবলম্বন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

উদ্ধৃত অংশটুকু কৃষ্ণধনবাবুর ১ম সংস্করণ 'সেতার' শিক্ষার মুখবন্ধ হইতে গৃহীত হইল। ঐ সংস্করণের গ্রন্থ আজকাল আর কিনিতে পাওয়া যায় না। এখন বাজারে যে সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহাতে মুখবন্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণধনবাবুর নিজ মত যুক্তিসহ উদ্ধৃত অংশে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষ্ণধনবাবুর Staff Notation চালাইবার প্রয়াস আদৌ সফল হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ বাঙ্গালা প্রেসে Staff Notation ছাপাইবার টাইপ নাই। সাধারণ শিক্ষার্থীও ঐ Notation সহ পরিচিত হইবার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করিতে চাহে না। কাজেই বর্ণমালা সা, রে গা, মা লেখার রীতিই চলিতেছে। এক বৎসরে দুই চারিখানি যাহা সঙ্গীত গ্রন্থ প্রচলিত হয় তাহা এই বর্ণমালা অভিব্যক্ত সং সরলিত। প্রত্যেক পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত। কেহ মাত্রা বুঝাইবার জন্য ১,২,৩, অঙ্কের ব্যবহার করেন; কেহ মাথার পাঁড়ি দিয়া মাত্রা প্রকাশ করেন। কোমল ঋষি বুঝাইতে কেহ যুক্ত অক্ষরে (ঋ, গ প্রভৃতি) ব্যবহার করেন, কেহ (গা, ধা প্রভৃতি লেখেন, আবার কেহ বা মাথায় ত্রিকোণাকৃতি চিহ্ন যোজন করেন। ফলতঃ বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থসমূহে কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। প্রত্যেক গ্রন্থ কিনিয়াই, গ্রন্থকার কিরূপ সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আগে শিখিতে হয়, তবে গ্রন্থ কাজে আসান যায়। বাঙ্গালা ভাষায় ছাপান পুস্তক বহুভাষায় অনভিজ্ঞ কাহারও কোন কাজে লাগে না। সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলের বা পাশ্চিমাত্যের গুণগ্রাহিগণের ইহাতে কোন আগ্রহই দেখা যায় না। কয়েক বৎসর হইতে All India Music Conference নামক একটি সম্মিলনী হইতেছে। এই সম্মিলনীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সঙ্গীতে নিপুণ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষে সঙ্গীত চর্চ্চার বিষয় আলোচনা করিতেছেন। কৃষ্ণধনবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মিলনীতে তাঁহার পিতৃদেবের উদ্ভাবিত Staff Notation প্রবর্ত্তন প্রস্তাব ইংরাজী প্রবন্ধে করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই বিভিন্ন দেশবাসী ও বিভিন্ন ভাষা ভাষী ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা

এইরূপ এক সাধারণ সঙ্কেত অবলম্বন না করিলে পরস্পর পরস্পরের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন না

পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় ও স্বরলিপি মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে এক এক রকম রীতিতে সঙ্গীতচর্চ্চা হইয়াছে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া অবস্থান করিয়া ওস্তাদদিগের মুখ উপাসনা করিয়া তবে এই সব বিভিন্ন রীতি আয়ত্ত করিতে হইত এবং এখনও হয়। কিন্তু সকলে যদি এই এইপ্রকার Staff Notation ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে গ্রন্থ দেখিয়াই যে কোন ভাষা ভাষী বা প্রদেশবাসী সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে পারিবেন।

এই সকল কারণে কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার সঙ্গীতবিষয়ক প্রত্যেক গ্রন্থের প্রারম্ভেই Staff Notation এর পরিচয় দিয়া, ঐ Notation এ সমগ্র গৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত আর কোনও সঙ্গীত গ্রন্থেই এ প্রকার চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। (ক্রমশঃ)

সুবুদ্ধি।

সুর-বাহার

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

বাঃ চমৎকার প্রভাত···

কর্ণা, কোলাহলময় এই কলকাতা সহরটা বোধ হয় একটু চুপ করে থাকবার অবসর পায় না। এখনও রাত্রির অন্ধকারে রাঙে নি, এরই মধ্যে পথের উপর লোকজনের, যাওয়া-আসা, গাড়ী-ঘোড়ার মক্ মড়ানি সুরু হলো।···

উপন্যাসখানা লিখ্‌তে আরম্ভ করে' কি বিপদেই না পড়েছি আমি! নায়িকাকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাব ভেবেছিলুম, হঠাৎ গত রাত্রে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে! তার ইচ্ছা নয় যে আমার কল্পিত পথ দিয়ে সে হাঁটে, সে চায় তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি! আচ্ছা, তাই যাক্, যেতে দাও তাকে!...আমরা পুরুষের মন দিয়ে মেয়েগুলোকে যেরকম ভাবি, সব সময় তারা ঠিক তা নয়; সেটা তাদের বাইরের রূপ! সে কথাটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি আজ।···রহস্যময়ী নারী, তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম!

আগামী (২৪শ) সংখ্যা হইতে মানব জীবনের বর্ত্তমান-কালের সমস্যা সম্বলিত এক নূতন ধরণের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।
গ্রন্থের নাম—স্মৃতি মন্দির।
গ্রন্থকার—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার।

নাঃ, ঘুম হয় নি। কাল সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটুও ঘুম হয় নি। কি আমার এই সাহিত্য সাধনার নিভৃত নিবাসে এমন কেউ নেই, যার কোলে আমার এই পরিশ্রান্ত মাথাটা এলিয়ে দিয়েও একটু শান্তি পাই! না—না, আমি সেটা পছন্দও করি না তেমন!

• • • •

ওই—ওই, রাস্তা দিয়ে ভবিল পেরিয়ে যাচ্ছে না? ডাকা যাক্,—সকাল বেলাটা তবে গল্প-গুজবে কেটে' যাবে।

ডাক্‌লুম, অখিল, অ অখিল!

কি একটা কাজের জন্যে সে যাচ্ছিল বাগবাজারে। এত সকালে আমার আহ্বান শুন্‌তে পাবে, সে আশা করতে পারা যায় কি। আমায় দেখেই কাছে এসে' বলে' উঠ্‌লো—বাঃ অরুণ দা'! যাক্, আজ আর বাগবাজারে যাওয়া হলো না দেখ্‌ছি। হাঁ করে' বসে' আছ যে দাদা?··· কি ভাব্‌ছো? মানস-প্রিয়ার প্রতিচ্ছবি?

অখিল পাশের চেয়ারখানা টেনে' নিয়ে বস্‌লো। আজ আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, অখিলের সাথে তর্ক করে' একটা সমস্যার মীমাংসা করে' নি।···চাকরকে বল্‌লুম, দু পেয়ালা চা নিয়ে আয়,...আর পয়সা ঘুয়ের পাশ। বুঝ্‌লি?

অখিল তোমার সাথে একটু তর্ক করবার ইচ্ছা রয়েছে। আমার একটা মস্ত সমস্যা নিয়ে গত রাত্রিটা আমার বিনিদ্রই কেটে' গেছে।...বল্‌তে পার অখিল মেয়েদিকে কি চোখে দেখি আমরা?

অখিল একটু ভেবে' বল্‌লে,—সকালবেলায় সুখরোচক আলোচনা দাদা! তোমার মত অবিবাহিত এক তরুণ কবি যে তাদিকে কি চোখে দেখে, তা বোধহয় একটা রাস্তার লোকেও বলে' দিতে পারবে দাদা,—আমার কেন?

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লুম,—না, না, সত্যি বল্‌ছি অখিল। এ ঠাট্টা তামাসার কথা নয়।

কথাটা শুনে' অখিলও যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে', কি যেন ভেবে নিয়ে বল্‌লে. তাদের অহংপনা, আমার বিশ্বাস, ওরাই আমাদের সর্ব্বনাশ করে। আমাদের শক্তির সুমুখে প্রলোভনের মত এসে' দাঁড়ায়,—মাত্র না, অসাড় হয়ে যায়। আমরা মাথা নত করে' স্বীকার করি তাদের সেই ক্ষমতাটা যেটা আমাদিগকে ভুল পথে চালিয়ে যায়। কিন্তু অখিল, আমাদিগকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার শক্তি নিয়েও তো তেজোময়ী মূর্ত্তিতে তারা আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়ায়।···এই যে, চা এসেছে, আচ্ছা চা খেয়ে নাও আগে,—তারপর হবে।

আমাদের চা খাওয়া সুরু হলো। চাকরটা পাণও নিয়ে এসেছিল দু'পয়সার!

যে কাগজে পাণ মোড়া ছিল, উল্‌টিয়ে দেখি, একটা মাসিকপত্রের ছেঁড়া পাতা।—ও মা, এযে আমারই লেখা 'মানসী' গল্পের শেষ পাতাখানা! আমার লেখার দুর্দ্দশা দেখেই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্, মনটা একটু কেমন হয়ে গেল।

বল্‌লুম, অখিল, দেখ্‌ছো সাহিত্যিকের দুরবস্থা! যে 'মানসী' গল্পের তুমি একদিন অজস্র প্রশংসা করে' গেছ, আজ সেই 'মানসীর' ছেঁড়া পাতা দিয়ে পান-ওয়ালা আমাদের পান পাঠিয়েছে।

অখিল একটোক গেলে' বল্লে—এটা খুব শিক্ষিত বাঙালীদের দাদা,—সাহিত্যের আদর এখানে এমনই অদ্ভুত ধরণেরই বটে!

একটুখানি চুপ করে' থেকে' অখিলকে বল্লুম, তুমি বাগবাজারে যাচ্ছিলে না? আচ্ছা, এখন যাও। আমার একটু কাজ আছে। তুমি ফিরে আস্‌বার সময় দেখা করেও যে।

অখিলকে বেরে' মনে হলো, যেন আমার হাত থেকে' পরিত্রাণ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে' বাঁচ্‌লো। ধীরে ধীরে উঠে বল্‌লে, ফির্‌বার সময় নিশ্চয় দেখা করে' যাব।

অখিল চলে' গেলে দরজা বন্ধ করে' টেবিলের কাছে বসলুম। সুমুখে 'মানসীর' ছেঁড়া পাতাখানা তখনও পড়েছিল।

• • •

তন্দ্রার মত কেমন যেন একটা ঘুম-ঘোর আমায় অভিভূত করে' দিলে। গায়ের গরম কাপড়খানা বেশ করে' জড়িয়ে নিয়ে বসলুম।

মানসী আমার! তোমায় প্রত্যক্ষ দর্শন আমি পাইনি! মনের গোপন কলিজার তলে চাপা আছ, সেইখানেই তোমার স্থান।—থাক, দুঃখে।

তোমারই উদ্দেশে আমি 'মানসী' লিখেছিলুম। আমার চোখে ধরা না দিলেও, হয় তো সত্যিকারের তুমি, কোথায় কোন্ নিভৃত অন্তঃপুরের অন্ধকার কক্ষে বসে' আমার লেখা 'মানসী' পড়েছ। তোমার সাথে সহানুভূতিতে ভরে গেছে।

হঠাৎ মনে হলো, একদা কোন্ নীরব নিশুতি রাতে হয় ত' অতি গোপনে আমার 'মানসীর' সাথে তোমার মনের

[illegible]

পুরিয়ে চল্‌ছিল।...বাইরে বাদলের জমজমানি। মাথার কাছে প্রদীপখানি থেকে' থেকে' ঝড়ের হাওয়ায় কেঁপে' কেঁপে' উঠ্‌ছে!...এক নিশ্বাসে গল্পখানি পড়ে' ফেলে' চুপ করে' বসেছিল! অতৃপ্তির প্রাণ-পোড়ানী হা-হুতাশ ঘরত' ঘরের ভিতরের তমই বাতাসের মতই তোমার বুকখানাকে একবার দুলিয়ে দিলে। আঃ! আঃ!

কবির সন্ধানে ছুটে গেল তোমার অতৃপ্ত আত্মা-কাজর হিয়া! কত অভিশাপ, কত অনুযোগ হান্‌লে তারে এবং নিজেকেও!

একটা দম্‌কা বাতাস এসে' ঘরের প্রদীপখানি নিভিয়ে দিয়ে গেল। যাঃ! সব অন্ধকার! হাঁ, এই তো সে চাইছিলো!...ওগো, অন্ধকারের অন্তর-বাসী, আমি তোমায় চিনি!

বাইরে বৃষ্টির সাথে ঝড়ের উতরোল! বুকের ভিতরে ব্যথার যা খেয়ে জেগে' উঠ্‌লো, গর্ভাগ্রস্ত সিংহীর মতই কোন্ এক বিদ্রোহী নারী!

ক্ষুব্ধ অভিমানে তুমি চীৎকার করে' উঠ্‌লে,—না, না, ভুল লিখেছ তুমি প্রিয়তম,—ভুল বুঝেছ!—

তাড়াতাড়ি 'মানসীর' পাতাগুলো দুহাতে ছিঁড়ে', বাইরে আঙ্‌না গলিয়ে ফেলে দিলে।

ছেঁড়া কাগজ আর, সিদিবোতলওয়ালা সবাদে তার থলের ভিতর নিয়ে গেল সেই পাতা কয়খানি! তারপর এলো পান-ওয়ালার কাছে।—তারপর?...আমায় কেন কেরত পাঠালে মানসী?

মনে হলো, আগুনের শিখায় মত জ্বলে' উঠ্‌লো আমার সুমুখের সেই পান-মোড়া ছেঁড়া পাতাখানা!—উঃ! কাগজখানা আকুল আগ্রহে টেবিলের উপর থেকে' তুলে' নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলুম!...

• • •

অখিল যখন দরজায় এসে' ডাক দিল, তখন আমার খেয়াল হলো। একি! একটা বেজে' গেছে! উঠি এবার।

বালিকা ও কুসুম।

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।]

(২)

কোরকা সম বালিকা ছিল নিরখি ফুল চয়নে,
কোমল কর ভরিয়া দিতে তাহার স্নেহ অযনে।
ঘুমিয়া তার কপালী,
দু'খানী ছিল আরশি,
সমীর ভরে চিকুর গুলি চুমিতে ছিল নয়নে।

(৩)

কুসুমগুলি উঁহার তরে হাসিয়া কহে, "বালিকা,
তোমার নিয়া রাখিবে বলি তোমার তরে মালিকা?
হেথনা কেলি অযনে,
আমারে নাও প্রযনে,
তোমার সনে ছলির বলি ভুমি যে স্থিতি পালিকা।"

(৪)

কুসুম শুনি চকিতা হ'য়ে কহিল তারে কাঁদিয়া,
"সকল মম জীবন কভু হবেনা শুধু তা দিয়া;
চাহিয়ে আমি যেই তা,
হয়ত তরে নেই তা,
তোমার বলি কভু নাহি রাখিবো মোরে বাঁধিয়া।"

তোড়া

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

তিনে তাস

একটী রেষ্টোরাঁতে মিঃ ভেভিসন্, মিঃ জি, এল্, কলির নিকট অতি নম্রভাবে চুরুট জ্বালাইতে "ম্যাচ বক্স" চান। যখন চুরুটে আগুন ধরাইলেন ঐমন সময় মিঃ কলি অতর্কিতভাবে একটী ভীষণ হাঁচি দিয়া বসে। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, পরে ঘুঁষির আদান প্রদান চলিতে থাকে, ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া উঠে যে অবশেষে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া শান্তি রক্ষা করে। ইহার পরে ভেভিসন্ হৃত-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে মিঃ কলির বিরুদ্ধে মনহানীর দাবীতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া নালিশ করে। এর পর হাঁচিকে আর সামান্য মনে করা চলে না!

মিঃ বোরেল নামক এক ব্যবসায়ী তাহার বন্ধু মিঃ ব্রেসোনের বিরুদ্ধে ২৫০ পাউণ্ড দাবী করিয়া নালিশ করিয়াছিল। অপরাধ,—বন্ধুবর—তাহার বিরাট গোঁফের এক কোণা কাটিয়া সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।—যাহা অপরের নিকট অতি খেলো ব্যাপার তাহাও কত সময়ে কিরূপ বিরাট ঘটায় তাহা ভাবিলে প্রকৃতই মনে হয়, মানুষের মনোগতি বিদ্যুতের চেয়েও চঞ্চল।

ফুটবলের কথা

সরকারী কর্মচারিদের প্রতিবাদের ফলেই ফুটবল খেলা অপ্রিয় হইয়াছিল। তৃতীয় এডোয়ার্ড, চতুর্থ ও সপ্তম হেনরী এবং প্রথম মেরী ইহাকে কুৎসিত খেলা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং এলিজাবেথের সময় এক আইন হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি ফুটবল খেলিবে তাহাকে জরিমানা বা কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

নীরব পরিষৎ

ফেলাডে এক বিচিত্র ক্লব আছে। উহার নাম নীরব পরিষৎ (The Silence club.) সেখানের প্রধান নিয়ম এই যে, কোন লোকই সভাস্থলে থাকা কালে একটী শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিবে না। নীরব পরিষদের জন্যই এই নীরব পরিষৎ। আর যেই ঠাঁই পাউক, বাঙ্গালী সেখানে ঠাঁই পাইবে কি-না, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

কোকেনের ইতিহাস

কোকা গাছ হইতেই কোকেনের জন্ম। পেরু দেশেই প্রথমে এই বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। আজ প্রায় ৩৫ বৎসর হইল, কোকেন ঔষধরূপে ব্যবহৃত

হইতেছে। বর্ত্তমানে ইহার চাষেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। আজা বীণেই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। [illegible]

প্রতিভাবান বিকলাঙ্গ।

লর্ড বায়রণের একটী পা খোঁড়া ছিল। তিনি তাঁহার কবিতায় দিন দিনই ইহার কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একজন সুদক্ষ অশ্ব-ঘোড়া ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি একজন সুদক্ষ নর্ত্তক ছিলেন। তিনি গ্রীস দেশীয় স্বাধীনতার নায়ক বিখ্যাত বীর মুকিয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া হেলিকট ও বার্ডেনেলিস প্রণালী সাঁতরাইয়া পার হইয়াছিলেন। তাঁর ডান্টীর কষ্ট পঙ্গু হইলেও কর্ম্মপটু ছিলেন। শৈশবে একদিন রাত্রে তাঁহার মা, তাঁহাকে শোয়া করাইয়াছিলেন, সকালবেলায় দেখা গেল যে, তাঁহার দক্ষিণ পদ অবশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই পায়ে আর কখনও শক্তি আসে নাই। আলেক্জাণ্ডার পোপ অত্যন্ত কুব্জ ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ যেমন কুঁজো ছিল, তাঁহার মনও সেইরূপ বক্র ছিল। কথিত যে, তিনি কখনও সরল মনে এক পেয়ালা চা'ও পান করিতেন না। বোধহয় তাঁহার বিকলাঙ্গতাই তাঁহার কাব্যগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। কারণ তাঁহার কাব্যগুলি বিদ্রূপ ব্যঞ্জক,—ব্যঙ্গ কাব্যই তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। ঔপন্যাসিক ব্রাণ্ড মিত্তি খুব্জাবস্থি পঙ্গু ছিলেন। তিনি কখনও হাটিতে পা ফেলিতেন না। তাঁহার অতি বড় মৈহয়ষ্টি, গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত শরীর, টেরা চক্ষু, নর্ত্তকদিগের ন্যায় তাঁহার আলেখ্যিক গমন সাহিত্য ক্ষেত্রে সকলের কৌতূহলজনক করিয়া তুলিয়াছিল। ডিকেন্স ব্রাউনিংকে পঙ্গু না বলিয়া খরদেহের রোগিনী বলা যাইতে পারে। ষোল বৎসর বয়সের পরই কোন দুর্ঘটনা হেতু তাঁহাকে কয়েক বৎসর বালিশ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি একদা মাঠের মধ্যে তাঁহার ঘোড়ার পিঠে গদি রাখিতে গিয়া পড়িয়া যান ও গদি তাঁহার উপর পড়িয়া যায়, ইহাতে তাঁহার মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে। তিনি বধির অবস্থা ছিলেন তথাপি তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে কোনও কষ্টবোধ করেন নাই। তাঁহার বিবাহ হওয়াতে উপকার হইয়াছিল। তিনি অল্প পরিমাণে চলিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ব্রাক্সমান, বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ মোরিস ওয়েবষ্টর, প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ক্লীভলিয়াণ্ড,—ইহাকেই সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন বলিয়াছিলেন—"ঐ অভিশপ্ত পঙ্গু," এবং সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক কেপ্লার, ইহাদের প্রত্যেকেই পঙ্গু ছিলেন।

(সম্মিলনী)

সঙ্গীতের মাহাত্ম্য

শ্রীকালিদাস রায়

(সংস্কৃত হইতে)

কোটিবার নাম জপ
একবার ধ্যানের সমান,
সমস্তুল্য লয় বোধ
কোটিবার ধ্যানধারণায়।

লক্ষবার হতে স্তোত্র
কোটিগুণ, গ্রাম বর গান,
গান হতে বড় কিছু
নাহি বিশ্বে ভক্তি সাধনায়।

সাচ্চা কথা

[শ্রীশ্রীশান্তিগুরুর বোধ কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

(যথাযথ ভাবে বাণী)

(১) মানুষ সম্বন্ধে যা বলা যায় তার কোন বিশিষ্ট আকারণ।

(২) বিদ্যের অহঙ্কার বিষের জ্বালা। কম জ্ঞানের পরিচায়ক নয়।

(৩) এই বুঝি সুখ করি, সর্ব্বদা এরূপ ভাবিয়া যাওয়াটাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।

(৪) ভাল কাজ করিব, এইরূপ লক্ষ্য রাখা খুবই ভাল। কিন্তু তার চেয়েও ভাল, মরিয়া একটা অন্য কাজ করিয়া যাওয়া।

(৫) উচ্চস্বরে হাসিও না, নতুবা উচ্চস্বরে ঘুমিয়া পড়া অনেক ভাল।

(৬) মানুষের একটা লাভ এই যে, উহাদের ক্ষতি করিবার পরিবর্ত্তে সে উহাদের দিয়াই যায়।

(৭) অন্যের কথিত সত্যের চিন্তাশীলতার অভাবের জন্যই জগতে অসত্য হয়।

(৮) মানুষই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘৃণ্যতম কাজ।

(৯) ছোট কাজকে যে ছোট করে না, বড় কাজ করিবার ক্ষমতা তাহারই থাকে।

(১০) অভিজ্ঞতা বুদ্ধিমানের নয়ই, মূর্খের নিকট উহার কোন মূল্য নাই।

(১১) ভগবানই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত্রু।

(১২) প্রতি দিনের নবীন রবি, নিত্য নূতন শিক্ষা দিতে পৃথিবীর এই শিক্ষালয়ে উদিত হয়, কিন্তু তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে কজন?

সৎ প্রসঙ্গ

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

পায়ের গড়নের কথা

দেশ হিসাবে আর জাতি হিসাবে মুখের চেহারাই যে শুধু বিচিত্র হয় তা' নয়। পায়ের গড়নও দেশ হিসাবে নানা রকমের হয়ে থাকে। ফরাসীদের পায়ের আকার হচ্ছে সরু আর লম্বা। স্পেনদেশের লোকের পা ছোট আর সুন্দর ভাবে বেঁকান। আরবদেরা [illegible] উঁচু বিন্যাসের মত। কোরাণে আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আরব তার পায়ের তলা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যেতে দেয়, তাই পা স্পর্শ করতে পারে না। স্কটল্যাণ্ডের লোকেদের পা বেশ উঁচু আর মোটা। আয়রল্যাণ্ডের লোকের পা চ্যাপ্টা আর চৌকোণা ধরণ। ইংরেজদের পা ছোট আর মাংসল। গ্রীকদের সভ্যতা যখন চরম সীমায় উঠেছিল, তখন তাদের পায়ের গড়ন তাদের শরীরের অনুরূপই সুষ্ঠু ছিল। সুইডেন, নরওয়ে আর জার্মানি দেশের লোকের পা আকারে বেশ বড় হয়ে থাকে। আমেরিকানদের পা সব চেয়ে ছোট। ফ্লরিডাদেশের লোকের পায়ের বুড়া আঙুলের কাছে প্রায়ই ঢেউখেলান বড়ন হয়। চাষীদের পা আগা গোড়া প্রায় সমান লম্বা হয়ে থাকে।

• • • •

মড়ার মাথায় তৈরী কীর্ত্তিস্তম্ভ

একটা বিরাট যুদ্ধ বা মহান কাজের জন্য কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করা, সকল দেশে সকল জাতের মধ্যে আবহমান কাল চলে আসছে। সার্ভিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে নিশ্ (Nish) নামে যে জায়গা আছে, সেখানে একটি অদ্ভুত রকমের কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সে স্তম্ভটি মড়ার মাথাদিয়ে তৈরী করা হয়েছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়, সে দেশের লোকেরা, তুর্কীদের হাতে আত্মসমর্পণ না করে একটা বারুদখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তুর্কীরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। এই যুদ্ধ জয়ের চিহ্ন স্বরূপ তারা একটা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের মাথা দিয়ে সেই স্তম্ভ বেশ করে সাজিয়ে তুলেছিল। দেশের প্রাচীনেরা, দেশের গর্ব্ব বাড়াবার

মত বলছে, [illegible] নিয়ে [illegible] খুলতে দেখা যাচ্ছে [illegible] এক করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সেটা একটা মিথ্যা মাত্র। [illegible] প্রথম রেলওয়ের চাকা ঘুরেছিলেন।

তাদের আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছু নয়। কারণ সে তক্তাটাই মোটা পচিশ ফিট উঁচু। আগে যারা দিনে বেরোতে বেতেন, তারা দেখবার ঠিক স্বরূপ, এই তক্ত থেকে এক একটা মাথা খুলে নিয়ে আসতেন। তারপর সার্কিয়ানরা যখন নিয়ে গেল, তখন সেই মুণ্ডার মাথাগুলোকে যেখানে কাজ করত, সেখানে রেখিয়ে, কয়েকটি [illegible] কাল সেই তক্তাটার ওপর একটা ছাদের মত আবরণ করে দেওয়া হয়েছে। এ স্থানটা এখন অনেকগুলির পুণ্য তীর্থ ক্ষেত্র হয়ে পড়েছে।

[illegible] গত বৎসর এক নতুন সহরেই ১৬ জন একশত বৎসরের ওপর বেঁচে ছিলেন।

"Silkworm Classis" নামে একখানা প্রাচীন চীনা

"Edinburgh" আর "Southport" দুটি নির্দ্ধার এমন বন্দোবস্ত করা হয়েছে, যে মধ্যরাত্রও উপাসনা বা বক্তৃতা শোনবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ১৫টি রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [illegible] ফলে সমস্ত মহাদেশটার ওপর রাজার আসন নেই। প্রায় [illegible] লোক এই গণতন্ত্র শাসিত রাজ্যে বাস করছে।

সকল দেশেই কল কারখানার দিন দিন উন্নতি ঘটেছে। সম্প্রতি ফিনিয়াতেও এর একটা অদ্ভুত নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেখানে মদ্যে সহরের কাছের একটা কারখানায় একখানা মোটরকার তৈরী হয়েছে। ফিনিয়ার এইপ্রথম মোটরকার প্রস্তুত হল।

গ্রন্থ সমালোচনা

বিপথা। একখানি সচিত্র সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৫০ টাকা, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন বটে, কিন্তু কোনটিই সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে নাই। যতীন্দ্রবাবুর "বিপথা" উপন্যাসটির আখ্যান বস্তু তাঁহাই; উদ্দেশ্যও তাহাই। তিনি যে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন—তাহারি বীজাণু কেবা আমাদের এই সমাজে সহজ ও নূতন বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে উপসংহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রগতি লক্ষ্য করিয়া পারা যায় না। উপন্যাস প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ উপন্যাস-খানি যে আগ্রহে পাঠ করিবেন তাহা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কোথাও একটুকু আড়ষ্টতা নাই; বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে ভাব-নিবিড় ছবিটি ফুল-ফুল করিয়া বহিয়া গিয়াছে। আগা-গোড়া কৌতূহলে উদ্দীপ্ত রাখিয়া, [illegible] পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিতই হইয়াছি; বাঙ্গালাদেশের উপন্যাস সমূহ যাহারা লিখিত ও প্রকাশিত হয়, আমাদের সেই কুলপুরোহিতও যে "বিপথা" পড়িয়া আনন্দ পাইবেন—এ কথাও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। গ্রন্থখানি সচিত্র। কয়েকখানি হাফ টোন ব্লক সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কি উদ্দেশ্যে ছবিগুলি দিয়াছেন বুঝিলাম না; তবে ইহাতে গ্রন্থের মোটা মোটা বাড়িয়া যায়—তাহা যে দেখিবে সেই বলিবে। উপন্যাস বহি-তে ছবি চিত্রিত করিয়া না দিলে পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন হয়—এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। গ্রন্থকারের লিপিকুশলতায়, ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার ভঙ্গিমায়, ভাবের প্রবাহে যে চিত্র পাঠকের চক্ষুসমক্ষে ফুটিয়া উঠে, তাহার চেয়ে অধিকতর ভাব-প্রকাশিকা ছবি যদি দিতে না পারা যায়, তা বহিখানি চিত্রশূন্য করিয়াই প্রকাশিত করা চলিতে পারে—আমাদের গ্রন্থের শ্রোতা-রসিক-ই বলা না।

দেশ-বিদেশ

বগুড়া।—স্থানীয় ব্যবসায়ী বিশ্বম্ভরলাল তুলা ব্যবসায়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের সহায়ে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। মাইকোয়ার্ড ব্রহ্মিত সহধর্মিণী দেবী ও ব্রাহ্মবান্ধব শ্রীযুক্ত হনীতি দেবীর এই বিয়োগ শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ঐশ্বর্য পুত্রশোকাতুরা জননীর সান্ত্বনার জন্য একমাত্র পুত্র প্রিন্স বিশ্বম্ভরলাল ও তথায়।

সপ্তাহ পরে হইতে আর একটি অনুষ্ঠানের সময় ধরিয়া পড়িল। অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির অধিকাংশ সভ্যদের আর ইহা জানিতে বাকী। গত ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রি ১টার সময়ে তাঁহাদের প্রাণ-বায়ু অনন্তে বিলীন হইয়াছে। অধিকা বাবুর বিয়োগে অনেকেই একটী আরাম-সেবকে হারাইলেন। অনেক ছিল তাঁহার বাম, আর ও বাবুর ছিল। যোগ সভায় সভাপতি হইয়াও তিনি অনেকের বিরুদ্ধ কথা করিতে কখনো দ্বিধা বোধ করেন নাই।

স্বামী ও এণ্ড্রুজ সুদূরে অনুভবের ভূমি নাই সম্বন্ধে তার পরলোক যাত্রার যে মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর মাইকেল ভারতীয় তার সভ্যতা সাধনের বিষয়ে বলিয়াছিলেন। বিষয়ে বিশ্ব-কবিতায়ন। বিদেশের সংবাদপত্র "ডেইলী এক্সপ্রেস" সম্বন্ধে বিদেশের যে তার দিতে লেখায় মাইকেল ওয়াকারের পক্ষ সমর্থন করিয়েন। তাঁর ফেলেকেড ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নরটি তার চালর্স সম্বন্ধে এবং সভ্যতা মেসোরল ভারত বাসীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। তার পত্রের ধারায় বলিয়াছেন যে, তিনি উচিত কাজই করিয়াছেন।

[illegible]

বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রদের একটি সভা সম্প্রতি এলবার্ট ইস্কাডেমির একটি অধিবেশন করিয়াছেন। এই ইস্কাডেমি বলা হইয়াছে তাঁহার কর্তৃপক্ষের নিকটে পত্র প্রেরণ করিতে রাজী হইবেন। কলেজের অধিকাংশের মতে বাহা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তিনি সম্মতি দেন না। তাঁহার কাজের বিশ্লেষণ-ব্যাপার তার সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু এই মতের পরিপন্থী হইবেন। তাঁহারা কলেজের মতে থাকিয়া অধিক অনুযোগ পাঁচিল অনুমান করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের কথা একেবারে করিয়া যাইবেন যে, অধিক অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ হইবেন।

[illegible]

শ্রীযুক্ত সম্প্রতি ইহার অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ আলোচনার পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুখোপাধ্যায় বলেন, আমার মনে হয়, সকলে বৈজ্ঞানিকের অভিনিবিষ্টের যদি কোন ইচ্ছা প্রকাশিত হইতেন, তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিকের অধিবেশন এখন বীরভূমে বসিয়া চালাইতে হইত না। পাঁচ সপ্তাহ আলোচনা [illegible] পিছনে। পাঁচের [illegible] সম্পর্কে অনেক ছিল হইল না। মুখোপাধ্যায় তাহার তাহার মুক্তি-বিষয়ে তুলে হইলে বিশেষ প্রবিধা হয় করিবার আলোচনা তুলাই তুলিবেন। [illegible] বৈজ্ঞানিকের [illegible] বসিবে অধিক থাকিবে, তাহাদের পর্যন্ত তুলাই। তুলে করিবে [illegible] বিষয়ে অনু যে বাঙ্গালার বক্তৃতা করার পরিচয় দিবে না।

তুর্ক-পত্রিকা অবস্থা ভেদে অধিবেশনকে মতে পরিণত হইয়াছে। প্রবাসী বিশিষ্ট প্রবাসের তুলিকলা বাঁধিয়া একত্র থাকিতে বলা হইয়াছে। তবু তাহাই নহে, তাহাদের কথাবার্তাও করা হইয়াছে।

এদিকে কমিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও যোগ হইয়াছে, সকল আশা উপস্থিত। [illegible] হইবে না।

কিন্তু যদি বৈঠক ভাঙিলে আজ যে তুমুল লড়াইয়ে, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। কোন সংবাদটী বলিয়াছেন, বৈঠক ভাঙিবে, সে বাড়ি, এবং পরের যুদ্ধের বাড়ি সবই নিয়ে পড়িবে তুর্কীর ঘাড়ে। তা পড়ুক, কিন্তু সে বাড়ি যা প্রতিপক্ষকে তোলাক যেসেরক যে তাহার বাড়ে সামলাইতে হইবে, তাহার উপায় কি?

সমবর্ণ বিষয়ের শেষ রাত্রিতে আইরিশ বিদ্রোহীদিগকে ডাবলিনের নানাস্থানে ফেলেন্স বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিতে দেখা যায়। বাড়ী-গুলির আগুন আরে ফেলোনির চিহ্নটুকু বিলীন হয়। এক বাড়ীর লোকদিগকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল।

কোন চিকিৎসক বলেন যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে, তুকার গোড়ালি ছাই ইঞ্চি উঁচু হইলে হানিজনক হয়।

১৯১৬ সালে সমস্তটার আয় ৫০০,০০০ পাউণ্ড বিশিষ্ট হয়, আশা করা যায়।

[illegible] নগরের চিড়িয়াখানায় একটী [illegible] [illegible] [illegible]

বাসন্তী

প্রতিবিম্ব ।

[মেসার্স শর্থা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোংর সৌজন্যে]

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৯শে পৌষ শনিবার ১৩২৯, ইং ১৩ই জানুয়ারি। [২৪শ সংখ্যা

পাঠ—আমরা মরাই যাই কোথায়?

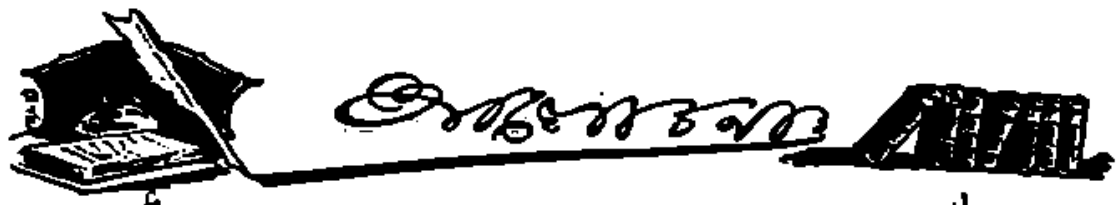

আজ সহরের অধিবাসীদের মুখে ট্রাম ধর্মঘটের কথা ছাড়া আর কথা নাই। আজ সহরবাসীরা প্রতি ঘরে বসিয়া প্রত্যহের "কাগজওয়ালার" পথ চাহিয়া থাকেন। কাগজ আসিলে সর্ব্বপ্রথমে ট্রাম ধর্ম্মঘটের কোন মীমাংসা হইয়াছে কি-না দেখিয়া লইয়া গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলেন। এই সহরের শতকরা নিরানব্বই জন অধিবাসীর এই অবস্থা। সহরবাসী জানিতে পারিয়াছেন যে ইহার প্রতীকার করিবার ক্ষমতা তাঁহারও হাতে নাই, কেহই এই ধর্ম্মঘট মিটাইয়া তাঁহাদের দুঃখ-মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন না, তবুও পিতৃমাতৃহীন অভাগারা একবার গবর্ণমেণ্ট একবার কর্পোরেশনের মুখের দিকে আকুল আগ্রহে চাহিয়া থাকে। এ আমাদের জাতির স্বভাবের দোষ। আমরা জানিয়াও তাহারা এই সকল কর্ত্তাদের মুখ পানে [illegible]

• • • •

কর্পোরেশনের বর্ত্তমান কর্ত্তা সুরেন্দ্র মল্লিক মহাশয় নাকি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের কোন হাত নাই, তাঁহারা নিরুপায়—বেশ কথা!

• • • •

মহাত্মা গবর্ণমেণ্টের সুবোধ—বাপু, কোম্পানীর এই বিপদের সময় আমরা তাঁহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন ও বিব্রত করিতে পারি না। কোম্পানী দয়া করিয়া মিটান, মিটাইলেন, নতুবা—চলিল!—আরও বেশ কথা!

এই পর্য্যন্ত বেশ জলের মত বুঝিলাম। বুঝিলাম না কেবল এই কথাটি যে এই সহরের পিতৃমাতৃহীন অভাগারা ট্রাম কোম্পানীর মত ধনবান বিদেশী কোম্পানীর যদাস্তার উপর নির্ভর করিয়া কতদিন থাকিবে? কতদিন আর এমন করিয়া [illegible] কষ্ট সহিবে? কতদিন বা অধিকৃত বাঙ্গালী কেরাণীরা লাল গরীতে ঝুলো ভাড়া জোগাইয়া আফিস [illegible] রহিতে পারিবে। ট্রাম-কোম্পানী সহরের একচেটিয়া অধিকার লইয়া উপবিষ্ট! তাঁহাদের যুচ্ বর্ষ ভেদ করা কর্পোরেশন কি গবর্ণমেণ্ট কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে! গবর্ণমেণ্ট বা কর্পোরেশন ইহাতে প্রবোধ মানিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু এই গরীব খেটেখাওয়া বাঙ্গালী যায় কোথায়? তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার, তাহাদের রক্ষা করিবার পবিত্র দায়িত্ব যাহাদের হাতে তাঁহারা কি কোন প্রতিকারই করিতে পারেন না?

• • • •

দুই বৎসরে যে কতবার এই এক কোম্পানীর ধর্ম্মঘট হইল, তাহা সকলেই জানেন। আজ একবার মাসেক কাল সহরে ট্রাম বন্ধ ছিল, তখন বাঙ্গা কোম্পানীর মোটর লরী-সহর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে কোম্পানী ধর্ম্মঘট মিটাইলেন, তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকারের বলে সহর হইতে সমস্ত লরী অন্তর্দ্ধান করিল। তাই কিছুদিন পরে আবার যখন ট্রাম কোম্পানীর ধর্ম্মঘট হইল তখন সহরের অধিবাসীর জন্য যে কোম্পানী যেমন পাইল মালবাহী, ময়লা ফেলা, ঘুরকীটানা লরীর উপর গোটাকতক কেরোসিন কাঠের বেঞ্চ বসাইয়া অর্থ রোজগার করিতে সহরের রাস্তায় রাস্তায় পাঠাইয়া দিল।

• • • •

দুর্ভাগা কেরাণী বাবুরা নাকি-না-খাইয়া, না-পরিয়া চিরদিনই মর মর হইয়া আছেন তাই তাঁহারা কেরোসিনের হুর্গীর নিচে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে সেই লরীতে চড়িয়াই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সহরে ট্রাম-কর্ম্মচারী আজ কাল যখন দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে তখন সহরে এইরূপ 'বাস' বা লরী চালাইবার অধিকার যদি সরকার হইতে কোনও কোনও কোম্পানীকে দেওয়া হয় তবে তাঁহারা ইতিমধ্যে লরীগুলির উন্নতি সাধনে যত্নপর হন, অপেক্ষাকৃত দ্রুত গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ লরীতে চড়িয়া কর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে পারেন। আর ট্রাম কোম্পানীর মরজিতে আবার যখন ধর্ম্মঘট হইবে তখন আর সহরবাসীকে আতান্তরে পড়িতে হইবে না।

• • • •

রাস্তায় অনেক রকম-বেরকের লরী ছুটিতেছে—দেখিতেছি, 'বিসরা লাইন্' ছুটিতেছে, ওয়ালফোর্ড ছুটিতেছে, 'দিঘিরপুর মেটিয়াবুরুজ' ছুটিতেছে, ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর কয়খানা গাড়ী আছে—কে জানে? বাঙ্গালী কি এখনও যান-বাহনের ভার পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে?

• • • •

শুনিলাম, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় শীঘ্রই একটি বিল পাস হইয়া যাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্প চূর্ণ না-কি এই বিলের বলেই করা যাইতে পারিবে! এই বিল-সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সিনেট-সভার সভ্য গণের মতামত লওয়া হইবে না বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। গবর্ণর বাহাদুর না-কি বিলটি সমর্থন করিয়াছেন।

• • • •

গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়কে অতি কষ্টে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন; অধিক দিবার ক্ষমতা দেউলিয়া গবর্ণমেণ্টের ছিল না বলিয়াই যেন

শুনিয়াছি। হঠাৎ শুনিতেছি, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের লালচাঁদ প্রোফেসরদের জন্য ন্যূনাধিক লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে বাস ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। এ-ত টাকার টানাটানি, এ-ত ধন কলাকসি, লালমুখের বাড়ীর নামে ত টাকার আমদানি হইতে কসুর হয় না। অভাব বুঝি হতভাগা দেশবাসীরই বেলায়? বলিহারি!!

• • • •

কেনিয়ার যে সকল ভারতীয়গণকে ভাগ্যবশে বসবাস করিতে হইয়াছে তাহাদিগকে নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট দেওয়ার অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, গত বৎসর সরকার হইতে এইরূপ ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই ভোগের ফলে চিরপ্রথামত ভারতীয়গণ গত বৎসর আন্দোলন থামাইয়াছিল। কিন্তু কাজ ফুরাইতেই এই ব্যাপারটা চিরদিনই গাজী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এবৎসর কেনিয়ার নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গাজীদের সে অধিকার আজও দেওয়া হয় নাই। সরকারের মনোভিলাষ সরকারই জানেন। কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ এবার স্পষ্টই বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি শ্বেতবদনদের মতই সমান অধিকার না পান—তবে শেষ পন্থা স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের সহিত অ-সহযোগ ঘোষণা করিয়া দিবেন। এই মর্ম্মে তাঁহারা ভারতের বড়লাট, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, ডিউক অব ডেভনসায়ার এবং আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠাশালী সদস্যের কাছে তার প্রেরণ করিয়াছেন। ভোগে আমাদের আস্থা নাই, ভোগ বাক্যে ভুলিতে ভুলিতেই আমরা বর্ত্তমান অসহায় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। নিজের হাতে প্রতীকারের উপায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই। যে জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, সে জাতির পতন সম্ভব নহে। এ বস্তুর মূঢ় হইয়া থাকিতে পারিলে, কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পাইবেন বলিয়াই মনে হয়।

• • • •

সুপ্রসিদ্ধ আনন্দব্যবসায়ী মিঃ জে-এফ্ ম্যাডান অত্যন্ত সঙ্কটে হইয়া পড়িয়াছেন। এক এক দিন এমন খবরও পাওয়া যায়—দেউলিয়ার অবস্থা তাঁহার প্রায় উপস্থিত হইয়া উঠে। মিঃ ম্যাডান বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, তবুও এ-বয়সে কর্ম্মীর যতদিন জীবিত থাকিয়া যেরূপে ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করেন, ততই মঙ্গল। আমরা বৃদ্ধ মিঃ ম্যাডানের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

• • • •

জমাটীপুরের ঘোড়া বাজারের পোড়া একজিবিসন আবার ঘোড়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ১৫ই জানুয়ারী সোমবার প্রদর্শনী খুলিবার দিন স্থির হইয়াছে। এবার—একজিবিসনের কর্ত্তারা নাকি বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রদর্শকদিগকে আবার ষ্টল তৈরী করিয়া দিবেন, ক্ষতির আংশিক ভার বহন করিতেও তাঁহারা নাকি প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রথম বারের একজিবিসনের সিণ্ডিকেট প্রদর্শকদিগকে ১২০০৲ টাকা দিতে রাজি হইয়াছেন। ইহা ছাড়া দৈনিক টিকিট বিক্রয় টাকায় শতকরা ২৫৲ টাকা আলাদা করিয়া রাখিয়া একটি ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠিত হইবে। যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহারা যদি কিছু পায় তবে তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এ ছোটা ঘোটাই সফল হইবে কিনা সে-সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। একজিবিসন পুড়িয়া ক্ষতি হইয়াছে বিশ লক্ষ টাকার। ১২০০ টাকায় এই ক্ষতির পূরণ যে কি হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। তবে একজিবিসন বসিলে একটা লাভের আশা আছে, কিন্তু তাহাতেই বা কত লাভ হইবে? তাহা ছাড়া একজিবিসন বসাইতে চাহিলেই বসানো যায় না। বহু দূরদেশ হইতে নানারকমের শিল্পদ্রব্যের আমদানী করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই ভস্মসাৎ হইয়াছে। সেই জিনিষগুলি কোথা হইতে আসিবে,সেটা একটা খুব বড় রকমের সমস্যার বিষয়। এবং সে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার যদি না আসে লোকে কি দেখিতে যাইবে? লোকের দেখা-না-দেখার কথা বাদ দিলেও সেরূপ অসম্পূর্ণ প্রদর্শনীর সার্থকতাও যে কোথায় তাহাও আমরা বুঝি না। শুধু কয়েকটা দোকান সাজাইয়া দিলেই প্রদর্শনী খোলা হয় না। দোকান দেখিবার জন্য অর্থব্যয় করিয়া শ্রম সহিয়া কেহ প্রদর্শনী দেখিতে যাইবে না। কলিকাতা সহরের যে কোন একটা রাস্তা ধরিয়া আধঘণ্টা চলিলে অনেক রকমের দোকান পাট, অনেক জীব-জন্তু দেখা যায়। সহরবাসি কি দেখিতে যাইবে? জুয়া খেলিতে না নাগরদোলা চড়িতে?

• • • •

আজ এই পর্য্যন্তই বলিয়া রাখিলাম। আর ভাবিবার নাই, তিন চারদিন পরেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

• • • •

একজিবিসন-কর্ত্তারা সত্যই যদি আবার এটিকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন—আমরা আনন্দিতই হইব। প্রদর্শনী মারফৎ দেশবাসীকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় শিল্প সম্ভার দেখাইয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিয়া নব-নব প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়া দিয়া দেশের অধিবাসীকে নিজ ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিয়া থাকেন—এইখানেই তাহার সার্থকতা, ইহাতেই প্রদর্শনীর সাফল্য। বাঙ্গালী পরিচালিত প্রদর্শনী যদি তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে সফল হয়, তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে।

প্রেম-অভিযান-পর্য্যায়ের তৃতীয় স্তবক

অভাগিনী

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ানের ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্ট উনিশ বৎসর বয়সে ভ্রাতার অনুগ্রহে এক জাহাজের কাপ্তেন হয়েছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান তখন ফরাসী রাজ্যের সম্রাট হন নাই তবু নেপোলিয়ানের এমন ক্ষমতা ছিল যার প্রভাবে তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অনুগৃহীতদের উচ্চকার্য্যে নিয়োগ করতে পারতেন। তাই তরুণ ভ্রাতা জেরোমকে তিনি কোন রাজনীতিক কার্য্যের জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পাঠিয়ে দিলেন।

বিশ্বজয়ী জ্যেষ্ঠের মত গুণ বা প্রতিভা জেরোমের বিশেষ কিছুই ছিলনা, তবু ভ্রাতার অনুগ্রহেই একাজ তিনি পেয়েছিলেন। জেরোম ছিলেন একটু আরাম-প্রিয়, বিলাসী, তিনি ভাবলেন এ ভালই হোল, এই সুযোগে বিশেষ আরামের সঙ্গে বিশ্বের অনেক স্থানই দেখে নেওয়া যাবে। দায়িত্বের কাজ যা তা জেরোমের নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীরাই সব করতেন—কার্য্যের সম্মান যা সে সব জেরোমই উপভোগ করতেন।

জেরোম বোনাপার্ট। — বেটসি প্যাটারসন।

জেরোম যখন জাহাজের কাপ্তেন হয়ে সমুদ্রে যাত্রা করলেন তখন ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য চলছিল। সমুদ্রপথে চলতে চলতে একখানা ইংরেজ জাহাজ জেরোমের ফরাসী জাহাজ দেখে তার সঙ্গ নিল। জেরোম তখন কমতা বাঁটায় বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন না—তিনি জাহাজ ঘোরে চালিয়ে নিউইয়র্কের উপকূলে আশ্রয় নিলেন। সে নিরাপদ স্থানে কারোই যুদ্ধ করবার ক্ষমতা ছিল না—তাই জেরোম পরম নিশ্চিন্ত মনে সেখান জাহাজ দাঁড়িয়ে আমেরিকা বেশ ভাল করে দেখে নেবেন মনে করলেন। আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই জেরোম দেখলেন সেখায় তাঁর বিপুল সম্মান—দলে দলে লোক সব বিশ্ব বিখ্যাত কর্সিকান সেনাপতির ভ্রাতাকে দেখতে আসতে লাগল।

চারদিকেই জেরোমের অভ্যর্থনার জন্য উৎসব, নাচ গানের ব্যবস্থা হতে লাগল। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট তাঁকে মহা সম্মানীয় অতিথি ভাবে গ্রহণ করলেন, আমেরিকান সুন্দরীরা সব জেরোমের গানে মধুর হাসি হেসে কটাক্ষ বর্ষণ করতে লাগলেন। বিবাহ যোগ্যা মেয়েদের মধ্যে জেরোমকে জায়া-তাগ্রহণ লাভ করবার জন্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ানের ভ্রাতা সুন্দর তরুণ বিদেশীকে পাবার জন্য কোন্ সুন্দরীই বা ইচ্ছা না করে?

নানা সম্মানে ভূষিত হয়ে জেরোম বাল্টিমুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাল্টিমুরের সেরা সুন্দরী ছিলেন এক ব্যাঙ্কারের মেয়ে। সুন্দরীর নাম ছিল বেটসি প্যাটারসন্, আর আর সুন্দরীদের মত বাল্টিমুরের সুন্দরীরাও বেটসিও এই নৌ বীরকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

সুন্দরী বেটসির বয়স তখন সতের বৎসর মাত্র—বেটসি একে পরমা সুন্দরী তার উপর তার পিতা আমেরিকার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠধনী তাই তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থী তরুণের দলের কোন অভাব ছিল না। তরুণী বেটসির সৌন্দর্য্যের যেমন খ্যাতি ছিল তার ব্যবহার গুণের ও মাধুর্য্যেরও তেমনি খ্যাতি ছিল। তাই বেটসিকে সকলেই সকলেই ভাল বাসত।

সেদিন যায় একটা ঘোড়া দৌড়ের মাঠে জেরোম ও বেটসির প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বেটসি সেদিন ঘোড়ায় চড়বার পোষাকে মাঠে গিয়েছিলেন। সেইখানে তাঁর তরুণীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়—দৃষ্টি বিনিময় হয়। জেরোমের সঙ্গে বেটসির পরিচয় হওয়ার পরেই জেরোম তার প্রণয়ে পড়ে গেলেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই জেরোম সুন্দরীর পিতৃ গৃহে তার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় তরুণ তরুণীর সাক্ষাৎ হোল—দু'জনার মনের মিলও বুঝি বা হোয়ে গেল। পরদিন দেখা গেল জেরোম ও বেটসি দুজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন—এই থেকে দু'জনার সঙ্গত আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়।

বেটসি ও জেরোমের এই খেলা-ধুলোর ব্যাপার নিয়ে বার্লিংটনের ঘরে ঘরে আলোচনা হতে লাগল। মেয়েদের মধ্যেরা সব বলতে লাগলেন কেন এ সহরে কি আর সুন্দরী মেয়ে নাই যে জেরোমের মত লোক শেষকালে বেটসিকে মেজে ঘুষে নেবেন। জেরোমের চোখে কিন্তু বেটসির মত সুন্দরী আর কাউকেই লাগে নাই। জেরোম বেটসিকেও তাই বলতেন।

দিনের পর দিন যেতে লাগল, জেরোমের রাজনীতিক কার্য্যে কত আহ্বান যাওয়ার কথা—নিজের মনে মেলা মেশার কত সখ কিন্তু বার্লিংটন ছেড়ে যাওয়া আর তাঁর হয় না। করাসী মন্ত্রী বার বার জেরোমকে লিখে জানাতে লাগলেন যে তিনি এভাবে এক জায়গায় বসে থেকে বড় বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন না। জেরোম কিন্তু এ সব উপদেশের কথা 'ঘুঘুকি উড়ানি হেঁস' ভাবে উড়িয়ে দিতে লাগলেন।

জেরোমের মনের অবস্থা তখন কিন্তু—যে তিনি সিংহাসন পেলে বেটসির জন্য তাও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তিনি এখন চান শুধু বেটসির প্রেম আর ভালবাসা। বেটসিকে জেরোম যখন এ কথা বলতেন তখন সুন্দরীর গণ্ড দু'খানি রাঙা হয়ে উঠত—চোখ দুটি হাসিতেও উজ্জ্বলতায়—জ্বলে উঠলো—বলি—বলি—জেরোম কোনদিন রাজা হন তবে তিনিও তিনিও তাঁর রাণী হতে পারবেন। এর আগে আমেরিকার কোন মেয়ে রাণী হয় নাই—কিন্তু এত রূপ এমন সৌন্দর্য্য বেটসির তিনি কেন রাণী হতে পারবেন না।

একদিকে উচ্চ আশা এক দিকে ভালবাসা বেটসিও জাঁহাপনা জেরোমকে তার রূপে গুণে বেঁধে ফেলতে লাগলেন; এক মুহূর্ত্ত জেরোমকে তিনি পাশ ছাড়া করেন না। বেটসির পিতা ছিলেন বড় ধনী—কলায়ই সে সমস্ত ধন রত্ন পাবার কথা, প্যাটারসন পরিবারও বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত—এ দিকে জেরোম বোনাপার্টি ধরতে গেলে কেউ নয়, শুধু মাত্র তিনি ফ্রান্সের প্রথম কন্সালের ভ্রাতা। এ বিবাহে জেরোমের লাভ ছাড়া অলাভ কিছু নয়। জেরোম ক্রমেই গভীর ভাবে সুন্দরীর প্রেমে পড়তে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দু'জনে উদ্যান ভ্রমণ করবার অনুমতি চাইলেন। বেটসিও লাজরাঙা মুখে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

সুন্দরী তখনি তার পিতার কাছে গিয়ে তাঁর মত চাইলেন। বৃদ্ধ পিতা এ বিয়েতে অমত করলেন। কিন্তু বেটসি ছিলেন তাঁর পিতার নয়নের মনি; জীবনে মেয়ের কোন আকাঙ্ক্ষা তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। আজ কন্যা পিতৃ-স্নেহের সেই বলে পিতার কাছে নিজ ভালবাসার জনকে জীবন সঙ্গী রূপে পাবার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। কন্যা স্নেহে অন্ধ পিতা অবশেষে সম্মতি দিলেন, বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ আরম্ভ হয়ে গেল।

সংবাদ সুসংবাদই হোক আর দুঃসংবাদই হোক বাড়ী হতে বড় বিলম্ব হয় না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ বিয়ের সংবাদ ওয়াসিংটনে বাড়ী হয়ে পড়ল,—ফরাসী মন্ত্রী সংবাদ শুনে মহা বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি তাড়া তাড়ি ছুটে বার্লিংটনে গিয়ে জেরোমকে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বললেন—ফরাসী মন্ত্রী জেরোমকে অনেক বুঝিয়ে বললেন যে তিনি এখনো বালক মাত্র তার বড় ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়েতে মত দিতে তিনি কোন মতেই পারেন না।

এ বিয়ে করলে ভাতার ক্রোধে হয়তো তাঁদের অনেক বিপদ হতে পারে কিন্তু বেটসির সুন্দর মুখ খানির পানে চেয়ে জেরোমের মনে হোল বড় বিপদই আসুক, বিপদের ভয়ে ভীত হয়ে এ সৌন্দর্য্য-সাগরের এই অমল সুষমাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যেতে পারে না। ফরাসী-মন্ত্রীকে তিনি নিজের মত জানালেন—মন্ত্রী বিপদ সঙ্কেত মুখ ভারী করলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী জেরোমের ভেরে নেপোলিয়ানকে ভালরূপই চিনতেন এবং নেপোলিয়ানের ঔদ্ধত্যকার্য্যও তাঁর অবিদিত ছিল না।

করাসী ভাষা জানত ছিলেন না, তিনি এ ব্যাপারে জেরোমের সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি না করে একেবারে বেটসীর পিতার কাছে গিয়ে খোলাখুলি ভাবে তাঁকে এ বিয়ের কদাকল বুঝিয়ে বললেন হয়তো এ বিয়ের ফলে বেটসির করাসী রাজ্যের প্রবেশও নিষিদ্ধ হতে পারে। বৃদ্ধ পিতা মেয়েকে কাছে বসিয়ে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু এদিকে তাদের অনবরত এক সঙ্গে মেলার ফলে তাদের মধ্যে ভালবাসা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছিল, বেটসির মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও মোহ হয়ে প্রবল হয়েছিল। বেটসি নীরবে কাকাত্মা মেয়ের পিতার মুখপানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধের হাতের উপর হাতখানি রেখে বললেন—

'বাবা—আমি যদি এক কটীর অধিকারিণী হয় তবু আমার জেরোমের পত্নীই হব—আজীবন দুঃখ দৌভাগ্যের অংশীও আমি অন্য কারো পত্নী হবো না।'

পিতার সাধ্য সাধনা, হিতোপদেশ মেয়ের সকল অনুনয়ের কাছে সব ভেসে গেল। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল—বেটসি পরম সুখী হলেন। বিবাহ সময় জেরোম নৌসেনার উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হয়ে রথ বেয়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হলেন; সুন্দরী বেটসিও ফলিনের উজ্জ্বল বিচিত্র পোষাকে বেরে কনে রূপে দেখা দিলেন। সকলের মুখেই বর কনের সৌন্দর্য্যের কথা।

বিবাহ হয়ে গেলে জেরোম ভাইকে একখানি অতি দীর্ঘ, উচ্ছ্বাসপূর্ণ রাজনীতিক চিঠিতে সব জানিয়ে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নেপোলিয়ান তার কোনও উত্তর দিলেন না। জেরোম ভাইয়ের চিঠি না পেয়ে বড় চিন্তার পড়ে গেলেন, তিনি বার বার তাঁকে চিঠি লিখতে লাগলেন, বেটসিও চিঠি লিখলেন—কোন উত্তর নেই। ভাইয়ের ব্যবহারে নেপোলিয়ান বড় ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—যখন উত্তর দিলেন তখন লিখলেন—

'যে যুবতীর সঙ্গে তুমি নিজকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করেছ—রাজনীতিতে তার পরাপর নিষিদ্ধ, কিন্তু তোমাকে অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হতে হবে।'

সব কল্পনা দু'জনাই দু'জনার জানাশুনার, জানে উভয়ে কেউ কারো সঙ্গ ছেড়ে দিতে চায় না। এক সঙ্গে থেকে দুঃখ কষ্ট যত আসুক সবই তাঁরা সইতে প্রস্তুত। নেপোলিয়ানের আদেশ তিনি পত্নীকে ত্যাগ করে যাওয়াই স্থির করলেন—মনে আশা জেরোমের বীরত্বের ভ্রাতা নেপোলিয়ান মুখে যাই বলুন না কেন একবার বেটসির মোহিনী মূর্ত্তিখানি দেখলে পরে তিনি আর রাগ করে থাকতে পারবেন না। জেরোম বেটসিকে তাঁর কথা বললেন, বেটসি শুনে স্বামীর কোড়ে মাথা লুকোলেন।

বেটসি এতদিনও একটী কথা তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে বলেন নাই। তাঁদের বয়স বেশী নয়, বালবল্লিকার মত তারা দু'জন। এর মধ্যেই বেটসির সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। এ অবস্থায় কথা শুনেও কি নেপোলিয়ানের মত বদলাবে না?

ফ্রান্সে পৌঁছে বেটসি দেখলেন নেপোলিয়ান বড় শক্ত মানুষ। ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়েই তিনি নেপোলিয়ানের আদেশ পেলেন যে আমেরিকান মহিলা জেরোমের সঙ্গে এসেছেন তাঁর ফ্রান্সের ভূমিতে অবতরণ নিষিদ্ধ।' জেরোম ভাইকে শান্ত করতে তাড়াতাড়ি ফ্রান্সে গেলেন, বেটসি ইংলণ্ডে গিয়ে সন্তান প্রসব করতে লাগলেন। বেটসির মনে, জনমত বিপক্ষে এ সব মেঘ কেটে যাবে—আমার সুদিন আসবে।

হতভাগিনী বেটসির সঙ্গে জেরোমের এর পর আর দেখা করবার কি কথা কইবারও অধিকার ছিল না—জীবনে আর একবার মাত্র তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। বার বার নেপোলিয়ানের সঙ্গে বেটসি একবার রাজ্যাভের কামনা জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মনোরথ সফল হয় নি।

এই সময় বেটসির প্রথম সন্তান একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ছেলেটির নাম রাখা হয় জেরোম নেপোলিয়ান। বেটসি ধনী আমেরিকান মহিলা—সাধ্বী, ধীরা—অসাধারণ শিক্ষিতের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রিয়তমের মত এই দুঃখ দুর্ভোগ অকাতরে সহ্য করিলেন। জেরোম ও বেটসির মধ্যে বিবাহচ্ছেদ মঞ্জুর করতে পোপ বাধ্য হলেন—আইন অনুসারে মঞ্জুর করলেন। আইন করে নেপোলিয়ান বিবাহ নামঞ্জুর করে দিলেন।

বেটসির নিজের অবশ্য তেমন কিছু না—কিন্তু জেরোমের সুখের পানে চাইবেই তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে আসতো। বেটসি বার বার জেরোমের পরিবার গড়িবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুর্বলা নারী তিনি, কি-ক্ষমতা তাঁর যে শক্তিশালী নেপোলিয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন।

নেপোলিয়ান ভ্রাতা জেরোমকে ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা করে দিয়ে বেটসি ও তাঁর ছেলের একটা ব্যবস্থা করে দিলেন—বেটসি নিজে বিপুল ধনী হলেও সে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বেটসি বোধ-হয় মনে ভেবেছিলেন নেপোলিয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেই আরও তাঁর অবস্থা ভাষণ হতে হবে—তাই তিনি কোনরূপেই নেপোলিয়ানের অসন্তোষ ভাজন হতে চাইলেন না।

এর পরে জেরোমের সঙ্গে একজন জর্মেন রাজকন্যার বিবাহ রাজনীতি প্রয়োজনার্থে স্থির হয়। এই সংবাদে বেটসির হৃদয় যেন একেবারে ভেঙে পড়লো—আজ তাঁর প্রেম ভালবাসার চেয়ে তাঁর মর্যেই যেন বেশী আঘাত পাইল। এ বিয়ে হয়ে গেলে তো তাঁর পুত্রের অধিকার বলতে আর কিছুই থাকবে না।

বেটসি প্যাটারসন এইভাবে পরিত্যক্তা অবস্থায় পিতৃ-হীন সন্তানকে একমাত্র সম্বল করে বাল্টিমুরে ফিরে এলেন। একদিন যাদের কাছে রাণী হবেন বলে বহু উচ্চাশা করে গিয়েছিলেন, আজ তাঁদেরই কাছে তাঁকে মনেমনে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে আসতে হোল। হৃদয় বেটসির ভেঙে গিয়েছিল—সাধীর মত এসব মান অপমান কোনদিকেই আর তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

পরে নেপোলিয়ানের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বেটসি আবার ইউরোপ যাত্রা করেন; এই সময় তিনি ফ্লোরেন্সে গিয়েছিলেন। এর পরে তিনি ব্রাসেল্স, ইংলণ্ড ও বেলজিয়ামে অনেক করে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাবার ইচ্ছা করেন। নেপোলিয়ানের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই জেরোমের আর সে সম্মান রইল না। তিনি রাজ্যচ্যুত হলেন, তার জর্মেন পত্নীও তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান।

এর পরে জীবনে আর একদিন মাত্র জেরোম ও বেটসির দেখা হয়। বেটসি একদিন ফ্লোরেন্স সহরের চিত্র প্রদর্শনী দেখছিলেন—এমন সময় দেখলেন তাঁরই প্রিয়তম জেরোম একজন ইটপুষ্ট জর্মেন মহিলার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে করতে এদিকে আসছেন। জেরোম বেটসিকে দেখেই যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। কত অপরাধীর মত তিনি নিশ্চল হয়ে গেলেন। বেটসি সেদিকে আর না চেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে সরে গেলেন।—

সত্য রাণী হবার যোগ্যা যিনি—আজ ভাগ্য দোষে তিনি অভাগিনী। অভাগিনী অবস্থায়ই সুন্দরী বেটসির জীবন-দীপ নিভে যায়।

সমাপ্তি

[ইংরেজী হইতে]

(শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়)

[Shelly.]

খেমে যায়, নদীস্রোত যখন—
জেগে রয়, মূরছনা প্রাণে;
মুখী, ঘরে, মরণ আতুর—
তখন, তার, বেঁচে রয় মানে।

তখন, হ'লে গোলাপের দল,
ঘরে, পড়ি', প্রিয়া শয্যা'পরে;—
সাঙ্গ, তব, দিবস সকল—
রবে, প্রেম, স্মৃতি তব ঘরে'।

নারীত্ব

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।)

ভারতের নব জাগরণের নেতা, আমাদের হিমাচল ভারতের কোটি কোটি মানবের হৃদয়, দেবতা মহাত্মা গান্ধী বার বার বলিয়াছেন এই আন্দোলনে আমি একটা কাজ করিতে পারিয়াছি—ভারতের নারী সমাজকে শুধু ঘরের কাজ ছাড়া বাহিরের কার্যেও পুরুষের সঙ্গিনী, পতির সহধর্মিণী করিতে পারিয়াছি, ভারতের নারীরা আজ দেশ চিনিয়াছেন—দেশের কার্যে ধর্মের কার্যে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন ইহা আমার একটী বড় সান্ত্বনা।

বাংলার দেশ-প্রেমিক কবি হেমচন্দ্র একদিন গাহিয়া-

দিয়েছেন 'না জাগিলে সব ভারত ললনা,—এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' সুতরাং দেশের নারী শক্তি বিকশিত হইয়া না উঠিলে দেশে জাতীয়তার স্রোত দেশের সমস্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে বহিয়া যাইতে পারে না।

ভারত পুরাণের অতি প্রসিদ্ধ কথা—যখন সেই সুদূর পুরাতন যুগে সমগ্র ভারত ব্যাপী একটা বিভীষিকা স্রোত বহিয়া যাইতেছিল, দুষ্টের দেবতারা যখন হীনবল বিপর্য্যস্ত তখন শক্তিসঞ্চারিণী নারী মহাশক্তি আপনার মহাশক্তি প্রয়োগে দেবতাদের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ভারতকে ত্রাস হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

তার পরও সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতের নারী সমাজের আর্য্য মহীয়সীগণ আপনার মহিমায় আপনি মহিমান্বিত হইয়া চলিয়াছেন। সকল বিষয়ে স্বামী পিতা পুত্র ভ্রাতার সহযোগী হইয়া তাহাদিগের মহৎকার্য্যের উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছেন। ভারতের নারী তখন সত্যই ভারতের পুরুষের সঙ্গিনী ও স্বামীর সত্য সহধর্ম্মিনী ছিলেন।

তারপর ভারতের উপর দিয়া কেমন একটা কাল মেঘযুগের পর যুগ বহিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই মেঘের কালিমা হইতে ভারতের নারী সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য ভারতের পুরুষ সমাজ তাহাদিগকে গৃহ কোণে বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। বাহিরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাহার বড় নির্জ্জনতায় এমন একটা বন্ধন জড়াইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে ভারতীয় নারী সমাজ তখন হইতেই পঙ্গু বধির হইয়া গেলেন।

বাহিরের আঘাতে মরণ আঘাতে যুদ্ধ করাইয়া দিবার ক্ষমতা হারাইয়া ভারতের পুরুষ সমাজও ঘর-মুখো কোণ-ঠেসা হইতে লাগিল তখন নিজেদের ঘরে ও অন্দর মহলে পুরুষসমাজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া নারীকে সেই বদ্ধ নির্জ্জনতার মধ্যেই আরও সঙ্কুচিত প্রাণে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের সমুখের সুবিধামত স্থান টুকু আটক করিয়া লইতে লাগিল। নারীর অন্দর মহলের রাজত্বেরও এই খানেই ভারতের এই যুগ বিপর্য্যের ইতিহাস যেমন শোচনীয় তেমনি করুণ। এই শোচনীয় ইতিহাস চলিতে চলিতে আজ তাহা এমন একটা স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহার আর চলিবার উপায় নাই। সমুখে, সম্মুখে, এপাশে, ওপাশে, চারি ধারেই একটা বিকট বিরাট বন্ধন। যুগ দিন হইতেই কি যেন বিকট বন্ধন মেলিয়া ভারতীয় নিখিলে গ্রাস করিতে আসিতেছে—সমুখে ঘনঘোর আলো দেখা যাইতেছে—পিছনে অন্ধকার তাই ভারতবাসী এখন কোন দিকে গতি পরিবর্ত্তন করিতে আগাইবে বা পিছু হটিবে আমাই ভাবিয়া আকুল হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের সব দিকের বন্ধনগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, তাই তিনি ভারতের আত্মবোধ সর্ব্বাগ্রে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর অস্পৃশ্যতা দোষ দূরিত করিবার কথা বলিয়াছেন, তারপর ভারতের প্রত্যেক নারী এক যোগে সত্য সঙ্গিনী হইয়া সত্য মাতা, ভগিনী, সহধর্ম্মিনী, হইয়া সত্য পিতা, ভ্রাতা, লইয়া, একযোগে যাহাতে দেশের উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিয়াছেন।

মহাত্মার সেই চেষ্টার ফলেই আজ মহাত্মা পত্নী, বেগম বাই আম্মা, শ্রীমতী সরোজিনী, বেগম মহম্মদ আলী, পণ্ডিত মতিলালের সহধর্ম্মিনী ও জহরলালের মাতা, দেশবন্ধুর পত্নী প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। দেশ-জাগরণের মন্ত্র শুনিয়া ইহাঁরা দেশের ভ্রাতা ভগিনী-দিগকে মহত্তর কার্য্যের প্রেরণা ও বোধ জানিয়া দিতে-ছেন। তাই স্বামী পুত্রের, ভ্রাতার কর্ম্মভার সানন্দে স্বেচ্ছায় আজ ইহাঁরা নিজ মস্তকে বহন করিয়া সত্য সঙ্গিনী হইবার গৌরব, আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

নারীশক্তি যে দেশের জড় পুরুষ শক্তির উপর যথেষ্ট ক্রীয়া করিতে পারে তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ দেখি-তেছি। সে দিন বিলাতের টাইমস পত্র খদ্দরপরা অ-সহ-যোগীর স্ত্রীর হস্তে লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি বটে, কিন্তু তারও একটা দিক্ আছে—জাতীয় প্রতিষ্ঠান না পাইলে, ঘরের পুরুষ সাজা পুরুষকে ঘরের নারী যে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিবে তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

সীতা, সুভদ্রা, রুক্মা, সাবিত্রীর দেশের নারীরা আজ যদি আবার তেমনিভাবে সত্য সহধর্ম্মিনী হইয়া গৌরব ফুটাইতে চাহেন তবে বিপুল কার্য্যক্ষেত্র তাঁহাদের সমুখে রহিয়াছে। আজ ভারত তেমনি নারী চাহিতেছে—যে নারী সঙ্গিনী, মাতা, ভগিনী—সত্য সহধর্ম্মিনী হইয়া ভারতীয় জড় পুরুষ সমাজের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। যে নারী নিজ নারীত্বে, আবার ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন তেমনি নারী আজ ভারত কামনা করিতেছে। শক্তিময়ী নারী কেন আহ্বানে ও আহ্বানে কি সাড়া দিবেন না।

জীবন-স্রোত

[শ্রীমতী সরস্বতী দেবী]

এক

মা মরা ছেলেকে নিয়ে বাপ বড় ফাঁপরে পড়লেন। ছেলে দিনরাত কাঁদে আর "মা, মা, মা কই" বলে অস্থির ঘরে ছুটে বেড়ায়। বাপ কত কথা বলেন ছেলেকে ভুলাবার জন্য, কিন্তু ছেলে কি তাতে ভোলে? বাপ ছেলের কাছে হার মেনে চোখে কাপড় দিয়ে সরে যেতেন।

মা যখন মারা যায় ছেলের বয়স—তখন ছয় পার হয়ে গেছে। মা ভিন্ন পৃথিবীতে তাকে আদর যত্ন করবার আর কেউ ছিল না। সেও মাকে গুরুর মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত।

বাপ সমস্তদিন খেটেখুটে এসে জলযোগের পর আপনার বিশাল বপুখানি বিছানায় এলিয়ে দিয়ে মুখে গড়গড়ার নলটা লাগিয়ে ঘুমাবার যোগাড় দেখতেন। ছেলের দিকে দেখবার তাঁর সময় ফুরিয়ে উঠত না।

এইরকম করে সুখেই তাদের দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন সুনির্মল আকাশের কোণে একখণ্ড কাল মেঘের ছায়া পড়ল। ছেলের মাই অসুখ করল। দেখতে দেখতে মেঘখানা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে এক প্রকাণ্ড মেঘের সৃষ্টি করল। মায়ের রোগও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল।

বাপ তাঁর সেব কপর্দকটুকুর বিনিময়েও স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। মা তাঁর স্বামীর প্রাণ মরুভূমি করে, ছেলেকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে অনন্তের পথের যাত্রী হলেন।

দুই

ছেলেটির এক বন্ধু ছিল; নাম তার নীলমণি। নীলমণি তাকে খুব ভালবাসত। যেদিন তার মা মারা গেল সে আর তার সঙ্গে সেদিন দেখা করল না। বোধহয় তার মনেও খুব আঘাত লেগেছিল।

যা হ'ক, পরদিন ত' নীলমণি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। একটী ছোট ঘরের কোণে একখানা পাতা মুনাসনের উপর খান ও চাদর পরে বসে সে একখানা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাতে ছিল। তাকে দেখে ছেলেটির কান্নার বেগ আর বাধা মানল না। দুগাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল। নীলমণিও একটা জানালার ধারে জলভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

শোকের বেগ যখন কিছু কমে এল ছেলেটি তখন তার বন্ধুর দিকে এগিয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ধরাগলায় জিজ্ঞেস্ করলে, "ভাই, আমার মা কোথায়, ভাই?"

হায়রে! একথার কোন সঠিক উত্তর কি দেওয়া যায়? অনেক গবেষণার পর বড় বড় জ্যোতিষীরা জগত-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা কোন তত্ত্ব বার খুঁজে বার করতে পারলে না, সামান্য বালক হয়ে নীলমণি-বন্ধু তার কি উত্তর দেবে?

হঠাৎ তার মনে পড়ল মা একদিন কথার ছলে বলেছিলেন, "হারে মনে, আমি যখন মরে স্বর্গে যাব তখন তুই আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?" তখন সে তার কি উত্তর দিয়েছিল তা তার মনে নেই। কিন্তু মানুষ মলে কোথায় যায়?—স্বর্গে।

চোখের পাতা ছাপিয়ে মুক্তার মত কয়েক ফোঁটা জল নীলমণির গালের উপর হাত দিয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল। মনের মধ্যে অনেক কথা জালগোল পাকাচ্ছিল কিন্তু কি বলবে, তাহা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কেবলমাত্র ইঙ্গিতে সে বাহিরের উন্মুক্ত আকাশকে দেখিয়ে দিল।

ছেলেটি বলে, "আঃ।"

তিন

তারপর সে অনেক দিনের পরের কথা। সুদীর্ঘ ছয় বছর কেটে গেছে। মাতৃহীন বালক এখন মাতৃহীন যুবকে পরিণত হয়েছে। মা-হারানর শোক এখনও যুবকের মন হতে মুছে যায় নি। এখন আবার তার এক নতুন-মা আছে। আপনার ছেলেমেয়ের চাইতে নতুন-মা সতীন-পোকে আদর যত্ন করেন। যুবককে তার মায়ের অভাব তিনি বুঝতে দিতেন না। তার বাপ তাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। নতুন মার একটি ছোট মেয়ে হয়েছে—সে তার ছোট বোন।

নীলমণি ও সে এক কলেজ থেকে এক সঙ্গে পাশ করে বেরিয়েছিল। সুখে দুঃখে সে তাদের ভাগীদার ছিল।

কিছুদিন হ'ল নীলমণির গলায় "ক্যানসার" হওয়ায় সে বড় ভুগ্‌ছিল। উৎকট রোগ; মানুষ নাকি এতে বাঁচে না।

সে এক বাদল রাতের অবসান হতেই তার প্রাণের বন্ধুটিও তাকে বন্ধুত্বের দাবী না মিটিয়েই মৃত্যুর ভয়াল অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আর তাকে এ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর—তারপর যুবকের মনে জগতের উপর কেমন এক বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। বাপ ও নতুন-মার স্নেহ তার অসহনীয় হয়ে উঠল। মা-হারানর শোক আবার তাকে পেয়ে বসল।

রাত্রির অন্ধকারে বসে তার অনেক কথা মনে হতে লাগল। মায়ের আদর যত্নের সঙ্গে নতুন-মার কোন তুলনাই হল না। নীলমণি তার যত প্রিয় ছিল তত আর কোন বন্ধুই প্রিয় ছিল না বলে তার মনে হল।

জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, যৌবনের অদম্য চিত্তবৃত্তিকে পদদলিত করে এক শরৎকালে সন্ন্যাসীর প্রাঙ্গণে যুবক গৃহত্যাগ করল।

তারপর,—তারপর অনেক সুখ দুঃখের দিন চলে গেছে তবু তার এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। বোধ করি জীবনের স্রোতে সে'ও কোথা ভেসে গেছে!

শিক্ষক। পড়া করিস নি পাজী?
ছাত্র। আজ্ঞে...
শিক্ষক। তোর আজ্ঞে শুনতে চাইনে কেন করিস নি—তাই বল।
ছাত্র। আজ্ঞে—আমার দিদির পেটের অসুখ....
শিক্ষক। তা তোর কি...
ছাত্র। আজ্ঞে, আমার কিছু না, তবে সে কিছু খায় নি, তার খাবারগুলো আমাকেই খান...
শিক্ষক। ওরে হতভাগা গুরোর...ইত্যাদি

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া তারানাথ দেখিল, তাহার নামে একখানা টেলিগ্রাম লইয়া পিয়ন অপেক্ষা করিতেছে। তারানাথ সহি দিয়া টেলিগ্রাম লইল, এবং নিজের ঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া পড়িল—

"ইওর ওয়াইফ্ কেস্ সিরিয়াস্, কম্ সার্প্।"

তারানাথের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে টেলিগ্রামখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতেও যেন শান্তি না পাইয়া, দেশলাই আনিয়া কাগজের ছিন্ন খণ্ডগুলাকে একটী একটী করিয়া পোড়াইতে লাগিল।

কাগজের টুকরাগুলা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তারানাথ সেই টুকরা ছাইগুলাকে পা দিয়া রগড়াইয়া টেলিগ্রামখানাকে যেন নিশ্চহ্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় তারকনাথ দরজার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'তে তারানাথবাবু?"

চোর চুরি করিতে করিতে হঠাৎ গৃহস্থের সাড়া পাইয়া যেমন ভীষণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তারানাথও ঠিক তেমনই আকস্মিক আতঙ্কে যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার এই শিহরণটুকু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নামে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে না?"

ঢোঁক গিলিয়া তারানাথ উত্তর দিল, "হাঁ।"

তারকনাথ বলিল, "কোথা হ'তে টেলিগ্রাম এল? বাড়ী হ'তে বুঝি?"

তারানাথ চট্ করিয়া উত্তর দিল, "না, বর্দ্ধমান হ'তে উকীল বামিনীবাবু টেলিগ্রাম ক'রেছেন, মামলাটা খারিজ হ'য়ে গিয়েছে। আপনি ফিরলেন কখন্?"

ক্ষণকাল গম্ভীরস্বরে থাকিয়া তারকনাথ বলিল, "ওঃ এই সংবাদ! আমি মনে করেছিলাম বোধহয় আপনার বাড়ীর টেলিগ্রাম। আপনার স্ত্রী—"

বাধা দিয়া তারানাথ বলিল, "আমার স্ত্রী নাই।"

তারকনাথ বলিল, "স্ত্রী না থাকলেও অন্য আত্মীয়স্বজনেও তো আছে।"

কর্কশকণ্ঠে তারানাথ বলিল, "আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নাই।"

একটা আশ্চর্য্যসূচক "ওঃ" শব্দ করিয়া তারকনাথ যেন আপনার ধারণার সংশোধন করিয়া লইল এবং মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে ধীর গম্ভীরপদে সেস্থান ত্যাগ করিল। তারানাথ যদি সে সময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের কুটিল হাসি একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুখ তুলিয়া তাহা দেখিবার শক্তি বা সাহস তারানাথের ছিল না; তারকনাথ চলিয়া গেলে সে ভিজা গামছা দিয়া ছাইএর বাকিটুকু মেঝে হইতে মুছিয়া ফেলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বাহিরে টেলিগ্রাম খানার কোন চিহ্নই রহিল না, কিন্তু তাহা মনের ভিতর যে একটু দাগ বসাইয়া দিয়াছিল, সেটুকুকে মুছিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই তারানাথ দেখিতে পাইল না, এবং তজ্জন্য অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু তাহাকে নীরবেই ভোগ করিতে হইল।

দূর হউক, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ ইওর ওয়াইফ্ কেস্ সিরিয়াস্!' আর একদিন এমনই হঠাৎ টেলিগ্রাম আসিয়াছিল—'ইওর আঙ্কল কেস্ সিরিয়াস্!' কিন্তু সে সংবাদে আর এই সংবাদে কত প্রভেদ! সেদিন সেই একটা ভুল সংবাদ আসিয়া তাহার জীবনটাকে এক নূতন—অচিন্তিত স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, আর আজ এই দুঃসংবাদটা আসিয়া তাহাকে সেই অভিনব স্বপ্নরাজ্য হইতে বিচ্যুত—বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে সংবাদটা আর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। নতুবা—অনুপমার কাণে গেলে—সে বিবাহিত—তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান, অনুপমা ইহা শুনিতে পাইলে—তাহার আশালতা কি সমূলে উৎপাটিত হইত না? ভাগ্যই তাহাকে আজ রক্ষা করিয়াছে।

"ইওর ওয়াইফ্ কেস্ সিরিয়াস্!" ওঃ, কি সুন্দরী মুরলা মনোমোহিনী স্ত্রী যে, এই সংবাদে তারানাথ ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, এবং অনুপমাকে ফেলিয়া সেই কথা স্ত্রীকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইবে! চুলোয় যাক্ সে স্ত্রী!

ইহা অপেক্ষা যদি সংবাদ আসিত, 'ইওর ওয়াইফ্ ডেড্' তাহা হইলে বোধ হয় কাতরতা দূরের কথা, তারানাথ আনন্দিত—সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইত।

ভাল, এখানকার ঠিকানা তাহারা জানিল কিরূপে? তারানাথ ত এখানে আসিয়া অবধি মামার কাছে বা স্ত্রীর কাছে একখানিও পত্র দেয় নাই, সেখানকার কোন লোকের সঙ্গেও কোন দিন সাক্ষাৎ হয় নাই? তবে তাহার ঠিকানা জানিয়া কিরূপে এখানে টেলিগ্রাম করিল? কে টেলিগ্রামের প্রেরক? মামা কি, না স্ত্রীর পিত্রালয়ের কেহ? প্রেরক যে কে তাহা না পড়িয়াই তারানাথ টেলিগ্রাম খানাতে সই করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং তাহা জানিবার আর কোন উপায় ছিল না। অথচ কে টেলিগ্রাম করিল, এই প্রশ্নটাই তাহার মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।

আচ্ছা, এটা শত্রুপক্ষের চক্রান্ত নয় তো? অনুপমার আনুরাগ দৃষ্টি হইতে তাহাকে দূরীভূত করাও তো লোকের উদ্বেগ হইতে পারে। কিন্তু তেমন শত্রু এখানে কে আছে, যে জানে সে বিবাহিত, দেশে তাহার স্ত্রী আছে। তারকবাবু—না, তারকবাবুর ইহা জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? ক্ষুপতিবাবু—না, প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইলেও তাহার মত লোকের দ্বারা এত অনুসন্ধান—এমন ক্ষুট কৌশল সম্ভব হইতেই পারে না। তবে কি সত্যই তাহার স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণোন্মুখ? সেই প্রত্যাখ্যাতা, অনাদৃতা রমণী মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তাহাকে একবার দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে? অসম্ভব, অসম্ভব! যে জীবনে তাহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র স্নেহ, কণামাত্র ভালবাসা পায় নাই, রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, আসন্ন মৃত্যুর কঠোর বিভীষিকাকে উপেক্ষা করিয়া সে যে সেই চির উপেক্ষা পরায়ণ স্বামীকে দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ পোষণ করিবে, ইহা যেমন অবাস্তবিক, তেমনই অসম্ভব। সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব, সে তাহার ঠিকানা প্রাইবে কোথায়?

তবে এই টেলিগ্রামখানা কি? কে জানে, ইহার মধ্যে কি গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

সেই রহস্যের মীমাংসার উপনীত হইবার জন্য তারানাথ আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রিতাবস্থায় তারানাথ স্বপ্নে দেখিল, সে যেন অনুপমাকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পুরী গিয়াছে এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের ফলে অনুপমা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দেহের সে পূর্ব্ব লাবণ্য, মুখমণ্ডলের সে স্বাভাবিক জ্যোতি ফিরিয়া আসিয়াছে। একদিন সে সাগরতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলিতেছে,—"তারানাথবাবু, আমার রুগ্ন প্রাণ আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন; এতে আর কারো অধিকার নাই, এ প্রাণ আপনারি।" আশার সাফল্য জনিত অপূর্ব্ব পুলকে তারানাথের হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া আসিল; অনুপমার এই স্বর্গীয় প্রতিদানের উত্তরে, প্রেম-পুলকিত কণ্ঠে কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হইল না; পশ্চাৎ হইতে কাহার করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া কে তাহার মুখটাকে চাপা দিয়া ফেলিল। তারানাথ বিস্ময়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, একি, এ যে তাহারই স্ত্রী। সেই প্রত্যাখ্যাতা অনাদৃতা রমণী অসহায় ভাবে বায়ুশয্যায় উপর পড়িয়া রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছে—"ওগো, তুমি একবার এস, এ সময়ে একবার দেখা দিয়ে আমার এই মৃত্যু-যন্ত্রণাটাকে শুধু সফল ক'রে দিয়ে যাও।" চারিদিক হইতে সূচীভেদ্য অন্ধকার আসিয়া সাগর পৃথিবী সব ঢাকিয়া দিল, সে অন্ধকারে তারানাথ অনুপমাকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার আসিয়া তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসকে পর্য্যন্ত যেন রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। তারানাথ ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া অনুপমাকে ডাকিতে গেল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না, নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে সেই করুণকণ্ঠের প্রতিধ্বনি আসিয়া যেন তাহার বুকের উপর পাহাড়ের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সেটাকে সরাইয়া দিবার জন্য সাধ্যের আপ্রাণ তারানাথ প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে গেল। শব্দ ভাঙ্গিয়া গেল; তারানাথ ঘর্ম্মাক্ত দেহে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর বসিয়া দেখিল, প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক আসিয়া তাহার সর্ব্ব অঙ্গ স্নান করিতেছে।

তারানাথ আর শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করিল না। সেইদিন মধ্যাহ্নে টেলিগ্রাফ অনুপমাকে লইয়া রমণী রানা করিল।

পুরীগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানা ছাড়িতে এক মিনিট বিলম্ব ছিল। আরোহীরা গাড়ীর জনতা অধিকার করিয়া স্ব স্ব সুবিধামত স্থান পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিল, এবং পাছে অন্য আরোহী আসিয়া আপনাদের সুবিধার ব্যাঘাত উপস্থিত করে, এই আশঙ্কায় সকলে চাপিয়া দাঁড়াইয়া স্থানলাভার্থে ব্যস্ত অন্য যাত্রীকে 'এ গাড়ীতে স্থান নাই' বলিয়া নিরাশ করিয়া দিতেছিল, এবং স্থানে স্থানে ইহা লইয়া আরোহীগণী ও আরোহণে বাধা দানকারী উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও হাতাহাতি পর্য্যন্ত বাধিয়া গিয়াছিল। ট্রেণের কর্ম্মচারীরা প্লাটফর্ম্মের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া আপনাদের কার্য্যের ব্যস্ততার পরিচয় দিতেছিল; এঞ্জিনখানা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া সশব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গার্ডের বংশী ধ্বনির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর ভিতরে, বাহিরে একটা উৎকণ্ঠা-পূর্ণ কোলাহলের সহিত বিরম চাঞ্চল্য, পরিচালিত হইতেছিল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল; সঙ্গে সঙ্গে সকল কোলাহল—সকল চাঞ্চল্য মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া আসিল। তীব্র বংশীধ্বনি দ্বারা ট্রেণনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ট্রেণখানা গমনমুখ হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—ট্রেনের বিদায় সূচক বংশী ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কৃপতি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া একটা মধ্যম শ্রেণীর কামরার দরজা ধরিয়া টান দিল। দরজা খুলিয়া গেল, ট্রেণও শুরু শুরু শব্দে চলিতে আরম্ভ করিল। কৃপতি লাফাইয়া গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে গাড়ীতে উঠিতে পারিল না, দরজার পার্শ্বের বেঞ্চির উপর এক ছদ্ম বেশ-ধারী প্রৌঢ় ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল; এবং 'এ গাড়ীতে স্থান নাই' বলিয়াই কৃপতিকে বাধা দিবার উপক্রম করিল। ট্রেণ তখন বেগে প্লাটফর্ম্মের অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং তাহার বাধায় পড়িয়া সেখানে লোকটা যে মুহূর্ত্তমধ্যে ট্রেণের চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবে, নিজের অসুবিধার আশঙ্কায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার অবসরও তাহার ছিল না। কিন্তু গাড়ীর অপর পার্শ্বে আর এক যুবক বসিয়াছিল, তাহার লক্ষ্য এই দিকে পতিত হইল। লক্ষ্য করিবা মাত্র সে তীরবেগে দরজার কাছে ছুটিয়া আসিয়া, একটা অতর্কিত ধাক্কায় প্রৌঢ় লোক-টাকে সরাইয়া দিয়া, কৃপতিকে এক প্রকার টানিয়া গাড়ীর ভিতর তুলিয়া লইল। ট্রেণনের দুই জন কর্ম্মচারী সেই গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহারা নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী প্লাটফর্ম্মের বাহিরে চলিয়া গেল। কৃপতি গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেঞ্চির এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তাহার রক্ষাকর্ত্তা যুবকটী তখন সেই প্রৌঢ় লোকটীকে তাহার অবিবেচনার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিল; গাড়ীর অন্যান্য আরোহীরাও এই তিরস্কারে যোগ দিয়া লোকটীকে লজ্জায় জড়সড় করিয়া তুলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃপতি অনেকটা সুস্থ হইলে পূর্ব্বোক্ত যুবকটী তাহাকে নিজের পাশে বসাইল, এবং এইভাবে গতিশীল গাড়ীতে উঠিতে গিয়া সে কিরূপ অবিমৃষ্যকারি-তার পরিচয় দিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ভবিষ্যতে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিল। কৃপতি সেই রক্ষাকর্ত্তা যুবককে ধন্যবাদ দিয়া জানাইল যে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সে এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছে; তাহার এক আত্মীয় কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পুরীধামে গিয়াছে, সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, তাহার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কৃপতি তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে; যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে পৌঁছান তাহার আবশ্যক। কিন্তু এই ট্রেণটা ধরিতে না পারিলে আজ আর সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়, রাত্রির ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিলে কাল অপরাহ্ণের পূর্ব্বে সে পুরীতে উপস্থিত হইতে পারিবে না। কাজেই সে এমন ছুঃসাহসিকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাহার এই কৈফিয়তের পর যুবক আর তাহাকে তিরস্কার করিতে পারিল না। অতঃপর পরস্পর পরিচয় হইল। কৃপতি নিজের নাম ধাম বলিল, এবং তাহার আত্মীয়া সম্রান্তা মহিলা হইলেও সে যে সামান্য বেতনের কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে সে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তারপর যুবকের পরিচয় লইয়া জানিতে পারিল, তিনি এঞ্জিনে হোমিওপাথী ডাক্তার, অল্পদিন পূর্ব্বে এম্ বি পাশ করিয়া

জাক্তারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পসার তেমন না জমিলেও আয় নিতান্ত মন্দ হইতেছে না। কিন্তু অবিরাম মানসিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশে বাহির হইয়াছেন। তিনি আপাততঃ পুরীতে যাইতেছেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আসিবেন। সঙ্গে তাঁহার কেহই নাই; যেখানে যাইবেন হোটেল বা ধর্ম্মশালায় থাকিবেন সঙ্কল্প করিয়া একাই বাহির হইয়াছেন। আপাততঃ ক্ষুপতিকে সঙ্গীরূপে পাইয়া পুরী পর্য্যন্ত একা যাইবার কষ্টটুকু দূর করিবার উপায় লাভ করিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছেন।

যুবকের নম্র মধুর আলাপে ক্ষুপতি মুগ্ধ হইল। ডাক্তার বাবুও তাহার সঙ্গলাভে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্ষুপতি কোন্ আত্মীয়কে দেখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে তাহা বোধহয় বলিতে হইবে না। কিন্তু অতঃপর পুরীতে অবস্থিতি ও তাহার শোচনীয় অবস্থার সংবাদ সে কিরূপে অবগত হইল? ক্রমশঃ

বনের টান।

(সংস্কৃত)

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর]

সোণার পিঞ্জরে রাখিয়া, এ যেহে
বুলায়ে কমল পাণি,
গোরসের সাথে খাদিম রসাল
দল ধারা দেয় ছানি'
মোরে অবিরাম রাম রাম নাম
শুনাইছে পরিজন
তবু সেই বনে অন্য কোটরে
পড়ে আছে মোর মন।

পালোয়ান গোবরের কথা

যিনি বৎসর বয়সের সময় সুপ্রসিদ্ধ জগৎ বিখ্যাত গোবর যে মুগুর ভাঁজিতেন, তাহার প্রত্যেকটার ওজন ছিল পঁচিশ সের করিয়া। তাঁহার আর এক জোড়া মুগুরও আছে, তাহার প্রত্যেকটার ওজন এক মণ দশ সের। তিনি অক্লেশে এই মুগুর জোড়াটী ভাঁজিতে পারিতেন।

মুখী করিবার সময় অন্যান্য পালোয়ানগণ তাঁহার খাদ্য সহজে যোগাইতে পারিত না, কাজেই তাঁহার খাদ্যের কোন প্রকার চালনা হইত না বলিতে পারা যায়। চালনা না হইলে অধিক উন্নতির স্থান বিবেচনা করিয়া তিনি খাদ্যে দুই মণ ওজনের সাপের একটা হাঁড়লির খাঁচা দিনির ঝুলাইয়া রাখিতেন। এই হাঁড়লি গলায় পরিয়া তিনি বাড়ীর সিঁড়িতে অনবরত উঠা নামা করিতে পারেন।

ঐ বয়সে গোবর দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ১ ইঞ্চি ছিলেন। তাঁহার ছাতির বেড় ৬৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি। কোমর ৪২ ইঞ্চি। বাহুর গুলি ১৮ ইঞ্চি। কব্জইয়ের নীচের বেড় ১৩ ইঞ্চি। কব্জি ৮ ইঞ্চি। জাঙ্ঘর বেড় ২০ ইঞ্চি। পায়ের ডিম্ব ১৮ ইঞ্চি। গলা ১৮ ইঞ্চি। ওজন—তিন মণ।

উপরোক্ত বয়সে গোবর নিম্নলিখিত ভাবে আহার করিতেন।—বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্য ব্যতীত তাঁহার কলিকাতায় বাস-অবস্থায় তিনি তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংস খাইতেন; ৪০০ বাদাম; এক ছটাক ছোট এলাচ; সের সের বেদানার রস; এক টাকার সোণার পাত, দুই আনা রূপার পাত, বাদাম ও নানাবিধ মসলা মিশ্রিত সরবত, একসের খাঁটী দুধ এবং এক টাকার ফল আহার করিতেন" বলেমাতরম।

এক

কর্মের সন্ধানে

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা সাতটা বাজিতেই রৌদ্র বেশ কড়া হইয়াছে।

ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডের একখানা বাগান-ঘেরা বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া একটি ত্রয়োবিংশবর্ষ বয়স্ক যুবাপুরুষ ভিতরের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। যুবক সৌম্যদর্শন, পাতলা একহারা চেহারা। অঙ্গে অতি অল্পদামের কাপড় ও একটি দেশী টুইলের সার্ট, পায়ে একজোড়া বাহুল্যতাবর্জিতভারবিহীন। মাথায় চুল অতি দীর্ঘ, সংস্কারাভাবে ধূলি মলিন। মুখখানিতে একটা বিষাদের কালিমা যেন মাখান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যুবককে সুন্দর বলা চলে। ইঁহার নাম সুশান্ত চৌধুরী। ইনি এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটি হইতে সম্প্রতি বি-এ পাশ করিয়া আসিয়াছেন।

ফটকের পাশেই দারবানজীর টুলখানি ও তদুপরি নিম কাষ্ঠের দাঁতনটি পড়িয়া রহিয়াছে, যুবক দশ মিনিট অপেক্ষা করিল কিন্তু দারবানজী আসিলেন না। যুবক সন্তর্পণে ফটকে প্রবেশ করিলেন। ফটক পার হইয়াই একটি নাতিবৃহৎ পুষ্পোদ্যান, তাহারই এক পাশ দিয়া সরু লাল কঙ্করময় একটি পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়ী বারান্দার নিচে অদৃশ্য হইয়াছে। যুবক ধীর পদে চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলেন, গাড়ীবারান্দার ঠিক সম্মুখে দুইটি হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব প্রকাণ্ড দুইটা বালতিতে দানা খাইতেছে। তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সহিস বারান্দার দিকে চাহিয়া তাহা হিন্দিতে কি বলিতেছিল। যুবক আশা করিয়াছিলেন, উপরে নিশ্চয়ই গৃহস্বামী দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এই ভাবিয়াই তিনি সহিসের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে চাহিয়াছিলেন—চাহিয়াই যুবক উন্নত দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন; গৃহস্বামী নন,—দু'তিনটী মহিলা হাস্যমুখে কথোপকথন করিতেছিলেন।

সাজ্জারই পদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলেন—একটি উড়িয়া বালক একখানি ঝাড়ন দ্বারা গৃহের প্রবেশ দ্বারের পিত্তল ও কাচগুলি ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেছে। তাহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—বাবু আছেন?

উড়িয়া বালক মাথা নাড়িয়া বলিল, বাড়ীর ভিতরের খবর সে বলিতে পারে না।

যুবক কিঞ্চিৎ বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীর চাকর যদি মনিবের সন্ধান বলিতে না পারে তবে আর কে পারিবে? কয়েকমিনিট সেই স্থানেই পাদচারণা করিয়া যুবক ভাবিলেন, ঐখানে গিয়া মহিলাটীকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত উত্তর পাওয়া সম্ভব; সহিস যদিও না জানে, মহিলারা নিশ্চয়ই বলিয়া দিবেন। কিন্তু সাহস হইল না, সহরের অর্থবান গৃহস্থের নরনারী সম্বন্ধে এমনই এক সনাতন সঙ্কোচ যুবকের হৃদয়টি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে কোনমতেই মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন না।

অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করাই বিশেষ বিবেচনা করিয়া জামার পকেট হইতে সযত্নে ভাঁজ করা একখানি পত্রী বাহির করিয়া উড়িয়া বালকের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন, কি ভাবিয়া আবার ফিরিলেন। যেখানি তাঁকে পাঠাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যে রক্তবর্ণ কঙ্করময় পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফটকের দিকে যাইবেন, সাদা উর্দি, মাথায় শীতবর্ণের পাগড়ী বাঁধা এক চাপরাশী ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—বাবু!

সুশান্ত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—নিখিলবাবু বাড়ীতে আছেন?

চাপরাশী বলিল—নিখিলবাবু নয়, এন সেন, সাহেবের-এ বাড়ী।

সুশান্ত আপনার ভুল বুঝিলেন, লজ্জিতভাবে কহিলেন—[illegible]—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—বলিয়া যুবতী একখানি পাশের কাঠের চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—বসুন। আপনার পাশের ঘরে আপনি যেন-নি-কিছু আছে ঠিক পেয়েছিলুম। আমাদের ধারণা ছিল, আপনি সেখানেই পড়ছেন, বাবা···

তিনি—ভাল আছেন?

হাঁ—ভালোই আছেন। বাবা কলকাতায় নেই, রেঙ্গুন বেড়াতে গেছেন। শরীরটা ইদানী ভালো যাচ্ছিল না, সবাই বলে, সি-ভয়েজ (সমুদ্র ভ্রমণ) হলে ভালো হয়, তাই এই মার্চের প্রথমেই গেলেন। আপনি এখন কি করছেন শান্তবাবু? এম্-এ পড়ছেন নিশ্চয়ই?

সুশান্ত বলিল—না। ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিলেন যে?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সুশান্ত জিজ্ঞাসিল—এটা তোমার···

এ-যে আমার মামার বাড়ী। জেন—আমার মামাকে ত আপনি কতদিন আমাদের বাড়ীতে দেখেছেন শান্তবাবু! এই চার বছরেই সব ভুলে গেলেন বুঝি?

না ভুলি নি!—সত্যই সুশান্তর মনে পড়িল, মিঃ সেনকে সে বহুবার রাজেশ্বরবাবুর গৃহে দেখিয়াছে।

মামার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ত?

সুশান্ত বলিল—না। এক মিনিট পরে আবার বলিল—মার্চ মাস থেকে তুমি এখানেই আছ কামনা?

কামনা মৃদু হাসিয়া বলিল—সেখানে একলা আর কি করে থাকি বলুন? মাঝে মাঝে যাই, যেতে আসি।

বাবা কবে আসবেন?

নভেম্বরের গোড়াতেই আসবেন। কৈ—আপনি কি করছেন, কোথায় আছেন, তা ত বল্লেন না!

আছি—কলকাতায় একটা মেসে, আর করা-করি এখনো কিছু হয় নি, চাকরি খুঁজছি।···বলিয়া মুখখানি ম্লান করিয়া বসিয়া রহিল।

কামনা মৃদু, সহানুভূতি পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—আর পড়লেন না কেন? বি-এতে আপনার ত ভালো রেজাল্টই হ'য়েছিল, এম্-এতে কাঁ ক্লাস-একটা পেলে বেশ একটা প্রোফেসারী পেতেন।

কিছু যোগাড় করতে পারলুম না, কামনা।

হ্যাঁ।

মিস্ বাবা—নিশ্চয়ই সুহৃদস্বামীর কন্যা, ধনীদুহিতা, নিঃসন্দেহে শিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা। তাঁহার পক্ষে হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয় কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত আলাপ করা কষ্টসাধ্য বা লজ্জাকর নহে, কিন্তু যুবক বহু মুহূর্তের মধ্যেই ঘামিয়া উঠিলেন। চাপরাশী অন্য স্থান হইতে দুইটি টিপিয়া পাখা চালাইয়া দিয়াছিল, তা সত্ত্বেও যুবকের সর্বাঙ্গ ঘেমে সিক্ত হইয়া উঠিল। একবার ভাবিলেন, থাক্ চিঠি, তাকে-ই পাঠাইব, চলিয়া যাই। আবার ভাবিলেন, সাক্ষাতে হয় ত সুফল ফলিতে পারে।

ঘণ্টা করিয়া শব্দ হইল, কাঠের পর্দা আবার খুলিয়া গেল। যুবক অতিকষ্টে মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

মেয়েটি দুহাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বলিল—এলাহাবাদ থেকে কবে এলেন শান্তবাবু?

যুবক অতিকষ্টে বলিল—মাস দুই।

মাস দুই এখানেই আছেন?

কেন—তাঁরা? যাঁদের ছেলের গার্জেন টিউটর ছিল আপনি শুনেছেন?

তাঁদের ছেলেটি মারা গেছে। অমাবস্যার পরীক্ষার কেস দুইদিন আগেই সে মারা যায়। সে দুঃখ—অতি কষ্টে ভুলতে পেরেছিলুম।

কামনা কাতরস্বরে বলিল—বাবারও ত ঐ—আমাকে নিয়ে এমনী আর চিঠিপত্রই লিখতেন না যে। বাবা কোন সুখ করছেন।

সুব্রত কোন উত্তর দিল না। কামনা তাহার দিকে তাকিয়া মুহূর্তে নীরবে থাকিয়া, বলিল—আমার কাছে চিঠি কোন দরকার ছিল?

ছিল একটু। তিনি ও সম্বন্ধে নাই।

না, হঠাৎ খবর পেয়ে রাতের গাড়ীতেই সীতারামপুর গেছেন। দু'একদিনের মধ্যেই আসবেন।

যুবক আর কোন প্রশ্ন করিল না, আস্তে আস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল।

কামনা বলিল—চল্লেন? একটু বসুন-না, চা-টা একটু...

আমি চা খাইনে কামনা।

খান-না?

না। গরীব লোকের পক্ষে...

বাধা দিয়া কামনা বলিল—আমার কাছেও কি...

ষ্টেটসম্যানে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল...

কামনা সহর্ষে বলিয়া উঠিল—আপনি নেবেন সে কাজ? নিন-না শান্তবাবু। মামা এলেই আমি বলে দেব খন। সে বেশ হবে!—বলিতে বলিতে কামনার মুখখানি, চোখ দুটি যেন এক নবীন শ্রী ধরিল।

যুবক নীরব। কামনা আপন-মনেই বলিতে লাগিল—পরশুদিন ছিটাট, আনেন ত? এখানেই থাকতে হবে। আপনার আর তাতে কিইবা ক্ষতি? মেসে আছেন... সেই মেসেই না-কি শান্তবাবু? সেই আমাদের বাড়ীর...

না। এখন সিমলের একটা মেসে...

সিমলের কোথায়?

সুব্রত এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল—মেসের নাম, ৯ নম্বর।

কামনা একখানা কাগজে ঠিকানা কথা কয়টি লিখিয়া লইয়া, বলিল—মামা এলেই খবর দেব। কিন্তু... আচ্ছা আপনিই কেন কাল পরশু একবার আসবেন না শান্তবাবু?

সুব্রত এক মিনিট কি ভাবিয়া বলিল—আসার বোধ হয় দরকার হবে না।

কামনা নিরুত্তরের বিস্ময়ে কথা কয়টা শুনিল। বলা জানিল না; বুঝিল না, দেখিল না যে ঐ কথা কয়টা বলিয়া যে স্থানে দিয়া পৌঁছিল সেই স্থানটা সঙ্গে সঙ্গে কি শূন্যই না হইয়া গেল। কামনা সে আঘাতটুকু সহ্য করিয়া লইয়া সহজ স্বরেই বলিল—আচ্ছা, আমরাই খবর দেব। ঐ ঠিকানায় লিখলে চিঠি পাবেন ত?

ঠিক বলিতে পারিনে, বাসা বদলাবার কথা হচ্ছে। দু'চারদিনের মধ্যেই ত আর বদলাবেন না?

তাও বলতে পারি নে। আচ্ছা—এখন আসি।

কামনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল—তাহলে কি করব বলুন? খবর দেব, না, আপনি একবার আসবেন? আসবেন-ই না শান্তবাবু, টাকার কতক্ষণই বা লাগে?

দেখব—বলিয়া সে সিঁড়ি কয়টা নামিয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

কামনা বলিল—নমস্কার...ইহার উত্তর মিলিল না। কামনা সেইখানেই কিছুক্ষণ নিশ্চল প্রতিমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কেন জানে না, এই প্রভাতের নব সূর্যোদয় মনটি তাহার কি এক বিষাদের কালিমায় অন্ধকার হইয়া গেল। গাছের আড়ালে লোকটি অদৃশ্য হইয়া গেলে—ধীরে ধীরে—ফিরিয়া উঠিয়া গেল।

যুবক ফটকের বাহিরে গিয়া যেন চক্ষু মেলিয়া চাহিল। চক্ষু মেলিতেই কামনার সেই সুস্থ বসনাবৃত কৃশ দেহটি, তাহার সেই সুন্দর, স্নেহকোমল তরুণ মুখ-খানি তাহার চোখের সামনে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর! কামনা চিরদিন সুন্দর! সেই চার বছর আগেও সে ছিল সুন্দর, আজ চার বছর পরেও তাহাকে দেখিল, সুন্দর! সুন্দর! অতি সুন্দর! তেমনি স্নেহশীল, তেমনি পরদুঃখকাতর, তেমনি বন্ধুবৎসল!

ট্রামের আশায় সে একটা গাছের নিম্নে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর পদব্রজেই চৌরঙ্গীর পথ ধরিয়া এসপ্ল্যানেডের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ইচ্ছা, ষ্টেটসম্যান আফিসের প্রাচীর গাত্রে লম্বিত বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাটি দেখিয়া বাসায় ফিরিবে। আর কয়টা পয়সাও বাঁচিবে! এখন চারিটি পয়সা যে তাহার কাছে চারখানি নিধি!

(ক্রমশঃ)

(মিঃ বি, জি, হর্ণিম্যানের পত্র)

: হার্ণম্যান লিখিয়াছেন, "আমি কাউন্সিল গমনের ঘোর বিরোধী। অসহযোগ আন্দোলনে আধাআধি ব্যবস্থা নাই। অসহযোগ আন্দোলনকে ভিন্ন-ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া কেহ বলিতে পারে না যে, আমি এই ভাগে এই সহযোগিতা করিব, আর এই এই ভাগে সহযোগিতা করিব না। ইহাতে কোনরূপ আপোষ চলে না। যখনই আমরা মানিয়া লই যে কাউন্সিলে যাইয়া সরকারের সঙ্গে বিরোধ হইবে, সে মুহূর্তেই আমরা অসহযোগকে বিসর্জন করি। কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি কাহার মত, সরকার ঐগুলি পাতিয়া রাখিয়াছেন আমাদের ধরিবার জন্য। এইগুলি বাস্তবিকই প্রতিনিধিমূলক বলিয়াই মনে হয় এবং উহাদ্বারা জনসাধারণের শাসন ব্যাপারে অধিকার লাভ হইবে ইহাও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু আসল ক্ষমতাগুলি সমস্তই রহিয়াছে সরকারের হাতে। সরকার ঐ ক্ষমতাবলে কাউন্সিলের অপ্রীতিকর বা অসুবিধাজনক সিদ্ধান্ত সমস্তই নাকচ করিয়া দিতে পারেন। জাতীয় দল যদি কাউন্সিলের সদস্যপদ অধিকার করিতে পারেন, তাহাতেও সরকারের বিশেষ কিছু আসিবে যাইবে না, কেননা কাউন্সিলের গঠনই এমন চমৎকারভাবে করা হইয়াছে যে, যেখানেই সরকারের মতের সহিত জনগণের মতের মিল হইবে না, সেখানেই সরকারের নাকচ করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারের সব কার্য্যে বাধা দিয়া বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে অচল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু এই বাধা দিবার নীতি কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, অন্যত্র দূরের কথা।

গত ৪০ বৎসর যাবৎ বিলাতের প্রত্যেক মন্ত্রীসভাই প্রথম হইতে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাধা দিবার নীতি কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কারণ সরকারও তাহাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলির হস্তাবৃত্তি প্রভৃতির হাতে যে সব ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা বিলাতের কর্তাদের হাতেও নাই। সুতরাং তাঁহারা প্রত্যেক ব্যাপারেই জয়লাভ করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এরূপ বার বার প্রতিহত হইলে জনগণের পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়ে, আর জনসাধারণের মনে একটা নৈরাশ্য ও বিরক্তির ভাব আসিয়া পড়ে।

এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অসহযোগীগণ যদি কাউন্সিলের সমস্ত যে সরকারী সদস্যগুলিই দখল করিতে সমর্থ হন, তথাপি সরকার তাঁহার মনোমীত সদস্য, কর্ম্মচারী নাকচ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতিদ্বারা কাউন্সিলে সর্ব্বদাই বিজয়ী হইবেন। কাউন্সিলপ্রবেশী অসহযোগিগণ আর একটি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন, কিন্তু নির্ব্বাচিত হইয়া পরে গড়িয়া দাঁড়াইবেন, কাউন্সিলে প্রবেশ করিবেন না। কিন্তু একই কারণে এ সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আইরিশগণ বিশেষ কৃতকার্য্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আয়র্লণ্ডের অবস্থা ভারত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে-সরকারী সদস্যগণ না থাকিলে ভারতের ব্যবস্থাপক সভাগুলি অচল হয় না। তাঁহারা না হইলেও সরকারের চলে। আইরিশগণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় পরে বুঝিয়াছিলেন, বৃটিশের ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া তাঁহাদের কিছু ফল হইবে না, কারণ তাঁহারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। এই সব বুঝিয়া তাঁহারা কমলগতা বরকট করেন, এবং যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা বয়কট করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহাদের হোমরুলযুদ্ধের জয় আরম্ভ হয়। নিজেদের অসহযোগ নীতির আশুফলের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহারা যদি ২১ বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতেন, তবে আজ আমরা স্বাধীন আইরিশরাজ্য দেখিতে পাইতাম না। তাঁহারা এত নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের অসহযোগনীতির উপরই সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা এরূপ স্বচ্ছন্দ এবং স্বাধীন হইয়াছেন যে, বিদেশী সরকারকে আপোষ করা ছাড়া, তাঁহাদের আর গত্যন্তর রহিল না। অসহযোগ আন্দোলন কোন কালে কোন দেশে ব্যর্থ হয় নাই। যেখানেই ইহা দৃঢ়, স্থির, সুবিচলিতচিত্তে অনুসৃত হইয়াছে, সেখানেই ইহা সুফলোপলব্ধি করিয়াছে। যদি ভারত আজ, স্বরাজপ্রিয় কিরূপ কাউন্সিলে প্রবেশ করে, তবে ভারতের অসহযোগনীতি নিশ্চয়ই বিফল হইবে, কেননা কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে অসহযোগনীতিকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে। কাউন্সিলে প্রবেশ করা অর্থ সরকার যাহা চান তাহাই করা। সুতরাং আপনা-আপনি বাকলার জালে যাইয়া উপস্থিত হইবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সংগ্রহ

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

অস্তিকায় মনুষ্য

ভীম, কুম্ভকর্ণের বিরাট বপু আর অতি নিদ্রার কথা আমরা গল্প বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি। রামায়ণ, মহাভারতে রাক্ষসের বর্ণনা যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছে, তেমন ভাবের জীব আজকাল পৃথিবীতে বিরল হলেও, একেবারে যে নেই, এমন কথাও বলা যায় না। হাঙ্গেরী প্রদেশে সম্প্রতি একজন সাইবিরীয়ার লোককে দেখাবার জন্য প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। আমেরিকার Medical Association-এর মতে এই লোকটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তি।

এই লোকটির বাড়ী সাইবীরিয়ায়। এর নাম Kazanloff চব্বিশ বৎসর বয়সেই এই দৈত্যাকার লোকটি উঠেছে ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি। লম্বা চেহারা বলে যে লোকটি বিশেষ রোগা, তা মোটেই নয়। শরীরটি এই অনুপাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। হাতের তালুটির মাপই হচ্ছে ১ ফুট ১ ইঞ্চি। পায়ের পাতা লম্বায় ১ ফুট ৯ ইঞ্চি। বুকের ছাতি ৫৩ ইঞ্চি। মাথার বেড় ২৩ ইঞ্চি। লোকটি ওজনে প্রায় ৫ মণ ২৩ সের। একবার মনে মনে লোকটির চেহারা ভেবে নেবুন দেখি! চারজনের লোকের আহার ভিন্ন এঁর পুষ্টিবৃদ্ধি হয় না। সারাদিনের মধ্যে চারবার আহার করার ফলে, দুইসের আড়াইসের দুধ, ১৫।২০টি ডিম, সের দুই মাংস, পাঁচ ছয়খানি বড় রুটি, তরকারী, আলু, আর বেশ অনেক খানি মধ্যাহ্নের উপরন্তু করে থাকে।

সাইবীরিয়ার প্রভাবটা এঁর শরীরের ওপর বিশেষ আধিপত্য করে বেসেছে। প্রায় সারাদিনই ইনি ঘুমিয়ে কেটে থাকেন। দিবারাত্রির ২৩ ঘণ্টাই ঘুমে কেটে যায়। ঐকান্তিক ঘুমের তাড়নাই এঁকে আনিয়ে তোলে। জাগ্রত অবস্থাতেও এঁর আধখানা বিমান ভিন্ন আর কিছু হয়ে চলে না। Kazanloff যখন আমার সাইবীরিয়ায় ছিলেন সেখানে তাঁর নিজের চাষের কাজে সাহায্য করাই নাকি তাঁর উদ্দেশ্য। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে কি ধরণের সাহায্য করে—সেই জানে!

অল্প সময়ে বড় কাজ

সময়ে সময়ে, অল্প সময়ের মধ্যে এমন সব বড় বড় কাজ করা হয় যে, শুনলে চমৎকৃত হতে হয়। কয়েক বৎসর আগে অষ্ট্রীয়াতে এক ঘণ্টার মধ্যে একটা মস্ত বড় হাসপাতাল তৈরী করা হয়েছিল। এমন সুচারুরূপে এই কাজ করা হয়েছিল, যে একঘণ্টার পরই সেখানে একজন রোগীকে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

এই অষ্ট্রীয়াতেই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে, গাছ কেটে, তা থেকে কাগজ প্রস্তুত করে, সংবাদপত্র ছাপান সম্ভবপর হয়েছিল। সকাল ৭-৩৫ মিনিটের সময় তিনটি গাছ কাটা হয়। ৯-৩৪ মিনিট মধ্যেই গাছের ছাল ছাড়িয়ে, টুকরা করে কেটে, তাকে মণ্ড করে কাগজ প্রস্তুত করে, ছাপাখানায় পাঠান হল। দশটার মধ্যে সেই কাগজে খবর ছাপা হয়ে বাজারে বিক্রী আরম্ভ হল।

নিউইয়র্কে এর চেয়েও একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। কোন এক আমেরিকান কোম্পানীর একজন এজেন্ট, প্যারী (Paris) সহরে জোলা (Zola)র একখানা নতুন বই পান। তিনি পরের ডাকেই বইখানা নিউইয়র্কে পাঠান। বইখানি সেখানে পৌঁছবামাত্রই, তার ইংরাজী অনুবাদ করে, বই ছাপা, বাঁধা সব হয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বই বাজারে বিক্রী হতে লাগল।

বেশীদিনের কথা নয়, ইংলণ্ডের একটা জুতার কারখানায় চব্বিশ মিনিটের মধ্যে একজোড়া সুন্দর জুতা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

নদীর ওপর সেতু তৈয়ার করতে কত দেরীই না লাগে! কিন্তু ফিন্‌সবেরী পার্কে (Finsbury Park) গ্রেট নর্থান রেলওয়ের একটা পুরাতন সেতুকে স্থানান্তরিত করে, সেখানে একটা নূতন সেতু ঠিক করে, দিতে মাত্র চার ঘণ্টা সময় লেগেছিল। অবশ্য ২০০ টনের নূতন সেতুটি দুখানি গাড়ী বোঝাই করে পাশেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

হ্যাটফিল্ডে (Hatfield) এর চেয়েও আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটেছে। ৫২ মিনিটের মধ্যে চার লাইন পাতা

পুরাতন পুলের পরিবর্ত্তে, ৬টি লাইন পাতা নূতন একটী পুল সেখানে খাটিয়ে গাড়ী চলাচলের যোগ্য করে তোলা হয়েছিল।

Stratford এর একটা কারখানায় মল ঘণ্টার মধ্যে একখানা ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ একত্রিত করে তাকে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল।

আত্মদান

[শ্রীযুতী প্রভাবতী দেবী]

পরিচিনী রাঙ্গা এক ষোড়শী তরুণী—
মনোহর কুসুমের বাসরেতে পশি,
দেখি গাছ-করা ফুল ফুলেতে পতিতা—
কহে তারে, "তুই ফুল অতীব কুৎসিতা"।
ফুল কহে "এক কালে তোমারি মতন,
ছিল রূপ, রস, মধু, ছিল গো যৌবন;
রূপ—যৌবন চালি প্রকৃতির পায়,
সুবাস ছড়ায়ে দিয়ি মলয়ের গায়।
মধুপ মধুরে করায়েছি পান,
হয়েছি কুরূপা এবে নিরস পরাণ।
যাহা কিছু ছিল মোর বিলায়ে সকলি,
নীরবে কালের কোলে পড়িয়াছি ঢলি'।

দুনিয়ার বিখ্যাত লেখক টলষ্টয় ১৯১০ তাঁর বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা গাছের তলিতে তাঁর শেষ উইল লিখে রেখেছিলেন। এই উইলে তিনি তাঁর সকল-সাহিত্য-সম্পত্তি তাঁর কন্যা আলেকজান্দ্রাকে দান করে যান। এই উইলে তিনি অন্যান্য কথার পর এই কথা লেখেন—

"যেখানে অনেক গরীব সেখানেই আমার কবর দিয়ো। যদি আমি শহরেই মারা যাই, তবে এমন যায়গায় আমার কবর দিবে, সেখানে সবচাইতে কম খরচে কাজ হবে। আর সবচাইতে কম ঘোড়ার কফিন ব্যবহার করবে—যে রকমটা কপর্দকহীনের বেলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কবরে ফুল বা ফুলের মালা দিতে পারবে না, বক্তৃতা হতে পারবে না।"

পতিতোদ্ধারের চেষ্টা

গত ৩রা ফাল্গুন এই জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতা ওভারটাইম—হলে মহাসমিতি এ্যাণ্ড্রুজের সভাপতিত্বে কলিকাতা—সহরের "ভিজিলেন্স এসোসিয়েশনের" উদ্যোগে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। ছিল ছিজন্ ব্যাপী একজন ইংরেজ মহিলা সভায় একটী বক্তৃতা দেন এবং সে প্রসঙ্গে বলেন যে বোম্বাই সহর দেখিয়া তাঁহার ভারতীয় সহরগুলির নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। যাহাতে সমাজ হইতে এই পাপ বিদূরিত হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা আবশ্যক। এজন্য ছাত্র সম্প্রদায়ের সাহায্য একান্ত আবশ্যক এবং সহরের পতিতোদ্ধার সমিতি এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। যাহাতে এই সকল আশ্রমে ফিরার সময়োপযুক্ত মুক্তকে দিকে আকৃষ্ট করা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানগুলিতে এই প্রকার আশ্রমের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণের সাহায্য চাই। ডাক্তার এ্যাণ্ড্রুজ, মিঃ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং মাননীয় চুনীলাল বসুর বক্তৃতা দেন। পরে, সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, তাহাতে কলিকাতা সহরের এই প্রকার বীভৎস পাপ ব্যবসার হইতে নিম্ন নারী-হিন্দুকে রক্ষা করা হয় তজ্জন্য কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয় যে তাহারা যেন উপযুক্ত লাইসেন্স প্রথা, এবং অন্য অন্য উপায়ে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন এবং সহরের শাসনের হিতকারী ব্যক্তিগণ যাহাতে এই কার্য্যে যোগদান করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয়।

আজ্ঞাবহ।

"চন্দ্রশেখর" বিভ্রাট

বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র প্রবোধচন্দ্রবাবু মনোমোহন থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয়ের নামে ড্যামেজের নালিশ করিয়াছেন। মনোমোহন বাবুর অপরাধ তিনি উক্ত গ্রন্থের বন্ধ পীড়িত দুঃস্থজনের সাহায্যার্থ অভিনয় রজনীতে চন্দ্রশেখরের অভিনয় করাইয়াছিলেন। তাঁহার আরও অপরাধ তিনি গ্রন্থকারের উত্তরাধিকারীগণের অনুমতি [illegible] নাই। বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্রগণ স্বকীয় সাহিত্য সম্রাটের গ্রন্থগুলির অভিনয় দ্বারা [illegible] উপার্জ্জন করিয়া যাবেন। মনোমোহনবাবু তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ, মাসিয়াই ঐ রাত্রে চন্দ্রশেখর অভিনয় করিয়াছেন—তাহারই ক্ষতি পূরণের দাবী দিয়া নালিশ করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র বাবুটির জানা উচিত ছিল, মনোমোহনবাবু ঐ রাত্রের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ উক্ত বন্ধ পীড়িতগণের সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার লাভ কিছুই হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী প্রসূত গ্রন্থের অভিনয় হইলে কিঞ্চিৎ বেশী টাকার টিকিট বিক্রয় হয়, অভাগা বন্ধ বিপন্নগণ কিছু বেশী সাহায্য পায়—এই উদ্দেশ্যেই মনোমোহনবাবু কার্য্যটি করিয়া ছিলেন। মকর্দ্দমা এখনও বিচারাধীন—ফলাফল কালেই অজ্ঞাত। আমরা তাহার [illegible] না।

বক্তব্য এই [illegible] একটি [illegible] অস্থিত্ব অবগত হইয়াও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] এরূপ একটা [illegible] কার্য্য করিলেন কেন? সম্রাটের কন্যা এখনও জীবিত, [illegible] সন্তান হইয়া তিনি [illegible]

বিচার ফল যদি মনোমোহনবাবুর বিপক্ষে হয়, এক রাত্রির অভিনয় [illegible] তাঁহাকে কিছু অর্থদণ্ড ও দিতে হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোনই ক্ষতি হইবে না কিন্তু কোন কারণেই যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ কোন রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষই অভিনীত করাইবেন না, তাহা বেশ বলা যায়। আর্থিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারীগণ এতটুকু ক্ষতিস্বীকার করিতে পারিলেন না, আর এই অভিনয় বন্ধ হইলে দেশের যে কতটা ক্ষতি হইবে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের যে অপূরণীয় অবদান হইবে সে দিকে তাঁহারা একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না—এই আশ্চর্য্য! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের মাতামহ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ-দেশেরই, এ দেশবাসীরই! বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দেশবাসীর একটা দাবী আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। সে দাবী উদ্ভেদ করিবার [illegible] কাহারো নাই, কস্মিনকালেও হইবে না।

সুগায়িকা শ্রীযুক্তা সুবাসিনী।

বড়দিনের সময় রঙ্গালয় বড় বড় প্রাকার্ড দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কই সুগায়িকা শ্রীযুক্তা সুবাসিনী "ষ্টারে" যোগদান করিলেন? থিয়েটার জমীভূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সুবাসিনীর সুধা কণ্ঠের গান শুনিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। "ষ্টারের" প্রাকার্ড দেখিয়া আশা হইয়াছিল, এইবার আবার আমরা তাঁহার গান শুনিয়া আনন্দানুভব করিতে পারিব। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত "ষ্টারের" কোন নাটকেরই অভিনয়ে সুবাসিনীর নাম দেখিলাম না। যোগদানই যদি করিলেন এমন আত্মগোপন করিবার অর্থ কি? "ষ্টার" কি কোন নূতন বহির মহলা দিতেছেন? সুধাকণ্ঠী সুবাসিনী সেই গ্রন্থের ভূমিকাতেই বোধ করি প্রথম দর্শন দিবেন—আই বি?

নাটকাভাব।

[illegible] দেখিতেছি নাটকের অভাব ঘটিয়াছে। মনোমোহন [illegible] ও মাতামহীর আশ্রয়ে [illegible] নাটক খুলিয়াছে [illegible] "ষ্টার" যোগাড়া [illegible] করিয়া চলিয়াছেন। এক কর্ণ[illegible] আবার [illegible]। বাকী মিনার্ভা! তাহাদের কথা আর বলা নাই, সম্প্রদায়টি যে এখনো জীবিত, সেই যথেষ্ট।

আজ দ্বিজেন্দ্রলাল নাই, গিরিশচন্দ্র নাই, অতুলকৃষ্ণ নাই, থাকিবার মধ্যে আছেন বুড়ো-দাদা অমৃতলাল, আর পণ্ডিত মহাশয়। বুড়োদাদা ও গুরুগুরীর প্রেমেই মসগুল, আর কীরোদ প্রসাদের প্রতিভারও সে তেজ নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে আরও কয়েকজন নাট্যকার নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তবুও নাটক-নদীতে এমন ভাটা পড়িবার কারণ কি?

[illegible] বিদেশ

[illegible] মজলিসের মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সাহেব আদালতের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কলিকাতার এই দুর্দিনে [illegible] মৌলানা সাহেবের [illegible] সকলকে [illegible] করিয়াছে।

[illegible] ফরাসী সোশালিষ্ট [illegible] বিরুদ্ধে অনাস্থা [illegible] করেন, কিন্তু প্রীকমাবিদীর সোশালিষ্ট [illegible] আনেন প্রথমে করিতে অসীকার করিয়াছেন। প্রীকমাবিদী এখন [illegible]

[illegible] ফরাসী [illegible] প্যারীতে বিদ্যুৎশক্তি-[illegible] যে বৈঠক বসিয়াছে তাহার আবহাওয়াও সুবিধাজনক নহে। ইহাদেরকে কোনরূপ কড়িপূরণ আদায় করিবার জন্য যে সকল উপায়ের কথা বলিয়াছেন কমানী তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহে। কিন্তু কোনার সাহেব এই প্রস্তাব লইয়া কমানী সংবাদপত্রসেবকদের [illegible] পুঁজির সিনেমা "ম্যাজিক," "ইকো প্যারী," "গীজারিন" "লেটিট [illegible] প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন সংবাদপত্রের [illegible] যে, যদি [illegible] পরিবর্তন করিয়া [illegible] করা হইবে। ফরাসী মন্ত্রী এই পরিকল্পনার কোনরূপ ধৈর্যের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকারে [illegible] করিতে [illegible] ইহা [illegible] এবং অন্য দুইটী ইউরোপীয় দেশের প্রতিনিধি লইয়া যে, [illegible] কমিশন বসাইবার কথা যিনি কোনার্স বলিয়াছেন, উহার মতে [illegible] করিলে কোন কাজই হইবে না। এই সকল বাদানুবাদের পর বৈঠক ঐ তিন বিষয়ের মত স্থগিত রহিয়াছে। আরও প্রকাশ এই পরিকল্পনার ফরাসী মৈত্র চালনা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কেনিয়ার ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে তাহা খুলিয়া বলা [illegible] ভারতীয়দের [illegible] যাহাতে ঐক্য ভাব বজায় রাখিয়া নিজের জন্য আন্দোলন করিতে পারেন।

[illegible] জানুয়ারী মাসীনের পরের প্রকাশ, মুসলমান ভিন্ন পরিচালকের [illegible] মজলিসের [illegible] জন্য [illegible] ঐ তিন পদের [illegible] এক তৃতীয়াংশ আসন খালি হইয়া গিয়াছে। মুসলীম-প্রতিনিধি [illegible] যে এলাকার হইতে [illegible] সেই [illegible] ভোটের জোর হইবে না। তাহারা প্যারীতে [illegible] উপরও [illegible] মুসলিম-ভোটের [illegible] করিয়াছেন। এই [illegible] ফরাসী ভোটারদের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible]

[illegible] পত্রের [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] সংবাদপত্র। ঐ সংবাদপত্র [illegible] যে, ঐ [illegible] ভারতের [illegible] খুব কাজে লাগিতে পারে।

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] [illegible] সোনা যাইতেছে।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত শুক্রবার রাত্রে পরলা [illegible] মোখার্জী মহাশয় তাঁহার [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

"ডাইলস অব ইণ্ডিয়া" পত্রে একজন চিঠি লিখিয়া [illegible] করিয়াছেন, [illegible] [illegible]? সম্প্রতি [illegible] দেখিয়া এখন বোঝা গিয়াছে যে [illegible] ইহাদের [illegible] [illegible] নাই। ৩০ হাজার [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible]

পর দিন হাইকোর্টে ডিক্রীজারি বিষয়ক ও মুসলমানদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় মকদ্দমার আপীলের ওকালী হয়। ডিক্রীজারি বিষয়ক মকদ্দমা উপস্থিত হইলে জজেরা বলিলেন, তাঁহারা উভয়ে এই আপীল সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিয়া দুইজনেই পৃথক্ পৃথক্ রায় দিবেন। সুতরাং তাঁহারা এখানি ডিক্রীজারির বিষয় অন্য একজন বিচারপতি সমীপে প্রেরণ করিতে এবং এই মোকদ্দমায় আপীল নিষ্পত্তি করিতে অনুরোধ করিবেন।

আমেরিকার প্রতীচ্য প্রান্তস্থিত বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া ইংলণ্ডের পালামেণ্টে প্রধানমন্ত্রি মহাশয় বক্তৃতা করিবার অবসর দিয়াছেন। তুর্কির সম্বন্ধেও আজি পাকা কথা হইয়াছে যে, তুর্কি সৈন্যগণ যুদ্ধের প্রস্তাবনায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাপতির বিপুল তুর্যধ্বনি উত্তীয়মান হইয়া তাবৎ অধীন হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে ইংলণ্ডের পরিচয়ের সহিত যুক্ত করিবার ফলে তুর্কির যে সৈন্য সাবধ ও সমর সজ্জার ছিল, তৎসমুদায় তাহা হইতে অনেক দূরে বাড়িয়া গিয়াছে। তুর্কির সৈন্যবাহিনী এখন বিপদ অনুসরণী আকার ধারণ করিয়াছে।

"সুদূর ইউরোপ যাহাতে তুর্কির পার্শ্ব ও রাজধানীকে ভোগ করিতে না পারে সেজন্য অতিসিদ্ধান্তরূপে চেষ্টা করিতে" ইংলণ্ডের পালামেণ্ট আমোদ সহকারে আদেশ দিয়াছেন।

বিলাত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ স্টীফেন, একদিনে দুই তিনটা ও ছয়টা দশ মুখর দুই ব্যক্তির বিচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই অভিযোগ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নামে একজন চতুর্থ শ্রেণীর যুবক বিরুদ্ধে রেলিয়া ব্রাঞ্চিকালে বিনাটিকিটে বিনা বাধায় যাইতেছিলেন। এজন্য আদালতের উপরে পীড়ন পূর্বক একখানি ফোর্থ ক্লাসের টিকিট ক্রয় করিয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। ভূপেন্দ্র তখন তাহার পকেট হাতড়াইয়া দেখিলেন, তাহার পকেটে আর একটি পয়সাও নাই। তখন তিনি বিচারকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, তাঁহার পকেটে

...বেলা আর কলসী ভরে নেওয়া,
এইল পড়ে, জমল তোলা দায় ;
বেলোনা আর বাড়ী ফিরে যাওয়া:

শিল্পী—শ্রীপরেশচন্দ্র বসু। বাঁশীর গানে ভাকছে [illegible]

Lakshmibilas Press